স্বাস্থ্য সবার অধিকার

প্রতিবেদন

স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন

এপ্রিল ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাস্থ্য সবার অধিকার

প্রতিবেদন

স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন

এপ্রিল ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রতিবেদন • স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই-আগস্ট ২০২৪-এ
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহীদ বীরদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত

একটি বৈষম্যহীন ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠায় তাদের স্বপ্নের সহায়ক হোক এই স্বাস্থ্যখাত সংস্কার প্রস্তাবনা

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
আদ্যাক্ষর ও শব্দ সংক্ষেপ	৭
মুখবন্ধ	৯
নির্বাহী সারসংক্ষেপ	১১
মূখ্য সুপারিশসমূহ	৩২
পরিচ্ছেদ ১: ভূমিকা	৪৭
পরিচ্ছেদ ২: পদ্ধতি	৪৮
পরিচ্ছেদ ৩: স্বাস্থ্য সেবাদান ও ভৌত অবকাঠামো	৫৩
পরিচ্ছেদ ৪: নেতৃত্ব, সুশাসন ও কর্মসংস্কৃতি	৯৭
পরিচ্ছেদ ৫: স্বাস্থ্য জনবল ব্যবস্থাপনা	১৪২
পরিচ্ছেদ ৬: স্বাস্থ্য জনবলের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ	১৪৯
পরিচ্ছেদ ৭: অত্যাবশ্যকীয় ঔষধপত্র, চিকিৎসা প্রযুক্তি ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ	১৫৫
পরিচ্ছেদ ৮: স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা	১৭৩
পরিচ্ছেদ ৯: স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়ন	১৯১
পরিচ্ছেদ ১০: স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনা	২৭৫
Further Readings / References	২৭৭
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	৩০০
পরিশিষ্ট	৩০১

আদ্যাক্ষর ও শব্দ সংক্ষেপ

API	Active Pharmaceutical Ingredient
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
BCGP	Bangladesh College of General Practitioners
BCPS	Bangladesh College of Physicians and Surgeons
BDHS	Bangladesh Demographic and Health Survey
BHC	Bangladesh Health Commission
BHCI	Bangladesh Health Care Improvement
BHFS	Bangladesh Health Facility Survey
BHS	Bangladesh Health Services
BICE	Bangladesh Institute of Health Care Excellence
BMDC	Bangladesh Medical and Dental Council
BMEAC	Bangladesh Medical Education Accreditation Council
BMMS	Bangladesh Maternal Mortality Survey
BMRC	Bangladesh Medical Research Council
BNMWC	Bangladesh Nursing and Midwifery Council
BUHS	Bangladesh Urban Health Survey
CASH	Centre for Advanced Specialized Healthcare
DGDA	Director General of Drug Administration
DGFP	Director General of Family Planning
DGHS	Director General of Health Services
DHIS	District Health Information System
DGME	Director General of Medical Education
EDCL	Essential Drugs Company Limited
eMIS	Electronic Medical Information System
eLMIS	Electronic Laboratory Management Information System
EML	Essential Medicine List
FDA	Food and Development Agency
FWVTI	Family Welfare Visitor Training Institute
GMP	Good Manufacturing Practice
HED	Health Engineering Department
HRIS	Human Resource Information System
HiAP	Health in All Policies
HSRC	Health Sector Reform Commission
HTA	Health Technology Assessment
ICMH	Institute of Maternal and Child Health

IEDCR Institute of Epidemiology, Disease Control and Research
IPH Institute of Public Health
IPHN Institute of Public Health Nutrition
mHealth Mobile Health
MICS Multiple Indicators Cluster Survey
MOHFW Ministry of Health and Family Welfare
MRP Maximum Retail Price
NDN National Diagnostic Network
NEMEW National Electromedical Equipment Workshop
NICVD National Institute of Cardiovascular Diseases
NIKDU National Institute of Kidney Diseases and Urology
NIMH National Institute of Mental Health
NILMRC National Institute of Laboratory Medicine and Referral Centre
NIPORT National Institute of Population Research and Training
NIPSOM National Institute of Preventive and Social Medicine
NINS National Institute of Neurosciences
NITOR National Institute of Orthopedics, Traumatology and Rehabilitation
OOPE Out-of-Pocket Expenditure
OTC Over the Counter
PPP Public-Private Partnership
PFM Public Financial Management
RDI Research, Development and Innovation
RTC Regional Training Centre
SCMP Supply Chain Management Portal
SDOH Social Determinants of Health
SHI Social Health Insurance
SVRS Sample Vital Registration System
TRIPS Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
UHC Universal Health Coverage
WFME World Federation for Medical Education
WHO World Health Organization

মুখবন্ধ

স্বাধীনতার পরবর্তী দশকগুলিতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা খাতে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা (Universal Health Coverage বা UHC) অর্জনে বাংলাদেশে অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

দেশে মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে, মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হ্রাস পেয়েছে এবং সংক্রামক রোগের প্রকোপ ও বিস্তার কমেছে—তবে এর বিপরীতে অসংক্রামক রোগ এখন প্রাধান্য বিস্তার করছে।

স্বাস্থ্য সেবার অপ্রতুলতা, দুর্বল মান এবং শ্রেণী, গোষ্ঠী, অঞ্চল ও লিঙ্গভেদে ব্যাপক বৈষম্য দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় প্রকট সংকট তৈরি করেছে। এতে অনেক মানুষকে চিকিৎসার জন্য ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে, এমনকি বিদেশেও যেতে হচ্ছে। আবার অন্যদিকে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিবর্তে বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার অনিয়ন্ত্রিত এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক বিকাশ ঘটেছে যেখানে, সেবার মান ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ একটি চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করেছে।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলোর অন্তরালে রয়েছে সুশাসনের অভাব, যেমন অপ্রতুল সরকারি বরাদ্দ ও বিনিয়োগ, অপর্যাপ্ত জনবল এবং অনিয়ন্ত্রতিত দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে, ২০২৪-এ ছাত্র-জনতার জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের মূল চেতনার সূত্র ধরে, বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন গঠন করে। সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী এ কমিশনের মূল উদ্দেশ্য হলো স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে জনমুখী, সহজলভ্য ও সর্বজনীন করা।

উপরোক্ত উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রায় চার মাস ধরে কমিশনের সদস্যগণ তাদের সম্মিলিত চিন্তা-ভাবনা ও মতামতের প্রতিফলন হিসেবে বর্তমান প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছেন। কমিশন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, জবাবদিহিমূলক এবং টেকসই স্বাস্থ্যব্যবস্থার রূপরেখা তৈরি করতে কাজ করেছে। এই প্রক্রিয়ায় কমিশন এদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, এবং সেবাগ্রহণকারী বিবিধ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে মত বিনিময় করেছে। উল্লেখ্য যে, এ সংস্কারের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে স্বাস্থ্যের জৈবিক নিয়ামকগুলির বাইরেও সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক, জলবায়ু ও প্রযুক্তিগত নিয়ামকগুলির গুরুত্ব অনুধাবন করা হয়েছে এবং কমিশন প্রথাগত স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও অংশীজনদের বাইরেও সরকারি - বেসরকারি নানান প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করেছে। পরামর্শগুলির পর্যালোচনায় 'হেলথ ইন অল পলিসি' ও 'ওয়ান হেলথ পলিসি'- র সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনে চারটি কৌশলগত অগ্রাধিকারকে ভিত্তি করে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে: প্রাথমিক সেবা শক্তিশালীকরণ, সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা (UHC) অর্জন, প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, এবং আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ। রোগী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সন্তুষ্টি, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন চিকিৎসা শিক্ষা এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর সেবার মাধ্যমে দেশে বিশ্বস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলার রূপরেখা এই প্রতিবেদনের মূল উপজীব্য।

বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও জনবল সৃষ্টি কার্যক্রম নানান কারণে কিছুটা অসংলগ্ন। এই কার্যক্রমগুলো অপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের অধীনে ছড়িয়ে থাকায় উপরোক্ত নীতিমালার বাস্তবায়নে, একটি একক নীতি নির্ধারক ও সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে এবং কমিশন কর্তৃক এ বিষয়ে সুস্পষ্ট সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া প্রথাগত ব্যবস্থার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী ও বিশেষজ্ঞদের দ্বারা স্বাস্থ্য-পুষ্টি-জনসংখ্যা বিষয়ক নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন এ সংস্কার প্রস্তাবনার একটি প্রধান বিষয়। স্বাস্থ্য সেবায় কাঙ্খিত উন্নয়নের প্রধানতম বিষয় হিসেবে সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কাঠামোবদ্ধ রেফারেল পদ্ধতির দ্বারা রোগীর সেবার মাধ্যমে সেকেন্ডারি ও উচ্চতর ক্লিনিক্যাল সেবা প্রদানের ব্যবস্থাকে কমিশন বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে।

এই প্রতিবেদন প্রণয়নে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার উদ্যোগ এবং মাননীয় স্বাস্থ্য উপদেস্টা, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ সহকারী, ও সকল অংশীজনের সুচিন্তিত তথ্যাদি ও পরামর্শ এই কমিশন কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করছে। সকলের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াস ও পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়িত হবে - এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছি। সেই সঙ্গে এই প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়নে কোন সহায়তার প্রয়োজন হলে কমিশনের সদস্যগণ সানন্দে অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করছে।

জাতীয় অধ্যাপক ডা. এ কে আজাদ খান
সভাপতি, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি
কমিশন প্রধান, স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন

ডক্টর আবু মোহাম্মাদ জাকির হোসেন
সভাপতি, কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট
সদস্য, স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন

প্রফেসর লিয়াকত আলী
চেয়ারম্যান, পথিকৃৎ ফাউন্ডেশন
সদস্য, স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন

প্রফেসর ডা. সায়েবা আক্তার
গাইনোকলজিস্ট
সদস্য, স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন

প্রফেসর ডা. নায়লা জামান খান
শিশু স্নায়ুতন্ত্র বিভাগ
সদস্য, স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন

এম এম রেজা
সাবেক সচিব
সদস্য, স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন

প্রফেসর ডা. মোঃ মোজাহেরুল হক
সাবেক আঞ্চলিক উপদেষ্টা(দক্ষিন-পূর্ব এশিয়া অঞ্চল),
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
সদস্য, স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন

ডা. আজহারুল ইসলাম খান
কনসালট্যান্ট, আইসিডিডিআর,বি
সদস্য, স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন

অধ্যাপক ড. সৈয়দ মো: আকরাম হোসেন
স্কয়ার ক্যান্সার সেন্টার, স্কয়ার হাসপাতাল
সদস্য, স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন

প্রফেসর ডা. সৈয়দ আতিকুল হক
চিফ কনসালটেন্ট, গ্রীন লাইফ সেন্টার ফর রিউম্যাটিক
কেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ
সদস্য, স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন

ড. আহমদ এহসানুর রহমান
বিজ্ঞানী, আইসিডিডিআর,বি
সদস্য, স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন

উমাইর আফিফ
শিক্ষার্থী, ৫ম বর্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ
সদস্য, স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

ক) ভূমিকা

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে অনেক প্রশংসনীয় অগ্রগতি হয়েছে। মূলত টিকাদান, পুষ্টি, মা-শিশু স্বাস্থ্য, সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। একই সাথে নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা ইত্যাদি সহায়ক কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্যক্ষেত্রের বিভিন্ন সূচকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে দেশের সংবিধান এবং বিভিন্ন জাতীয় নীতিমালা ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার অনুসারে (বিশেষত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি) সকল নাগরিকের জন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে অগ্রগতির ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিগত বছরগুলিতে স্বাস্থ্য খাতে এ দেশের অগ্রগতি শ্লথ হয়েছে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পুরোপুরি থেমে গেছে কিংবা পশ্চাদমুখী হয়েছে। ফলে প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্য অর্জন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ এখনো একটি ন্যায্য (equitable),মানবিক ও টেকসই স্বাস্থ্যব্যবস্থা গঠনের পথে দৃশ্যমান বাধাগুলোকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ক্যানসারসহ অসংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি, মানসিক স্বাস্থ্যসেবার ঘাটতি, জরুরী চিকিৎসা ও মানসম্মত সেবার অপ্রতুলতা, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং স্বাস্থ্যসেবা গ্রহনে ব্যক্তি-পর্যায়ে খরচ জনগণের ওপর তীব্র চাপ তৈরি করছে। পাশাপাশি দুর্নীতি, সক্ষমতার ঘাটতি, ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা এবং চিকিৎসা শিক্ষায় নিম্নমান ভবিষ্যতের জন্য একটি গুরুতর হুমকি হয়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ স্বাস্থ্যখাতে আজ এক জটিল বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছে।

জুলাই ২৪-এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্যখাতকে জনমুখী, সহজলভ্য ও সর্বজনীন করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। এ সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কমিশন নিম্নলিখিত বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছে: ১) একটি ন্যায্য ও অধিকার-নির্ভর সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলা; ২) প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো ও জনবল শক্তিশালী করা; ৩) জরুরী চিকিৎসা সেবার উন্নয়ন, ৪) স্বাস্থ্যব্যবস্থায় সুশাসন, আর্থিক স্বচ্ছতা ও দুর্নীতির প্রতি শূন্য সহনশীলতা নীতি প্রবর্তন; ৫) মানসম্পন্ন চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রযুক্তিনির্ভর চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি; ৬) জনসাধারণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনতে রোগী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সন্তুষ্টি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; এবং ৭) স্বাস্থ্যসেবা গ্রহনে ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয় উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়ে নিয়ে আসা।

এই প্রতিবেদন তৈরির কাজটি একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয় ছিল, যেখানে দীর্ঘ দিনের দুর্নীতি, অনিয়ম, পক্ষপাত, রাজনীতি প্রভাবিত কর্মকান্ড, অযোগ্য লোকদের নিয়োগ এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পরিসংখ্যান ও বিকৃত তথ্য পুরো স্বাস্থ্যখাতের ক্ষতি করেছে। এসব চ্যালেঞ্জিং দিক তথ্য সংগ্রহে বড় বাধা সৃষ্টি করেছে। প্রচলিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কমিশন তথ্য সংগ্রহের ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছে।

খ) পদ্ধতি

এই প্রতিবেদন প্রণয়নে একটি বহুমাত্রিক ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক বিশ্লেষণ, অংশীজনের মতামত এবং নীতিনির্ধারণে প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

একটি বহুমাত্রিক ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে এই প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণী প্রাসঙ্গিক বিবিধ তথ্য-উপাত্ত, অংশীজনের মতামত, জরিপ থেকে প্রাপ্ত জনমত এবং সরেজমিন পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য ও মতামত বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

১. প্রকাশনা পর্যালোচনা (Literature Review): প্রাসঙ্গিক নীতিমালা, আইন, গবেষণা প্রতিবেদন এবং পরিকল্পনাগুলোর ভিত্তিতে প্রকাশনা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে জাতীয় সকল নীতি , সেক্টর পরিকল্পনা, কৌশলপত্র, গাইডলাইন, সার্ভে ইত্যাদি। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের এবং শিক্ষাবিদ-গবেষকদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত প্রাসঙ্গিক সকল

প্রকাশনাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়া স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সফলতা অর্জনকারী দেশ যেমন থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর, ভারত, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া , রুয়ান্ডা, ভিয়েতনাম ও কিউবার স্বাস্থ্যনীতি ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণা ও নীতিমালা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণ স্বাস্থ্যখাতে বৈশ্বিক ও স্থানীয় বাস্তবতা মিলিয়ে প্রাসঙ্গিক, প্রয়োগযোগ্য ও প্রমাণভিত্তিক সুপারিশ প্রণয়নে সহায়ক হয়েছে।

২. কমিশনের কার্যালয়ে অংশীজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনা: কমিশন কর্তৃক পরিকল্পিত একটি তালিকা অনুসারে স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে নির্দিষ্ট দিনক্ষণে কমিশন সাক্ষাৎ আলোচনা করেছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, শিক্ষাদান, গবেষণা, সামাজিক আন্দোলন, সাংবাদিকতা ইত্যাদি নানাবিধ কর্মকান্ডে এ সকল প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তি পর্যায়ের অংশীজনের সংশ্লেষ রয়েছে।

৩. কমিশন কর্তৃক দেশের বিভিন্ন স্থানে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভার আয়োজনঃ নিজস্ব কার্যালয়ে সাক্ষাৎ মতবিনিময় ছাড়াও কমিশন দেশের বিভিন্ন স্থানে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় ও পরামর্শ সভার আয়োজন করেছে।

৪. **তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ:** স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, জাতীয় স্বাস্থ্য হিসাব (National Health Accounts) এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অসংক্রামক রোগ, মাতৃমৃত্যু, শিশুস্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য ব্যয় এবং স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনে ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয়ের হার - এসব বিষয়ে বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৪. **সরেজমিনে পরিদর্শন ও মতবিনিময়ঃ** কার্যালয় ও নির্দিষ্ট স্থানে আলোচনা ছাড়াও কমিশন সংশ্লিষ্ট বিবিধ প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রম পরিদর্শনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। পরিদর্শনকালে চিকিৎসক-নার্স ছাড়াও বিবিধ পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের সঙ্গে একক ও যৌথ মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং সেই সঙ্গে সেবা গ্রহণকারীদের মতামত গ্রহণ করা হয়। স্থান ও প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের সময় দুর্গম এলাকা ও অবহেলিত ডিসিপ্লিনগুলির ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে।

৫. **জনমত জরিপ :** স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশনের অনুরোধে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) একটি জনমত জরিপ পরিচালনা করেছে। সুপারিশ প্রণয়নে এই জরিপের ফলাফল গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

জনমত জরিপটি পরিচালনার লক্ষ্যে সমগ্র দেশের আটটি বিভাগ (শহর ও পল্লী এলাকা) হতে প্রায় ৩৪৪ টি প্রাথমিক নমুনা এলাকা (শুমারি গণনা এলাকা) নির্বাচন করা হয়। জরিপ পরিচালনার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত প্রতিটি নমুনা এলাকা হতে নমুনায়নের মাধ্যমে ২৪টি সাধারণ খানা নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত প্রতিটি থানা হতে ১৮ বা তদূর্ধ্ব বয়সী একজনের নিকট হতে নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এভাবে দেশব্যাপী প্রায় ৮২৫৬ জন নাগরিকের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ পূর্বক উক্ত জরিপের উপাত্ত বিশ্লেষণসহ রিপোর্ট প্রণয়নের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। জরিপের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমে জনশুমারি ও গৃহ গণনা ২০২২ - এর ভিত্তিতে প্রণীত ইন্টিগ্রেটেড মাল্টিপারপাস স্যাম্পলিং (আই এম পি এস) ব্যবহার করা হয়।

খানাভিত্তিক জরিপের প্রশ্নপত্রটি নিম্নোক্ত ৪টি সেকশনে বিভক্ত করা হয়:

সেকশন ১ - খানা সদস্যদের তালিকা ও পরিচিতি

সেকশন ২ - জনগণের স্স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি বিষয়ের অভিজ্ঞতা

সেকশন ৩ - জনগণের সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি বিষয়ে মতামত

সেকশন ৪ - নীতি নির্ধারণ বিষয়ে প্রশ্ন

জনমত জরিপ থেকে প্রাপ্ত মূল মতামতসমূহ:

- ৯৭% উত্তরদাতা জানিয়েছেন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিনা মূল্যে দেয়া প্রয়োজন;
- ঔষধের মূল্য, রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষার মূল্য ও ডাক্তারের পরামর্শ ফী বা অস্ত্রোপচারের ফি নির্দিষ্ট করার পক্ষে মত দিয়েছেন যথাক্রমে ৯৭%, ৯৬%, ৯৬% ও ৯৫% উত্তর দাতা;
- শহর অঞ্চলের ওয়ার্ডগুলোতে গ্রামীণ ইউনিয়ন পর্যায়ের মত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র তৈরী করার পক্ষে মত দিয়েছেন ৯২% উত্তর দাতা;
- চিকিৎসা, স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম তথা জনস্বাস্থ্য সেবা পৃথক অবকাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া উচিত, এ বিষয়ে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন ৭২% উত্তর দাতা;
- সহায়ক পদে কর্মরতদের বদলির পক্ষে মোট দিয়েছেন ৭৬% উত্তর দাতা;
- ৬৮% উত্তর দাতা এমবিবিএস ডাক্তার ছাড়া অন্য কারো প্রেসক্রিপশনে এন্টিবায়োটিক বিক্রী না করার পক্ষে মত দিয়েছেন;
- স্বাস্থ্যসেবা ব্যয়ের বেশির ভাগের দায়িত্ব থাকা উচিত সরকারের এই মত ৯২% উত্তর প্রদানকারীর;
- স্বাস্থ্যহানিকর খাদ্য, পানীয় ও ভোগ্যপণ্যের উপর উচ্চহারে কর প্রয়োগ করা উচিত এই বিষয়ে একমত ৭৯% উত্তরদাতা;
- স্বাস্থ্যবীমা গ্রহণে আগ্রহী ৭১% উত্তরদাতা;
- স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিচালিত একই ধরনের সেবাক্রম একীভূত করা উচিত বলে মনে করেন ৬৭% উত্তরদাতা।

উপস্থাপন:

স্বাস্থ্য খাত সংস্কারের সুপারিশগুলোকে ৭টি স্তম্ভে ভাগ করে উপস্থাপন করা হয়েছে। স্তম্ভগুলো হলোঃ

১. স্বাস্থ্য সেবাদান ও ভৌত অবকাঠামো
২. নেতৃত্ব, সুশাসন ও কর্মসংস্কৃতি
৩. স্বাস্থ্য জনবল ব্যবস্থাপনা
৪. স্বাস্থ্য জনবলের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
৫. অত্যাবশ্যকীয় ঔষধপত্র, চিকিৎসা প্রযুক্তি ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ
৬. স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়ন
৭. স্বাস্থ্য তথ্যব্যবস্থা

গ) পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং চ্যালেঞ্জসমূহ :

১) স্বাস্থ্য সেবাদান ও অবকাঠামো

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের একটি বিশাল স্বাস্থ্যকর্মী দলের ব্যবস্থাপনা করে থাকে।বাংলাদেশের সরকারি স্বাস্থ্য খাতে প্রথম থেকে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত অনুমোদিত পদ দুই লক্ষ ৩৬ হাজার ৮২৮ টি। এর মধ্যে কর্মরত মোট জনবল হচ্ছে এক লক্ষ ৭৩ হাজার ২৬১। মোট ৬৩ হাজার ৫৭১টি পদ শূন্য রয়েছে, যা মোট পদের শতকরা ২৭ ভাগ। কোনও কোনও শ্রেণীর কর্মচারীরের পদের শূন্যতার হার গ্রামীণ এলাকায় ৪০ শতাংশ। পক্ষান্তরে শহর এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য প্রদানের জন্য রয়েছে নাম মাত্র অবকাঠামো।এসডিজির লক্ষ্যমাত্রার আলোকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ মোতাবেক এসডিজি-৩ অর্জনের জন্য প্রতি ১০ হাজার জনগণের জন্য ২০২৫ সালে ৩১.৫ এবং ২০৩০ সালে ৪৪.৫ জন সেবা প্রদানকারী থাকার কথা, অথচ বাংলাদেশের এক তথ্য অনুযায়ী ২০২২ সালে প্রতি ১০ হাজারে কর্মরত ছিলেন ১১.৭০ জন। চাহিদা মোতাবেক উৎপাদনে অক্ষমতা, প্রয়োজনীয় নীতিমালার

অভাব এবং উপকরণের সীমাবদ্ধতার কারণে এই অনুপাত অর্জন করা কঠিন। তদুপরি, কর্মীদের বিতরণেও বৈষম্য রয়েছে, যেখানে শহুরে এলাকায় প্রতি এক হাজার ৫০০ জনে একজন চিকিৎসক সেবা দেন সেখানে গ্রামীণ এলাকায় এই অনুপাত ১৫ হাজারে একজন। অনুমোদিত পদের বিপরীতে সাধারণ এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ঘাটতি যথাক্রমে ২৫ শতাংশ এবং ৫৮ শতাংশ। এসব ঘটছে নিয়োগ প্রক্রিয়ার জটিলতা, স্বচ্ছতার অভাব, পদায়ন ও পদোন্নতিতে স্থবিরতার ফলে। যে কারণে বিদ্যমান কর্মীদের উপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, সেবার মান কমে যাচ্ছে, এবং গ্রামীণ জনগণ কাঙ্খিত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

দেশের প্রতিটি বিভাগে একটি করে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার বিভাগীয় পরিচালকের দপ্তর, প্রতিটি জেলা সদরে ৬৪টি সিভিল সার্জন ও পরিবার পরিকল্পনার উপপরিচালকের দপ্তর, ৬৩টি জেলায় সদর হাসপাতাল, ৪৩২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ১,৩৬২টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্র ও ৩,২৯১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র, ও ১৩,৯২৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে।অপরদিকে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের হাতে আছে ২৮৮টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র যার ১৬২টিই রয়েছে ইউনিয়ন পর্যায়ে। এর প্রতিটি ১০ শয্যা বিশিষ্ট (এগুলোকে এখন ক্রমাগত ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হচ্ছে ,(যার প্রতিটিতে দুজন চিকিৎসক থাকার কথা। যদিও এসব সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরস্ত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে (জেলা সদরে সদর হাসপাতালে) সেবাগ্রহীতা প্রেরণই এখন এসব প্রতিষ্ঠানের মুখ্য দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মোট কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ৫৫,০০০, এর মধ্যে ৬০৩ পদ আছে সাধারণ ক্যাডারভুক্ত, যার মধ্যে ৩৩০ জন কর্মরত আছেন। টেকনিকাল ক্যাডারে আছে ১,১২০টি পদ চিকিৎসকদের জন্য। একই অধিদপ্তরের এই দুই ক্যাডারের মধ্যে রয়েছে ভ্রাতৃত্ববোধের অভাব। এতদ্ব্যাতীত উপজিলা পর্যায় আছে ৫০ শয্যার অন্ত:বিভাগসহ অন্যান্য সেবার ব্যবস্থা, যেমন, দন্ত চিকিৎসা, রোগ নির্ণয়ের মৌলিক ব্যবস্থা ইত্যাদি।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীনে আরো আছে ঢাকা শহরের চারটি বিশেষায়িত হাসপাতাল । উল্লেখ্য যে এসব হাসপাতালে সেবা প্রদানকারীগণ মূলতঃ চিকিৎসক। তাদের কাজের পরিবেশ দায়িত্ব পালনের জন্য সহায়ক ও অনুকূল নয়। এছারাও নগর এলাকায় অন্যান্য কিছু মন্ত্রণালয়েরও রয়েছে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, নার্সিং ও প্যারামেডিকেল ইনস্টিটিউট, প্রাথমিক স্বাস্থ্য প্রদানের প্রতিষ্ঠান। যদি ও এসবের অবস্থান জনগণের বা নগর এলাকার আয়োজনের সমানুপাতিক নয়।

চিকিৎসাসেবা বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক, জটিল ও পেশাগত/কারিগরি জ্ঞান অপরিহার্য। কিন্তু স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক সিদ্ধান্তসমূহ চূড়ান্ত করেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা। তাই এসব সিদ্ধান্ত অগ্রগণ্যতা ও প্রায়োগিক বিচারের আলোকে অভ্রান্ত হয় না। পক্ষান্তরে, বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে অনেক সময় সেবার তুলনায় লাভের প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়া দেখা যায়।এসব সেবা প্রতিষ্ঠানের তদারকি করা এবং লাইসেন্সের শর্তাবলী প্রতিপালিত হচ্ছে কি না তা দেখার সামর্থ্য লাইসেন্স প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নাই। সরকারি হাসপাতালে সেবার মান এবং বেসরকারি হাসপাতালে সেবার মূল্য এবং অপ্রয়োজনীয় সেবা প্রদান নিয়ে প্রচুর সমালোচনা আছে। হাসপাতালের সেবার মান উন্নয়ন করার পৃথিবী-স্বীকৃত পদ্ধতি হলো সেবার মানের পদ্ধতিগত স্বীকৃতি তথা এক্রেডিটেশন যা দেশের সবার কাছেই কম পরিচিত।

বর্তমান স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা, সহজলভ্যতা, সমানুপাতিকতা ও ন্যায্যতা (সবার প্রতি সমান সন্মান প্রদর্শন) সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। আবার বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে তথা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞান সীমিত।

সেবা ব্যবস্থাপনার অতীতে অবলোকিত দুর্বল দিকগুলো হলো: অবকাঠামোগত দ্বৈততা; ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা; উপকরণের অভাব; ঔষধের, সেবার ও উপকরণের অহেতুক উচ্চ মূল্য; ভুল সিদ্ধান্ত তথা অগ্রগণ্যতা ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের অভাব; সেবা প্রদানকারীদের সময় ও সেবাকাজে পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগের অভাব; প্রশংসনীয় সেবার জন্য পুরস্কারের এবং অসন্তোষ উদ্রেককারী সেবা প্রদানের জন্য শাস্তির ব্যবস্থার সংস্কৃতির অনুপস্থিতি; স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সময়মত বদলি, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না করা; উচ্চশিক্ষিত জনস্বাস্থবিদদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোনও সুবিধা না দেয়া; জনগণের মধ্যে তথ্য প্রচারে দূর্বলতা; সেবা প্রদানকারীদের পরিপূর্ণ দলের অভাব; উচ্চ পরিমাণে পদ শূন্যতা; স্বাস্থ্য প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা; সেবা কাজে সুচারু পদ্ধতি অনুসরণের অভাব; রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষাগারের দূর্বলতা; আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব এসব পরিচালনায় দক্ষতার অভাব এবং দক্ষ

সেবা প্রদানকারীর স্বল্পতা; কর্মসূচি পরিচালনায় অর্থের অভাব; সংরক্ষণ ও মেরামতে দীর্ঘসূত্রীতা; ক্রয় ও সংগ্রহ কাজে অপরাধ প্রবণতা; স্বাস্থ্যসেবা কাজে দালালের ও ঔষধ কোম্পানিগুলির প্রতিনিধিদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ইত্যাদি।

বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে মূল স্বাস্থ্যগত সমস্যাগুলি বস্তুত: অসংক্রামক রোগভিত্তিক। শতকরা ৬৭ ভাগ মৃত্যু ঘটছে এই রোগগুলো থেকে। এর মধ্যে বিশিষ্ট কয়টি হলো: বার্ধক্যজনিত সমস্যা, স্ট্রোক, প্যারালাইসিস, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ক্যানসার, স্থূলতা, মানসিক সমস্যা, শ্বাসতন্ত্রের মেয়াদী রোগ। অন্যান্য প্রধান স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে রয়েছে সড়ক দুর্ঘটনা, শারীরিক অক্ষমতা এবং অস্ত্রোপচার পরবর্তী পুনর্বাসনের অসুবিধা। ক্ষয়িষ্ণু হাড় এবং পেশী রোগের পাশাপাশি, কিছু সংক্রামক রোগ এখনও একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা। প্রতিরোধযোগ্য মাতৃ, নবজাতক এবং শিশু মৃত্যুহার, অপুষ্টি এবং স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনায় অংশীদারদের দূর্বল সম্পৃক্ততা উদ্বেগের বিষয়। নিবিড় পরিচর্যা ইউনিট (আইসিইউ) পরিচালনা প্রশিক্ষিত পেশাদারদের অভাব রয়েছে।ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রায় প্রতিটি পরিবার বা বৃহত্তর পরিবারে ক্যান্সার রোগী আছে। রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেরি হওয়া এবং প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্তকরণের জন্য কোনো স্ক্রীনিং বা পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে।জনসংখ্যা এবং হাসপাতালভিত্তিক ক্যান্সার রেজিস্ট্রি না থাকায় দেশে ক্যান্সার রোগের প্রকৃত চিত্র জানা কঠিন হচ্ছে, ফলে সঠিক পরিকল্পনা ও প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে বড় বাধা সৃষ্টি হচ্ছে।স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা দূর্বল, যার ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন অকার্যকর হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশি রোগীদের বিদেশে চিকিৎসার জন্য যাওয়ার হার সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো সরকারি পরিসংখ্যান বা রিপোর্ট নেই। তবে বিভিন্ন সূত্র ও অনুমান অনুযায়ী, প্রতি বছর আনুমানিক ৮ লাখ রোগী চিকিৎসার উদ্দেশ্যে দেশের বাইরে যান। তাদের বেশিরভাগই ভারত, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের মতো দেশে চিকিৎসা গ্রহণ করেন।বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর ক্যান্সার চিকিৎসা, অঙ্গ প্রতিস্থাপন সার্জারি, হৃদরোগ, জটিল কিডনি রোগ ও বন্ধ্যাত্ব ব্যবস্থাপনার জন্য বিপুল সংখ্যক রোগী বিদেশে যান, যার ফলে কয়েক বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অপচয় হয়। ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে দেশটিতে চিকিৎসার বৈধভাবে ভিসা নিয়ে যাওয়া বাংলাদেশীর সংখ্যা বেড়েছে ৪৮ শতাংশ।এর মধ্যে বাংলাদেশীর সংখ্যা ছিল ২ লাখ ২১ হাজার ৬৯৪ জন, যা ওই বছরের মোট চিকিৎসা পর্যটকের ৪৪ দশমিক ৮ শতাংশ। তবে এর পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোগী নানা কারণে যথাযথ চিকিৎসা ভিসা না নিয়ে সাধারণ ভ্রমণ (ট্যুরিস্ট) ভিসায় অথবা কখনো কখনো অনিয়ম বা আবৈধ উপায়ে বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করেন।

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে দুটি পৃথক বিভাগে—স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ এবং চিকিৎসা শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে ভাগ করা হয় । এ বিভাজন ব্যবস্থাপনার উন্নতি করার পরিবর্তে বেশ কিছু সমস্যা তৈরি করেছে।

শহর এলাকার স্বাস্থ্য সমস্যা গ্রামীণ এলাকা থেকে কিছুটা ভিন্ন । হৃদরোগ, হাঁপানি, ক্যান্সার এবং ডায়াবেটিসের মতো রোগগুলি আরও জটিল হয় অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং কর্মপরিবেশ, অপর্যাপ্ত সবুজ স্থান, শব্দ, পানি এবং মাটি দূষণ, শহরে তাপ দ্বীপপুঞ্জ (হিট আইসল্যান্ড), এবং হাঁটা, সাইকেল চালানো এবং সক্রিয় জীবনযাপনের জন্য জায়গার অভাবের কারণে। উন্নত পরিবহন এবং হাঁটা/সাইকেল চালানোর অবকাঠামোর অভাব শহরগুলিতে স্থূলতা এবং শারীরিক নিষ্ক্রিয়তার সঙ্গে যুক্ত। নগরায়ন, হতাশা, উদ্বেগ এবং মানসিক অসুস্থতার উচ্চ হারের সাথেও যুক্ত। আরবান হেলথ সার্ভে ২০২১ থেকে জানা যায় যে শহর বা নগর এলাকায় শতকরা শুধু ৬০ ভাগ মানুষ তাদের বাসস্থানের এক কিলোমিটারের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের নাগাল পান।পৌর বা নগর এলাকায় কখনোই প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার কোনও অবকাঠামো গড়ে উঠে নাই। যদিও ১৯৭৫ সালের পৌরসভা আইন, ১৯৮৩ সাল থেকে প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন সৃষ্টির আইন এবং ২০০৯/২০১০ খ্রিস্টাব্দ সালের স্থানীয় সরকার (পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন) আইন এসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে জনস্বাস্থ্য এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের দায়ীত্ব প্রদান করেছে কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের পৌর/নগর অঞ্চলে এই আইন প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সক্ষমতা নাই। ১৯৯৮ সাল থেকে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিস ডেলিভারি প্রকল্প দেশীয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ১১টি সিটি কর্পোরেশন ও আরও ১৮টি পৌর এলাকায় সেবা দেয়।

জাতীয় আরবান হেলথ স্ট্রাটেজি ২০২০ শহর/নগর স্বাস্থ্যসেবায় বিভিন্ন অংশীজনের ও অবকাঠামোর ভূমিকা বিধৃত হয়, সেবা ব্যবস্থাপনা উল্লেখিত হয় এবং অর্থায়নের কৌশল প্রস্তাবিত হয়। তবে এই কৌশলপত্র আরও সুস্পষ্ট করণের এবং আইন সিদ্ধ করার প্রয়োজন রয়েছে।জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন কর্তৃক বিবিএস এর মাধ্যমে পরিচালিত সাম্প্রতিক জরীপ থেকে লব্ধ বিগত এক বছরে যে সমস্ত সেবাপ্রদানকারীরা কাছ থেকে সেবা নেওয়া হয়েছে: ১) এমবিবিএস ডাক্তার: ৭৮.২%; ২) ফার্মাসির ঔষধ বিক্রেতা: ৫.৭%; ৩) কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী: ৪.৮%; ৪) পল্লী চিকিৎসক: ৪.৭%; ৫) স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার পরিকল্পনা সহকারী: ১.৯%; ৬) মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট: ১.৭%; ৭) এফডব্লিউভি: ১.৬%; ৮) আয়ুর্বেদী/ ইউনানী: ০.২%; ৯) হোমিওপ্যাথি: ১.১%। এছাড়াও ৯৭% উত্তরদাতা জানিয়েছেন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিনা মূল্যে দেয়া প্রয়োজন

- শহর অঞ্চলের ওয়ার্ডগুলোতে গ্রামীণ ইউনিয়ন পর্যায়ের মত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার কেন্দ্র তৈরী করার পক্ষে মত দিয়েছেন ৯২% উত্তর দাতা
- চিকিৎসা, স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম তথা জনস্বাস্থ্য সেবা পৃথক অবকাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া উচিত এ বিষয়ে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন ৭২% উত্তর দাতা
- হাসপাতাল, মেডিক্যাল-নার্সিং ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন চেয়েছেন ৬৬% উত্তর দাতা। ৭২% উত্তর দাতা চান একজন ডাক্তার এক জন রোগীকে কম পক্ষে ১০ মিনিট থেকে ২০ মিনিট সময় দিবেন। যার বেশির ভাগ চেয়েছেন ২০ মিনিট (২৮.৫%)
- এক মাত্র জরুরী কারণ ছাড়া রেফারেল না হলে কোন বিশেষজ্ঞ সেবা দেয়া যাবে না এ বিষয়ে একমত ৭২% উত্তর দাতা
- জরুরী সেবার জন্য সপ্তাহের সাতদিনই সার্বক্ষণিকভাবে সরকারিভাবে অ্যাম্বুলেন্স সেবার ব্যবস্থা থাকতে হবে, এ বিষয়ে ৯৯% উত্তর প্রদানকারী একমত।
- স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিচালিত একই ধরনের সেবাক্রম একীভূত করা উচিত বলে মনে করেন ৬৭% উত্তরদাতা।

২) নেতৃত্ব, সুশাসন ও কর্মসংস্কৃতি

স্বাস্থ্য একটি মৌলিক রাজনৈতিক অঙ্গীকার। কার্যকর স্বাস্থ্য শাসন পদ্ধতি এবং বৃহত্তর স্বাস্থ্য-বান্ধব শাসন কাঠামো নিশ্চিত করতে হলে সরকারকে নিয়মিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং কখনো কখনো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এসব সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার, প্রদত্ত সেবার মান এবং রোগীর আর্থিক বোঝার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। কিন্তু এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া প্রায়ই বিদ্যমান কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে জটিল হয়ে পড়ে।

আধুনিক বিশ্বে স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে যে বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে, তার প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিকে বাস্তব পদক্ষেপে রূপান্তর করা অত্যন্ত জরুরি। এর জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা—যার মাধ্যমে জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি, সেবার মানোন্নয়ন এবং আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে।বিশ্বজুড়ে বহু সদিচ্ছাপূর্ণ স্বাস্থ্যনীতি ব্যর্থ হয়েছে—নীতির গঠনগত ত্রুটির কারণে নয়, বরং তা বাস্তবায়নে ঘাটতি, অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফল, দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক অদক্ষতার কারণে। কখনো ব্যর্থতার কারণ রাজনৈতিক বা আর্থিক, আবার কখনো তা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার গভীরে—অর্থাৎ শাসনের মধ্যেই নিহিত।

শাসন কাঠামো বুঝে তা শক্তিশালী করা অপরিহার্য, কারণ শাসনের মাধ্যমেই একটি সমাজ ও তার স্বাস্থ্যব্যবস্থা দ্বন্দ্ব মোকাবিলা করে, সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত নেয় এবং কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে। শাসনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো—বহুস্তরীয় ও বৈচিত্র্যময় অংশীজনদের (যেমন—সামাজিক বীমা তহবিল, পেশাজীবী সংগঠন, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, বিভিন্ন স্তরের সরকার, এনজিও এবং বেসরকারি খাত) একটি অভিন্ন লক্ষ্য, সমন্বিত পদক্ষেপ ও জবাবদিহিতার কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসা। দুর্বল শাসন থেকে যে সমস্যা দেখা দেয়, তার মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি, প্রণোদনার বিকৃতি, নীতিগত দখলদারিত্ব, ভুলভাবে পরিকল্পিত নীতি, স্বজনপ্রীতি, অদক্ষতা, জনবিশ্বাসের ঘাটতি এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অভাব।

ভাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শাসনের জন্য কয়েকটি মৌলিক নীতিমালা গুরুত্বপূর্ণ, যার মধ্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ, সততা এবং সক্ষমতা অন্যতম। **স্বচ্ছতা** (Transparency)নিশ্চিত করে যে নীতি, সিদ্ধান্ত এবং সম্পদের ব্যবহার জনগণের কাছে উন্মুক্ত ও সহজবোধ্য হয়, যা বিশ্বাস গড়ে তোলে এবং দুর্নীতির সুযোগ কমায়। **জবাবদিহিতা** (Accountability) হলো স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, নীতিনির্ধারক এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজের জন্য দায়বদ্ধ থাকা, যাতে সেবা মানসম্পন্ন হয় এবং সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার হয়। **অংশগ্রহণ** (Participation) জনগণ, সুশীল সমাজ এবং অন্যান্য অংশীজনদের স্বাস্থ্যনীতি গ্রহণ ও পরিকল্পনার প্রক্রিয়ায় যুক্ত করার মাধ্যমে সেবাকে আরও প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর করে তোলে। **সততা** (Integrity) মানে হচ্ছে নৈতিকতা বজায় রাখা এবং স্বার্থের সংঘাত থেকে বিরত থাকা, যা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা রক্ষা করে। সর্বশেষে, **সক্ষমতা** (Capacity) নির্দেশ করে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নীতি বাস্তবায়ন, সেবা ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সামর্থ্যকে। এই পাঁচটি নীতির সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী, ন্যায্য, দক্ষ ও জনগণের চাহিদা অনুযায়ী সাড়া দেওয়া স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

স্বাস্থ্যখাতে দীর্ঘমেয়াদি, ন্যায়ভিত্তিক ও টেকসই শাসন কাঠামো গঠনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে একটি সুসংগঠিত সংস্কার প্রক্রিয়া প্রয়োজন, যা শাসনের মৌলিক নীতিসমূহ—স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ, সততা ও সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে। এই কাঠামোর মূল লক্ষ্য হবে "জনমুখী" স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, অর্থাৎ একটি এমন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেখানে সেবা সহজলভ্য, মানসম্পন্ন, সমতাভিত্তিক এবং জনগণের আস্থার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। এতে করে জনগণের স্বাস্থ্যসেবার প্রতি বিশ্বাস বাড়বে, এবং স্বাস্থ্যখাতে বিদ্যমান দুর্বলতা ও অসাম্য দূর করে একটি টেকসই ও মানবিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত - শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতার বাস্তব চিত্র : বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় উপরের এইসব শাসনসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জের প্রায় সবগুলোই প্রতিফলিত হয়। যদিও সংবিধানের ১৫ ও ১৮ অনুচ্ছেদে স্বাস্থ্যসেবাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, বাস্তবতা হলো—স্বাস্থ্যখাত দীর্ঘদিন ধরেই অর্থনৈতিক সংকট, অতিনিয়ন্ত্রণ, এবং দুর্বল প্রশাসনিক কাঠামোর শিকার। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (MOHFW) যদিও খাতটির প্রশাসনিক দায়িত্বে, তবে এর কার্যকারিতা রাজনৈতিক প্রভাব, কর্তৃত্বের খন্ডতা এবং স্বাধীন পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে বারবার প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারি এই কাঠামোগত দুর্বলতাগুলিকে আরও প্রকট করে তোলে। এটি স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ চেইন, ক্রয় প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুতর দুর্বলতা প্রকাশ করে। অতিরিক্ত ব্যয়, ভুয়া নথিপত্র, এবং অসৎ কার্যকলাপের অভিযোগ জনমনে ব্যাপক অনাস্থার সৃষ্টি করে। যদিও কয়েকটি উচ্চপ্রোফাইল মামলায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তা মূলত প্রতীকী ছিল এবং ব্যবস্থাগত ব্যর্থতার মূলে কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি।

শাসন ব্যবস্থার ঘাটতির পথসমূহ : বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে শাসন ব্যবস্থার ব্যর্থতা ব্যাপক এবং তা ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক—উভয় স্তরেই বিদ্যমান: ১. ব্যক্তিগত স্তরের ব্যর্থতা: সরকারি খাতের সকল স্তরে—উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা যেমন মহাপরিচালক থেকে শুরু করে নিম্নস্তরের কর্মচারী পর্যন্ত—দুর্নীতি, অবহেলা এবং পেশাদারিত্বের অভাব মারাত্মক অদক্ষতার সৃষ্টি করেছে। এই ধরনের অসদাচরণ জনস্বাস্থ্য সেবার মান হ্রাস করেছে এবং জনগণের আস্থা নষ্ট করেছে। ২. প্রাতিষ্ঠানিক স্তরের ব্যর্থতা: ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতার মধ্যে রয়েছে বাজেট পরিকল্পনা, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ, ক্রয় প্রক্রিয়া এবং লজিস্টিক ব্যবস্থাপনার অসঙ্গতি। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবে সরঞ্জাম ক্রয়ে বিলম্ব, সম্পদের অপব্যবহার এবং গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে ব্যর্থতা দেখা গেছে। এর ফলে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সময়মত ও মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

শাসন ব্যবস্থার ঘাটতির কারণসমূহ: প্রাতিষ্ঠানিক ও নেতৃত্বের ব্যর্থতা - নেতৃত্বের দুর্বলতা নীতি বাস্তবায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকে ব্যাহত করেছে। গ্লোবাল হেলথ সিকিউরিটি ইনডেক্স ২০২৩ অনুযায়ী, স্বাস্থ্য শাসনের দিক থেকে বাংলাদেশ ১৯৫টি দেশের মধ্যে ১১৩তম, যা ভারতের (৬৬তম) ও শ্রীলঙ্কার (৭২তম) তুলনায় অনেক পিছিয়ে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ: ২০২২ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (BIDS)-এর এক গবেষণায় দেখা যায়, ৬০% স্বাস্থ্য নেতৃত্বের পদ রাজনৈতিক প্রভাবে পূরণ হয়েছে, যোগ্যতার ভিত্তিতে নয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণে ধীরতা - স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (DGHS) বিভিন্ন সংকটে যেমন—ডেঙ্গু মহামারী কিংবা কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন সংগ্রহে – বিলম্বে সাড়া দিয়েছে।

স্বাস্থ্য অর্থায়নের অব্যবস্থাপনা চিত্র: ক. অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা ও ক্রয় দুর্নীতি:- ক্রয় ব্যবস্থায় দুর্নীতি বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের অন্যতম বড় ব্যর্থতা। বিশ্বব্যাংকর (২০২৩) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই খাতে অনিয়মের কারণে প্রতি বছর প্রায় ৩০% বাজেট অপচয় হয়। মূল্যস্ফীতি:- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (TIB) জানিয়েছে, কোভিড-১৯ চলাকালীন কিছু হাসপাতালে প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জামের দাম ৩০০% পর্যন্ত বেড়েছিল। অব্যবহৃত যন্ত্রপাতি: এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB)-এর ২০২৪ সালের এক গবেষণায় দেখা যায়, নতুন কেনা ৪০% চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়নি। উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাবে এই সরঞ্জামগুলো পড়ে ছিল। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেটের বড় অংশই বিদেশি মুদ্রায় যন্ত্রপাতি ও ওষুধ ক্রয়ে ব্যয় হয়। তথাকথিত প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়া থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় এজেন্ট ও রাজনৈতিক প্রভাবশালীরা এই প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে থাকে।উচ্চমূল্যের যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে—যেমন ক্যান্সার চিকিৎসার কোবাল্ট মেশিন বা লিনিয়ার অ্যাক্সেলারেটর—অনেক সময় মন্ত্রণালয় নিজেই চাহিদা তৈরি করে, যদিও সংশ্লিষ্ট হাসপাতালগুলো এমন যন্ত্রপাতির প্রয়োজন জানায়নি। উদাহরণস্বরূপ, খুলনার একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দশ বছর ধরে অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পড়ে ছিল।বরিশালের একটি হাসপাতালে একটি কোবাল্ট মেশিন নয় বছর ধরে মেরামত ছাড়াই পড়ে ছিল।২০২৫ সালের জানুয়ারিতে জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউট, ঢাকা-তে শেষ কার্যকর মেশিনটির কার্যক্ষমতা শেষ হওয়ায় রেডিওথেরাপি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। এই ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, ব্যবস্থাপনার ঘাটতি ও জবাবদিহিতার অভাব কীভাবে জনগণের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবাকে ব্যাহত করে।

ক্রয় অনিয়মের একটি দৃষ্টান্ত: একটি বড় দাতাসমর্থিত প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালকের (PD) অনভিজ্ঞতা এবং সরকারি আর্থিক নিয়ম না জানার কারণে বড় ধরনের অনিয়ম ঘটে। এই ব্যর্থতার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হয় এবং প্রকল্প পরিচালককে অপসারণ করা হয়। এই অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দেয়, দক্ষ ব্যবস্থাপক ও নেতৃত্বের অভাবে স্বাস্থ্যখাত কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিবার পরিকল্পনা উপকরণ ঘাটতি: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনে দেরি হওয়ায় পরিবার পরিকল্পনার উপকরণ, বিশেষত কনডমের সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে নিয়মিত গ্রাহকরা বাজার থেকে ক্রয় করতে বাধ্য হন। এই পরিস্থিতি দেখায় যে, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া না থাকলে বহুদিনের সফল কর্মসূচিও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নয়নে অনিয়ম ও অকার্যকারিতা: বিশ্বব্যাংকের ২০২৪ সালের পাবলিক এক্সপেনডিচার রিভিউ অনুযায়ী, নবনির্মিত হাসপাতালগুলোর প্রায় ৪৫% জনবল ও মৌলিক ইউটিলিটির অভাবে চালু হতে বিলম্ব ঘটে। অবকাঠামো উন্নয়ন অনেক সময় জনস্বাস্থ্য চাহিদার পরিবর্তে রাজনৈতিক বিবেচনায় পরিচালিত হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (ADP) ৩০% এর বেশি ব্যয় হয় নতুন ভবন নির্মাণে, যেখানে বিদ্যমান অবকাঠামোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় অনেক কম। যদিও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (HED) এবং বৃহৎ প্রকল্পে গণপূর্ত বিভাগের (PWD) সহায়তায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়, তবুও স্বাধীন পর্যালোচনাকারী দলগুলোর সুপারিশ সত্ত্বেও পরিকল্পিত ও চাহিদাভিত্তিক কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি।

রাজনৈতিক প্রভাব ও দুর্নীতি : এই অনিয়ম রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি করেছে, ফলে অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় স্থানে হাসপাতাল নির্মাণ হয়েছে যেখানে চিকিৎসক, যন্ত্রপাতি বা কর্মী নেই। অনেক স্থাপনাই কাগজে সম্পূর্ণ হলেও ব্যবহারযোগ্য নয়, যার ফলে জনগণ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয়, আর ঠিকাদারসহ সংশ্লিষ্ট পক্ষ লাভবান হয়।

রাজনৈতিক দুর্নীতির চক্র: গত ২৫ বছরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেট বেড়ে যাওয়ায় প্রভাবশালী মহল নির্মাণ প্রকল্প নিয়ে লবিং শুরু করে। মন্ত্রণালয়ের শীর্ষপর্যায়ে এমনকি মন্ত্রী পর্যায়ে এসব সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক সুবিধা বিতরণ করার অভিযোগ রয়েছে। এর ফলে নির্মাণের স্থান ও প্রকৃতি নির্ধারণে রাজনৈতিক প্রভাবশালীরা ও ঠিকাদাররা প্রভাব বিস্তার করে, যার ফলে নিম্নমানের ও অপ্রয়োজনীয় স্থাপনা তৈরি হয়। এভাবে নতুন স্থাপনার সংখ্যা বাড়লেও বিদ্যমানগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে বরাদ্দ না থাকায় বহু প্রতিষ্ঠান অচল হয়ে পড়ে। এই বরাদ্দের ভারসাম্য নতুন নির্মাণ বনাম মেরামত—পুনর্বিবেচনা করা জরুরি।

যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণে অব্যবস্থা: জাতীয় ইলেক্ট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট ওয়ার্কশপ (NEMEW) পর্যাপ্ত সম্পদের অভাবে দেশব্যাপী হাসপাতালের যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে, যার ফলে প্রায় ৩৫% যন্ত্রপাতি অচল ।এই সংস্থাটি ঢাকাভিত্তিক

হওয়ায় সীমিত আউটরিচ রয়েছে, এবং স্থানীয় হাসপাতালে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা না থাকায়, সব মেরামতের প্রস্তাব মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। এই ব্যবস্থায় শুধু সামান্য সমস্যার স্থানীয় সমাধান সম্ভব হয়। সর্বশেষ আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা হালনাগাদ হয়েছে ২০১৫ সালে, যা বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মূল্য কাঠামোও পরিবর্তিত হয়েছে, ফলে এখনই রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। এই বাস্তবতা দেখায় যে, যন্ত্রপাতি সচল না থাকলে সরকারি সেবা অকার্যকর হয়ে পড়ে, আর রোগীদের প্রাইভেট সেবা নিতে বাধ্য করে—অনেক সময় সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দালালদের সহায়তায়।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আর্থিক অনিয়মের চিত্র: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- এর আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা থাকলেও বাস্তবে বহু অনিয়ম বিদ্যমান। সরকারি নিরীক্ষা ব্যবস্থা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষা ইউনিট এবং ফিডিউশিয়ারি অ্যাকশন প্ল্যান) থাকা সত্ত্বেও বহু নিরীক্ষা আপত্তি অমীমাংসিত থেকে গেছে। বিশ্বব্যাংকের পাবলিক ফিন্যান্স ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে একটি গবেষণায় দেখা যায়, ৮,০০০-এর বেশি নিরীক্ষা আপত্তি এখনও নিষ্পত্তি হয়নি, যার মধ্যে অনেকগুলো ১৯৯৮-২০০৩ সালের প্রথম সেক্টর প্রোগ্রামের সময়কার। এই আপত্তিগুলোর আর্থিক মূল্য বিশাল: রাজস্ব বাজেটে ৬,৬৩,০৫৯ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন বাজেটে ৩,৪৭০ কোটি টাকা। এর প্রায় ৯৫% আপত্তি রাজস্ব বাজেট সম্পর্কিত, যার বেশিরভাগই স্বাস্থ্য অধিদপ্তর-এর আওতাধীন। এই পরিস্থিতি মন্ত্রণালয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং জবাবদিহিতার ঘাটতির একটি পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরে।

অর্থ ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট-এর ভূমিকা: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সেক্টরওয়াইড প্রোগ্রামের শুরু থেকেই অর্থ ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট সক্রিয় রয়েছে। উন্নয়ন সহযোগীদের চাপের ফলে, ইউনিটটি এর কাঠামো আনুষ্ঠানিকভাবে গঠনের দিকে কিছু অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং জনবলও বৃদ্ধি পেয়েছে। ৪র্থ HPNSP (২০২৪) - এর শেষ নাগাদ, পূর্বে যেসব অভ্যন্তরীণ অডিট আউটসোর্স করা হতো, সেগুলো এখন FMAU নিজেই সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। তবে, বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিশেষ করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আর্থিক ও হিসাব সংক্রান্ত অনিয়মের কারণে এখনও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অডিট আপত্তি রয়ে গেছে। বিভাগীয় সচিব, যিনি প্রধান হিসাব কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত, তিনিই সরকারী অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য চূড়ান্তভাবে দায়ী। কিন্তু অডিট আপত্তিগুলোর সুষ্ঠু নিষ্পত্তি না হওয়ায় এই দায়িত্ব আরও জটিল ও চাপপূর্ণ হয়ে উঠছে। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে এই ব্যর্থতা অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার দুর্বলতাকেও নির্দেশ করে, যা পুরো স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় একটি বড় ঝুঁকির ইঙ্গিত দেয়। ফিডিউশিয়ারি ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (MOHFW) ৪র্থ HPNSP (২০১৭-২০২৪)- এর সময়ে ফিডিউশিয়ারি অ্যাকশন প্ল্যান গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল MOHFW ও উন্নয়ন সহযোগীদের যৌথভাবে নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। তবে জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত, মোট ৫৪৪টি অমীমাংসিত অডিট আপত্তি থেকে যায়, যার আর্থিক মূল্য ৩০১,২৫৯ কোটি টাকা। এমনকি WB-IDA, ADB, JICA-এর মতো প্রধান উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়িত প্রকল্পগুলিতেও অডিট সম্মতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়নি। এটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, FAP কিছু প্রচেষ্টা করলেও আর্থিক জবাবদিহিতা ও অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মূল সমস্যাগুলো যথাযথভাবে সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পরও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না হওয়া, একটি ফলাফলভিত্তিক ও কার্যকর কৌশলগত হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের-**এর আর্থিক তদারকি ব্যবস্থা দুর্বল:**স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের (MOHFW) আর্থিক তদারকি ব্যবস্থাগুলো বর্তমান আর্থিক অনিয়ম ও অডিট আপত্তিগুলো যথাযথভাবে মোকাবিলা করতে পারছে না। যদিও সরকারী অডিট এবং ফিডিউশিয়ারি অ্যাকশন প্ল্যান- এর মতো ব্যবস্থা চালু আছে, তবুও বহু সমস্যার অমীমাংসিত রয়ে যাওয়া ইঙ্গিত দেয় যে সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনা এখনো নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

বেসরকারি স্বাস্থ্যখাতের দুর্বল শাসনব্যবস্থা: বেসরকারি খাতের লাইসেন্সিং এবং চিকিৎসা অবহেলা পর্যালোচনা:- **বাংলাদেশে বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ একটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয়।** স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের (DGHS) **তথ্য অনুযায়ী, দেশের ১৫,২৩৩টি বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের মধ্যে মাত্র** ৪,১২৩টি তাদের লাইসেন্স নবায়ন করেছে, **এবং** ১,০২৭টি প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছে। **এটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দুর্বল এবং আইন লঙ্ঘনের মাত্রা অত্যন্ত**

উদ্বেগজনক, যা রোগীদের নিরাপত্তা এবং পুরো স্বাস্থ্যব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাকে হুমকির মুখে ফেলছে। লাইসেন্সিং প্রক্রিয়ায় চ্যালেঞ্জসমূহ জটিল। অনুমোদন প্রক্রিয়া: **বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের অনুমতি নিতে গিয়ে মালিকদের বারবার অফিস করতে হয়।** বিভ্রান্তিকর চাহিদা: **উদাহরণস্বরূপ, DGHS পরিবেশ লাইসেন্স চায়, অথচ পরিবেশ অধিদপ্তর প্রথমে হাসপাতাল লাইসেন্স চায়।** উচ্চ ফি: **সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ফি বেড়ে যাওয়ায় ছোট ক্লিনিকগুলো লাইসেন্স করতে আগ্রহ হারাচ্ছে।** লাইসেন্স পেতে বিলম্ব: **অনেক সময় কাগজপত্র ঠিক থাকলেও ২-৩ বছর পর্যন্ত লাইসেন্স পেতে বিলম্ব হয়, এবং** অননুমোদিত অর্থের দাবি **নিয়ে অভিযোগ রয়েছে।**

প্রতিশ্রুতিশীল নীতি ও বাস্তব ব্যর্থতা: স্বাস্থ্যখাতে শাসনকে পুনরায় শক্তিশালী করা মানে একক ব্যক্তি বা বিচ্ছিন্ন নীতির পরিবর্তে বৃহত্তর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রতি মনোযোগ দেয়া। কেবলমাত্র আদর্শ নেতার ওপর নির্ভরতা বা বাজারভিত্তিক ব্যবস্থার সফলতা আশা করা বাস্তবসম্মত নয়। স্বাস্থ্যসেবা একটি সমতা-নির্ভর, টেকসই এবং মানসম্পন্ন ক্ষেত্র—যেখানে সুপরিকল্পিত শাসন কাঠামো ছাড়া গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

স্বাস্থ্যখাতে শাসনের পথে যেসব চিরস্থায়ী বাধা রয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে পর্যাপ্ত অর্থের অভাব, রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি, আইনি জটিলতা, নীতিগত ভুল, শাসনযোগ্যতার সীমাবদ্ধতা এবং মতপার্থক্যের অমোচনীয়তা। এমনকি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত নীতিও ব্যর্থ হতে পারে যদি তার ধারণাগত ভিত্তি দুর্বল হয় অথবা জনগণের মঙ্গল ব্যতিরেকে অন্য স্বার্থে গৃহীত হয়। সুতরাং, শাসন কখনোই দ্বন্দ্ব নির্মূল করতে পারে না; বরং তা সুসংহত ও ন্যায়সংগত উপায়ে দ্বন্দ্ব মোকাবিলার রূপ দিতে পারে।

আগামীর পথে রূপরেখা: এই পরিস্থিতির উত্তরণে বাংলাদেশকে কয়েকটি কৌশলগত সংস্কারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে—পরিষ্কার ও বাধ্যতামূলক নীতিমালা প্রণয়ন, আর্থিক ও কর্মসম্পাদন নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা, প্রমাণ-ভিত্তিক সম্পদ বণ্টন নিশ্চিত করা, এবং নেতৃত্ব গঠনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি জোরদার করা। এই পদক্ষেপগুলো একটি জবাবদিহিমূলক, দক্ষ ও প্রতিক্রিয়াশীল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

সবশেষে, স্বাস্থ্যখাতের শাসন কাঠামোকে একটি প্রতিক্রিয়াশীল সংকট-নির্ভর মডেল থেকে রূপান্তর করে একটি পূর্বপ্রস্তুতিমূলক, অভিযোজনযোগ্য এবং জনবিশ্বাসনির্ভর কাঠামোয় নিয়ে যেতে হবে। স্বাস্থ্য কেবল ঘোষিত অগ্রাধিকার নয়—বরং তা যেন একটি নিশ্চিত অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেজন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও গঠনমূলক প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার।

নীতিগত ঘাটতি: স্বাস্থ্য একটি বহুমাত্রিক বিষয়, যা কেবল স্বাস্থ্যসেবা খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি শিক্ষা, আবাসন, পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক নীতিসহ একাধিক খাতের দ্বারা প্রভাবিত। বাংলাদেশে “সকল নীতিতে স্বাস্থ্য (HiAP)” বাস্তবায়নের জন্য স্বীকার করা অপরিহার্য যে স্বাস্থ্য ফলাফল এসব আন্তঃসম্পর্কিত খাতের ওপর নির্ভরশীল। জাতীয় ও খাতভিত্তিক নীতিগুলোর সঙ্গে স্বাস্থ্যকে সংযুক্ত করতে হলে সরকারকে "সমগ্র সরকারভিত্তিক" দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে।

এই লক্ষ্যে বাংলাদেশে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় করা প্রয়োজন, যেখানে নগর পরিকল্পনা, শিক্ষা, কৃষি, পরিবেশ ও পরিবহন মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট প্রধান খাতসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই নীতিমালাকে স্বাস্থ্য লক্ষ্যসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করবে এবং বিভিন্ন নীতির স্বাস্থ্যগত প্রভাব নিরীক্ষণ করবে ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণের সুপারিশ করবে। এ উদ্যোগ সফল করতে হলে উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক অঙ্গীকার অত্যাবশ্যক। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় সকল মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাস্থ্য অগ্রাধিকার নির্ধারণ নিশ্চিত করতে হবে।

এছাড়াও, সকল নীতিতে স্বাস্থ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হলে স্বাস্থ্যকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জনগণের সক্রিয় সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তারা স্বাস্থ্য নির্ধারকের সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দিকসমূহ বুঝে এবং নগর পরিকল্পনা, পরিবেশনীতি, শিক্ষা ও অন্যান্য খাতের সঙ্গে সমন্বয় করতে পারে। জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় পর্যায়ে প্রচারাভিযান পরিচালনা করতে হবে, যাতে মানুষ বুঝতে পারে অন্য খাতের নীতির প্রভাব তাদের স্বাস্থ্যেও পড়ে। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি হালনাগাদ করে HiAP নীতিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং একটি শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যা আন্তঃখাতীয় নীতির স্বাস্থ্যগত প্রভাব মূল্যায়ন করবে। সর্বশেষে, HiAP-এর দীর্ঘমেয়াদী বাস্তবায়নের জন্য টেকসই অর্থায়ন কাঠামো যেমন—

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই ও কার্যকর স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবে, যা সমাজের সকল খাতকে উপকৃত করবে।

বাংলাদেশে সংবিধান ও আইনি পর্যায়ে স্বাস্থ্য অধিকার: বাংলাদেশে স্বাস্থ্যকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে, যেখানে বলা হয়েছে—রাষ্ট্র তার নাগরিকদের জন্য মৌলিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, যার মধ্যে স্বাস্থ্যসেবাও অন্তর্ভুক্ত। অনুচ্ছেদ ১৫-এ বলা হয়েছে: "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে জনগণের পুষ্টির মানোন্নয়ন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধন।" এছাড়াও, অনুচ্ছেদ ১৮-এ বলা হয়েছে: "পুষ্টির মানোন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নকে রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য হিসেবে গণ্য করা হবে।" যদিও এ অনুচ্ছেদদ্বয়ের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকে মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তবুও এগুলোতে সুস্পষ্টভাবে স্বাস্থ্যকে একটি প্রযোজ্য বা বাস্তবায়নযোগ্য অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি—যার ফলে কার্যত এগুলোর প্রয়োগ সীমিত।

সরকারি ব্যবস্থায় বাংলাদেশ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকলেও তা নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি—যেমন পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের অভাব, অতিরিক্ত ভিড়, এবং দুর্বল অবকাঠামো। এসব কারণে দেশের সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্যকে একটি কার্যকর সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কোভিড-১৯ মহামারি এই সীমাবদ্ধতাগুলিকে আরও প্রকট করে তোলে—বিশেষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি কঠিন হয়ে পড়ে। এছাড়াও, বাংলাদেশে এখনো একটি সমন্বিত আইনি কাঠামো নেই, যেমনটি অনেক দেশে আছে যেখানে ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ বা জাতীয় স্বাস্থ্যবীমা কার্যকর রয়েছে।

আন্তর্জাতিক কাঠামো ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ: আন্তর্জাতিকভাবে স্বাস্থ্যকে একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন চুক্তি ও ঘোষণার মাধ্যমে। জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত ১৯৪৮ সালের "সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা"-র ২৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: "প্রত্যেক মানুষের খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবাসহ এমন এক জীবনযাত্রার অধিকার আছে যা তার এবং তার পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য যথোপযুক্ত।" একইভাবে, "আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সনদ (ICESCR)"- এর ১২ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রকে জনগণের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সর্বোচ্চ মান অর্জনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা দেয়া হয়েছে। অনেক দেশে সংবিধান বা আইনি কাঠামোর মাধ্যমে স্বাস্থ্যকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের সংবিধানে জীবনধারার অধিকার (অনুচ্ছেদ ২১) অন্তর্ভুক্ত করে স্বাস্থ্যকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং "আয়ুষ্মান ভারত" কর্মসূচি চালু করা হয়েছে দরিদ্র জনগণের জন্য। নেপালের সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদে স্বাস্থ্য অধিকার স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয়েছে এবং সরকার সকলের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করেছে। ভূটান ও থাইল্যান্ডের মতো দেশগুলোতে আরও গঠনমূলক ব্যবস্থা রয়েছে—যেমন ভূটানে প্রতিরোধমূলক যত্ন-ভিত্তিক বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং থাইল্যান্ডের "ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ (UHC)"।

বাংলাদেশের তুলনায় দক্ষিণ এশিয়া ও আসিয়ান অঞ্চলের অনেক দেশ স্বাস্থ্যসেবায় অধিক অগ্রসর। যেমন—ইন্দোনেশিয়ার "জে কে এন (JKN)" ব্যবস্থা সর্বজনীন স্বাস্থ্যসুরক্ষা নিশ্চিত করে এবং মালয়েশিয়ায় সরকারি ও বেসরকারি উভয় সেবা ব্যবস্থা রয়েছে। কিউবা বিশিষ্ট একটি উদাহরণ, যেখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ও প্রতিরোধভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। চীনের ব্যাপক স্বাস্থ্য বীমা কর্মসূচির মাধ্যমে ব্যাপক জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হয়। বাংলাদেশে যদিও সংবিধানের ১৫ ও ১৮ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকে কল্যাণমূলক দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তবুও এটি নেপাল বা ভারতের মতো বাস্তবায়নযোগ্য অধিকার নয়। অর্থ বরাদ্দের ঘাটতি, দুর্বল অবকাঠামো এবং গ্রামীণ জনগণের সীমিত প্রবেশাধিকার—এই চ্যালেঞ্জগুলো বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিকারকে বাস্তবায়নের পথে বড় বাধা হয়ে আছে। সফল মডেল—যেমন কিউবা, ভূটান এবং থাইল্যান্ড—থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশকে একটি ন্যায়সংগত, কার্যকর ও সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা: একটি দেশের আইনি কাঠামোর মধ্যে স্বাস্থ্যকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হলে তা জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে ১৫ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকে মৌলিক অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে রাষ্ট্র নাগরিকদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করবে। এই সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের

জন্য একটি পৃথক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা আইন প্রণয়ন করতে হবে, যা নাগরিকদের অধিকার ও রাষ্ট্রের কর্তব্য নির্ধারণ করবে, এবং স্বাস্থ্যখাতে দীর্ঘমেয়াদে ন্যায্যতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে,যাতে এই সেবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা যায়। এ ধরনের সাংবিধানিক ও আইনি স্বীকৃতি সব শ্রেণির নাগরিককে—আয়ের অবস্থা, সামাজিক অবস্থান বা ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা নির্বিশেষে—গুণগত স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করে। এর ফলে শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার কমে, আয়ু বাড়ে, এবং স্বাস্থ্যগত সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা দীর্ঘমেয়াদে চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস করে এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমায়—যা সামগ্রিকভাবে জনজীবনের মানোন্নয়নে সহায়ক।

আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ও কৌশলপত্র: বাংলাদেশে বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আধুনিক স্বাস্থ্য চাহিদা, সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও বৈশ্বিক স্বাস্থ্য প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ও কৌশলপত্র পুনর্বিবেচনা ও হালনাগাদ করা জরুরি। এসব হালনাগাদ উদ্যোগ দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর করে তুলবে। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ আইন, বিধিমালা ও কৌশলপত্রের পর্যালোচনা ও হালনাগাদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আধুনিক স্বাস্থ্য চাহিদা মোকাবিলায় সকল সংশ্লিষ্ট পুরাতন আইন পর্যালোচনা ও যুগোপযোগী করা, এবং নতুন আইন প্রণয়ন জরুরি। এতে রোগী সুরক্ষা, আর্থিক স্থায়িত্ব, জবাবদিহিতা ও জরুরি প্রস্তুতি নিশ্চিত হবে। আইনসমূহ সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে একটি সমন্বিত কাঠামো গড়ে তুলতে পারে। এ আইনসমূহ শুধু স্বাস্থ্যখাতেই নয়, বরং পরিবেশ, খাদ্য নিরাপত্তা ও সামাজিক ন্যায়বিচারেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে স্বাস্থ্যখাত আরও নিরাপদ, সমতাভিত্তিক ও টেকসই হবে এবং বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বিকেন্দ্রীভূত স্বাস্থ্য শাসন কাঠামোর অনুপস্থিতি: বিকেন্দ্রীভূত স্বাস্থ্য শাসন কাঠামোর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা দেশের স্বাস্থ্যখাতে উন্নতি ও স্বচ্ছতা আনতে সহায়ক হতে পারে। তবে, বর্তমান পরিস্থিতিতে, এই ধরনের একটি কাঠামো প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, যেমন স্বাস্থ্য কমিশন, তৈরি করা জরুরি। এটি স্বাস্থ্যসেবার মান, নিরাপত্তা, দক্ষতা, স্বচ্ছতা, নীতিগত তত্ত্বাবধান, সেবা নিয়ন্ত্রণ এবং রোগীর অধিকার রক্ষা করার জন্য কাজ করবে। তবে, বর্তমানে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে, যা স্বাস্থ্যসেবা পর্যবেক্ষণ এবং নাগরিকদের মানসম্পন্ন চিকিৎসা নিশ্চিত করতে সক্ষম নয়। স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ, কর্মদক্ষতা, এবং মানদন্ড নির্ধারণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে বর্তমানে এর সঠিক বাস্তবায়ন ও তদারকি যথেষ্ট কার্যকরভাবে হচ্ছে না।জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে না।বর্তমানে একটি স্থায়ী এবং কার্যকর স্বাস্থ্য কমিশন না থাকার ফলে,স্বাস্থ্যখাতের সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন,নীতিগত পরিবর্তন কার্যকর,এবং সেবাদানকারীদের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ সম্ভব হচ্ছে না,কমিশনটি সরাসরি সরকার প্রধানের কাছে রিপোর্ট করবে এবং কমিশন প্রতি বছর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করবে।

বিকেন্দ্রীভূত স্বাস্থ্য শাসন কাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অনুপস্থিতি: বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এটি দেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর, স্বচ্ছ এবং দুর্নীতিমুক্ত করার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে। দেশে স্বাস্থ্যখাতের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এবং পেশাদারিত্ব, দক্ষতা ও জবাবদিহিমূলক সেবার মান নিশ্চিত করতে, বর্তমান স্বাস্থ্য ও সংশ্লিষ্ট ক্যাডারসমূহকে পুনর্গঠন করা এখন সময়ের দাবি। প্রশাসনিকভাবে স্বায়ত্তশাসিত ও পেশাভিত্তিক একটি নতুন সিভিল সার্ভিস ক্যাডার গঠন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া পেশাদারিত্ব, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার ন্যূনতম মান অর্জন করা সম্ভব নয়। স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, নার্সিং সেবা এবং নগর ও পৌর স্বাস্থ্যসেবার অবকাঠামো পুনর্গঠন ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। দেশের সামগ্রিক জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য, নিয়মিত নিয়োগ প্রক্রিয়া ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) গঠন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। বর্তমানে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অযোগ্য ও রাজনৈতিক প্রভাবিত ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলে জনস্বাস্থ্যখাতে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। স্বাধীন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) গঠনের পাশাপাশি, একটি উচ্চপর্যায়ের সার্চ কমিটি গঠন করা প্রয়োজন, যা নিরপেক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহের জন্য নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও নিয়োগের সুপারিশ করবে।

নিয়ন্ত্রক সংস্থা: বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল, বাংলাদেশ মেডিকেল এডুকেশন অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল, বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল, স্টেট মেডিকেল কাউন্সিল, এবং বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল- এর মতো নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি সরকারি, বেসরকারি এবং এনজিও স্বাস্থ্যসেবার ওপর তদারকি করে। সম্পদের ঘাটতি এবং ব্যাপক পর্যবেক্ষণের অভাবের কারণে তাদের কার্যকারিতা প্রায়ই বাধাগ্রস্ত হয়।

বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল-এর শাসন ব্যবস্থায় বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যা স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের কার্যকারিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যদিও এটি মেডিকেল শিক্ষা ও চিকিৎসা পেশাজীবীদের লাইসেন্স প্রদান নিয়ন্ত্রণ করে, তবুও পর্যাপ্ত তদারকির অভাবে ভুগছে। বর্তমানে দেশে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৭২-এ দাঁড়িয়েছে, যেখানে প্রায় ৫০% শিক্ষার্থী পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছাড়াই পাশ করছে (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ২০১৯)। এছাড়াও, লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়া ধীরগতির, যা প্রায়ই ছয় মাসের বেশি সময় নেয়, ফলে স্বাস্থ্যখাতে দক্ষ পেশাজীবীর ঘাটতি আরও বাড়ে (বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২০)। মেডিকেল কলেজগুলোর জন্য জার্নালে গবেষণা প্রকাশ বাধ্যতামূলক করার ফলে অনেক নিম্নমানের গবেষণা হচ্ছে, যা সম্পদের অপচয় এবং দেশের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে কার্যকর অবদান রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল বাংলাদেশের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের মেডিকেল ডিগ্রির পাঠ্যক্রম অনুমোদনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। কিন্তু দেশে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে পাঠ্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য ও কার্যকারিতার ঘাটতি রয়েছে, যার ফলে চিকিৎসা শিক্ষার মান অসম হয়ে পড়ছে। এই শাসন ঘাটতির পাশাপাশি দুর্বল পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার কারণে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করা স্বাস্থ্যসেবাকর্মীদের মানেও বৈষম্য দেখা যায়। এছাড়াও, মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা ও অন্যান্য পরীক্ষার শাসনব্যবস্থা প্রায়ই স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতার অভাবে সমালোচিত হয়, যা দুর্বল মানের শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার একটি বড় কারণ। বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং- স্কুল এর মতো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত যোগ্যতাগুলোর ওপর কর্তৃত্ব রাখতেও সমস্যায় পড়ে, যার ফলে স্বাস্থ্যসেবাকর্মীদের মান নিয়ন্ত্রণ আরও জটিল হয়ে পড়ে।

স্বাস্থ্যখাতে দুর্বল অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা (Grievance Redressal System): বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে এখনো একটি কার্যকর ও সুলভ অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি, যা জনসাধারণের স্বাস্থ্যসেবা-সংক্রান্ত অভিযোগগুলো যথাযথভাবে সমাধান করতে পারে—চাই সেটা সরকারি হোক বা বেসরকারি খাতে। বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল হলো দেশের চিকিৎসক ও দন্তচিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা এবং এদের পেশাগত আচরণ সম্পর্কিত অভিযোগ নিষ্পত্তির এখতিয়ারও এই সংস্থার রয়েছে। তবে, বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল অভিযোগ নিষ্পত্তিতে খুবই দুর্বল পারফরম্যান্স দেখিয়েছে, যার ফলে রোগী ও তাদের পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবার মান নিয়ে বিশ্বাসের ঘাটতি তৈরি হয়েছে। এই ব্যর্থতা বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় জনগণের আস্থাকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করছে।

মেডিকেল এথিকস কমিটি এবং রিপোর্টিং গাইডলাইন থাকা সত্ত্বেও, অনিয়ম ও অনৈতিক আচরণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল -এর প্রয়োগক্ষমতা দুর্বল। দেরি ও জবাবদিহিতার অভাবে বহু অনিয়মের অভিযোগ নিষ্পত্তি হয় না। এছাড়া, বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল একটি বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থায় কাজ করে যেখানে অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার সাথে সমন্বয় অত্যন্ত দুর্বল, ফলে অকার্যকারিতা আরও বাড়ে। চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াকে দ্রুত, স্বচ্ছ এবং কার্যকর করতে একটি আধুনিক ডিজিটাল অভিযোগ নিষ্পত্তি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা জরুরি। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অভিযোগকারীরা সহজে অনলাইনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন এবং প্রতিটি অভিযোগের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। এতে স্বয়ংক্রিয় অভিযোগ শ্রেণিবিন্যাস, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে। পাশাপাশি, তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সেবাপ্রদানকারীর এবং অভিযোগকারীর পরিচয় গোপন রেখে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা যাবে। এই প্ল্যাটফর্ম স্বাস্থ্য খাতের জবাবদিহিতা ও নৈতিকতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি জনগণের আস্থা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৩) স্বাস্থ্য জনবল ব্যবস্থাপনা:

প্রতিটি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নির্মাণে স্বাস্থ্য জনবল একটি অপরিহার্য স্তম্ভ। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বেশ কিছু সাফল্য অর্জন করেছে, কিন্তু একই সঙ্গে, এমনকি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলেও জনগণের সংখ্যা অনুপাতে স্বাস্থ্যকর্মীদের ঘনত্ব এ

দেশে সবচেয়ে কম । বিভিন্ন অধিদপ্তর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশে সর্বমোট ১,৬৬,৮৩৪ জন স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োজিত রয়েছেন। এক্ষেত্রে অনুমোদিত পদ রয়েছে ২৪৪,৭১১ টি; অর্থাৎ অনুমোদিত পদের মধ্যে ৩২ শতাংশ (৭৭,৮৭৭) এখনো শূন্য হয়ে আছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইউকে এইডের ২০২১ সালের একটি সার্ভে থেকে হিসাব করলে দেশে ৭৮৫,১৬৯ জন স্বাস্থ্যকর্মী চিহ্নিত করা যায়। এর মধ্যে ৫৩১,৪৫৪ অর্থাৎ ৬৮ শতাংশ শিক্ষিত এবং স্বীকৃত, ৯৯৬১ (১%)- এর কোনো শিক্ষা নেই অথচ স্বীকৃত, এবং ২৪৩,৭৫৪ (৩১ শতাংশ) শিক্ষাগত যোগ্যতাবিহীন এবং তাদের কোন স্বীকৃতি নেই ।

স্বাস্থ্য জনবলের আঞ্চলিক বিভাজনে ঢাকা বিভাগে প্রচুর স্বাস্থ্য কর্মী রয়েছেন যা সমগ্র জাতীয় জনবলের ৪৭ শতাংশ। অর্থাৎ, বাংলাদেশের আনুমানিক ৩০ শতাংশ জনগণের সেবা দিয়ে থাকেন ৪৭ শতাংশ (৩৬৬,৬৮৬) স্বাস্থ্যকর্মী; বাকি ৭০ শতাংশের সেবা করেন ৫৩ শতাংশ স্বাস্থ্যকর্মী। উপরোক্ত রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় যে, সিলেট বিভাগে জনসংখ্যার অনুপাতে সবচেয়ে কম স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন। এছাড়া নগরে অঞ্চলে অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন প্রায় সব বিভাগে। গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যকর্মীর ঘাটতি রয়েছে যেখানে দেশের প্রায় ৬২ শতাংশ মানুষ এখনো গ্রাম অঞ্চলে বাস করেন। স্বাস্থ্যকর্মীর এই অসম বিভাজন দেশের দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় একটি ঋনাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল এবং দুর্গম অঞ্চলে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়োগ অবস্থান নিশ্চিত করা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়েছে।

চাকরিকালীন সময়ে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য সুপরিকল্পিত কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। বিগত বছরগুলিতে বিভিন্ন অপারেশন প্লানের আওতায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কিছু প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু সেগুলি যথাযথ প্রয়োজনভিত্তিক ছিল না এবং চতুর্থ এইচপিএনএসপি-র মধ্যমেয়াদী রিভিউ-এ সেগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

বিভিন্ন স্বাস্থ্য জনবল ক্যাটেগরির অনুপাত (যেমন চিকিৎসক-নার্স অনুপাত) হিসাব করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে চিকিৎসক বনাম নার্স অনুপাত, অনুমোদিত পদ অনুযায়ী ১.৫, এবং পুরনকৃত পদ অনুযায়ী ১.৯। এদের ক্ষেত্রে সেবার বিভিন্ন পর্যায়ে দক্ষতার যথাযথ মিশ্রণের প্রচুর অভাব রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর অনুপাত হওয়া উচিত ১:৩ ও ১:৫ । ২০২১ সালে হিসাবকৃত ১৮ কোটি জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসকের সংখ্যা হবে ১,০৩,৫০০, সেই হিসেবে নার্সের সংখ্যা হবে ৩, ১০,৫০০ এবং মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও অন্যান্য দক্ষ জনবলের সংখ্যা হবে ৫,১৭,৫০০। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রকাশিত বাংলাদেশ স্বাস্থ্য জনবল জাতীয় প্রোফাইল ২০২১ অনুযায়ী চিকিৎসকের সংখ্যা ৮৬,৬৭৫ (অর্থাৎ ১৬. ৫ শতাংশ কম), নার্স-মিডওয়াইফরি ও সহযোগী সংখ্যা ৫৬,৭৩৪ (অর্থাৎ ৮২ শতাংশ কম) এবং মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও অন্যান্য দক্ষ জনবল সংখ্যা ২৩০,২১৯ (অর্থাৎ ৫৫.৫ শতাংশ কম)। বাংলাদেশে সরকারি খাতের প্রায় সব ক্যাটেগরীর জনবল ঘাটতি রয়েছে ।

সেবার পর্যায় ও দায়িত্ব-স্তর ভেদে জনবল চিহ্নিতকরণ ও তার সংখ্যা নির্ধারণ বাংলাদেশের জন্য একটি জটিল বিষয়। একমাত্র অবস্থানভিত্তিক এক ধরনের প্রাথমিক, সেকেন্ডারি ও উচ্চতর সেবার বিভাজন ছাড়া সত্যিকারের সুপরিকল্পিত স্তরভিত্তিক গাইডলাইন এখনো দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিদ্যমান নেই, ফলে বিভিন্ন পর্যায়ে সেবাদানকারী স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা সঠিকভাবে চিহ্নিত করা কঠিন।

স্বাস্থ্যব্যবস্থা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষ স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের অভাব এই দেশে প্রকট। জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দক্ষ জনবল প্রায় অনুপস্থিত। ঊর্ধ্বতন পর্যায়েও এ ধরনের জনবলের প্রচুর ঘাটতি রয়েছে।

স্থানীয় পর্যায়ে কমিউনিটির যথাযথ অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের অভাব রয়েছে। উপজেলা এবং কমিউনিটিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কমিটি সাধারণত তৈরি করা হয়, কিন্তু সিংহভাগ ক্ষেত্রে এইসব কমিটিগুলোকে কোন দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায় না এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য সেবাদানকারীদের মধ্যে কোনো জবাবদিহিতা তৈরি হয় না।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংস্থাগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। বাংলাদেশে অনেক মন্ত্রণালয় এবং সংস্থায় বহু স্বাস্থ্যকর্মী কাজ করেন । যেমন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ছাড়াও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, সিটি কর্পোরেশন এবং আরো অনেক প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থায় স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন। কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেই কোন

ক্যারিয়ার বা চাকুরী পরিকল্পনা নেই এবং সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত ও পেশাগত উন্নয়নের কোন পদ্ধতি নেই। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সংস্থার এসব স্বাস্থ্যকর্মী মধ্যে কোন সমন্বয়ের সুযোগ তৈরি হয়নি। এ সবই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যথাযথ উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশে বেসরকারি খাতের সেবাদান কার্যক্রম অতি দ্রুত বিকশিত হয়েছে, বিশেষত সেকেন্ডারি ও উচ্চতর পর্যায়ে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যায় তাদের ভূমিকা অত্যন্ত কম। বেসরকারি খাতের জনবল সংক্রান্ত বর্তমান অবস্থা এবং সংকট মূল্যায়ন করা অত্যন্ত কঠিন, কারণ এক্ষেত্রে কোনো সমন্বিত প্রকাশিত তথ্যসূত্রের অভাব। সরকারি থেকে বেসরকারি খাতে স্বাস্থ্যব্যবস্থার অতি দ্রুত স্থানান্তর অনেক চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করেছে যার মধ্যে স্বাস্থ্য জনবল একটি প্রধানতম চ্যালেঞ্জ। সিংহভাগ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের জনবল সরকারি অর্থ শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন। অথচ বেসরকারি খাতে অতি উচ্চ আর্থিক প্রণোদনের ফলে, দ্বৈত প্র্যাকটিসের সুযোগে, এই সকল বিশেষজ্ঞের সেবা বেসরকারি খাতেই বেশি পাওয়া যায়। আইনগত নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশাসনিক শিথিলতার কারণে বেসরকারি খাতের সেবা কার্যক্রম পুরোপুরি নৈতিক ও সমন্বিত করা সম্ভব হয়নি। বেসরকারি খাতে চিকিৎসা শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের পরিকল্পনাও একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে। বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্যসেবার জন্য ব্যক্তিগত অর্থব্যয়ের এটি একটি প্রধান কারণ।

৪) স্বাস্থ্য জনবলের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ :

যে কোন স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য স্বাস্থ্য জনবল একটি অপরিহার্য উপাদান। যথাযথ স্বাস্থ্য জনবল পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ক্যাটেগিরির যথেষ্ট সংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা যে কোনো স্বাস্থ্যব্যবস্থার সফলতার জন্য অপরিহার্য। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিদর্শিত হলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের মধ্যেও জনসংখ্যার অনুপাতে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য জনশক্তির সংখ্যা সবচেয়ে কমা পরিমাণের সঙ্গে জনবলের মানের কথা চিন্তা করলে এই সমস্যাটি আরো প্রকট হয়ে ওঠে। স্বভাবতই দেশের স্বাস্থ্য সমস্যাগুলোর আলোচনা করতে হলে স্বাস্থ্য জনবলের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ইস্যুগুলি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেয়। প্রথম চ্যালেঞ্জই হচ্ছে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক-প্রশিক্ষক ও গবেষকের ঘাটতি। অন্য চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে দক্ষ এবং ন্যায্যভাবে শিক্ষক-প্রশিক্ষক নিয়োগ, এই জনশক্তিকে সঠিক স্থানে রাখা রাখতে পারা, দক্ষতার যথাযথ মিশ্রণ, সামর্থ্য ও কর্মদক্ষতার মূল্যায়ন, জবাবদিহিতা, সমন্বয় দক্ষতা এবং নীতি নির্ধারণের সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি পরিকল্পিত সুপরিকল্পিত তথ্য ব্যবস্থাপনা।

শিক্ষক-প্রশিক্ষক-গবেষক ইস্যু ছাড়াও ভৌত অবকাঠামো এবং অন্যান্য সহায়ক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রচুর সংখ্যক চ্যালেঞ্জ রয়েছে এক্ষেত্রে। গত বছরে দেশে একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে। সেই সঙ্গে দেশের জনগণ এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিটি আশা করছি যে টেকসই লক্ষ্যমাত্রার লক্ষ্য ৩ (উত্তম স্বাস্থ্য ও সুস্থতা) অর্জনে সরকার আরো দ্রুত সফল হবে। তবে ২০৩০ সালের পূর্বে যে সামান্য কয়েকটি বছর রয়েছে তার মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অর্জন (যা এসডিজি ৩ অর্জনের আবশ্যিক অঙ্গ) অর্জনে, বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বাস্তবতায়, কঠিন হয়ে পড়বে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংস্কারে অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে এই বাস্তবতা, বিশেষ বিশেষ চ্যালেঞ্জ, ও গৃহীত পদক্ষেপগুলিকে সমন্বিতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্য জনবল সৃষ্টির সামর্থ্য : বাংলাদেশে ৩০টি সরকারি (৩২১২ আসন সংখ্যা), ৬৪ টি বেসরকারি (৫৯৫০ আসন সংখ্যা), একটি আর্মড ফোর্সেস (১২৫ আসন সংখ্যা) এবং ৫টি আর্মি মেডিকেল কলেজ (২৫০ আসন সংখ্যা) রয়েছে। ডেন্টাল কলেজের ক্ষেত্রে ৫টি সরকারি এবং ২৪ টি বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ রয়েছে যেখানে যথাক্রমে ৫৩২ ও ১৩৫৫ আসন সংখ্যা রয়েছে। বিএমডিসি-র তথ্য অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ উভয় ক্ষেত্রে ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ সেশন থেকে ছাত্রী সংখ্যা ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যানুপাত বেশি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট শাখাগুলির তথ্য অনুযায়ী, নারী চিকিৎসকদের সংখ্যা বেশি।

বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিশেষজ্ঞের সংখ্যা অনেক কম, তাদের মধ্যে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা আরো কম। বর্তমানে, বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের (যেমন হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা, অসংক্রামক ব্যাধি, কমিউনিটি

মেডিসিন, রোগতত্ত্ববিদ্যা, রিপ্রোডাক্টিভ ও চাইল্ড হেলথ, এনভায়রনমেন্টাল ও অকুপেশনাল হেলথ, হেলথ প্রমোশন ও হেলথ এডুকেশন ইত্যাদি) মোট সংখ্যা মাত্র ৩,৫৬৩ জন।

দেশে ডিগ্রিধারী ক্লিনিক্যাল বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (MD, MS, FCPS, MCPS) বিশেষজ্ঞদের চাহিদা দেশের জনসংখ্যা এবং রোগের বর্ধিত প্রাদুর্ভাবের কারণে অনেক বেশি বেড়েছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শতকরা মাত্র ২৩ শতাংশ প্রতিষ্ঠান পাবলিক সেক্টরে রয়েছে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় সেগুলিতে খরচ যৎসামান্য। বিগত বছরগুলিতে প্রাইভেট সেক্টরে স্বাস্থ্যকর্মী সৃষ্টির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে অতি দ্রুত। ফলে, প্রায় সকল ধরনের ডিগ্রি ও কোর্সের জন্য প্রাইভেট সেক্টরের তুলনায় আসন সংখ্যার অনুপাত অনেক গুণ বেশি।

২০২১ সালে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সংখ্যা সম্পর্কিত একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে যেখানে দেশের স্বাস্থ্য জনবলের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মী সৃষ্টির তুলনা করে করা হয়েছে। এর সঙ্গে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য জনবল সংক্রান্ত তথ্যসংক্ষেপ মিলিয়ে দেখা যায় যে, ২০৩০ সালের মধ্যে প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ করতে হলে চিকিৎসকের সংখ্যা ১.৮ গুণ বৃদ্ধি করতে হবে। এই অনুপাত কিছুটা রক্ষণধর্মী কারণ বিদ্যমান জনবল পরিকল্পনার ভিত্তিতে সেটি করা হয়েছে এবং সেটি কিছুটা কম হতে পারে। এই হিসাব অনুসারে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কর্মীদের সংখ্যা ১.৫ গুণ ও নার্সিং-সহযোগী সহযোগী কর্মীদের সংখ্যা ৩ গুণ বৃদ্ধি করতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য-সহায়ক কর্মীদের সংখ্যা (যারা মূলত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পর্যায় কর্মরত তাদের সংখ্যা) প্রায় ছয় গুন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এদেশে। বাংলাদেশ স্বাস্থ্য জনবলের কর্মক্ষেত্রের পর্যায় খুব সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত নয়।

এদেশের প্রয়োজন এই হারে স্বাস্থ্য জনবল সৃষ্টির মাধ্যমে মেটানো সম্ভব নয়। বর্তমান আসন সংখ্যা অনুযায়ী চিকিৎসক-এর সঙ্গে নার্স-মিডওয়াইফ- এর সৃষ্টির অনুপাত ১:১.৫, অথচ স্বাস্থ্যকর্মীর স্টক-এর ভিত্তিতে সেই অনুপাত ১:০৭, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত অনুপাতের অনেক কম। লক্ষ্যণীয় যে, স্বাস্থ্য প্রশাসক, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং বায়োস্ট্যাটিশিয়ান-এর মত স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের সংখ্যা অনেক হওয়া উচিত, অথচ খুব কম সংখ্যক প্রতিষ্ঠানে এই পেশাজীবীদের সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং বিশ্লেষণে তাদের বিবেচনা করা হচ্ছে না।

শিক্ষক-প্রশিক্ষক-গবেষক-এর এর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন সম্পর্কে সংখ্যা নির্ণয়ের চ্যালেঞ্জ: দেশে শিক্ষক-প্রশিক্ষক-গবেষকের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের প্রয়োজনভিত্তিক সংখ্যা নির্ণয়ের সমন্বিত কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। বিভিন্ন নীতিমালা ও দাপ্তরিক আদেশের মাধ্যমে বিভিন্ন শাখায়, কিছুটা অপরিকল্পিতভাবে, শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাতের একটি সাধারণ ধারণার ভিত্তিতে শিক্ষক-প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে এবং সেটিও বহু বছর একই অনুপাতে রয়ে গেছে।

যথাযথ দক্ষতার মিশ্রণ সহ জনবল সৃষ্টি: এই সংক্রান্ত দক্ষতার যথাযথ মিশ্রণ সংক্রান্ত কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই, সাধারণভাবে স্বাস্থ্য জনবলের সৃষ্টি পরিকল্পনা করা হয়।

বর্তমানকালে স্বাস্থ্য জনশক্তি সৃষ্টিতে গবেষণা, উন্নয়ন ও উদ্ভাবন (innovation), সংক্ষেপে RDI, একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উন্নততর জ্ঞান, দক্ষতা এবং উদ্ভাবক তৈরীর ক্ষেত্রে, এবং সেই সঙ্গে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভ্যাস তৈরির জন্য এ কাজগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত, উচ্চতর জনশক্তি সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই উপাদান অপরিহার্য। কিন্তু বাংলাদেশে এ ধরনের পদক্ষেপ অত্যন্ত অপ্রতুল। স্বাধীনতার পর পরই 'বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল' সৃষ্টি করা হয়েছিল এই উদ্দেশ্যে; কিন্তু যথাযথ আইনগত ভিত্তি এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও পর্যাপ্ত জনবলের অভাবে প্রতিষ্ঠানটি সেভাবে অগ্রসর হতে পারেনি। এই ত্রুটির ফলে প্রতিষ্ঠানটি দেশে একটি গবেষণা সংস্কৃতি সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে।

স্বাস্থ্য জনবল স্বাস্থ্য জনবল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় ও পরিচালনায় সুদক্ষ পেশাজীবীদের অন্তর্ভুক্তির অভাব: স্বাস্থ্য জনবল সৃষ্টির ক্ষেত্রে ও প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় দক্ষ পেশাজীবীদের অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত আবশ্যক। বাংলাদেশ এ বিষয়ে এ পর্যন্ত নেতৃত্বদানকারীদের অনেকেরই এই বিশেষ বিষয়গুলিতে তেমন কোন শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ছিল না।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন শাখায় সমন্বয় এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা ও সমন্বয়: স্বাস্থ্য জনবল সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা ও উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সঙ্গে পরিকল্পনাগত এবং বাস্তবায়ন সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের অভাব রয়েছে।

এক্রেডিটেশন: বাংলাদেশের শিক্ষা (বিশেষত উচ্চতর শিক্ষা)-র বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতির জন্য এক্রেডিটেশন একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় কিন্তু সেটির কোন সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। সাম্প্রতিককালে একটি কাউন্সিল করা হয়েছে, কিন্তু এটিও শুধুমাত্র এমবিবিএস প্রোগ্রামের জন্য এবং এখন পর্যন্ত সেভাবে সক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়নি।

বিগত বছরগুলিতে শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণের সমস্যা : সারা বিশ্বেই সাম্প্রতিক বছরগলিতে স্বাস্থ্য জনবলের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এক্ষেত্রে একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। সে তুলনায় বাংলাদেশ শিক্ষা-প্রশিক্ষণের কারিকুলাম-সিলেবাস এবং পদ্ধতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন এখনো সীমিত রয়ে গেছে।

প্রতিষ্ঠানগুলির ভৌত অবকাঠামো এবং অন্যান্য সহায়ক সম্পদের সীমাবদ্ধতা: এমনকি প্রথম দিকের প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ছাত্র-ছাত্রী আসন সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি করা হলেও অবকাঠামো, সহায়ক সম্পদ এবং জনবলের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো উন্নয়ন করা হয়নি। নতুনগুলোর ক্ষেত্রেও প্রচুর সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে।

কারিকুলাম বহির্ভূত কার্যক্রম: শিক্ষা-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে শুধুমাত্র কারিকুলার কার্যক্রম যে ছাত্রদের মান বৃদ্ধি করে তা নয় | কারিকুলাম বহির্ভূত যেসব সৃষ্টিশীল কার্যক্রম রয়েছে সেগুলিও কিন্ত অত্যন্ত প্রয়োজন; অথচ সেগুলোর সুযোগ-সুবিধা খুবই সীমাবদ্ধ।

বেসরকারি খাতে শিক্ষা: বিভিন্ন রকম রাজনৈতিক পদক্ষেপ ও নীতির কারণে, সরকারি খাতের তুলনায় বেসরকারি খাতে অনেক বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে। অথচ সেগুলোর শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মান সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন রয়ে গেছে এবং এটি বাংলাদেশের জন্য প্রধান একটি চ্যালেঞ্জ। যখন অনেক অর্থ ব্যয় করে কেউ শিক্ষা লাভ করে তখন সেটি ফেরত আনা পরিবারের ও অভিভাবকের জন্য একটি বিশেষ আগ্রহের কারণ হয়ে ওঠে।

৫) অত্যাবশ্যকীয় ঔষধপত্র, চিকিৎসা প্রযুক্তি ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ

অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের সর্বজনীন প্রাপ্তি প্রতিটি নাগরিকদের মোলিক স্বাস্থ্য অধিকার । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুসরণ করে বাংলাদেশ সরকার একটি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা প্রণয়ন করেছে, যাতে ২৮৫ টি ওষুধ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করার দায়িত্ব ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের (DGDA)। দেশীয় ওষুধ শিল্প বর্তমানে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ, যা দেশের চাহিদার ৯৮ শতাংশ পূরণ করতে সক্ষম। বাংলাদেশের ওষুধ আজ ১০০টিরও বেশি দেশে রপ্তানি হচ্ছে । এই শিল্প জাতীয় অর্থনীতিতে ১.৮ শতাংশ অবদান রাখছে। তবে এই সাফল্যের পাশাপাশি বেশ কিছু কাঠামোগত দুর্বলতা এখনো রয়ে গেছে, যা জনগণের জন্য মানসম্পন্ন ও সাশ্রয়ী ওষুধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প এখনো সক্রিয় ফার্মাসিউটিক্যাল উপাদান (API)-এর ক্ষেত্রে চীন ও ভারতের ওপর ৮৫ শতাংশের বেশি নির্ভরশীল। এই অতিনির্ভরতা কোভিড-১৯ পরবর্তী বৈশ্বিক সংকটে গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিশ্ব বাজারে এপিআই-এর মূল্য বৃদ্ধি, টাকার অবমূল্যায়ন এবং উৎপাদন ব্যয় বাড়ার ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে ওষুধের দাম বেড়েছে। এই মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে সাধারণ ও নিম্নআয়ের মানুষের ওপর, যাদের আয়ের একটি বড় অংশ ওষুধ কিনতে ব্যয় হচ্ছে। বর্তমানে দেশের মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের প্রায় ৭৩ শতাংশ ব্যক্তি পর্যায়ের খরচ, যার সিংহভাগই ব্যয় হয় ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রীর পেছনে। সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ সময়ে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ পাওয়া যায় না, যার ফলে রোগীদের বেসরকারি ফার্মেসির ওপর নির্ভর করতে হয়। এতে অনর্থক ব্যক্তি পর্যায়ের খরচ বাড়ে এবং অনেকে মারাত্মকে আর্থিক চাপে পড়েন।

সরবরাহ ব্যবস্থার বৈষম্যও একটি বড় সমস্যা। শহরাঞ্চলে তুলনামূলকভাবে ফার্মেসির বিস্তার বেশি হলেও গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকায় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রী সহজলভ্য নয়। বর্তমানে দেশে অনুমোদিত ফার্মেসির সংখ্যা প্রায় ৪ লাখ, এবং প্রতিদিন গড়ে ২২০টির বেশি নতুন ফার্মেসি অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এসব ফার্মেসির একটি বড় অংশ প্রশিক্ষিত ফার্মাসিস্ট ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছে। নিয়ম না মেনে অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি, ওষুধের অপব্যবহার, এবং নিয়ন্ত্রণহীন বাজার বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। এর ফলে ওষুধের মান, কার্যকারিতা এবং রোগীদের নিরাপত্তা, সবই ঝুঁকির মুখে পড়েছে।

ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সীমিত সক্ষমতার কারণে বাজারে নকল, নিম্নমানের ওষুধ এবং মানহীন রোগ নির্ণয় সরঞ্জাম ছড়িয়ে পড়েছে। ওষুধের দাম নির্ধারণেও অস্পষ্টতা রয়েছে। বর্তমানে মাত্র ১১৭টি ওষুধের দাম ডিজিডিএ সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে; বাকি ওষুধের দাম কোম্পানিগুলোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে অনুমোদন দেওয়া হয়। এতে দাম ও গুণমান, দুই ক্ষেত্রেই বিরুপ প্রভাব পড়ছে। তদারকির অভাব, ফার্মাকোভিজিলেন্স ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং জনবল ঘাটতি ডিজিডিএ-র কার্যকারিতা সীমিত করে রেখেছে, যা বাজারে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বড় অন্তরায়।

সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান Essential Drugs Company Limited (EDCL) দেশের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ সরবরাহ করে থাকে। তবে এই প্রতিষ্ঠানে সুশাসনের ঘাটতি, সরবরাহে বিলম্ব, চুক্তি প্রদান প্রক্রিয়ায় অনিয়ম এবং দুর্নীতির অভিযোগ বারবার উঠে এসেছে। এসব দুর্বলতার কারণে নির্ধারিত সময়মতো ওষুধ পৌঁছে না, এবং রাষ্ট্রীয় অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় না হওয়ার ঝুঁকি থাকে। একই সাথে বেসরকারি খাতের ওষুধ উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠানগুলো অতিরিক্ত মুনাফাকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। তাদের বিরুদ্ধে ডাক্তার ও ফার্মেসির ওষুধ বিক্রেতার সাথে অনৈতিক প্রচারনা ও অবৈধ লেনদেনের নানা অভিযোগ আছে। নানা সময়ে বিদ্যমান নীতি ও কৌশলের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে ওষুধের আযাচিত মুল্য বৃদ্ধি অভিযোগও পাওয়া যায়।

এই বাস্তবতায় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হলে একটি সমন্বিত ও কাঠামোগত রূপান্তর অপরিহার্য। ডিজিডিএ-র নিয়ন্ত্রক ক্ষমতা, জনবল এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা দ্রুত বাড়াতে হবে। ওষুধের মূল্য ও মান নিয়ন্ত্রণে আধুনিক আইন ও শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। স্থানীয়ভাবে এপিআই উৎপাদনের জন্য সরকারি প্রণোদনা ও অবকাঠামো সহায়তা প্রয়োজন, যাতে আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর নির্ভরতা কমানো যায়। একই সঙ্গে ইডিসিএল-কে পুনর্গঠনের মাধ্যমে তার কার্যক্রমে জবাবদিহিতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে। বেসরকারি খাতের ওষুধ উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও কঠোর নিয়ন্ত্রনের মধ্যে আনতে হবে। প্রশিক্ষিত ফার্মাসিস্ট তৈরির জন্য জাতীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করতে হবে এবং একটি জাতীয় ফার্মেসি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে, যা শহর ও গ্রাম, উভয় অঞ্চলের হাসপাতালগুলোতে সমভাবে কার্যকর হবে।

অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ শুধু চিকিৎসা নয়, এটি মানুষের জীবনের নিরাপত্তা, আস্থা এবং মর্যাদার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। এই খাতে যে দুর্বলতা, অনিয়ম ও বৈষম্য রয়েছে, তা দূর করতে না পারলে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তাই এখনই সময়—সাহসী সিদ্ধান্ত, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে একটি কার্যকর ও ন্যায্য ওষুধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার।

৬) স্বাস্থ্য তথ্যব্যবস্থা

স্বাস্থ্য তথ্যব্যবস্থার (HIS) উন্নয়নে বাংলাদেশ গত দুই দশকে প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। বর্তমানে দেশের HIS কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে—রুটিন স্বাস্থ্য তথ্য, জনসংখ্যাভিত্তিক জরিপ, জনস্বাস্থ্য নজরদারি এবং নাগরিক জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ব্যবস্থা। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যেমন DHIS২ এবং eMIS সার্বিক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, আর জাতীয় জরিপগুলো

(যেমন BDHS, MICS, BMMS, BHFS) স্বাস্থ্য অবস্থা ও সেবা কাভারেজের উপর গভীরতর তথ্য দিচ্ছে। বিভিন্ন জেলায় পরিচালিত স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নজরদারি কেন্দ্রগুলো দীর্ঘমেয়াদি তথ্য সরবরাহ করে যা নীতিনির্ধারণে সহায়ক।

রুটিন তথ্য ব্যবস্থার পরিসর ও সক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। DHIS২ বর্তমানে দেশের ১৪,০০০-এর বেশি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে চালু আছে এবং এতে সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩৭,০০০-এর অধিক। প্ল্যাটফর্মটি হাসপাতালে ভর্তি, টিকাদান, রোগ নির্ণয়, লজিস্টিকস, মৃত্যু-সংক্রান্ত তথ্যসহ স্বাস্থ্যসেবার নানা সূচক সংরক্ষণে ব্যবহৃত হচ্ছে। অপরদিকে, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের eMIS প্ল্যাটফর্ম মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং প্রজননস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সেবা পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত হচ্ছে। OpenMRS+, HRIS, OpenSRP, এবং eLMIS-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলোও চিকিৎসাসেবা, জনবল, সরঞ্জাম ও ওষুধ ব্যবস্থাপনার তথ্য ডিজিটালভাবে সংরক্ষণে ভূমিকা রাখছে।

রুটিনবহির্ভূত তথ্যসূত্র—যেমন জনস্বাস্থ্য জরিপ ও নজরদারি ব্যবস্থাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। BDHS, MICS, BMMS, BHFS-এর মতো জরিপগুলো স্বাস্থ্যসেবার মান, ব্যবহারের বৈষম্য, এবং স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির নানা দিক তুলে ধরে। সারাদেশে চালু হওয়া নজরদারি কেন্দ্র যেমন Matlab, Chakaria, Baliakandi এবং ঢাকার নগর এলাকায় পরিচালিত Demographic Surveillance Site-গুলো নিয়মিতভাবে মৃত্যুহার, প্রসব, শিশুস্বাস্থ্য ও স্থানান্তর সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করে, যা মহামারি ও স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থার পূর্বাভাসেও গুরুত্বপূর্ণ।

তবে, এই অগ্রগতি সত্ত্বেও, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থার সক্ষমতা এখনো অনেক সীমাবদ্ধতায় জর্জরিত।

১. তথ্যের গুণগত মান একটি বড় দুর্বলতা। DHIS২ এবং eMIS-এ সংগৃহীত তথ্যে অনেক সময় অসম্পূর্ণতা, ভুল এন্ট্রি, বা পুরনো জনসংখ্যা ডিনোমিনেটর ব্যবহারের কারণে পরিসংখ্যানগুলো বাস্তব অবস্থা প্রতিফলিত করতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে, অনেক সময় সেবার কাভারেজ বা রোগের প্রকোপের হিসাব অতিরিক্ত বা কম করে ধরা পড়ে, যা নীতিনির্ধারণে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

২. প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে আন্তঃসংযোগ সীমিত। DHIS২, eMIS, CRVS, surveillance বা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মগুলো একে অপরের সঙ্গে কার্যকরভাবে সংযুক্ত না হওয়ায় একীভূত স্বাস্থ্য তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। রোগীর স্বাস্থ্য-যাত্রার পূর্ণ চিত্র—প্রাথমিক থেকে তৃতীয় স্তরের সেবা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান—আজও বিচ্ছিন্নভাবে সংরক্ষিত, যা একটি ‘continuum of care’ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ।

৩. তথ্য ব্যবহারের সংস্কৃতি এখনো গড়ে ওঠেনি। বিশাল পরিমাণে তথ্য সংগৃহীত হলেও, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ব্যবস্থাপক এবং কেন্দ্রীয় নীতিনির্ধারকরা অনেক সময় সেই তথ্য ব্যবহার করতে পারেন না, প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ ও ভিজ্যুয়াল টুলসের অভাবে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ, ব্যবহারবান্ধব ড্যাশবোর্ড এবং ফিডব্যাক ব্যবস্থার উন্নয়ন।

৪. অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থাকে দুর্বল করছে। বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, উচ্চগতির ইন্টারনেট, পর্যাপ্ত কম্পিউটার ও প্রশিক্ষিত অপারেটর না থাকায় রিয়েল-টাইম তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না। এটি ডিজিটাল ব্যবস্থার সার্বজনীনতা এবং কার্যকারিতা দুটোকেই বাধাগ্রস্ত করে।

৫. eMIS-এর টেকসইতা একটি উদ্বেগজনক ইস্যু। এই সিস্টেমটি বহুলাংশে বিদেশি অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। অব্যাহত প্রযুক্তি সহায়তা, সার্ভার রক্ষণাবেক্ষণ, এবং জনবল প্রশিক্ষণের অভাব eMIS-এর দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্বকে হুমকির মুখে ফেলেছে। পাশাপাশি DHIS২ ও eMIS-এর মধ্যে আন্তঃসংযোগের ঘাটতিও কার্যকারিতা কমিয়ে দিয়েছে।

৬. জরিপ ও নজরদারির ক্ষেত্রে একাধিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। জরিপে অনেক সময় স্মৃতি-নির্ভর তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়, যা ফলাফলকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। দুর্গম এলাকায় পৌঁছানো, লোকবল ঘাটতি, অনভিজ্ঞতা এবং প্রশাসনিক জটিলতাও কার্যক্রমে বিলম্ব ঘটায়। দীর্ঘমেয়াদে এসব কার্যক্রমের টেকসইতা রক্ষায় স্থায়ী অর্থায়ন ও কাঠামোগত সমর্থন জরুরি।

৭. HISPIX অনুযায়ী, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থার সামগ্রিক স্কোর ৩০-এর মধ্যে মাত্র ১৫ (অর্থাৎ ১০০-এর মধ্যে ৫০)। স্বাস্থ্য জরিপ ও রিসোর্স ট্র্যাকিংয়ে কিছু অগ্রগতি থাকলেও, মৃত্যুনিবন্ধন, তথ্য বিশ্লেষণ, রিপোর্টিং মান এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই ওয়েব-ভিত্তিক রিপোর্টিং, প্রমিত ডেটা কোয়ালিটি মূল্যায়ন এবং আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য নিয়ম (IHR) বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থার ভিত্তি নির্মিত হলেও, এটি এখনো খণ্ডিত, অপর্যাপ্ত এবং প্রকৃত অর্থে স্বাস্থ্যব্যবস্থার আধুনিক চাহিদা পূরণে অক্ষম। যদি এই ব্যবস্থাকে একটি সুসংহত, তথ্যনির্ভর ও রেসপন্সিভ কাঠামোতে রূপান্তর করা না যায়, তবে এটি সামগ্রিক স্বাস্থ্যখাতের অগ্রগতিকেই প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্ত করবে। এখনই প্রয়োজন—একটি সমন্বিত ডিজিটাল রূপান্তর পরিকল্পনা, তথ্যের মানোন্নয়ন, আন্তঃসংযুক্তি, এবং একটি শক্তিশালী আইনি কাঠামোর ভিত্তিতে স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থাকে জাতীয় অগ্রাধিকারের স্তরে উন্নীত করা।

৭) স্বাস্থ্য অর্থায়ন

বাংলাদেশ বিগত দুই দশকে বাংলাদেশ প্রভুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করেছে। মাথাপিছু আয়, জীবনমান এবং মানব উন্নয়ন সূচকে দৃশ্যমান উন্নতি হয়েছে, অথচ স্বাস্থ্যখাত অর্থায়নের কাঠামো ও কার্যকারিতায় কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটেনি। ২০২১ সালে দেশের মাথাপিছু আয় ২,৪৮৩ মার্কিন ডলারে উন্নীত হলেও স্বাস্থ্যখাতে সরকারি বিনিয়োগ এবং আর্থিক সুরক্ষার অন্যান্য সূচকগুলোতে এই উন্নয়নের ছোয়া লাগেনি। ২০০০ সালে জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্যখাতের জন্য বরাদ্দ ছিল ৬ শতাংশ, যা ২০২১ সালে নেমে এসেছে মাত্র ৪.২ শতাংশে। একই সময়ে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যয় জিডিপির ০.৭–০.৮ শতাংশের মধ্যে আবর্তিত হয়েছে, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্দেশিত ন্যূনতম মানেরও অনেক নিচে এবং পৃথিবীর মাঝে অন্যতম সর্বনিম্ন। ২০২১ সালে বাংলাশে মাথাপিছু সরকারি স্বাস্থ্য ব্যয় ছিল মাত্র ২৬ মার্কিন ডলার, যা ভারতে ৮১ ডলার, নেপালে ৭৬ ডলার এবং শ্রীলঙ্কায় ২৮৩ ডলার। এ প্রবণতা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগ চরমভাবে অপর্যাপ্ত, যা জনগণের স্বাস্থ্য অধিকার বাস্তবায়ন এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বড় বাধা তৈরি করছে।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়ন কাঠামো এখনো প্রকল্পনির্ভর এবং দাতা-নির্ভর, যেখানে টেকসই ও সমন্বিত তহবিল ব্যবস্থাপনার অভাব সুস্পষ্ট। দেশের কর-জিডিপি অনুপাত মাত্র ৯ শতাংশ, যেখানে অধিকাংশ উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে এটি ১৫–২০ শতাংশের মধ্যে থাকা উচিত। স্বাস্থ্যবান্ধব করনীতির আওতায় তামাক সারচার্জ চালু হলেও, এই রাজস্বের বরাদ্দ স্বাস্থ্যখাতের জন্য নিশ্চিত করা যায়নি। জাতীয় পর্যায়ে সমন্বিত আর্থিক পরিকল্পনা এবং ফান্ডিং মেকানিজমের অনুপস্থিতির কারণে স্বাস্থ্যখাতের অর্থায়ন এখনও টেকসই ভিত্তি লাভ করেনি।

একদিকে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ অপ্রতুল, অপরদিকে, বরাদ্দকৃত এই অর্থেরও দক্ষ ব্যবহারও নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। ২০১০ সালে যেখানে বরাদ্দের ৯২ শতাংশ ব্যয় হয়েছিল, ২০২১ সালে এই হার কমে এসেছে ৬৯ শতাংশে। বাজেট বাস্তবায়নে বিলম্ব, প্রশাসনিক অদক্ষতা এবং সরবরাহ ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা সেবা সম্প্রসারণ ও গুণগত উন্নয়নকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করছে। এর ফলে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেলেও কাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ বা গুণগত পরিবর্তন ঘটছে না, যা স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়ন ব্যবস্থাপনায় গভীর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

সরকারি স্বাস্থ্য বাজেটের বরাদ্দ এখনো ইনপুটভিত্তিক (যেমন শয্যা সংখ্যা, ভবন) সূচকের ওপর নির্ভরশীল, বাস্তব জনস্বাস্থ্য চাহিদা কিংবা আউটপুটভিত্তিক ফলাফলের সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ নয়। অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ (ESP) ২০১৬ সালে হালনাগাদ হলেও, ক্রমবর্ধমান অসংক্রামক রোগের চাহিদা এবং জনসংখ্যার বার্ধক্যের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট এতে প্রতিফলিত হয়নি। এর ফলে স্বাস্থ্যখাতে বাজেটের বরাদ্দ তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক ও জনস্বাস্থ্যের চাহিদা ভিত্তিক হইনি। কোভিড-১৯ মহামারির অভিজ্ঞতা দেশের জরুরি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা নগ্ন করে দিয়েছে, যেখানে জরুরি তহবিল সংগ্রহ ও বরাদ্দের সক্ষমতা ছিল মারাত্মকভাবে সীমিত।

সামাজিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (SSK) ও নগরভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির আওতা ও পরিধি এখনো নগন্য। অপর দিকে বেসরকারি খাতে ফি-ফর-সার্ভিস মডেল (টাকার বিনিময়ে সেবা) অতিরিক্ত এবং অনিয়ন্ত্রিত সেবাকে উৎসাহিত করছে। এতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয় উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে, যা দেশের জনগণকে আর্থিক ঝুঁকিতে ফেলে দিচ্ছে। ২০২১ সালে মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের ৭২ শতাংশ ব্যক্তিগত ব্যয় থেকে এসেছে। এই হার দক্ষিণ এশিয়া এবং সারা বিশ্বে অন্যতম সর্বোচ্চ। ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয়ের ৬২ শতাংশ খরচ হয় ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয়ে, যা সরকারি সরবরাহ ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং ভর্তুকির সীমাবদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ। ব্যক্তি পর্যায়ের এই অতিরিক্ত ব্যয় জনগনকে দরিদ্র হবার ঝুঁকিতেও ফেলে দিতে পারে । ২০১৬ সালের তথ্যমতে, ১৫% শতাংশ পরিবার এ ধরণের বিপর্যয়কর চিকিৎসা ব্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে অতিরিক্ত ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয় শুধু আর্থিক সুরক্ষাকে দুর্বল করে না, এটি দীর্ঘ মেয়াদে সেবার প্রাপ্তিতা ও ধারাবাহিকতাকেও বাধাগ্রস্ত করে ।

এই বাস্তবতায় বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের টেকসই উন্নয়নের জন্য এখন মৌলিক রূপান্তর প্রয়োজন। প্রথমত, স্বাস্থ্যখাতে সরকারি বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়াতে হবে । দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে হবে। তৃতীয়ত, ইনপুটভিত্তিক বাজেট প্রক্রিয়া থেকে সরে এসে চাহিদাভিত্তিক ও ফলাফলনির্ভর বাজেটিং এবং কৌশলগত ক্রয়ব্যবস্থা (Strategic Purchasing) চালু করতে হবে, যাতে কার্যকর ও ব্যয়-সাশ্রয়ী সেবা ও চিকিৎসাকে অগ্রাধিকার দেয়া যায়। একই সঙ্গে, জরুরি স্বাস্থ্য সংকটে দ্রুত সাড়া দিতে একটি স্থায়ী ইমার্জেন্সি হেলথ ফান্ড গঠন এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতির সক্ষমতা তৈরি করা জরুরি।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে পৌঁছেছে। এখনই সময়—একটি সুদূরপ্রসারী, প্রমাণভিত্তিক ও দায়িত্বশীল নীতিমালার মাধ্যমে স্বাস্থ্যখাতের অর্থায়ন কাঠামো পুনর্গঠন করা। এটি কেবল জনগণের স্বাস্থ্যগত মঙ্গল নিশ্চিত করবে না, বরং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই ও স্বাস্থ্যনিরাপদ উন্নয়নের ভিত্তি শক্তিশালী করবে। স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে, সমতা ও কার্যকারিতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে, এবং ভবিষ্যতের ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য সক্ষমতা তৈরি করে, বাংলাদেশ আগামী প্রজন্মের জন্য একটি আরও নিরাপদ ও সুস্থ ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পারবে।

ঘ) মূখ্য সুপারিশসমুহ

[স্বল্প-মেয়াদী] [মধ্য-মেয়াদী]

১. **সংবিধান সংশোধন :** [স্বল্প-মেয়াদী]

সংবিধান সংশোধন পূর্বক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। এই সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য একটি পৃথক 'প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা আইন' প্রণয়ন করতে হবে, যা বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির ব্যাপারে নাগরিকদের অধিকার ও রাষ্ট্রের কর্তব্য নির্ধারণ করবে, এবং স্বাস্থ্যখাতে দীর্ঘমেয়াদে ন্যায্যতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

২. **আইনের সংস্কার:** [স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী]

সকল সংশ্লিষ্ট পুরাতন আইন পর্যালোচনা করে যুগোপযোগী করতে হবে। এছাড়া রোগী সুরক্ষা, আর্থিক বরাদ্দ, জবাবদিহিতা ও জরুরি অবস্থায় পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে কিছু নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে । হবে। প্রস্তাবিত নতুন আইনসমূহ হল: বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন আইন; বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস আইন; জনস্বাস্থ্য **ও** অবকাঠামো আইন; বাংলাদেশ সেইফ ফুড, ড্রাগ, আইভিডি ও মেডিকেল ডিভাইস আইন; ঔষধের মূল্য নির্ধারণ ও প্রাপ্তি আইন; স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী ও রোগী নিরাপত্তা আইন; এ্যালায়েড হেলথ প্রফেশনাল কাউন্সিল আইন; হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক এক্রেডিটেশন আইন; স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন; নারী স্বাস্থ্য আইন; ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ আইন; শিশু বিকাশ কেন্দ্র আইন; বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল আইন; স্বাস্থ্য তথ্য সুরক্ষা আইন ও স্বাস্থ্যখাতে টেকসই অর্থায়ন আইন। এছাড়াও নিম্নলিখিত আইনসমূহের সংশোধন প্রয়োজন: বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, মেডিকেল শিক্ষা এক্রেডিটেশন আইন, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন, বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল আইন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন, পৌর ও সিটি কপোরেশন আইন ইত্যাদি।

৩. **বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন গঠন :** [স্বল্প-মেয়াদী]

একটি স্বাধীন ও স্থায়ী "বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন (BHC)" প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই কমিশন স্বাস্থ্যবিষয়ক নীতি প্রণয়নে সংসদ ও সরকারকে কৌশলগত পরামর্শ দেবে। পাশাপাশি, এটি জাতীয় কৌশল, সেবা ও সেবাদানকারি প্রতিষ্ঠানের মানদন্ড এবং ক্লিনিক্যাল গাইডলাইন প্রণয়ন করবে। কমিশন নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্যব্যবস্থার কার্যকারিতা, সেবার গুনগত মান এবং সার্বিক ব্যয়-সাশ্রয়িতা পর্যালোচনা করবে। এর ভিত্তিতে কমিশন বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও সরকারকে উন্নয়নের জন্য গঠনমূলক মতামত ও দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। এই কমিশন সরাসরি সরকার প্রধানের নিকট জবাবদিহি করবে এবং প্রতি বৎসর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সংসদে পাঠাবে। এই কমিশন নিম্নোক্ত বিভাগসমূহ এ বিষয়ক তদারক ও গঠনমূলক দিকনির্দেশনা প্রদান করবে: ১. চিকিৎসা শিক্ষা বিভাগ - স্নাতক ও স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা, নার্সিং ও প্যারামেডিক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন; ২. জনস্বাস্থ্য বিভাগ - জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়ন, রোগ প্রতিরোধ; ৩. ক্লিনিক্যাল বিভাগ – স্বাস্থ্যসেবার ও রোগীর নিরাপত্তা তদারকি; ৪. BICE (Bangladesh Institute for Health and Care Excellence) – ক্লিনিকাল গাইডলাইন ও প্রটোকল উন্নয়ন, পাবলিক হেলথ গাইডলাইন উন্নয়ন; ৫. BHCI (Bangladesh Health Care Improvement) – সেবার মানদণ্ড, রোগীর নিরাপত্তা ও প্রটোকল অনুযায়ী সেবা প্রদান বিষয়ক নিয়মতান্ত্রিক তদারকি; ৬. রেগুলেটরি ওভারসাইট বিভাগ – BMDC, BMRC, BMEAC, ইত্যাদির ক্ষমতা বৃদ্ধি ও নেটওয়ার্ক গঠন; ৭. ল্যাবরেটরি ও ডায়াগনস্টিক বিভাগ – মান নিয়ন্ত্রণ, স্বীকৃতি, ও National Diagnostic Network (NDN) তদারকি; ৮. নিরাপদ খাদ্য, ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম বিভাগ – ফার্মেসি নেটওয়ার্ক, আইভিডি-মেডিকেল ডিভাইস ও খাদ্য তদারকি; ৯. এনজিও (NGO) ও প্রাইভেট হাসপাতাল

সমন্বয় বিভাগ – বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাতের মান তদারকি ও সমন্বয়; ১০. CASH (Centre for Advanced Specialized Healthcare) – বিশেষায়িত সেবা কেন্দ্র: রোগীদের বিদেশমুখিতা রোধ ও দেশে আত্মনির্ভরশীল চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন (ক্যান্সার, কিডনি, লিভার ও অন্যান্য অঙ্গ প্রতিস্থাপন, হৃদযন্ত্রের শল্যচিকিৎসা, বন্ধ্যত্ব, ও দুর্লভ রোগ ইত্যাদি); ১১. Allied Health Professionals বিভাগ – টেকনোলজিস্ট, থেরাপিস্ট, কাউন্সেলর প্রমুখ পেশার মান উন্নয়ন; ১২. প্রথাগত ও বিকল্প চিকিৎসা বিভাগ – আয়ুর্বেদ, ইউনানি, হোমিওপ্যাথি ইত্যাদি; ১৩. সেক্টোরাল হেলথ কোঅর্ডিনেশন বিভাগ - স্থানীয় সরকার, প্রতিরক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্বরাষ্ট্র, রেলপথসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রায়শই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়হীনভাবে কাজ করে। এটি তথ্যভিত্তিক নীতিনির্ধারণ, সম্পদ বণ্টন এবং জরুরি সাড়া প্রদানে সহায়ক হবে। ১৪. স্বাস্থ্য প্রযুক্তি মূল্যায়ন (Health Technology Assessment) বিভাগ – ব্যয় সাশ্রয়িতা, অর্থনৈতিক প্রভাব, বাজেট ও ক্রয় ব্যবস্থাপনা; ১৫. স্বাস্থ্য নিরীক্ষা ও দুর্নীতি বিরোধী বিভাগ – স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে কার্যকর তদারকি; ১৬. স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিভাগ - সেবাগ্রহীতার অভিযোগ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে একটি আধুনিক ডিজিটাল অভিযোগ নিষ্পত্তি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা; BMDC, BNMC, Bangladesh Pharmacy Council ইত্যাদির আইনগত ক্ষমতা ও কাঠামোকে আরও কার্যকর করা; চিকিৎসা প্রদানকারীদের নিরাপত্তা ও পেশাগত সুরক্ষা; মেডিকেল প্রফেশনাল ইন্স্যুরেন্স; পেশাগত অবহেলা বিষয়ে সুরক্ষা; স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি; এবং ১৭. আইন বিভাগ - সকল সংশ্লিষ্ট পুরাতন আইন পর্যালোচনা ও যুগোপযোগী করা, এবং নতুন আইনের সুপারিশ করা।

৪. **বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস (BHS) গঠন :** [স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী]

ক) পেশাদারীত্ব, দক্ষতা ও জবাবদিহিমূলক সেবার মান নিশ্চিত করতে বিদ্যমান স্বাস্থ্য ক্যাডার, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ক্যাডার এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল জনবল নিয়ে প্রশাসনিকভাবে স্বায়ত্তশাসিত ও পেশাভিত্তিক একটি নতুন সিভিল সার্ভিস - বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস (BHS) - গঠন করতে হবে। বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস-এর অধীনে ১১ টি আঞ্চলিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ থাকবে; এর মধ্যে প্রতিটি বিভাগীয় সদরে একটি করে মোট ৮ টি, এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম- এ একটি করে মোট ৩ টি। বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস-এর জন্য একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় গঠন করা হবে, যার নেতৃত্বে থাকবেন মুখ্য সচিব পদমর্যাদার একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক, যিনি চিফ অফ বিএইচএস (Chief of BHS) নামে অধিষ্ঠিত হবেন। তাঁর অধীনে জনস্বাস্থ্য, ক্লিনিকাল সেবা, এবং চিকিৎসা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা—এই তিনটি প্রধান খাত পরিচালনার জন্য জ্যেষ্ঠ সচিব পদমর্যাদার তিনজন উপপ্রধান নিযুক্ত হবেন, যারা ডেপুটি চিফ অফ হেলথ-DCH) নামে অধিষ্ঠিত হবেন। প্রতিটি খাতের অধীনে একজন করে মহাপরিচালক (DG) পদ সৃষ্টি করা হবে, যাঁরা সচিব-সমমানের পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং কার্যক্রম পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট ডেপুটি চীফ অব হেলথ-এর অধীনে কাজ করবেন। কর্মরত জনবলের জন্য একটি স্বতন্ত্র চাকরি বিধি ও পৃথক বেতন কাঠামো প্রণয়ন করতে হবে এবং যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন ভাতা পাবেন যাতে পেশাদারীত্ব, দক্ষতা ও জবাবদিহিমূলক সেবার মান নিশ্চিত হয়। বিদ্যমান বিসিএস ক্যাডারভুক্তদের জন্য নতুন বিএইচএস ক্যাডারে বেছে নেওয়া বা বিকল্প অপশন- এর সুযোগ রাখা হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

খ) বাংলাদেশ হেলথ সাভিস গঠনের জন্য DGHS, DG মেডিকেল এডুকেশন, পরিবার পরিকল্পনা, নার্সিং, টোব্যাকো কন্ট্রোল, হেলথ ইকোনমিক্স, TEMO ও NEMEW-সহ সব ইউনিটকে একীভূত করে একক "বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস (BHS)" গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। আলাদা সেক্রেটারিয়েট থাকবে না; সব ফাইল DG পর্যায় থেকে সরাসরি BHS-এর Deputy Chief ও Chief-এর কাছে যাবে, ফলে প্রশাসনিক কাজ হবে আরও দ্রুত, সমন্বিত ও দক্ষ। [স্বল্প-মেয়াদী]

গ) **বিকেন্দ্রীকরণ:** স্বাস্থ্যসেবার বিকেন্দ্রীকরণ করে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বাধীনতা দিতে হবে, এবং ক্ষেত্রবিশেষে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাস্থ্যের অবস্থা, স্বাস্থ্য সমস্যার ধরণ ও রোগতাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তার আলোকে উপজেলা-ওয়ারি বাজেট ও পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।

বিভাগীয় পর্যায়ের কার্যক্রম স্বশাসিত আঞ্চলিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের অধীনে পরিচালিত হবে, যা নিয়ন্ত্রণ করবে বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস। জনবল নিয়োগ, বদলি নিয়ন্ত্রন ও ক্রয়-সংগ্রহ-আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য দায়-দায়িত্বের প্রয়োগযোগ্য বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।[মধ্য মেয়াদী]

৫. স্বতন্ত্র পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) গঠন : [স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী]

ক) স্বাস্থ্যখাতের নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রক্রিয়া নিয়মিতকরন ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) গঠন করতে হবে। [স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী]

খ) গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদের ক্ষেত্রে (যেমন চিফ অফ বিএইচএস, ডেপুটি চিফ অফ বিএইচএস, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ, মহাপরিচালক, মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ, BMDC ও BMRC চেয়ারম্যান ইত্যাদি) স্বচ্ছতা ও রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রেখে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগের সুপারিশ করার জন্য উচ্চপর্যায়ের সার্চ কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি এই পদসমুহে নিয়োগপ্রাপ্তদের যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জাতীয় সংসদকে অবহিত করবে। এই উদ্যোগ জনস্বাস্থ্য ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

৬. প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা : [স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী]

ক) প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সর্বজনীন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে সরকারকে এই সেবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে (বা ক্ষেত্রবিশেষে ভর্তুকিমূল্যে) প্রদান করতে হবে, যাতে কোনো নাগরিক আর্থিক প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত না হন। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার কাঠামো শক্তিশালী করতে গ্রামাঞ্চলে ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহকে একত্রিত করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে রূপান্তর করতে হবে। শহরাঞ্চলে ওয়ার্ডভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ লক্ষ্যে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারি খাত ও বেসরকারি খাতের সহায়তা নেয়া যেতে পারে। প্রাথমিক সেবা চিকিৎসকের নেটওয়ার্ক গঠন করে শুন্যপদে প্রাথমিক স্বাস্থ্য চিকিৎসক/ জিপি/ পারিবারিক চিকিৎসক (Family Physician) -দের নিয়োগ করতে হবে, যা ইউনিয়ন থেকে উপজেলা পর্যন্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার প্রথম স্তরকে শক্তিশালী করবে। ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় জনবল, রোগনির্ণয় ব্যবস্থা, ঔষধ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জামাদির প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। প্রশিক্ষণের জন্য জেনেরিক কারিকুলাম অনুযায়ী BCPS, BCGP ও মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফ্যামিলি মেডিসিন কোর্স বা জিপি (GP) কোর্স প্রবর্তন করতে হবে। [স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী]

খ) বিদ্যালয়ে এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানেও জনগনের মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক অবহিতিকরণ ও সৃজনশীল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

৭. হাসপাতাল ভিত্তিক সেবা : [মধ্য-মেয়াদী]

ক. উপজেলা পর্যায়ে সেকেন্ডারি স্বাস্থ্যসেবা জোরদার করে জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসেবাকে আরও সহজলভ্য করতে হবে।

খ. জেলা হাসপাতালগুলোতে বিশেষায়িত (টারশিয়ারি স্তরের) চিকিৎসাসেবা চালু করতে হবে, যাতে সেবার বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত হয়, মেডিকেল কলেজ ও জাতীয় ইনস্টিটিউটগুলোর ওপর রোগীর চাপ কমানো যায়, এবং ভৌগোলিক কারণে কেউ বিশেষায়িত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না হন।

গ. প্রতিটি বিভাগীয় সদরে অন্তত একটি পূর্ণাঙ্গ, সর্বাধুনিক সুবিধাসম্পন্ন ও বিশ্বমানের টারশিয়ারি সেবা হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে, যা জটিল ও বিশেষায়িত চিকিৎসার জন্য একটি আঞ্চলিক রেফারেল কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। এ বিশেষায়িত হাসপাতালগুলি মেডিকেল কলেজ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়। এই হাসপাতালগুলো নতুনভাবে গড়ে তোলা যেতে পারে, অথবা বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধাপে ধাপে উন্নীত করে করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে

প্রয়োজনে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ, সামাজিক ব্যবসা মডেল ও বিদেশি যৌথ বিনিয়োগ সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি এই হাসপাতালগুলোতে বার্ধক্যজনিত স্বাস্থ্যসেবা-কে বিশেষ অগ্রাধিকার দিতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

ঘ. প্রতি রোগীর জন্য গড়ে ১০ মিনিটের পরামর্শ সময় নিশ্চিত করতে হবে, এজন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সেবা প্রদান কারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং সাপ্তাহিকভাবে প্রেসক্রিপশন নমুনা যাচাই পদ্ধতি চালু করা হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

ঙ. অতি দরিদ্র বা যারা দেশের মোট জনসংখ্যার ২০%, তারা সব হাসপাতালে বিনামূল্যে সব সেবা পাবেন।

চ. দেশের সব সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি হাসপাতালের রক্ত সঞ্চালন সেবা, ল্যাবরেটরী সেবা ও ফার্মেসী ২৪/৭ খোলা থাকবে।

ছ. সরকারি প্রয়োজনে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিসহ সকল স্তরের সেবাপ্রদানকারী কর্মচারীদের বিধি অনুযায়ী বদলি করা যাবে।

জ. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কার্যক্রমসমূহ জেলা ও উপজেলা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের অধীনে পরিচালিত হবে, যা নিয়ন্ত্রণ করবে বিভাগীয় পর্যায়ের বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস। [মধ্য-মেয়াদী]

ঝ. হাসপাতালে মানোন্নয়নের জন্য কাযকরী মান উন্নয়ন পর্ষদ ও কন্টিনিউড এডুকেশন পদ্ধতির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৮. **অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের প্রাপ্যতা:** [স্বল্প মেয়াদী]

ক) অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের সর্বজনীন প্রাপ্যতাকে একটি মৌলিক স্বাস্থ্য অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। দেশের সকল নাগরিককে প্রয়োজনের ভিত্তিতে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ বিনামূল্যে (যথা প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পর্যায়ে এবং অতি দরিদ্রের ক্ষেত্রে) বা ভর্তুকি মূল্যে সরবরাহ করতে হবে। এজন্য সরকারি ওষুধ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলোকে আধুনিকায়ন ও কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে পুনর্গঠিত ও শক্তিশালী করতে হবে। বেসরকারি খাত থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্মত ঔষধ সংগ্রহে কৌশলগত ক্রয়ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে প্রতিটি সরকারি হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে ফার্মেসি ২৪ ঘণ্টা চালু রাখতে হবে। এই ফার্মেসিগুলো জাতীয় ফার্মেসি নেটওয়ার্ক-এর আওতায় পরিচালিত হবে। [স্বল্প মেয়াদী]

খ) অ্যান্টি-ক্যান্সার, অ্যান্টি-ডায়াবেটিক, অ্যান্টি-হাইপারটেনসিভ ও অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের তালিকাভুক্ত অ্যান্টিবাইয়োটিকের ওপর ভ্যাট এবং প্রযোজ্য অন্যান্য শুল্ক ও কর শূন্য হবে। অন্যদিকে, ভিটামিন, মিনারেলস, ব্রেস্ট মিল্ক সাবস্টিটিউট ও প্রোবায়োটিকসহ স্বাস্থ্য-সম্পূরক ও উচ্চমূল্যের ঔষধের ওপর ভ্যাট ও শুল্ক বৃদ্ধি করতে হবে। এর মাধ্যমে একদিকে জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধের প্রাপ্যতা বাড়বে, অন্যদিকে তুলনামূলক কম-প্রয়োজনীয় ও বিলাসমূলক পণ্যে কর বাড়িয়ে রাজস্ব আয় জোরদার করা যাবে। [স্বল্প মেয়াদী]

৯. **জরুরি স্বাস্থ্যসেবা নেটওয়ার্ক:** [স্বল্প মেয়াদী]

জরুরি চিকিৎসাকে একটি বিশেষায়িত ও অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবা হিসেবে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় একে একটি স্বীকৃত চিকিৎসা বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি হাসপাতালের জরুরি বিভাগসমূহ পর্যায়ক্রমে এই বিশেষজ্ঞদের নেতৃত্বে পরিচালিত হতে হবে, যাতে জরুরি চিকিৎসাসেবার পরিসর ও মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

১০. **স্বাস্থ্য পরিষেবা সহায়ক নেটওয়ার্ক:** [স্বল্প-মেয়াদী]

স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলোর প্রাপ্যতা, মান ও পরিব্যাপ্তি নিশ্চিত করতে **জাতীয় ফার্মেসি নেটওয়ার্ক, জাতীয় ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি নেটওয়ার্ক, জাতীয় রক্ত সঞ্চালন নেটওয়ার্ক** এবং **জাতীয় অ্যাম্বুলেন্স নেটওয়ার্ক** গঠন করতে হবে। এই

পরিষেবাগুলো নির্ধারিত মানদন্ড অনুযায়ী স্ব স্ব ক্ষেত্রে একটি একীভূত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সারাদেশে সংযুক্ত থাকবে এবং পরিচালিত হবে, যাতে জনগণ সহজে, দ্রুত ও নির্ভরযোগ্যভাবে এই পরিষেবাগুলো পেতে পারেন। [স্বল্প-মেয়াদী]

১১. স্বাস্থ্য সুরক্ষা:

সেবাগ্রহীতার অভিযোগ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে একটি আধুনিক ডিজিটাল অভিযোগ নিষ্পত্তি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হবে। BMDC, BNMC, Bangladesh Pharmacy Council, Allied Health Professional Council - ইত্যাদির আইনগত ক্ষমতা ও কাঠামোকে আরও কার্যকর করা হবে ।

চিকিৎসা প্রদানকারীদের নিরাপত্তা ও পেশাগত সুরক্ষা (স্বাস্থ্য সুরক্ষা নীতির অংশ) -- **১.** মেডিকেল প্রফেশনাল ইন্স্যুরেন্স: চিকিৎসক, নার্স, টেকনোলজিস্ট ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য মেডিকেল প্রফেশনাল ইন্স্যুরেন্স চালু করা হবে, যাতে কর্মজীবনে আইনি ঝুঁকি বা অপ্রীতিকর ঘটনার ক্ষেত্রে তাদের আর্থিক ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত হয়। ২. পেশাগত অবহেলা (Professional Negligence) বিষয়ে সুরক্ষা: BMDC, BNMC, Bangladesh Pharmacy Council, Allied Health Professional Council ইত্যাদি) - র পূর্বানুমতি ছাড়া কোনো চিকিৎসক, নার্স, টেকনোলজিস্ট ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে গ্রেফতার করা যাবে না। শুধুমাত্র অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য হবে, তবে তা অভিযোগ দাখিলের নব্বই দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে ।

স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা: বাংলাদেশ পুলিশের অধীনে একটি নির্দিষ্ট ইউনিট থাকবে যেখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সংরক্ষিত কিছু পুলিশ থাকবেন (যাদের মেডিকেল পুলিশ বলা যেতে পারে) যারা জরুরী পরিস্থিতিতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। হাসপাতাল ও ক্লিনিকে অনাকাঙ্ক্ষিত হামলা, হুমকি ও সহিংসতা প্রতিরোধে এই ইউনিট কাজ করবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

১২. চিকিৎসা শিক্ষা সংস্কার: [স্বল্প ও মধ্য-মেয়াদী]

চিকিৎসা শিক্ষার মানোন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত, নীতিনির্ভর এবং কাঠামোগত সংস্কার অপরিহার্য। নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন:

জনস্বাস্থ্য চাহিদা, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, প্রতিষ্ঠান সক্ষমতা এবং World Federation for Medical Education (WFME)-এর গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে দেশের সকল মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম নিয়মিত মূল্যায়ন করতে হবে। [স্বল্প মেয়াদী]

মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন, প্রতিষ্ঠান সংখ্যা ও আসন সংখ্যা পুনর্বিন্যাস করতে হবে। মানহীন সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বন্ধ করতে হবে। তবে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষতি এড়াতে তাদের অন্যান্য স্বীকৃত মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরের (transfer) ব্যবস্থা করতে হবে। [স্বল্প মেয়াদী]

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথ উদ্যোগে (joint venture) বাংলাদেশে মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে WFME-এর মানদন্ড অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে। [স্বল্প মেয়াদী]

পাঁচ দিনের একাডেমিক সপ্তাহ চালু করে শিক্ষার কাঠামো উন্নত করতে হবে, যাতে ছাত্রদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষকদের ওপর কাজের চাপ কমে। ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের জন্য ভর্তি প্রক্রিয়ায় অপ্রয়োজনীয়

বাধা অপসারণ করে 'ব্রেইন ড্রেইন' রোধ এবং প্রবাসী বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের দেশে ফিরে আসার সুযোগ তৈরি করতে হবে। [স্বল্প মেয়াদী]

FCPS ও MD/MS কোর্সসমূহে পাঠ্যক্রমে সমন্বয় (curricular alignment) আনতে হবে এবং দেশ-বিদেশে পারস্পরিক স্বীকৃতি (reciprocal recognition) নিশ্চিত করে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষার আন্তর্জাতিক মান বৃদ্ধি করতে হবে। [স্বল্প মেয়াদী]

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে Competency-Based Medical Education (CBME) এবং Community-Oriented Medical Education (COME) কার্যকরভাবে চালু করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান, দক্ষতা ও পেশাগত আচরণে পূর্ণ সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। [মধ্য-মেয়াদী]

১৩. **চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার:** [স্বল্প ও মধ্য-মেয়াদী]

ক. বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি (BMU), অন্যান্য মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস (বিসিপিএস), প্রাথমিক পর্যায়ে পুরানো আটটি সরকারি মেডিকেল কলেজ এবং পরবর্তীতে সকল মেডিকেল কলেজ, ও বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহের জন্য Bangladesh Health Commission (BHC) - এর Medical Education Wing-এর অধীনে পৃথক ও স্বায়ত্তশাসিত শাসন কাঠামো গঠন করা হবে। বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি আইনের সংস্কার করে কার্যকর পরিচালন কাঠামো নিশ্চিত করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

খ. বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি ও অন্যান্য মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়-সংযুক্ত হাসপাতালসমূহ (University Hospitals) সরাসরি প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে নিজস্ব বোর্ড অব গভর্ন্যান্স-এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে, যাতে নীতিনির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত হয়। [মধ্য-মেয়াদী]

গ. ভবিষ্যতে একক ও সমন্বিত কাঠামোর ভিত্তিতে একটি স্বায়ত্তশাসিত মেডিকেল ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক, যা দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার সামগ্রিক ও সমন্বিত উন্নয়ন ও গবেষণাকে সুসংহতভাবে এগিয়ে নিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। [মধ্য-মেয়াদী]

ঘ. বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস (বিসিপিএস) - কে পরিগণ্য (Deemed) বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব করা হচ্ছে। বিসিপিএস-এ কাউন্সিল সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রতিটি বিশেষজ্ঞ শাখার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে, যাতে নীতিনির্ধারণে পেশাগত অন্তর্ভুক্তি ও বহুমাত্রিকতা বজায় থাকে। এই কাঠামোর আওতায় বিসিপিএস -এর প্রতিটি ফ্যাকাল্টিকে সাব-কলেজে রূপান্তরিত করে একাডেমিক স্বায়ত্তশাসনসহ প্রশ্ন ব্যাংক, পাঠ্যক্রম উন্নয়ন ইউনিট ও রিসার্চ কোঅর্ডিনেশন সেল পরিচালনা করবে। [মধ্য-মেয়াদী]

ঙ. NICVD, NITOR, NIKDU, ICMH, NIMH, NICRH, NIDCH, NIPSOM, IEDCR, IPH, IPHN ইত্যাদি সহ জাতীয় বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে এবং প্রধানদের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদায় নিয়োগ করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

চ. স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলি এনজিও ব্যুরোর পরিবর্তে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশনের মাধ্যমে সরাসরি স্থানীয় ও বিদেশি তহবিল গ্রহণ করতে পারবে এবং তা গবেষণা ও সেবা প্রদানে সঠিকভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের নিয়মিত অডিট কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। [মধ্য-মেয়াদী]

ছ. সকল টারশিয়ারি ও কোয়ার্টনারি হাসপাতালসমূহে ইলেকট্রনিক মেডিকেল রেকর্ড চালু করে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় গতি, নির্ভুলতা ও ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

জ. সেবা প্রদানকারী হাসপাতাল ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণ প্রদানকারী হাসপাতালকে, ধারণা ও কার্যক্রমের ভিত্তিতে, পৃথকভাবে পরিচালনা করতে হবে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং অন্যান্য শিক্ষা-প্রশিক্ষণ হাসপাতালগুলোর কাঠামোগত সংস্কার করতে হবে, যাতে তাদের প্রধান কার্যক্রম শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের উপর কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে চিকিৎসা শিক্ষা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে উৎকর্ষতা অর্জনের পথ প্রশস্ত হবে এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থায় জ্ঞানভিত্তিক অগ্রগতি নিশ্চিত করা যাবে। [মধ্য-মেয়াদী]

ঝ. সরকারি মেডিকেল কলেজসমূহে অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার অধ্যক্ষের নেতৃত্বে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হবে, যা কলেজ ব্যবস্থাপনা,কলেজের কোর্স কারিকুলাম, তার বাস্তবায়ন ও শিক্ষার মান নিশ্চিত করবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

ঞ. প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ আইন সংস্কার: স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সরকারি তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করতে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ আইনের আওতায় বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সার্ভিস থেকে কো-চেয়ারপারসন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

১৪. **জনবল সংস্কার :** [মধ্য-মেয়াদী]

ক) যেসব বিষয়ে জনবল সংকট প্রকট (যেমন: মেডিকোলিগ্যাল, অন্যান্য ক্লিনিক্যাল ও বেসিক সাবজেক্ট), সেখানে আগ্রহ সৃষ্টি ও জনবল ধরে রাখতে বিশেষ ভাতা এবং উপযুক্ত আর্থিক ও অন্যান্য প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে।

খ) সকল বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র পূর্ণকালীন শিক্ষক ক্যাটেগরি চালু করতে হবে। এই ক্যাটেগরির জন্য নন-প্র্যাকটিসিং ভাতা ও অতিরিক্ত প্রণোদনা প্রদান করতে হবে, যাতে শিক্ষকরা শিক্ষা ও গবেষণায় পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারেন। এর ফলে এই খাতে দীর্ঘমেয়াদে পেশাগত উৎকর্ষতা নিশ্চিত করা যাবে।

গ) স্বাস্থ্য অবকাঠামোর বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি করতে হবে। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে বেতন ভাতাদি দিতে হবে। পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা, দুর্গম এলাকায় সেবা ও প্রশিক্ষণ, এবং নির্ধারিত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী সেবা প্রদান-কে বিবেচনা করা হবে; এর ব্যত্যয় ঘটলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) দুর্গম এলাকায় সেবা প্রদানের জন্য সেবা প্রদানকারীদের বিশেষ ভাতা এবং বসবাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঙ) প্রস্তাবিত ‘বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস’ কাঠামো এবং অন্যান্য সেবা ও পরিষেবা সংক্রান্ত সুপারিশের আলোকে সারাদেশে স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় জনবলের ধরন ও পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বিদ্যমান শূন্যপদগুলো, প্রয়োজনে ব্যক্তিখাতের সেবাপ্রদানকারীদের চুক্তির মাধ্যমে, অবিলম্বে পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় নতুন পদ সৃষ্টি ও জনবল নিয়োগের উদ্যোগ নিতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

১৫. স্বাস্থ্যসেবায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয়: [স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী]

ক. বাংলাদেশে একটি কার্যকর ও টেকসই স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে, সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ, মান ও দক্ষতা বাড়াতে সামাজিক ব্যবসার মডেল প্রয়োগের জন্য সঠিক নীতিমালা ও অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এতে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে, স্বাস্থ্যসেবা জনমুখী ও সহজলভ্য হবে এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা আরও কার্যকর ও টেকসই হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

খ. বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক কেন্দ্র ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইসেন্সিং ও প্রশাসনিক কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য একটি “একক সেবা কেন্দ্র” চালু করতে হবে। করছাড়, প্রণোদনা ও সহজতর নীতিগত সহায়তার মাধ্যমে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

গ. মাননির্ভর গ্রেডিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং এজন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সেবার স্বীকৃতিতে অ্যাক্রিডিটেশন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, যেখানে নিবিড় পরিচর্যা ইউনিট (ICU) ব্যবহারের মান, হাসপাতালে সংক্রমণের হার ও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবস্থাপনার ওপর নজরদারি থাকবে। প্রতিটি ৫০ শয্যার হাসপাতালে একজন সিনিয়র চিকিৎসকের নেতৃত্বে ব্যবস্থাপনা বোর্ড গঠনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সেবার মান ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের তদারকি ও সেবার পরিমাণ, মান ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং অপ্রয়োজনীয় সেবা ও প্রেসক্রিপশন মান নিয়ন্ত্রণে, অন্যন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সাথে, মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন, ক্লিনিকাল সেবা অধিদপ্তরের (প্রস্তাবিত) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিকস)। [স্বল্প-মেয়াদী]

ঘ. বেসরকারি হাসপাতাল সম্প্রসারণ: রোগীদের বিদেশমুখিতা রোধ ও দেশে আত্মনির্ভরশীল চিকিৎসা ব্যবস্থার সম্পর্কে প্রশিক্ষিত (কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট ও অন্যান্য অঙ্গ প্রতিস্থাপন, ক্যান্সার, কার্ডিয়াক সার্জারি, বন্ধ্যত্ব, ও দুর্লভ রোগ চিকিৎসা ইত্যাদি)-র উন্নয়ন, চিকিৎসায় করছাড়, আমদানিতে সুবিধা ও অর্থনৈতিক প্রণোদনা দিতে হবে। প্রয়োজনে সরকার বেসরকারি খাতের সাথে অংশীদারিত্ব (PPP) ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন, ঝুঁকি বণ্টন ও সেবার মান উন্নয়ন করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

১৬. স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য বেতন বোর্ড: [স্বল্প-মেয়াদী]

বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশনের অধীনে ইন্টার্ন চিকিৎসক, স্নাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রী (ভাতা), বেসরকারি চিকিৎসক, নার্স, ও সব ধরনের স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য একটি সুসংগঠিত এবং যুগোপযোগী বেতন কাঠামো প্রণয়ন করতে হবে। এই কাঠামো প্রণয়ন করলে, কর্মীদের আর্থিক স্থায়িত্ব এবং চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এটি স্বাস্থ্য সেবা কর্মীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী উৎসাহ এবং কাজের পরিবেশের উন্নতি করতে সহায়তা করবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

১৭. সমন্বিত ও সরক্ষিত স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা:[স্বল্প-মেয়াদী] ও **[মধ্য-মেয়াদী]**

বাংলাদেশে একটি সম্পূর্ণ কাগজবিহীন স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্যখাতের সব সেবা ও ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রূপান্তর করতে হবে।

ক) স্বাস্থ্য তথ্যকে একটি রাষ্ট্রীয় সম্পদ, জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত ও নাগরিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। এজন্য একটি স্বাস্থ্য তথ্য সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করতে হবে যেন ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। সরকার, বেসরকারি খাত ও সুশীল সমাজের অংশগ্রহণে একটি জাতীয় স্বাস্থ্য তথ্য পরিষদ গঠন করতে হবে, যাতে একটি শক্তিশালী স্বাস্থ্য তথ্য শাসন কাঠামো গড়ে ওঠে এবং ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। [স্বল্প-মেয়াদী]

খ) বিদ্যমান খন্ডিত, অপর্যাপ্ত এবং বিদেশি প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থা থেকে সরে এসে একটি একীভূত ডিজিটাল স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা (প্ল্যাটফর্ম) ‘স্বাস্থ্য-সেতু’ গড়ে তুলতে হবে, যা সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করবে। এই প্ল্যাটফর্মে প্রতিটি নাগরিকের জন্য ইউনিক হেলথ আইডি চালু করতে হবে, যার সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে একটি স্মার্ট ‘স্বাস্থ্য-চাবি’ কার্ড, যাতে রোগীর যাবতীয় স্বাস্থ্যতথ্য ও সেবার ইতিহাস থাকবে। এই প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত থাকবে: ‘স্বাস্থ্য-বৃত্তান্ত’: একটি ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ড (EHR) ব্যবস্থা, যেখানে প্রতিটি নাগরিকের চিকিৎসা ইতিহাস, প্রেসক্রিপশন, ল্যাব রিপোর্ট ও চিকিৎসকের পরামর্শ ডিজিটালি সংরক্ষিত থাকবে; ‘স্বাস্থ্য-চিত্র’: ডিজিটাল রেডিওলজি ও ইমেজিং শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম, যাতে এক হাসপাতালের করা এক্স-রে বা সিটি স্ক্যান সহজে অন্য কোথাও দেখা ও বিশ্লেষণ করা যায়; ‘স্বাস্থ্য-উপকরণ’: লজিস্টিক ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম, যা ওষুধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষার সামগ্রী ও চিকিৎসা সরঞ্জামের স্টক ট্র্যাকিং ও স্বয়ংক্রিয় চাহিদা নিরূপণে ব্যবহৃত হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

গ) সারাদেশে একটি একীভুত ই-প্রেসক্রিপ্সন ব্যবস্থা চালু করতে হবে - যা 'স্বাস্থ্য-সেতু'- র সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত থাকবে। সকল চিকিৎসকের জন্য এই একীভুত ই-প্রেসক্রিপ্সন ব্যবহার বাধ্যতামুলক করতে হবে এবং ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও অন্যান্য সহায়তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। [স্বল্প-মেয়াদী]

ঘ) সারাদেশে 'স্বাস্থ্য-সাক্ষরতা' কর্মসূচি চালু করে জনগণকে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা ব্যবহারে সক্ষম করে তুলতে হবে। গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য চালু করতে হবে একটি mHealth অ্যাপ 'স্বাস্থ্য-বিকাশ', যার মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরামর্শ, ভ্যাকসিন নোটিফিকেশন, গর্ভবতী মা ও শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট বার্তা, এবং টেলিমেডিসিন সেবা সরাসরি মোবাইলে পাওয়া যাবে। ডিজিটাল স্বাস্থ্য প্রকৌশলকে একটি স্বতন্ত্র পেশাগত ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি খাতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

ঙ) সকল সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ও পরিষেবাগুলোকে (জাতীয় ফার্মেসি নেটওয়ার্ক, জাতীয় ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি নেটওয়ার্ক, জাতীয় রক্ত সঞ্চালন নেটওয়ার্ক এবং জাতীয় অ্যাম্বুলেন্স নেটওয়ার্ক) ধাপে ধাপে 'স্বাস্থ্য-সেতু' -তে একীভূত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও হাসপাতালের বহির্বিভাগ সেবা, নির্ধারিত অন্তঃবিভাগ সেবা, জাতীয় ফার্মেসি নেটওয়ার্ক, ইত্যাদিকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে। [স্বল্প-মেয়াদী]

চ) প্রতিটি বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে 'স্বাস্থ্য-সেতু' -তে সংযুক্ত হতে বাধ্য করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

ছ) স্বাস্থ্যখাতের তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ সক্ষমতা বাড়াতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে রোগভিত্তিক নিবন্ধন (Disease Registry) চালু করতে হবে, যাতে রোগ প্রবণতা, জটিলতা ও খরচ বিশ্লেষণ করা যায়। এক্ষেত্রে ক্যান্সার, কিডনি ডায়ালাইসিস, ডায়াবেটিস, অবস্ট্রেতিক ফিস্টুলা, বিরলরোগ, ইত্যাদিকে প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে AI ও মেশিন লার্নিং একীভূত করে ভবিষ্যৎ ঝুঁকি শনাক্ত ও প্রতিরোধমূলক পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। এর জন্য একটি স্বতন্ত্র হেলথ ইনফরমেটিক্স ইউনিট গঠন প্রয়োজন, যারা এই বিশ্লেষণগুলো করে নীতিনির্ধারকদের সিদ্ধান্তে সহায়তা করবে। [মধ্য-মেয়াদী]

১৮. **স্বাস্থ্যখাতে পর্যাপ্ত, ন্যায্য ও টেকসই অর্থায়ন:**

ক) স্বাস্থ্যখাতে পর্যাপ্ত, ন্যায্য এবং টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিত করতে একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে হবে, যা "স্বাস্থ্যখাতে টেকসই অর্থায়ন আইন" নামে পরিচিত হতে পারে। এর মাধ্যমে একটি আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যাবে, যাতে সরকার প্রতি বছর মোট জাতীয় আয়ের (GDP) অন্তত ৫ শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ দিতে বাধ্য থাকে। এছাড়া, এই আইন নিশ্চিত করবে যে, স্বাস্থ্যখাত বার্ষিক বাজেটের সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত পাঁচটি খাতের একটি হিসেবে বিবেচিত হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

খ) জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিকে এমনভাবে সংশোধন করতে হবে যাতে স্বাস্থ্যকে একটি পাবলিক গুড (public good) এবং মেরিট গুড (merit good) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। একে জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়নের একটি কৌশলগত চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এই নীতিমালায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে যে, সকল অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ, জাতীয় কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত টিকা, অত্যাবশ্যকীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং স্বাস্থ্য তথ্যব্যবস্থা- এসবই জাতীয় নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও সহনশীলতা জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ উপাদানগুলোতে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

গ) একটি পর্যাপ্ত, ন্যায্য ও টেকসই অর্থায়ন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে "সকল নীতিতে স্বাস্থ্য" (Health in All Policies - HiAP) এই ধারণাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। HiAP -এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য—জাতীয়

ও খাতভিত্তিক নীতি প্রনয়ন ও পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যখাতে অবদান এবং স্বাস্থ্য প্রভাব মূল্যায়ন (health impact assessments) বাধ্যতামুলক করতে হবে; স্বাস্থ্যবান্ধব রাজস্ব নীতির (health-promoting fiscal policies) গ্রহন করতে হবে.

ঘ) স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়ন কৌশলকে সার্বিকভাবে পরিবর্তন করতে হবে, যেখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে এর মূল ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করে ব্যক্তিপর্যায়ে ব্যয়ের ঝুঁকি, বিশেষ করে বিপর্যয়কর চিকিৎসা ব্যয় কমাতে লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচি চালু করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

ঙ) কর আদায় সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ট্যাক্স-টু-জিডিপি অনুপাত বাড়াতে হবে, এবং সর্বোচ্চ আয়শ্রেণি থেকে আদায়কৃত করের অন্তত ৫% স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দের জন্য নির্ধারিত করতে হবে। স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ভোগ্যপণ্যের ওপর আবগারি করা আরোপ/বৃদ্ধি করতে হবে এবং স্বাস্থ্যখাতে এর উল্লেখযোগ্য পরিমান বরাদ্দ দিতে হবে। অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসবহুল পণ্য ও সেবার ওপর পৃথক স্বাস্থ্য কর চালু করতে হবে। জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা তহবিল (National Health Impact Fund) গঠন করতে হবে এবং বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠানের CSR বাজেটের নির্দিষ্ট অংশ (>২০ শতাংশ) বাধ্যতামূলকভাবে এই তহবিলে জমা করতে হবে। স্বাস্থ্যখাতের অর্থায়নের জন্য উদ্ভাবনী উৎস হিসেবে সামাজিক ব্যবসা মডেল এবং প্রবাসী বাংলাদেশি ডিসপরা বন্ড গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে।

চ) সরকারি রাজস্বে শতভাগ অর্থায়নের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে সর্বজনীন ও বিনামূল্যে নিশ্চিত করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

ছ) ব্যয়বহুল চিকিৎসায় আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা ‘স্বাস্থ্য-কবচ’ চালু করতে হবে। এই বীমা কাঠামোতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে বিপর্যয়কর ব্যয়ের প্রধান কারণ—যেমন ক্যান্সার, হৃদরোগ, কিডনি ডায়ালাইসিস ও মারাত্মক দুর্ঘটনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রাথমিকভাবে সকল সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবী ও তাদের পরিবারবর্গ, এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বাধ্যতামূলকভাবে ‘স্বাস্থ্য-কবচ’-এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী] অনানুষ্ঠানিক খাতকে ধাপে ধাপে এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সামাজিক স্বাস্থ্যবীমা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করা। সার্বজনীন স্বাস্থ্য বীমার জন্য একটি স্বাস্থ্য বীমা কর্তৃপক্ষ গঠন করা । [মধ্য-মেয়াদী]

জ) প্রয়োজন ও চাহিদাভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে স্বাস্থ্য বাজেটের >৫০% বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

ঝ) জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা অফিস (NHSO) গঠন করতে যাতে কৌশলগত ক্রয়ক্ষমতা (STRATEGIC PURCHASING) জোরদার হয় এবং ‘স্বাস্থ্য-কবচ’ এর যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হয়। [মধ্য-মেয়াদী]

ঞ) কার্যকরিতা ও ব্যয়-সাশ্রয়িতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি স্বাস্থ্য প্রযুক্তি মূল্যায়ন ইউনিট (HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT – HTA UNIT) গঠন করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

ট) স্বাস্থ্যখাতের সকল ক্রয়ে বাধ্যতামূলক ই-জিপি (ELECTRONIC GOVERNMENT PROCUREMENT – E-GP) চালু করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

ঠ) সরকারি হাসপাতালসমূহে ধাপে ধাপে আর্থিক স্বায়ত্তশাসন চালু করে ব্যবহারকারী ফি সংরক্ষণ ও হাসপাতালের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সরঞ্জাম ক্রয়ে ব্যবহারের ক্ষমতা দিতে হবে। পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে স্বাধীনতার পরিসর বাড়ানো যেতে পারে। [মধ্য-মেয়াদী]

ড) ব্যয়-সাশ্রয়িতা বৃদ্ধি ও অপচয় রোধের জন্য নিম্নলিখিত বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবেঃ

- হাসপাতাল ও প্রাথমিক সেবাকেন্দ্রে ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্ট নিয়োগ করতে হবে যাতে ওষুধের যৌক্তিক ব্যবহার ও ব্যয়-সাশ্রয়িতা নিশ্চিত করা যায়। [স্বল্প-মেয়াদী]
- 'ন্যাশনাল এসেনশিয়াল ডায়াগনস্টিক লিস্ট' প্রণয়ন করতে হবে এবং এই নির্ধারিত পরীক্ষাগুলোর জন্য স্থান ও প্রতিষ্ঠানের ধরণভেদে মূল্য নির্ধারণ করে দিতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]
- জরুরি সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে একটি জাতীয় অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]
- রেফারেল ব্যবস্থাকে কাঠামোবদ্ধ, বাধ্যতামূলক ও কার্যকর করতে হবে। সরকারি হাসপাতালে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত প্রাথমিক সেবা চিকিৎসকের রেফারেল বাধ্যতামূলক করতে। এই বাধ্যবাধকতা জরুরি চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। [স্বল্প-মেয়াদী]
- ওষুধ ব্যবস্থাপনা, যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার ও ব্যয়-সাশ্রয়িতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সার্বিকভাবে 'ই-প্রেসক্রিপশন' ব্যবস্থা চালু করতে হবে।[স্বল্প-মেয়াদী]
- সকল সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ব্যক্তি পর্যায়ে সেবাদানকারী চিকিৎসকদের মধ্যে প্রেসক্রিপশন নিরীক্ষা চালু করতে হবে এবং নিরীক্ষার ফলাফল ব্যবহার করে আর্থিক অপচয় রোধ ও সেবার মান উন্নয়নে নিয়মিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

১৯. **ঔষধ ও প্রযুক্তিঃ** [মধ্য-মেয়াদী]

জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের বিবেচনায় মানসম্মত এপিআই, ভ্যাকসিন, আইভিডি, এবং মেডিকেল ডিভাইস উৎপাদনে দেশীয় স্বনির্ভরতা অর্জন করতে হবে। বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং আমদানি নির্ভরতা কমাতে এই খাতে গবেষণা ও উৎপাদন সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। প্রয়োজনে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের যৌথ বিনিয়োগে উৎসাহ দিতে হবে। এজন্য পর্যাপ্ত প্রণোদনা, স্বল্পসুদের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ, ট্যাক্স ও ভ্যাট ছাড়সহ প্রয়োজনীয় নীতিগত সুবিধা প্রদান করতে হবে। দেশীয় শিল্প যখন নির্ধারিত উৎপাদন সক্ষমতা ও চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে, তখন উচ্চহারে আমদানি শুল্ক আরোপের মাধ্যমে আমদানি ধাপে ধাপে সীমিত এবং পরবর্তীতে নিরুৎসাহিত করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

২০. **বিদেশে চিকিৎসা নির্ভরতা হ্রাস এবং মেডিকেল ট্যুরিজম উন্নয়ন:**

প্রতিবছর বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং বিদেশগামী রোগীর সংখ্যা হ্রাসের লক্ষ্যে একটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। ক্যান্সার চিকিৎসা, অঙ্গ প্রতিস্থাপন সার্জারি, হৃদরোগ, জটিল কিডনি রোগ, বন্ধ্যাত্ব ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত রোগনির্ণয়ের জন্য আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন উৎকর্ষকেন্দ্র (Centers of Excellence) প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেয়া হবে, যাতে দেশেই উচ্চমানের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা যায়। এই উদ্যোগের জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP)-কে উৎসাহ দিতে হবে এবং উচ্চপ্রযুক্তি-নির্ভর বিশেষায়িত হাসপাতালে বিনিয়োগ সহযোগিতা করতে হবে। দক্ষ জনবল উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি (যেমন: JCI, ISO) অর্জন এবং সেবার মানোন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় স্বাস্থ্যসেবায় জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পাবে। [মধ্য-মেয়াদী]

একইসঙ্গে, মেডিকেল ট্যুরিজম সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি আঞ্চলিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিকল্পিত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এ জন্য রোগনির্ণয়ের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য দেশের পুরাতন ল্যাবরেটরীগুলির দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

২১. **ফুড, ড্রাগ, ও আইভিডি-মেডিকেল ডিভাইস প্রশাসন গঠন:**

একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে তিনটি শাখা থাকবে: ঔষধ-টিকা-প্রসাধনী, আইভিডি-মেডিকেল ডিভাইস, ও নিরাপদ খাদ্য। [স্বল্প-মেয়াদী]

ক. ঔষধ-টিকা-প্রসাধনী খাতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে প্রতি দুই বছর অন্তর অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের তালিকা পর্যালোচনা, অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (API)-এর মান নিয়ন্ত্রণ ও

নিশ্চিতকরণ, স্থানীয় রোগীদের উপর ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ও বায়োএভেইলিবিলিটি পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত নিরপেক্ষ নিরীক্ষা কমিটি গঠন, এবং বৈদেশিক যৌথ বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদান। [মধ্য-মেয়াদী]

খ. আইভিডি-মেডিকেল ডিভাইস খাতে মধ্য-মেয়াদে টেলিমেডিসিন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন একটি মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি, নীতিমালা হালনাগাদ, স্থানীয় উদ্ভাবনকে উৎসাহ প্রদান, পুরনো যন্ত্রপাতি পরিত্যাগ এবং বৈদেশিক যৌথ বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

গ. খাদ্য নিরাপত্তা খাতে সংক্ষিপ্ত-মেয়াদে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (Food Safety Authority)-কে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থানান্তর, ২০১৩ সালের খাদ্য আইন হালনাগাদ, খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনে ট্রেসেবিলিটি চালু, স্থানীয় পর্যায়ে অফিসার নিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক মানদন্ড নিশ্চিতকরণ। [স্বল্প-মেয়াদী]

ঘ. চিকিৎসক-ফার্মাসিউটিক্যাল সম্পর্কিত নীতি: [মধ্য-মেয়াদী]

World Medical Association (WMA)-এর প্রস্তাবনার আলোকে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা দেয়া হচ্ছে, যাতে করে মধ্য-মেয়াদে একটি নৈতিক ও ভারসাম্যপূর্ণ চিকিৎসক-ফার্মাসিউটিক্যাল সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়:

১. ঔষধের নমুনা বা উপহার প্রদান করে কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে; ২. মেডিকেল কনফারেন্স আয়োজনের পূর্বে অবশ্যই বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (BMEAC) অনুমোদিত CPD ক্রেডিট পয়েন্ট গ্রহণের জন্য আবেদন করতে হবে **এবং** মেডিক্যাল কনফারেন্সের সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব ট্যাক্স অফিসে জমা দিতে হবে এবং এর একটি কপি বিএমইএসি-তে জমা দিতে হবে; ৩. কনফারেন্সে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির অংশগ্রহণ:- ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো অনুমোদিত কনফারেন্সে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে পারবে, তবে কেবলমাত্র প্রদর্শনী এলাকায় পণ্যের উপস্থাপনার জন্য তাদের প্রতিনিধির শারীরিক উপস্থিতি অনুমোদিত থাকবে। কোনো ধরনের খাবার, উপহারের ব্যাগ বা অন্য কোনো উপহার সামগ্রী সরবরাহ ও ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধূলা, রাফেল ড্র ইত্যাদি করতে পারবে না; ৪. ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো শুধুমাত্র ডাক্তারদের ই-মেইল বা ডাকযোগের মাধ্যমে তাদের পণ্য সম্পর্কিত তথ্য পাঠাতে পারবে।প্রতিনিধিরা সরাসরি সাক্ষাতের মাধ্যমে দৈনন্দিন প্রোডাক্ট প্রমোশন করতে পারবে না; ৫. চিকিৎসকের চেম্বার বা হাসপাতাল প্রাঙ্গণে কোনো ধরনের ঔষধের/ পণ্য প্রচার কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে, কারণ এসব কর্মকাণ্ডে চিকিৎসকের মনোযোগ বিঘ্নিত হয় এবং রোগীরা সঠিকভাবে চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হন; ৬. চিকিৎসকদের যেকোনো পেশাগত সংগঠন, যেমন—চিকিৎসক সমিতি, পেশাগত সংস্থা বা বিশেষজ্ঞ সমাজ (Professional Associations or Societies)–এ কোনো ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে থাকতে পারবে না; ও ৭. নতুন ওষুধ বা নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য থাকলে তা প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক না করে কেন্দ্রীয়ভাবে নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক সভার মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

২২. ক্রয় ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার: [মধ্য-মেয়াদী]

ই-জিপি চালু, স্বাধীন নিরীক্ষা, স্বাস্থ্য সমস্যার আলোকে স্থানীয়ভাবে বাস্তবসম্মত বাজেট ব্যবস্থাপনা, পারফরম্যান্সভিত্তিক প্রণোদনা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর চাহিদা পূর্বাভাস চালু করতে হবে এবং সে অনুযায়ী ক্রয় সংগ্রহ কাজ সম্পাদিত হতে হবে। বাজেট প্রাক্কলনে উন্নয়ন, রাজস্ব ও পরিচালনা ভিত্তিক বাজেট এক সাথেই প্রতিফলিত হতে হবে। স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা, বাজেট, ও কমর্সূচীর পর্যালোচনা করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

২৩. **দুর্নীতি প্রতিরোধ :**

ক. প্রতিটি মহাপরিচালকের দপ্তরে অবস্থিত স্বাধীন ইন্টারনাল অডিট ইউনিট অধিকতর শক্তিশালী এবং কার্যকর করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

খ) কোন চিকিৎসক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হাসপাতাল সেবা, ঔষধ, রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষার পরামর্শ দিবেন না। কোন ঔষধ কোম্পানীর প্যাডে ঔষধের নিদান (প্রেসক্রিপশন) লিখবেন না।

২৪. **স্বাস্থ্য গবেষণা:** [স্বল্প-মেয়াদী]

দেশের স্বাস্থ্য গবেষণার নৈতিক মান উন্নয়ন ও প্রমিতকরণ, গবেষণা সংক্রান্ত নীতিমালা ও গাইড লাইন প্রণয়ন, গবেষণা অনুদান ব্যবস্থাপনা, যথাযথ আইনের অধীনে BMRC-র অবকাঠামোগত ও আর্থিক-প্রশাসনিক সামর্থ বৃদ্ধির সুপারিশ করা হলো। জাতীয় বাজেটের স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দের নুন্যতম ২.৫% স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণার জন্য ব্যয় করতে হবে। এক্ষেত্রে মেডিকাল বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দেশীয় স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাস্থ্য গবেষনায় উৎসাহ দিতে হবে, প্রয়োজনে কারিগরি সহায়তা প্রদান করতে হবে, এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে গবেষণার জন্য অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে [স্বল্প-মেয়াদী]

২৫. নারী স্বাস্থ্য: [মধ্য-মেয়াদী]

নারীর সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতা নিশ্চিত করতে 'জাতীয় নারীস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই প্রতিষ্ঠান বিশেষায়িত সেবা প্রদান, সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি হাসপাতালের জন্য রেফারেল কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে এবং তাকে স্বাস্থ্যকর্মীদের নারী স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এটি নারীর স্বাস্থ্যসংক্রান্ত উপেক্ষিত ও জটিল সমস্যার সমাধানে নেতৃত্ব দেবে এবং নারীস্বাস্থ্যকে জাতীয় অগ্রাধিকারের পর্যায়ে উন্নীত করবে। মা, শিশু, কৈশোরকালীন ও বিশেষ প্রয়োজনে থাকা ব্যক্তিদের জন্য উপযোগী ও সম্মানভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। এইসব জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনভিত্তিক ও সংবেদনশীল সেবা-প্রদান ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত না হন এবং তাদের অধিকার নিশ্চিত হয়। তদপুরি নারীস্বাস্থ্যে সরকারি ও ব্যক্তিগত অলাভজনক প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিটিউট গুলোকে উৎসাহিত করতে হবে এবং সরকারি সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। একই সাথে শিশু, কিশোর-কিশোরী ও বৃদ্ধদের মানসিক সুস্থতা,রোগ, মানসিক ও শারীরিক গড়ন, বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তা-চেতনা, সামাজিকতা ইত্যাদি বিষয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টিকে প্রাধান্য দিতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

২৬. জলবায়ু ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে শিশু, কিশোর-কিশোরী,মহিলা ও গর্ভবতীদের জন্য সম্মানজনক পরিবেশের নিশ্চয়তা দিতে হবে এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে দুর্যোগ-নিরোধক ও নারী, শিশু, কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক বান্ধব হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

২৭. বাংলাদেশের বাইরে কর্মরত সকল চিকিৎসক, নার্স, প্রযুক্তিবিদ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা পেশাজীবীদের দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ ও উন্নয়নের জন্য তাদের মূল্যবান দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরে আসার জন্য আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য একটি বিশেষ নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে, যা প্রত্যাবর্তনকারী পেশাজীবীদের প্রয়োজনীয় সুবিধা ও সহায়তা প্রদান করবে। [মধ্য-মেয়াদী]

২৮. ক) সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও বেশ কিছু দীর্ঘস্থায়ী জটিল ব্যাধির অতি দ্রুত হার বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলির রেজিস্ট্রি তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা জরুরি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এই রেজিস্ট্রি, সঠিক পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে, এসকল ব্যাধির চিকিৎসা ও প্রতিরোধ পরিকল্পনায় প্রচুর ভূমিকা রাখতে পারে।

খ) উপরোক্ত সুপারিশের ধারাবাহিকতায়, অগ্রাধিকারভিত্তিতে, অত্যন্ত ব্যয়বহুল মরণব্যাধি ক্যান্সারকে প্রথমে নির্বাচন করে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করার সুপারিশ করা হচ্ছে। এর আওতায়, জেলা ও উর্ধ্বতন সকল সরকারি হাসপাতাল এবং ১০০ শয্যার অধিক বেসরকারি হাসপাতালে প্রাথমিক ক্যান্সার শনাক্তকরণ কেন্দ্র স্থাপন এবং ক্যান্সার

রেজিস্ট্রি চালু,নিয়মিত স্ক্রিনিং কর্মসূচি চালু, ক্যান্সার শনাক্তকরণ ও চিকিৎসার জন্য হিস্টোপ্যাথোলজিস্ট, ক্লিনিক্যাল অনকোলজিস্ট, গাইনি অনকোলজিস্ট, মেডিক্যাল অনকোলজিস্ট, নার্স, টেকনোলজিস্টসহ প্রয়োজনীয় জনবল গড়ে তুলতে হবে এবং ক্যান্সার ট্রাস্ট ফান্ড সৃষ্টি করতে হবে। এর মাধ্যমে ক্যান্সার দ্রুত শনাক্ত, চিকিৎসা এবং মৃত্যুহার কমানো সম্ভব হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

২৯. BHC-র নির্দিষ্ট উইং-এর তদারকির মাধ্যমে সারা দেশব্যাপী রোগ-ব্যাধির নজরদারি বা সার্ভেলেন্স কার্যক্রমকে আরো গুরুত্ব দিয়ে উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আই ডি সি আর-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরো শক্তিশালী করে তুলতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

৩০. পুলিশ, শ্রমিক, জেলবন্দি, ড্রাইভার, ইত্যাদি পেশার মানুষকে জরুরী স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক দায়িত্ব পালনে সহায়তার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আন্তঃজেলা সড়কের পাশে প্রতিটি উপজেলায় ট্রমা সেন্টার ও রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র থাকতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

৩১. **নবজাতক, শিশু, কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্য বিকাশ এবং মঙ্গল:** [মধ্য-মেয়াদী]

একটি নিরবিচ্ছিন্ন ডিজিটাল তথ্য সম্প্রচার ব্যবস্থার মাধ্যমে, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলির সার্বজনীন নজরদারি এবং সময়োচিত ও যথাযথভাবে মাধ্যমিক ও তৃতীয় পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে রেফার করার মাধ্যমে নবজাতক, শিশু, কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্য, বিকাশ এবং মঙ্গল সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

৩২. **পেশাগত নিরপেক্ষতা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা:** [মধ্য-মেয়াদী]

স্বাস্থ্যখাতের অস্থিতিশীলতা মোকাবেলায় পেশাগত নিরপেক্ষতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা (১৯৭৯) অনুযায়ী রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। জনগণের ট্যাক্সের অর্থে (সরকারি অর্থে) পরিচালিত প্রতিষ্ঠান (যেমন সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান)-এর স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা এবং সরাসরি দলীয় রাজনীতি সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের নির্বাহী পদে 'না' রাখার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

পরিচ্ছেদ ১

ভূমিকা

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে অনেক প্রশংসনীয় অগ্রগতি হয়েছে। মূলত টিকাদান, পুষ্টি, মা-শিশু স্বাস্থ্য, সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, একই সাথে নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা ইত্যাদি সহায়ক কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্যক্ষেত্রের বিভিন্ন সূচকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে দেশের সংবিধান এবং জাতীয় নীতিমালা ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার (বিশেষত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি) অনুসারে সকল নাগরিকের জন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে অগ্রগতির ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিগত বছরগুলিতে স্বাস্থ্যখাতে বাংলাদেশের অগ্রগতি শ্লথ হয়েছে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পুরোপুরি থেমে গেছে কিংবা পশ্চাদমুখী হয়েছে। ফলে প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্য অর্জন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ এখনো একটি ন্যায্য (equitable),মানবিক ও টেকসই স্বাস্থ্যব্যবস্থা গঠনের পথে দৃশ্যমান বাধাগুলোকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ক্যানসারসহ অসংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি, মানসিক স্বাস্থ্যসেবার ঘাটতি, জরুরী চিকিৎসা ও মানসম্মত সেবার অপ্রতুলতা, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং স্বাস্থ্যসেবা গ্রহনে ব্যক্তি-পর্যায়ে খরচ জনগণের ওপর তীব্র চাপ তৈরি করছে। পাশাপাশি দুর্নীতি, সক্ষমতার ঘাটতি, ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা এবং চিকিৎসা শিক্ষায় নিম্নমান ভবিষ্যতের জন্য একটি গুরুতর হুমকি হয়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ স্বাস্থ্যখাতে আজ এক জটিল বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছে।

জুলাই ২৪-এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্যখাতকে জনমুখি, সহজলভ্য ও সর্বজনীন করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। এ সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কমিশন নিম্নলিখিত বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছে: ১) একটি ন্যায্য ও অধিকার-নির্ভর সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলা; ২) প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো ও জনবল শক্তিশালী করা; ৩) জরুরী চিকিৎসা সেবার উন্নয়ন, ৪) স্বাস্থ্যব্যবস্থায় সুশাসন, আর্থিক স্বচ্ছতা ও দুর্নীতির প্রতি শূন্য সহনশীলতা নীতি প্রবর্তন; ৫) মানসম্পন্ন চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রযুক্তি নির্ভর চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি; ৬) জনসাধারণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনতে রোগী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সন্তুষ্টি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; ও ৭) স্বাস্থ্যসেবা গ্রহনে ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয় উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়ে নিয়ে আসা।

পরিচ্ছেদ ২

পদ্ধতি

একটি বহুমাত্রিক ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে এই প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণী প্রাসঙ্গিক বিবিধ তথ্য-উপাত্ত, অংশীজনের মতামত, জরিপ থেকে প্রাপ্ত জনমত এবং সরেজমিন পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য ও মতামত বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

১. প্রকাশনা পর্যালোচনা (Literature Review):

প্রাসঙ্গিক নীতিমালা, আইন, গবেষণা প্রতিবেদন এবং পরিকল্পনাগুলোর ভিত্তিতে প্রকাশনা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে জাতীয় সকল নীতি, সেক্টর পরিকল্পনা, কৌশলপত্র, গাইডলাইন, সার্ভে ইত্যাদি। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের এবং শিক্ষাবিদ-গবেষকদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত প্রাসঙ্গিক সকল প্রকাশনাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ ছাড়া স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সফলতা অর্জনকারী দেশ যেমন থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর, ভারত, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, রুয়ান্ডা, ভিয়েতনাম ও কিউবার স্বাস্থ্যনীতি ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণা ও নীতিমালা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণ স্বাস্থ্যখাতে বৈশ্বিক ও স্থানীয় বাস্তবতা মিলিয়ে প্রাসঙ্গিক, প্রয়োগযোগ্য ও প্রমাণভিত্তিক সুপারিশ প্রণয়নে সহায়ক হয়েছে।

২. কমিশনের কার্যালয়ে অংশীজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনা:

পরিকল্পিত একটি তালিকা অনুসারে স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে নির্দিষ্ট দিনক্ষণে কমিশন সাক্ষাৎ আলোচনা করেছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, শিক্ষাদান, গবেষণা, সামাজিক আন্দোলন, সাংবাদিকতা ইত্যাদি নানাবিধ কর্মকান্ডে এ সকল প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তি পর্যায়ের অংশীজনের সংশ্লেষ রয়েছে। ছক ২.১ -এ এই সকল অংশীজন গ্রুপের একটি সংক্ষিপ্তসার প্রদান করা হয়েছে, এর বিস্তারিত তালিকা পরিশিষ্ট-এ প্রদান করা হলো।

ছক ২.১ সাক্ষাৎ আলোচনায় অংশগ্রহণকারী অংশীজনদের গ্রুপভিত্তিক তথ্য

ক্রম	গ্রুপ ব্যক্তি	সভার সংখ্যা
১	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১
২	বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ	৭
৩	স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রক সংস্থা	৬
৪	রাজনৈতিক দল	৩
৫	চিকিৎসক ও শিক্ষার্থী সংগঠন	৫
৬	মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	১
৭	অন্যান্য সংস্কার কমিশন	২
৭	উন্নয়ন সহযোগী (একক)	২
৮	উন্নয়ন সহযোগী কনসোর্টিয়াম	১
৯	পেশাজীবী সামাজিক সংগঠন	৫
১০	বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৮
১১	শিক্ষক-গবেষক-সমাজকর্মী-সংগঠক-সাংবাদিক ইত্যাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ	২০

৩. **কমিশন কর্তৃক দেশের বিভিন্ন স্থানে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভার আয়োজন:** নিজস্ব কার্যালয়ে সাক্ষাৎ মতবিনিময় ছাড়াও কমিশন দেশের বিভিন্ন স্থানে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় ও পরামর্শ সভার আয়োজন করেছে। ছক ২.২-এ একটি সংক্ষিপ্তসার প্রদান করা হলো।

৪. **তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ:** স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ,স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো,জাতীয় স্বাস্থ্য হিসাব (National Health Accounts) এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অসংক্রামক রোগ, মাতৃমৃত্যু, শিশুস্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য ব্যয় এবং স্বাস্থ্যসেবা গ্রহনে ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয়ের হার - এসব বিষয়ে বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৫. **সরেজমিনে পরিদর্শন ও মতবিনিময়:** কার্যালয় ও নির্দিষ্ট স্থানে আলোচনা ছাড়াও কমিশন সংশ্লিষ্ট বিবিধ প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রম পরিদর্শনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। পরিদর্শনকালে চিকিৎসক-নার্স ছাড়াও বিবিধ পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের সঙ্গে একক ও যৌথ মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং সেই সঙ্গে সেবা গ্রহণকারীদের মতামত গ্রহণ করা হয়। স্থান ও প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের সময় দুর্গম এলাকা ও অবহেলিত ডিসিপ্লিনগুলির ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে (ছক ২.৩)।

ছক ২.২ দেশের বিভিন্ন স্থানে অংশীজনদের সাথে স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা

ক্রম	সভার স্থান	অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধি/ ব্যক্তির সংখ্যা (প্রায়)
১	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	৩০০
২	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	১১৫
৩	রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	৫৯
৪	খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	৯২
৫	শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল	১২০
৬	সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	২৫০
৭	মুন্সিগঞ্জ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল	৫০
৮	রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ ও পার্বত্য এলাকার জনগোষ্ঠী	১৫০

৬. **জনমত জরিপ :** স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশনের অনুরোধে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) একটি জনমত জরিপ পরিচালনা করেছে। সুপারিশ প্রণয়নে এই জরিপের ফলাফল গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

জনমত জরিপটি পরিচালনার লক্ষ্যে সমগ্র দেশের আটটি বিভাগ (শহর ও পল্লী এলাকা) হতে প্রায় ৩৪৪ টি প্রাথমিক নমুনা এলাকা (শুমারি গণনা এলাকা) নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত প্রতিটি নমুনা এলাকা হতে নমুনায়নের মাধ্যমে ২৪টি সাধারণ খানা জরিপ পরিচালনার উদ্দেশ্যে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত প্রতিটি থানা হতে ১৮ বা তদূর্ধ্ব বয়সী একজনের নিকট হতে নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এভাবে দেশব্যাপী প্রায় ৮২৫৬ জন নাগরিকের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ পূর্বক উক্ত জরিপের উপাত্ত বিশ্লেষণসহ রিপোর্ট প্রণয়নের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

ছক ২.৩. কমিশন কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনকৃত প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রম

ক্রম	**প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রম**	**স্থান**
১	মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	চট্টগ্রাম
২	মিরসরাই আবু নগর কমিউনিটি ক্লিনিক	চট্টগ্রাম
৩	চট্রগ্রাম শীপ ব্রেকিং	চট্টগ্রাম
৪	চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন মাতৃসদন হাসপাতাল	চট্টগ্রাম
৫	আগ্রাবাদ মা ও শিশু হাসপাতল ও কলেজ	চট্টগ্রাম
৬	তারাগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র	রংপুর
৭	রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	রাজশাহী
৮	শিশু বিকাশ কেন্দ্র	রাঙ্গামাটি
৯	ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন	ফরিদপুর
১০	শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতল, বরিশাল পরিদর্শন	বরিশাল
১১	বাবুগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	বরিশাল
১২	সিরাজদিখান উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স	মুন্সিগঞ্জ
১৩	শ্রীনগর উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স	মুন্সিগঞ্জ
১৩	মুন্সিগঞ্জ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল	মুন্সিগঞ্জ
১৪	সিলেট নর্থ ইস্ট ক্যান্সার হসপিটাল	সিলেট
১৫	ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	সিলেট
১৬	সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ	সিলেট
১৭	ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গ	ঢাকা
১৮	ফেনী মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র	ফেনী
১৯	রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ	রাঙ্গামাটি
২০	কাউখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	রাঙ্গামাটি
২১	চৌদ্দগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	কুমিল্লা
২২	রাজারহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	কুড়িগ্রাম
২৩	সিংগাপুরের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে বৈঠক ও স্বাস্থ্য স্থাপনা	সিংগাপুর
২৪	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন	রংপুর
২৫	রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বাগেরহাট
২৬	আমার গ্রাম ক্যান্সার হাসপাতাল, রামপাল	বাগেরহাট
২৭	কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প	রাঙামাটি

খানাভিত্তিক জরিপের প্রশ্নপত্রটি নিম্নোক্ত সাতটি সেকশনে বিভক্ত করা হয়:

সেকশন ১ - খানা সদস্যদের তালিকা ও পরিচিতি

সেকশন ২ - জনগণের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি বিষয়ের অভিজ্ঞতা

সেকশন ৩ - জনগণের সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি বিষয়ে মতামত

সেকশন ৪ - নীতি নির্ধারণ বিষয়ক প্রশ্ন

জরিপের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমে জনশুমারি ও গৃহ গণনা ২০২২ - এর ভিত্তিতে প্রণীত ইন্টিগ্রেটেড মাল্টিপারপাস স্যাম্পলিং (আই এম পি এস) ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেকটি বিভাগ হতে ৪৩ টি করে মোট ৩৪৪ টি পি এস ইউ এবং প্রত্যেক প্রাইমারি সামপ্ললিং ইউনিট থেকে ২৪ টি করে মোট ৮২৫৬ টি খানা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

এই জনমত জরিপ থেকে প্রাপ্ত মূল মতামতসমূহ:

- বিগত এক বছরে যে সমস্ত সেবাপ্রদানকারীর কাছ থেকে সেবা নেয়া হয়েছে: ১) এমবিবিএস ডাক্তার: ৭৮.২%; ২) ফার্মাসির ঔষধ বিক্রেতা: ৫.৭%; ৩) কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী: ৪.৮%; ৪) পল্লী চিকিৎসক: ৪.৭%; ৫) স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার পরিকল্পনা সহকারী: ১.৯%; ৬) মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট: ১.৭%; ৭) এফডব্লিউভি: ১.৬%; ৮) হোমিওপ্যাথি: ১.১%; ৯) আয়ুর্বেদী/ ইউনানী: ০.২%।
- ঔষধের মূল্য, রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষার মূল্য ও ডাক্তারের পরামর্শ ফী বা অস্ত্রোপচারের ফি নির্দিষ্ট করার পক্ষে মত দিয়েছেন যথাক্রমে ৯৭%, ৯৬%, ৯৬% ও ৯৫% উত্তরদাতা;
- ৯৭% উত্তরদাতা জানিয়েছেন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিনা মূল্যে দেয়া প্রয়োজন;
- শহর অঞ্চলের ওয়ার্ডগুলোতে গ্রামীণ ইউনিয়ন পর্যায়ের মত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার কেন্দ্র তৈরী করার পক্ষে মত দিয়েছেন ৯২% উত্তর দাতা;
- চিকিৎসা, স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম তথা জনস্বাস্থ্য সেবা পৃথক অবকাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া উচিত, এ বিষয়ে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন ৭২% উত্তর দাতা;
- হাসপাতাল, মেডিক্যাল-নার্সিং ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন চেয়েছেন ৬৬% উত্তর দাতা। একই সংখ্যক উত্তর দাতা চান যে স্বাস্থ্যসেবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো প্রশাসনিক ক্যাডারের বাইরে স্বাধীন একটি অবকাঠামো দ্বারা পরিচালিত হোক;
- প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে মত দিয়েছেন ৬৪% উত্তর দাতা;
- শূন্যপদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের পক্ষে মত দিয়েছেন ৭৬% উত্তর দাতা;
- সহায়ক পদে কর্মরতদের বদলির পক্ষে মোট দিয়েছেন ৭৬% উত্তর দাতা;
- ৪৫% ও ৩১% উত্তর দাতা চিকিৎসক কর্তৃক যথাক্রমে ঔষধের জেনেরিক নাম ও জেনেরিক এবং ব্র্যান্ড নামে লিখার পক্ষে মত দিয়েছেন;
- ৬৮% উত্তর দাতা এমবিবিএস ডাক্তার ছাড়া অন্য কারো প্রেসক্রিপশনে এন্টিবায়োটিক বিক্রী না করার পক্ষে মত দিয়েছেন;
- ৭২% উত্তর দাতা চান একজন ডাক্তার এক জন রোগীকে কম পক্ষে ১০ মিনিট থেকে ২০ মিনিট সময়দিবেন। যার বেশির ভাগ চেয়েছেন ২০ মিনিট (২৮.৫%);
- এক মাত্র জরুরী কারণ ছাড়া রেফারেল না হলে কোন বিশেষজ্ঞ সেবা দেয়া যাবে না এ বিষয়ে একমত ৭২% উত্তর দাতা;
- জরুরী সেবার জন্য সপ্তাহের সাতদিনই সার্বক্ষণিকভাবে সরকারিভাবে অ্যাম্বুলেন্স সেবার ব্যবস্থা থাকতে হবে, এ বিষয়ে ৯৯% উত্তর প্রদানকারী একমত;

- স্বাস্থ্যসেবা ব্যয়ের বেশির ভাগের দায়িত্ব থাকা উচিত সরকারের এই মত ৯২% উত্তর প্রদানকারীর;
- স্বাস্থ্যহানিকর খাদ্য, পানীয়ও ভোগ্যপণ্যের উপর উচ্চহারে কর প্রয়োগ করা উচিত এই বিষয়ে একমত ৭৯% উত্তরদাতা;
- স্বাস্থ্যবীমা গ্রহণে আগ্রহী ৭১% উত্তরদাতা;
- দেশের সব মানুষের জন্য স্বাস্থ্য কার্ড প্রচলনের পক্ষে মত দিয়েছেন ৯৩% উত্তরদাতা;
- স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিচালিত একই ধরনের সেবাক্রম একীভূত করা উচিত বলে মনে করেন ৬৭% উত্তরদাতা।

উপস্থাপন:

স্বাস্থ্য খাত সংস্কারের সুপারিশগুলোকে ৭টি স্তম্ভে ভাগ করে উপস্থাপন করা হয়েছে। স্তম্ভগুলো হলোঃ

৮. স্বাস্থ্য সেবাদান ও ভৌত অবকাঠামো
৯. নেতৃত্ব, সুশাসন ও কর্মসংস্কৃতি
১০. স্বাস্থ্য জনবল ব্যবস্থাপনা
১১. স্বাস্থ্য জনবলের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
১২. অত্যাবশ্যকীয় ঔষধপত্র, চিকিৎসা প্রযুক্তি ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ
১৩. স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা
১৪. স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়ন

পরিচ্ছেদ ৩

স্বাস্থ্য সেবাদান ও ভৌত অবকাঠামো

৩.১ স্বাস্থ্যসেবা ও সেবা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সংস্কারের লক্ষ্যে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবনা

ক্রমিক	শিরোনাম	প্রস্তাবনাসমূহ	বাস্তবায়নের সময়সীমা	দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া
ক) জনস্বাস্থ্য সেবাভিত্তিক সংস্কার প্রস্তাবনা				
৩.১.১	১) মৌলিক তথ্যের অসম্পূর্ণতা দূরীকরণের জন্য প্রস্তাবনা	(১) রোগীদের জন্য অনন্য পরিচয়পত্র তৈরি, (২) উপজেলা-ওয়ারি জনমিতি, রোগতাত্ত্বিক, সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ, রোগীদের ও অন্যান্যদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও জ্ঞান, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ সম্পর্কিত জরিপ এবং (৩) বাজেট, পরিকল্পনা, সেবার মান ও পরিমাণ মূল্যায়নের জন্য এসব তথ্যের ব্যবহার;	(১) এর জন্য ২বছর (২) এর জন্য প্রতি ১০ বছর	প্রস্তাবিত জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৩.১.২	২) স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, ও পুষ্টি সম্পর্কিত পরিষেবা এবং যোগাযোগ কার্যক্রমের দুর্বলতা দূরীকরণের অগ্রগণ্য বিষয়াদী	(১) সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধ-ভিত্তিক শৈশব ও কৈশোরকালীন শিক্ষা, পুষ্টি এবং বিকাশ, যুবকাল ও যৌনরোগ; নারী ও মাতৃস্বাস্থ্য; পরিবার পরিকল্পনা; বয়স্কদের স্বাস্থ্য; মানসিক স্বাস্থ্য ও আত্মহত্যা; রোগের সংক্রমণ ও অসংক্রামক রোগ; রোগীর অধিকার; পরিবেশ, (২) জুলাই আন্দোলনে আহতদের নির্ভুল চিহ্নিতকরণ ও সেবা এবং পোস্ট ট্রমাটিক ডিসঅর্ডার এর সেবা, (৩) বিদ্যালয়েশাক- সবজি ও ফলদ বাগান, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পুষ্টিমেলার আয়োজন এবং ফলাদি এবং শাক-সবজির পুষ্টিগুণসম্পর্কে অবহিতি, (৪) বসতবাড়ির আশে পাশে হাঁস-মুর্গী, শাকসবজি ও ফলদ গাছের চাষ, (৫) এনজিওর সহযোগিতা, (৬) প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব, কৈশোরকালীন বিয়েবা গর্ভধারণ, সিজারিয়ান অপারেশন/ ধাত্রীসেবা, (৭) শিশু, বৃদ্ধ এবং লিঙ্গ সহিংসতা, (৮) অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার, (৯) নিরাপদ খাদ্য; ফাস্ট-ফুড, টিন এবং প্যাকেজজাত খাবার ও পানীয়; চিনি, লবণ এবং ট্রান্স-ফ্যাট, (১০) বর্জ্য এবং পরিবেশ, (১১) সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, মিডিয়া, শিক্ষা, ক্রীড়া, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, মৎস্য, ও পশুপালন বিভাগ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সমাজকল্যাণ, শিশু ও মহিলা বিষয়ক বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া, এবং স্থানীয়সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়; (১২) তামাক নিয়ন্ত্রণ;	১.৫ বছর	প্রস্তাবিত জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৩.১.৩	৩) রোগ প্রতিরোধ, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, সীমিত প্রতিকার এবং রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রস্তাবিত কার্যক্রম	(১) টিকা এবং ওষুধ সংগ্রহের পূর্বে কার্যকারিতা পরীক্ষা, (২) জরুরী ও অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের নীতি ও নিশ্চিয়তা, (৩) বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং ঝুঁকিতে থাকা গর্ভবতী মহিলাদের AI সফ্টওয়ার ভিত্তিক সহায়তা, (৪) ইপিআই কার্ড প্রদর্শনের ভিত্তিতে স্কুলে ভর্তি, (৫) শিশুর স্নায়বিক গড়ন বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ, (৬) প্রতিষ্ঠানে, দূর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্রে, অপেক্ষা কেন্দ্রে এবং জনগণের সমাগম স্থানে স্যানিটারি প্যাড ও প্রয়োজনীয়ওষুধের পর্যাপ্ততা, (৭) দূর্গম এলাকায়প্রাথমিক স্বাস্থ্যের অগ্রাধিকার, (৮) গর্ভাবস্থা ও নবজাতকের বিপদজনক লক্ষণ, ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিসের জটিলতা, মানসিক রোগ, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ সমস্যা,	(১৮) থেকে (২১) এর জন্য ৬ মাস থেকে ৮ মাস (১) ও (৩) থেকে (১০), (১২), (১৩), (২৩) ও (২৪) এর জন্য ১ বছর;	(১৮) থেকে (২১) এর জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স অন্যান্য প্রস্তাবনার দায়িত্বের জন্য

		অপুষ্টি এবং রোগের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রান্তিক কর্মীদের সক্ষমতা, (৯) বেসরকারি এবং সম্প্রদায়-ভিত্তিক সংগঠন ও সম্প্রদায়ের প্রভাবশালীদের সহায়তা গ্রহণ, (১০) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আবাসিক মেডিক্যাল অফিসারের নেতৃত্বে যৌন নির্যাতনের শিকার মানুষের পরীক্ষা, (১১) প্রান্তিক কর্মীদের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রতিবন্ধক শিশু এবং পিতামাতাদের সাহায্য, (১২) কমিউনিটি ক্লিনিকে ঔষধ বিক্রী, (১৩) সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রাথমিক চিকিৎসা এবং জীবন রক্ষাকারী পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ, (১৪) শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল, (১৫) সব প্রতিষ্ঠানে ডে কেয়ার সেবা, (১৬) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, পুলিশ বিভাগ এবং কারাগারে মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের কর্মসূচী, (১৭) বিদ্যালয়েউদ্ভাবনী স্বাস্থ্য কার্যক্রম, (১৮) মহামারী, স্থানীয় সরকার আইন ও দ্য ফুড সেফটি আইনের পর্যালোচনা, (১৯) দেশব্যাপী রোগের নজরদারীর জন্য আইইডিসিআরকে শক্তিশালীকরণ, (২০) বার্ধক্য ও পুনর্বাসন পরিষেবা, বয়স্ক, অপুষ্ট শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য পুষ্টিভাতা, (২১) দূর্যোগে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা, (২২) তথ্য, মূল্যায়ন, জরীপ, গবেষণা, (২৩) জেন্ডার-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, দরিদ্র ও সমাজ-বান্ধব সেবা সম্পর্কিত নীতি গ্রহণ, (২৪) মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের জন্য সমন্বিত ও মডিউলার আকারে প্রশিক্ষন, (২৫) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শক্তিশালী পরীক্ষাগার, (২৬) তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম;	(২), (১১), ও (১৪), এর জন্য ২ বছর; (৭), (১৫) থেকে (১৭), (২০), ও (২১) এর জন্য ৩ বছর; (২২) এর জন্য ৫ বছর	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ স্বাস্থ্য/ হেলথ সার্ভিস (বিএইচএস), জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরামর্শদাতা (নীতি ও কৌশলপত্র তৈরী ও প্রশিক্ষণের জন্য)
৩.১.৪	৪) সঠিক কাঠামো অনুযায়ী পর্যানুসরণ, তত্বাবধায়ন, কর্মসূচির মূল্যায়ন ও শিক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে তথ্যের ব্যবহার	(১) তত্বাবধায়ন, পর্যানুসরণ ও মেন্টরিং কার্যক্রমকে সেবার মানোন্নয়ের জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান, (২) চিকিৎসার ধরন, পরিমাণ, ক্রয়ও রক্ষনাবেক্ষন, তত্বাবধান, পর্যানুসরণ, দক্ষতা-মিশ্রিত জনবল ইত্যাদির জন্য বাজেট, অর্থ এবং পরিকল্পনা, (৩) হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক ও ইউনানি চিকিৎসা কার্যক্রম প্রমাণ-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন, (৪) ডিএইচআইএস-২ এর বিকল্প সফটওয়্যারে সেবাপ্রদানকারী-সংশ্লিষ্ট তথ্যের উল্লেখ, (৫) সাম্প্রতিকতম তথ্যের ভিত্তিতে সেবা, প্রশাসন, বাজেট এবং পরিকল্পনার সংস্কৃতি, (৬) নিয়মিত-ভিত্তিতে তথ্য ও সেবাভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং তথ্য ও সংবাদকর্মীদের সাথে সহযোগিতা;	১.৫ বছর	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস ও সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর
৩.১.৫	৫) সম্প্রদায়কে অন্তর্ভূক্ত করে স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা এবং গণ জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তাবনা	(১) জনমিতির প্রকৃতি অনুযায়ী উপজেলা-ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহীতাদের সংখ্যাভিত্তিক মানচিত্র, (২) সম্প্রদায়, অন্যান্য সেক্টর ও সেবাপ্রদানকারীদের নিয়ে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের পরে তার পর্যালোচনা ও মূল্যয়ন এবং এর ভিত্তিতে গণ অবহিতি ও জবাবদিহিতা, (৩) নারী কেন্দ্রিক সেবা, বৃদ্ধ, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ও দরিদ্রদের প্রতি সেবা, (৪) সম্প্রদায়-ভিত্তিক কার্যক্রমে নারীর জোরদার প্রতিনিধিত্ব, (৫) সক্রিয়সম্প্রদায়-ভিত্তিক কমিটি, (৬) প্রতি অপরাধের তদন্ত করে যথাবিহিত শাস্তির বিধান, যাতে একের দোষে ওপর একজন বা একজনের কারণে অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়;	(১) এর জন্য ৩ বছর; (২) এর জন্য ২ বছর; (৩) থেকে (৫) এর জন্য ১ বছর	প্রস্তাবিত জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৩.১.৬	৬) জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার অবকাঠামো ও কার্য	*১. সেবা ব্যবস্থাপনার অবকাঠামো শক্তিশালীকরণে গৃহীতব্য কার্যাবলী:* (১) জনবল ও সেবা সম্পর্কিত নীতি, স্বচ্ছতা ও	(১) থেকে (১১), (১৪),	(১) থেকে (১১), (১৪),

	প্রণালীকে পুনর্গঠন ও বিকেন্দ্রী করার প্রস্তাবনা	তদারকির জন্য বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন গঠন, (২) বাংলাদেশ স্বাস্থ্য/হেলথ সার্ভিস প্রতিষ্ঠা, এই দপ্তরে কিছু নতুন পদ সৃষ্টি অথবা বর্তমান পদসমূহকে পুনর্গঠন এবং এতে পরিবার পরিকল্পনা এবং নার্সিং বিভাগের অবস্থান স্পষ্টীকরণ, (৩) জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর গঠন, (৪) সকল মহাপরিচালকদের নিয়ে পরিচালনা পরিষদ গঠন, (৫) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরস্থ সেবা প্রদানকারীদের দ্বৈততা পরিহার এবং আত্মীকরণ, (৬) নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কর্মকর্তাদের হাসপাতাল সেবা ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়, (৭) সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার স্বাস্থ্য বিভাগকে প্রস্তাবিত জনস্বাস্থ্য অবকাঠামোতে আত্মীকরণ, (৮) লাইন পরিচালকের স্থলে রাজস্বখাতের পরিচালকগণ কর্তৃক উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনা, (৯) উন্নয়ন খাতের কর্মচারীদের অবিলম্বে রাজস্বখাতে আত্মীকরণ এবং ভবিষ্যতে সব নবসৃষ্ট পদ সূচনা থেকেই রাজস্বখাতে সৃষ্টি, (১০) রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার জন্য ইউনিয়ন, জেলা, উপজেলা ও বিভাগীয় ব্যবস্থাপনা কাঠামো এবং সব স্তরের কর্মচারীর দায়দায়ীত্ব পুনঃনির্ধারণ, (১১) হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায় ডিগ্রিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পরিচালক নির্বাচন, (১২) জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকদের ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ, (১৩) অভিজ্ঞতার আলোকে আউটসোর্সিং কর্মী নির্বাচন, (১৪) যোগ্যতার আলোকে বেতন-ভাতা, দুর্গম এলাকায় বর্ধিত বেতন (যার অর্ধেক থাকবে সেবাকাজে প্রণোদনার জন্য) এবং উৎসাহব্যঞ্জক বসতবাড়ীর নীতি গ্রহণ, (১৫) পদোন্নতির জন্য পরীক্ষা এবং পদোন্নতিপ্রাপ্তদের প্রশিক্ষণ, (১৬) জনস্বাস্থ্য অবকাঠামোর বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি, (১৭) স্বাস্থ্যসেবায় কর্মঘণ্টার পর্যালোচনা, (১৮) সম্ভাবনাময় কর্মচারীদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গ্রেড এবং সবাইর অন্তত তিন ধাপ পদোন্নতির সুযোগ, (১৯) কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের মধ্যে জনসংখ্যার সমান বিভাজন ও তাদের স্ব স্ব তত্ত্বাবধায়কের সহায়তায় একই ধরনের কাজ, (২০) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্র এবং মাতৃ ও শিশুসেবা অবকাঠামোকে একত্রিত করে তাকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা, এবং ইউনিয়ন পর্যায় থেকে কমিউনিটি ক্লিনিকে তত্ত্বাবধান ও পর্যানুসরণ, (২১) ইপিআই আউটরীচ এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিকসমূহ একত্রিত করে জনসংখ্যা ও যাতায়াতের সুবিধার আলোকে এর সংখ্যা নির্ধারণ ও নির্মাণ, (২২) ভালো কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের তিরস্কারের সংস্কৃতি, (২৩) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী বদলী না করে আইনানুগ অন্য কোনও শাস্তি প্রদান, (২৪) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অবস্থিত নিপোর্টের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন;	(১৬) থেকে (১৯), (২১) এবং (২৪) এর জন্য ৬ মাস থেকে ৮ মাস বাস্তবায়নের জন্য ৩ বছর	(১৬) থেকে (১৯), (২১) এবং (২৪) এর জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স (১৬) এর জন্য স্ট্যাটুটরি রেগুলেটরী অর্ডার (এসআরও) ও হতে পারে। তবে একবারে অর্ডিনেন্সের মাধ্যমে হলে অতিরিক্ত কালক্ষেপণ হবে না। (১০) এর জন্য থেকে (১৩), (১৫) প্রস্তাবিত জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৩ ১.৭		*২. পৌর ও নগর এলাকায়প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার সংগঠন*: সরকারি ও ব্যক্তিখাতের হাসপাতাল ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়েও সহায়তা নগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামোর সৃষ্টি এবং প্রয়োজনে ব্যক্তিখাতের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা;	৬ মাস থেকে ৮ মাস এবং ২.৫ বছর	মহামান্য রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স ও জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর

				(বাস্তবায়নের জন্য)
৩.১.৮		*৩. প্রায়োগিক ভৌত কাঠামো*: (১) দূর্যোগ প্রতিরোধী এবং রোগীদের জন্য স্বস্তিদায়ক ও প্রান্তিক ব্যবহারকারীদের ব্যবহার উপযোগী ভৌত কাঠামো, (২) ইউনিয়ন ও কমিউনিটি পর্যায়ের ভৌত অবকাঠামোর সম্প্রসারণ (৩) সব পর্যায়ে মর্যাদাসম্পন্ন এবং স্বস্তিদায়ক আবাসিক ব্যবস্থা;	৩ বছর	বিএইচএস ও জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৩.১.৯		*৪. জলবায়ু, পরিবেশ এবং দুর্যোগ সংক্রান্ত সেবা কার্যক্রম*: (১) বর্জ্য, পানি ও পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, (২) ব্যয়াম ও খেলাধুলার জন্য পর্যাপ্ত পার্ক, (৩) শহরে উত্তপ্ত অঞ্চল (হিট আইল্যান্ড) সৃষ্টি প্রতিরোধ, (৪) পরবর্তী প্রজন্মকে সীসা ও প্লাস্টিকের বিষক্রিয়া থেকে রক্ষা, (৫) হাসপাতাল ও ফ্যাক্টরিতে এফলুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, (৬) National Guideline for Medical Waste Management (Revised) এবং Waste Management and Processing Rule ২০০৮ এর বাস্তবায়ন, (৭) আপৎকালীন স্বাস্থ্যসমস্যার ব্যাপক, তাৎক্ষণিক ও কার্যকরী ব্যবস্থাপনার জন্য আইন প্রণয়ন;	(২) থেকে (৬) এর জন্য ৩ বছর রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স এর জন্য ৬ মাস থেকে ৮ মাস	(২) থেকে (৬) স্বাস্থ্য কমিশন ও বিএইচএস (৭) এর জন্য রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স
৩.১.১০		*৫. ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রস্তাবিত কার্যাবলী এবং দায়ী-দায়ীত্ব নির্ধারণ*: (১) জেলা ও উপজেলায় স্থানীয়ভাবে জনস্বাস্থ্যের দায়িত্ব: (ক) বাজেট প্রণয়ন, অর্থ গ্রহণ ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, (খ) তত্ত্বাবধায়ন, পর্যানুসারণ, সুশাসন, (গ) সম্পদের ব্যবহার ও দক্ষতা পর্যবেক্ষণ, (ঘ) সেবার যৌক্তিকতা, মান ও পরিমাণ নির্ণয়, (২) প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা, (৩) বোর্ডের মাধ্যমে জনবল পরিচালনা-উপজেলা, জেলা, বিভাগ, এবং অধিদপ্তর কর্তৃক পদোন্নতি, বদলি ও পদায়ন, (৪) শ্রমিক, কারাবন্দী, বন্দর/ বিমানবন্দরের কর্মী, পুলিশ ও শিক্ষার্থীদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের সুরক্ষা ও প্রশিক্ষণ, (৫) লক্ষ্য অর্জনের বার্ষিক মূল্যায়ন, (৬) দাতাসংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থানীয় পর্যায়ে সরকারকে সমন্বিতভাবে সহায়তা;	রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স এর জন্য ৬ মাস থেকে ৮ মাস (৫) হবে বছর ব্যাপী	(১ থেকে (৩) এর জন্য অর্ডিন্যান্স (৪) ও (৫) এর জন্য সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর
৩.১.১১		*৬. লজিস্টিক ব্যবস্থাপনা*: (১) যানবাহনকে সরঞ্জামের তালিকায় অন্তর্ভূক্তি, (২) সরঞ্জাম এবং যানবাহনের হালনাগাদ তালিকা, (৩) AI-এর মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে বস্তুগত সম্পদের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ পরীক্ষা এবং রোবোটিক্স এর ব্যবহার, (৪) ন্যায্য, স্বচ্ছ, আইনানুগ এবং যুক্তিসঙ্গত, মূল্যের স্টেন্টিং, ট্রান্সপ্লান্টেশন, ঔষধ, রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষা, প্রেসক্রিপশন করা, (৫) 'টার্ন কি' পদ্ধতিতে ক্রয় ও সংগ্রহ; ব্যবহারকারী না থাকলে ক্রয়-সংগ্রহ বিধিবদ্ধ হবে না, (৬) মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষনের জন্য বাৎসরিক বরাদ্দ, (৭) সরঞ্জাম এক্সপাইরি তারিখের অর্ধেক সময়ের মধ্যে নষ্ট হলে স্বাস্থ্য কমিশন কর্তৃক ব্যবস্থা, (৮) অনলাইনে ইনডেন্টিং, ক্রয়/বিক্রয়, সংরক্ষণ ও বিতরণ, (৯) তত্ত্বাবধান ও পর্যানুসরণে রিমোট সেন্সিং ও তথ্যের স্বয়ংক্রিয়তা, দূর-চিকিৎসা (টেলিমেডিসিন) ও শল্যসেবা এবং এর উন্নয়নে সৃজনশীলতা ও গবেষণা, (১০) চিকিৎসার	(১), (২), (৪) থেকে (৭) এর জন্য ১ বছর (৩), (৮), (৯) এর জন্য ২ বছর	প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য কমিশন ও বিএইচএস ও জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর

		যন্ত্রপাতি উৎপাদন ও প্রযুক্তিবিদ্যার আধুনিকায়নে উৎসাহ ও আর্থিক প্রণোদনা;		
৩.১.১২		*৭. অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার দক্ষ ব্যবস্থাপনা*: (১) অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা স্থানীয়ভাবে একটি স্বাধীন চুক্তিবদ্ধ তৃতীয়পক্ষ/ একটি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব/ বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বা সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে, (২) প্রতিটি অ্যাম্বুলেন্সে একজন প্রশিক্ষিত প্যারামেডিক এবং সব জরুরি সরঞ্জাম;	২ বছর	স্বাস্থ্য কমিশন, বিএইচএস ও জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৩.১.১৩		*৮. স্বাস্থ্যসেবার জন্য বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা এবং বাজেট প্রণয়ন ও বরাদ্দ পদ্ধতি*: (১) অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা কর্তৃপক্ষের কাছে বার্ষিক বরাদ্দ, (২) লব্ধ অর্থ- হাসপাতাল সেবা, জনস্বাস্থ্য, ও মেডিক্যাল ও সম্বন্ধযুক্ত শিক্ষায় বিভাজন। অর্থাৎ : (ক) উপজেলা এবং শহর/নগরের জন্য, (খ) হাসপাতালের জন্য, এবং (গ) মেডিক্যাল ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য, (৩) বিভাজনের আলোকে বাজেট তৈরী করবে : (ক) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং শহর/নগর এলাকার জন্য সিভিল সার্জন ও পৌরসভা/ সিটি করপোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ, (খ) হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার/ তত্ত্বাবধায়ক/ পরিচালক এবং (গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, (৪) বাজেটসমূহ বিভাগীয় পরিচালক দ্বারা সমর্থিত হবার পর স্বস্থ অধিদপ্তরে প্রেরন এবং সেখানে অনুমোদনের পর বাজেট প্রণয়নকারী দলের একাউন্টে অর্থ প্রেরণ, (৫) বাজেটের থাকবে বেতন ও ভাতা, ক্রয়-সংগ্রহ, সেবা, কর্মসূচী, গণযোগাযোগ, গবেষণা/মূল্যায়ন; পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধান; সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা; মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ; ব্যক্তিখাত থেকে সেবা ক্রয় এবং নিয়ন্ত্রক পরিষদের বাজেট, (৬) চিকিৎসকদের অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য করা ইনডেমনিটি বিমা থেকে দরিদ্রদের স্বাস্থ্যসেবায় ২০% ব্যয়, (৭) জাতীয়করণ ছাড়া স্বাস্থ্যসেবার জন্য অতিরিক্ত অর্থায়ন হবে সিএসআর ও দূষণ (সিন) কর, যাকাত, দাতা বা দাতা সংস্থা প্রদত্ত ফান্ড, সারচার্জ এবং সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা (সোশ্যাল হেলথ ইনসুরেনস) থেকে, (৮) সব পদে বেতন কাঠামো যোগ্যতার ভিত্তিতে, যা নির্ধারিত হবে বিভাগীয় দপ্তর, সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর, বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সার্ভিস এবং স্বাস্থ্য কমিশন কর্তৃক, (৯) সবার জন্য বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, (১০) উন্নয়ন এবং চলিত/রাজস্ব উভয়খাতের লাইন আইটেম-ওয়ারী সমন্বিত বাজেট, (১১) প্রকৃত ভর্তি রোগীর সংখ্যার আলোকে বাজেট;	(১) থেকে (৯) এর জন্য ৬ মাস থেকে ৮ মাস বাস্তবায়নের জন্য ২ বছর	(১) থেকে (৯) এর জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স বাস্তবায়নের জন্য বিএইচএস এর অধিদপ্তরসমূহ
৩.১.১৪		*৯. স্বাস্থ্যসেবার জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি :* (১) ব্যক্তিখাত থেকে সেবা ক্রয়: (ক) সেবাপ্রদানকারীকে স্থানীয় সরকারী সেবা ক্রয়কারী কর্তৃক সরাসরি সেবার মূল্য প্রদান, বা, (খ) সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা ব্যবস্থা, যেখানে সরকার স্বয়ং একটা নির্বাচিত সেবাপ্রদানকারীর মাধ্যমে সেবা ক্রয় করবে বা নির্বাচিত একটা তৃতীয়পক্ষ সেবার অর্থ সংগ্রহ এবং সেবা ক্রয় করবে, (২) আর্থিক দায়ীত্ব পালনের জন্য থাকবে পৃথক অর্থ ব্যবস্থাপনা পর্ষদ;	(১) থেকে (২) এর জন্য ৬ মাস থেকে ৮ মাস	মহামান্য রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স

৩.১.১৫	৭. সেবাকেন্দ্র এবং সেবাপ্রদানকারীর সংজ্ঞা এবং পুনঃনামকরণ	(১). কমিউনিটি ক্লিনিকের নাম- গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, (২). ইউনিয়ন স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্রের নাম-ইউনিয়ন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, এবং (৩). উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নাম- প্রাথমিক রেফারেল স্বাস্থ্য কেন্দ্র, (৪). স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার কল্যাণ সহকারী এবং সিএইচসিপি এর নাম হবে গ্রামীণ স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মী;	১.৫ বছর	বিএইচএস
খ) হাসপাতাল এবং রোগ নির্ণয়পরিষেবা ভিত্তিক সংস্কার প্রস্তাবনা				
	১) সেবার মান উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবনা			
৩.১.১৬	১. সেবা গ্রহীতা কেন্দ্রীক সেবার ব্যবস্থাপনা	(১) রোগীকে ঔষধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চিকিৎসক এবং হাসপাতাল নির্বাচনে বিকল্প নির্ধারণের অধিকার, (২) হাসপাতালে পরস্পর থেকে পৃথকীকৃত ডিপার্টমেন্ট, (৩) রোগীর জন্য যথেষ্ট সময়, (৪) রোগীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা, (৫) হাসপাতালে পর্যাপ্ত দিকনির্দেশনা, (৬) নির্ভুল রোগী চিহ্নিতকরণ এবং চিকিৎসা, (৭) দীর্ঘস্থায়ী, মৃত্যুসজ্জাশায়ী ও দুর্ঘটনায় পতিত রোগী, গর্ভবতী মহিলা, অপুষ্ট রোগী, কিশোর-কিশোরীদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক কাউন্সেলর পদায়ন, (৮) কাউন্সেলর পদে নারীদের অগ্রগণ্যতা, (৯) রোগীকে প্রেসক্রিপশন বুঝিয়ে দেয়া, (১০) শিশু ভূমিষ্ট হবার স্থানে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশ এবং শিশু ভূমিষ্টকরণের জন্য ট্রায়াল, (১১) হাসপাতালে কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট টিম, (১২) হাসপাতালে বায়োমেডিক্যাল প্রকৌশল বিভাগ, নিবন্ধিত ফার্মাসি ও ফার্মাসিস্ট;	(১) থেকে (৬), (৯) এবং (১০) থেকে (১১) পর্যন্ত ১ বছর (৭), (৮) এবং (১২) এর জন্য ৬ মাস থেকে ৮ মাস	(৭), (৮) এবং (১২) এর জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স/ স্ট্যাটুটরি)
৩.১.১৭	২. জেলা, উপজেলায় ক্লিনিকাল সেবার মান ও পরিমাণ উন্নয়ন	(১) মেডিকেল কলেজে প্রদত্ত সেবা জেলা সদর হাসপাতালে প্রাপ্তি, (২) জেলা সদর হাসপাতালে পদ বিন্যাস অনুযায়ী প্রয়োজনীয়সংখ্যক সেবা প্রদানকারী নিয়োগ, (৩) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শুধুমাত্র কনসাল্টেশন, অবজারভেশন, এবং রেফারেল রোগীকে ভর্তি;	(১) ও (২) এর জন্য ৩ বছর, (৩) এর জন্য ১ বছর	(১), (২) ও (৩) এর জন্য এসআরও; বাস্তবায়নে বিএইচএস ও অধিদপ্তরসমূহ
৩.১.১৮	৩. হাসপাতাল মর্গে প্রদত্ত কার্যক্রমের উন্নয়ন	(১) আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামসহ মর্গ স্থাপন, (২) ফরেনসিক পরীক্ষা, প্রমাণ সংগ্রহ, সুরক্ষা এবং পরিবহন সম্পর্কে প্রতি উপজেলায় কমপক্ষে ২ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার, (৩) মেডিকো-লিগাল সেবার জন্য পারিশ্রমিক;	২ বছর	বিএইচএস ও ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর
৩.১.১৯	৪. স্বাস্থ্যসেবার (ক্লিনিক্যাল ও জনস্বাস্থ্য) মান উন্নয়নে কারিগরী ও প্রশাসনিক কার্যাবলী	(১) সুস্থতা-কেন্দ্রিক স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতি গ্রহণ, (২) পরিষেবা গ্রহণ এবং প্রদানকারীদের অনুপাত এবং দক্ষতা-মিশ্রণ, (৩) সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলির জন্য অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড, (৪) বড় হাসপাতালে নগদ ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ দশ বছর পর পর ৮০% বৃদ্ধি এবং কোটেশনের মাধ্যমে ক্রয়ের পরিমাণ তিন বারে ১৫০% বৃদ্ধি করার নীতি, (৫) হাসপাতালে সংগৃহীত অর্থের অর্ধেক হাসপাতালে ব্যবহারের নীতি;	(১) ও (২) এর জন্য ২ বছর (৩) থেকে (৫) এর জন্য ৬ মাস থেকে ৮ মাস	(১) ও (২) এর জন্য বিএইচএস ও অধিদপ্তরসমূহ; (৩) থেকে (৫) এর জন্য

				রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স/ এসআরও
৩.১.২০	৫. স্বাস্থ্যসেবার মান (ক্লিনিক্যাল ও জনস্বাস্থ্য) উন্নয়নের জন্য গৃহীতব্য অন্যান্য কার্যাবলী	(১) চিকিৎসক, নার্স, প্যারামেডিক/ মাঠকর্মীর জন্য প্রশিক্ষণ মডিউলের বিষয়াদি: অ্যান্টিবায়োটিক; সিজারিয়ান; ঔষধের ডোজ; টিকা; গর্ভনিরোধক; ক্লিনিকাল, শরীরবৃত্তীয়এবং বয়স-ভিত্তিক পুষ্টি; গর্ভাবস্থা; বার্ধক্যজনিত সমস্যা; দুর্ঘটনা, আঘাত, মনোসামাজিক উদ্বেগ, অসংক্রামক রোগ কাউন্সেলিং, (২) শরীরবৃত্তীয় ফিটনেসভিত্তিক স্ব-মূল্যায়নে রোগীকে সহায়তা, (৩) পেশীশক্তি, দৃষ্টি, শ্রবণশক্তি, ভাষা এবং আন্ত:ব্যাক্তিক যোগাযোগের বয়স অনুসারে দক্ষতা, জ্ঞান, বন্ধুত্ব, সামাজিকতা, খাদ্য, সেবাগ্রহীতাদের স্বপ্ন সংশ্লিষ্ট সহায়ক সেবা, (৪) সকল সংশ্লিষ্ট কমিটিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ;	(১) ও (৪) এর জন্য ১ বছর (২) ও (৩) এর জন্য ১.৫ বছর	বিএইচএস ও ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর
৩.১.২১	৬. রোগী বান্ধব হাসপাতালের জন্য গৃহীতব্য কার্যাবলী	(১) নারী-বান্ধব হাসপাতালের উদ্যোগ পর্যালোচনা এবং কর্মসূচিটি পুনঃগ্রহণ, (২) স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী এবং গ্রহীতা-বান্ধব হাসপাতাল, (৩) হাসপাতালের ফার্মাসি, পরীক্ষাগার ও রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রে ২৪ ঘণ্টা সেবা প্রদান, (৪) নিরাপদ পানি, বায়ু, স্বস্তিদায়ক পরিবেশ, পয়:প্রণালী, রোগীর শয্যার পাশে যথেষ্ট স্থানের নিশ্চয়তা;	(১) ও (৪) এর জন্য ৬ মাস থেকে ৮ মাস (২) ও (৩) এর জন্য ৩ বছর	বিএইচএস ও ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর (৪) এর জন্য রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স
৩.১.২২	৭. রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য গৃহীতব্য কার্যাবলী	(১) শক্তিশালী জাতীয় রেফারেন্স ল্যাবরেটরি, (২) রোগ নির্ণয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি, (৩) রাসায়নিকের সংস্পর্শে উদ্ভূত রোগ নির্ণয়ের জন্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ল্যাবরেটরি মেডিসিন, রেফারেল সেন্টার এবং মলিকুলার ল্যাবকে শক্তিশালী এবং বিকেন্দ্রীকরণ, (৪) রোগ নির্ণায়কের ফলাফল প্রশিক্ষিত/ স্বীকৃত পেশাজীবী কর্তৃক স্বাক্ষর;	(১), (২) ও (৩) এর জন্য ৩ বছর (৪) এর জন্য ১ বছর	বিএইচএস ও ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর
৩.১.২৩	৮. সিজারিয়ান অপারেশন নিয়ন্ত্রণের জন্য পদক্ষেপ সমূহ	(১) সিজারিয়ান অপারেশনের হার অযাচিতভাবে বৃদ্ধি করে এরকম কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ, (২) ২০২৩ সালের উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান অপারেশন নিয়ন্ত্রণ, (৩) মিডওয়াইফদের হাতে শিশুপ্রসব;	(১) ও (২) এর জন্য ১ বছর/ (৩) এর জন্য ৩ বছর	বিএইচএস ও জনস্বাস্থ্য/ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর
৩.১.২৪	৯. সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা	(১) যা করা যাবে না: (ক) সরকারি সেবা প্রদানকারী কোন রোগীকে বেসরকারি হাসপাতালে প্রেরণ, (খ) ঔষধ প্রস্তুতকারকের প্যাডে প্রেসক্রিপশন লেখা, (গ) অপ্রয়োজনীয় ওষুধ বা পরীক্ষা করার পরামর্শ, (২) প্রতিটি ওটিতে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকবে, শল্য চিকিৎসার প্রতিটি পদক্ষেপ স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হবে এবং তার রেকর্ড থাকবে, (৩) ঝুঁকি ভাগাভাগির ভিত্তিতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব, (৪) জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের দক্ষতার সাথে চুক্তি	(১) ও (৩)এর জন্য ৬ মাস থেকে ৮ মাস	(১) ও (৩) এর জন্য রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স; বিএইচএস ও জনস্বাস্থ্য/ক্লি

		ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষণ, (৫) দুর্ঘটনার ব্য দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং প্রশিক্ষণ;	(৬) ও (৭) এর জন্য ২.৫ বছর	নিক্যাল সেবা অধিদপ্তর
	২) সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চয়তার লক্ষ্যে গৃহীতব্য কার্যাবলীর প্রস্তাবনা			
৩.১.২৫	১. শিশু, কিশোর-কিশোরীদের ও মহিলা রোগীদের অগ্রাধিকার প্রদান	(১) বন্ধ্যাত্ব, গর্ভপাত-পরবর্তী যত্ন এবং যৌনবাহিত রোগের অগ্রাধিকার, (২) হাসপাতালে কার্যকরী স্পেশাল কেয়ার নিউবর্ন ইউনিট (SCANU), (৩) দূর্গম এলাকায় প্রসবের দুই সপ্তাহ আগে গর্ভবতী মহিলাদের হাসপাতালে ভর্তি, (৪) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিশুদের পুনর্বাসন এবং সামাজিক সংহতিকরণ, (৫) কিশোর-কিশোরীদের অগ্রাধিকার প্রদান;	(১) ও (৩) এর জন্য ১ বছর; (২) ও (৪) এর জন্য ২ বছর	বিএইচএস ও জনস্বাস্থ্য/ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর
৩.১.২৬	২. শিশু বিকাশ কর্মসূচিকে অগ্রাধীকার প্রদান	(১) শিশু বিকাশ কেন্দ্রগুলির পুনর্বিন্যাস, (২) জেলা ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মাল্টি- ডিসিপ্লিনারি (শিশুস্বাস্থ্য চিকিৎসক, শিশু মনোবিজ্ঞানী এবং উন্নয়ন-থেরাপিস্ট) ‘শিশু বিকাশ কেন্দ্র’ প্রতিষ্ঠা এবং মান উন্নয়ন, (৩) প্রয়োজনে উচ্চতর শিশু বিকাশ কেন্দ্রে রেফারেলের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা, (৪) শিশুর স্নায়বিক বিকাশের দ্রুত মূল্যায়ন ও প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা গ্রহণ, (৫) শিশু বিকাশ কেন্দ্রগুলিতে প্রশিক্ষণ, জনবল, ও গবেষণা পরিচালনা, (৬) শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন এবং তার কার্যক্রম ও কর্মসূচিতে সহায়তার জন্য আইন;	৩ বছর	বিএইচএস ও ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর
৩.১.২৭	৩. জরুরি চিকিৎসার সহায়তা	(১) দেশব্যাপী আধুনিক চিকিৎসা কাঠামো প্রতিষ্ঠা, (২) জরুরি/ক্রিটিকাল কেয়ার সেবা পৃথক বিভাগ হিসাবে প্রতিষ্ঠা, (৩) হাসপাতালের জরুরী বিভাগের পুনঃনির্মাণ এবং জনসম্পদ ও সরঞ্জামের নিশ্চয়তা, (৪) মহাসড়কের কাছাকাছি অবস্থিত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রক্ত সঞ্চালনকেন্দ্র ও অ্যাম্বুলেন্সসহ ট্রমা সেন্টার, (৫) প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে সেবার জন্য স্থানীয় ব্যক্তিখাত থেকে দক্ষতা-মিশ্রিত সেবাপ্রদানকারীর সঙ্গে চুক্তি (৬) অঙ্গ ও রক্ত দাতাদের উপজেলাভিত্তিক ডাটাবেস;	(১) থেকে (৪) পর্যন্ত ৩ বছর (৫) এর জন্য ২ বছর	বিএইচএস ও জনস্বাস্থ্য/ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর
৩.১.২৮	৪. উপজেলা/পৌর/ নগর এলাকায় স্তরের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম	(১) নগরে/ পৌর এলাকায়বা নতুন সৃষ্ট পদে এক বছরেরও বেশি সময়ধরে শূন্য, এরকম পদে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা চিকিৎসক নিয়োগের নীতি, (২) নারীর প্রতি সহিংসতা জনিত সেবার জন্য সকল উপকরণসহ হাসপাতালে অন্তত: ৫ শয্যা বিশিষ্ট ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, (৩) দুর্ঘটনার শিকার মানুষের প্রাথমিক সেবা দেওয়ার জন্য পুলিশ সদস্যদের প্রশিক্ষণ এবং থানায় প্রয়োজনীয় উপকরণাদীর সার্বক্ষণিক নিশ্চয়তা	(১) ও (২) এর জন্য ৬ মাস থেকে ৮ মাস ; (৩) ও (৪) এর জন্য ৩ বছর	(১) ও (২) এর জন্য রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স; (৩) ও (৪) এর জন্য বিএইচএস ও জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর

৩.১.২৯	৫. স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান/ হাসপাতাল নির্মাণের মান এবং সেবা চালু করার শর্ত	(১) স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র নির্মাণের প্রয়োজন নির্ধারণ; প্রয়োজনে তাতে সকল প্রয়োজনীয় সম্পদের অন্তর্ভুক্তি, (২) আবেদনের চার সপ্তাহের মধ্যে বেসরকারি হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারের লাইসেন্স নবায়ন, (৩) উপজেলা হাসপাতালগুলিতে সার্জারি, স্ত্রীরোগ-প্রসূতি ও অ্যানেস্থেসিয়ার পরিপূর্ণ দলের নিশ্চয়তা, (৪) অচল হাসপাতালগুলিকে দক্ষভাবে চালু করার ব্যবস্থা, (৫) ২০% দরিদ্র রোগীকে কাছাকাছি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে, বিনামূল্যে, অন্ত:বিভাগ, বহির্বিভাগ, ওষুধ, এবং ডায়াগনস্টিক সেবা প্রদানের নীতি, (৬) ক্যাচমেন্ট জনসংখ্যা এবং রোগতাত্ত্বিক অবস্থার ভিত্তিতে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান এবং তার বিস্তৃতি, (৭) রোগীর সংখ্যা ও অন্যান্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা, (৮) হাসপাতালে চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইসিইউ স্থাপন, (৯) জেলা ও উর্ধ্বতন হাসপাতালে প্রয়োজনীয়যন্ত্রপাতির নিশ্চয়তা;	(১), (৩), (৪), (৮) ও (৯) এর জন্য ২ বছর (৫) থেকে (৯) এর জন্য ৬ মাস থেকে ৮ মাস	(১), (৩), (৪), (৮) ও (৯) এর জন্য বিএইচএস ও জনস্বাস্থ্য/ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর (৫) ও (৯) এর জন্য রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স
৩.১.৩০	৬. জনমুখী ক্লিনিক্যাল এবং ডায়াগনস্টিক সেবা	(১) বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক উচ্চতর স্তরের হাসপাতাল থেকে নিম্নস্তরের হাসপাতালে সেবা, (২) জরুরী সেবাগ্রহীতাদের জন্য প্রথমে বিনামূল্যে সেবা, (৩) হ্রাসকৃত এবং যৌক্তিক মূল্যে ঔষধ, উপকরণ, রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষা, কনসালটেশন ফী ও হাসপাতালে ভর্তি জনিত সেবা, (৪) উপজেলা, জেলা, ও বিভাগ পর্যায়েপ্রস্তাবিত স্বাস্থ্য সেবা কমিশনের নিয়ন্ত্রণাধীন পর্যানুসরণকারী/ মনিটরিং দল অথবা প্রস্তাবিত কমিশনকে সহায়তা করার জন্য প্রস্তাবিত জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরস্থ বিভিন্ন স্তরের দল, (৫) কার্যকরী স্বাস্থ্যসেবা সমন্বয় কমিটি;	১.৫ বছর	স্বাস্থ্য কমিশন বিএইচএস ও জনস্বাস্থ্য/ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর
৩.১.৩১	৭. ইন্টারনেট ভিত্তিক সেবা সম্প্রসারণ এবং হালনাগাদ করণ	(১) টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান এবং পরিষেবা, (২) রক্ত এবং অঙ্গদাতার ডেটাবেস, (৩) সহজ ভাষায়স্বাস্থ্য তথ্য ও চিকিৎসা পরামর্শ দেওয়ার জন্য সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে সংযুক্ত ডিজিটাল স্বাস্থ্য প্ল্যাটফর্ম, (৪) দূর্গম জনগোষ্ঠীর জন্য স্থানীয় হটলাইন;	২.৫ বছর	বিএইচএস ও জনস্বাস্থ্য/ক্লিনিক্যাল সেবা অ ধিদপ্তর
৩.১.৩২	৮. বিশেষ ধরনের সেবার চাহিদা পূরণ	(১) অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে ডিপ্রেশন, আলঝাইমার ও ডিমেনশিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য আবাসিক সেবা, (২) স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে, বিদ্যালয়ে, প্রতিষ্ঠান বা বড় বড় ভবনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী অবকাঠামো, (৩) স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবার জন্য বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, (৪) স্বল্পমূল্যে অর্গ্যান ট্রান্সপ্লান্ট, রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি, কিডনি ডায়ালিসিস, ক্যান্সার ইত্যাদির কার্যকরী এবং আইনভিত্তিক চিকিৎসা;	(১) থেকে (৩) ৩ বছর (৪)এর জন্য ৬ মাস থেকে ৮ মাস	বিএইচএস ও জনস্বাস্থ্য/ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর (৪) এর জন্য রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স
৩.১.৩৩	৯. দূর্যোগ ও দূর্যোগ পরবর্তী নারীবান্ধব সেবা প্রদান	(১) স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সমূহে দূর্যোগ পরবর্তী প্রজনন স্বাস্থ্য ও মাতৃস্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা, (২) নারীবান্ধব ও নিরাপদ দূর্যোগ-আশ্রয়স্থল, (৩) দূর্যোগকালে গর্ভবতী নারীদের স্বাস্থ্য সেবার নিশ্চয়তা, (৪) সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় বন্ধ্যাত্বকে গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ স্বাস্থ্য কর্মসূচি গ্রহণ;	১.৫ বছর	বিএইচএস ও জনস্বাস্থ্য/ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর

৩.১.৩৪	১০. অলাভজনক হাসপাতাল/সংস্থাগুলিকে সহযোগিতা প্রদান	অলাভজনক বেসরকারি খাতের হাসপাতাল বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলিকে দেশব্যাপী সেবা দেবার জন্য সহযোগিতা প্রদান	অর্ডিন্যান্স এর জন্য ১ বছর। বাস্তবায়নের জন্য ৩ বছর	রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স বিএইচএস ও জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৩.১.৩৫	১১. অসংক্রামক এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগের ব্যবস্থাপনা	(১) ক্যান্সার, উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসতন্ত্রের রোগ, মানসিক সমস্যা, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, আত্মহত্যা প্রতিরোধ এবং পুনর্বাসনের জন্য প্রতি দশ বছর অন্তর কৌশলপত্র তৈরি, (২) স্বাস্থ্যসেবার সকল স্তরে অসংক্রামক রোগের ঔষধপ্রাপ্তি, (৩) জেলা পর্যায়েপ্রযুক্তি/সরঞ্জামসহ পর্যাপ্ত নিবিড় পরিচর্যা ইউনিট, (৪) জেলা হাসপাতালে কার্ডিওলজি, কার্ডিয়াক সার্জারি, মনোরোগবিদ্যা, নিউরোলজি, পালমোলজি, অনকোলজি, নেফ্রোলজি, হেপাটোলজি, ট্রমাটোলজি, ইউরোলজি, বয়স্কদের যত্ন এবং হেল্প-লাইন;	(১) এর প্রথম কৌশলপত্রের জন্য ও (২) এর জন্য ১ বছর (৩) ও (৪) এর জন্য ৪ বছর	বিএইচএস ও /ক্লিনিক্যাল সেবা জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৩.১.৩৬	১২. নারীদের জন্য হাসপাতাল ও প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	(১) ডে কেয়ার সেন্টারসহ নারী ও শিশুবান্ধব হাসপাতাল, (২) বিভাগীয় পর্যায়ে নারী ও শিশুদের হাসপাতাল, বিকল্প হিসেবে মাতৃ ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্রগুলোকে জেলা ও উপজেলার ক্লিনিক্যাল ধারার সাথে সংযুক্তি, (৩) মহিলা ও শিশু সেবার উন্নয়নের জন্য মহিলা স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রতিষ্ঠান	(১) এর জন্য ৬ মাস থেকে মাস ৮ (২) ও (৩) এর জন্য ৩ বছর	(২) এর জন্য অর্ডিন্যান্স; (১) ও (৩) এর জন্য ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর
৩.১.৩৭	১৩. চাহিদা সম্পন্ন সেবার জন্য পদ সৃষ্টি	পর্যাপ্ত সংখ্যক মানসিক ও চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ, হিস্টোপ্যাথোজিস্ট, ফিজিওথেরাপিস্ট, বায়োমেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট, বায়োমেডিক্যাল প্রকৌশলী, এবং ক্যান্সার এবং অন্যান্য রোগ নির্ণয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিশেষজ্ঞ	২.৫ বছর	বিএইচএস ও ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর
৩.১.৩৮	১৪. বিশ্ব মানের উৎকর্ষতা সম্পন্ন হাসপাতাল স্থাপন	(১) দেশে চিকিৎসা-পর্যটন কেন্দ্র তৈরির জন্য বিশ্ব মানের হাসপাতাল স্থাপন, (২) বিদেশীদের চিকিৎসা পরবর্তী ফলোআপের জন্য টেলি-মেডিসিন পরিষেবা, (৩) বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোর সাহায্যে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচার, (৪) উদ্বৃত্ত থাকলে দেশের চিকিৎসক, নার্স এবং প্যারামেডিকদের অন্যান্য দেশে চাকুরির ব্যবস্থা, (৫) ব্যক্তিখাতে চিকিৎসা সরঞ্জাম ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতা, দূর-চিকিৎসা ও হাসপাতালের মানোন্নয়নের জন্য সহায়তা প্রদান;	৫ থেকে ১০ বছর	প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য কমিশন, (বিএইচএস) ও ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর
৩.১.৩৯	১৫. অঙ্গদান সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োগ	অনাত্মীয়ব্যক্তি অঙ্গ দাতা হতে পারবেন এ বিষয়ে২০১৯ সালের এক রীট আবেদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী আইন সংশোধন;	১ বছর	স্বাস্থ্য কমিশন ও বিএইচএস
	৩). কার্যকর রেফারেল সেবা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাবনা			
৩.৩.৪০	১. রেফারেল এবং প্রাসঙ্গিক সেবা শক্তিশালীকরণ	(১) শক্তিশালী প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো এবং পরিষেবা, (২) প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জনগণের আত্মবিশ্বাস;	(১) এর জন্য ৬ মাস থেকে ৮ মাস (২)	(১) এর জন্য অর্ডিন্যান্স, (২) এর জন্য

			এর জন্য ৩ বছর	জনস্বাস্থ্য অধি:
৩.৩.৪১	২. রেফারেল সিস্টেমের জন্য কৌশলগত ও আর্থিক সিদ্ধান্ত	(১) ক্যাচমেন্ট এলাকার জনসংখ্যা ও সেবার প্রয়োজনীয়তার আলোকে হাসপাতালের পরিষেবা, (২) রেফারেল সেবার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান, (৩) রেফারেল ব্যবস্থার নিয়ম, সুবিধা ও সুফল সম্পর্কে জনঅবহিতি, (৪) রেফারকারী এবং রোগীদের গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পৃথকভাবে রেফারেল ইউনিট পরিচালনা, (৫) সেবা গ্রহণকালে নৈতিক ঝুঁকি এবং ঔষধের অপব্যবহার রোধ করার জন্য সেবাগ্রহীতা থেকে আয় অনুযায়ী ৫ থেকে ২০ টাকা সংগ্রহ, যা প্রতি দশ বছর পর ২০% হারে বাড়বে।	(১) ও (২) এর জন্য ৩ বছর; (৩) থেকে (৫) এর জন্য ১ বছর	বিএইচএস, ক্লিনিক্যাল সেবা ও জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর

৩.২ স্বাস্থ্যসেবা ও সেবা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সংস্কারের লক্ষ্যে প্রদত্ত বিশদ প্রস্তাবনা

সূচনা

১৯৭৮ সালে আলমাতি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত 'সকলের জন্য স্বাস্থ্য' শীর্ষক উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য অর্জনের জন্য শক্তিশালী কাঠামোগত এবং কার্যকরী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রয়োজন। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার টেকসইতা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভিতরের এবং বাইরের সমস্ত উপলব্ধ সম্পদের দক্ষতার সাথে ম্যাপিং এবং ব্যবহার করার উপর নির্ভর করে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অংশীদাররা তাদের নিজস্ব চাহিদা পূরণের জন্য একটি দক্ষ এবং কার্যকর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রত্যাশা করে। এজন্য অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সরকারি এবং বেসরকারি খাত এবং সংস্থাগুলি, যাদের এই টেকসইতার জন্য যতটা প্রয়োজন, ততটার জন্য তাদের একত্রিত হতে হবে। সেবা সরবরাহকারী পক্ষ এবং চাহিদার দিক উভয়ই আমাদেরকে 'জনগণের স্বাস্থ্য জনগণের হাতে অর্পণ'-এর কৌশলের কথা মনে করিয়ে দেয়। স্বাস্থ্যসেবা পরিচালনায় সম্প্রদায় কর্তৃক নেতৃত্ব প্রদান কৌশল হিসেবে সহজ মনে হলেও এটির বাস্তবায়ন কঠিন। সম্প্রদায় এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যা সমস্ত প্রাসঙ্গিক অংশীদারদের জনগণের স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য একটি মঞ্চ প্রদান করতে পারে। এই বিষয়েবাংলাদেশে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চিত আছে। তবে, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার কাঠামোতে সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের অন্তর্ভুক্তির গুরুত্ব খুব কমই উপলব্ধ হয়। এর জন্য মৌলিক বিষয়হলো সুষমভাবে বণ্টিত মান সম্পন্ন এবং কার্যকর মানবসম্পদ সহ অন্যান্য সম্পদের পর্যাপ্ততা এবং যথার্থতা; লক্ষ্য-ভিত্তিক, সমন্বিত এবং চৌকস পরিকল্পনা এবং সম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনা, তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য ভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে জবাবদিহিমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তথ্যের ব্যবহার । যা এখনও দেশের ব্যবস্থাপনা সংস্কৃতির অংশ হয়েউঠে নাই। স্বাস্থ্য সেবার গ্রাহকদের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য এই উপাদানগুলির দক্ষ সংমিশ্রণ অপরিহার্য। এই লক্ষ্যে, স্বাস্থ্যের বিষয়েপারিবারিক বিশ্বাস, মনোভাব এবং অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই সমস্ত প্রত্যাশা পূরণের দায়িত্ব অভিজ্ঞ এবং দূরদর্শী জনস্বাস্থ্য নেতা এবং গুরুত্বপূর্ণ স্তরের নেতাদের উপর অর্পণ করতে হবে, যারা জনসাধারণের চাহিদা পূরণের জন্য দক্ষ-মিশ্র দল তৈরি করবে এবং এজন্য অনুসরনীয় মৌলিক কৌশল তৈরি করবে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার গতিশীল সম্পর্কের আলোকে সংশ্লিষ্ট সম্পদের ভারসাম্য এবং সমন্বয়যাতে প্রয়োজনীয়ভাবে গতিশীল হয়, যাতে নির্ধারিত জনগোষ্ঠীর জন্য সহজলভ্য, সাশ্রয়ী, ন্যায়সঙ্গত এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য, এবং জনসংখ্যা এবং পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করা যায়সেটা হতে হবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মূল সম্মুখমুখি লক্ষ্য। এর জন্য সমগ্র ব্যবস্থার ভিত্তি এবং পর্যায়ক্রমে এর উপাদানগুলি পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এই ইউনিটগুলিকে এককভাবে এবং সমগ্রের মধ্যে বুঝা এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সাথে জড়িত কারিগরি এবং ব্যবস্থাপনা কর্মীদের দক্ষতা পরীক্ষা করা ছাড়াও তাদের কার্যকারিতার অবস্থা, মিথস্ক্রিয়া এবং সম্পর্ক, বিশেষাধিকার এবং নিষেধাজ্ঞা, নীতি এবং কৌশল, পরিকল্পনা, আইন, নিয়ম, প্রবিধান, রীতিনীতি, কর্মপরিবেশ, অর্থাৎ শাসন, অনুশীলন এবং পদ্ধতি ইত্যাদি অনুধাবন করা আবশ্যকীয়। এ লক্ষ্যে সামগ্রিক কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়হল: স্থিতিস্থাপক ব্যবস্থার জন্য কৌশলগত বিনিয়োগ; অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আস্থা বৃদ্ধি; টেকসই স্বাস্থ্যের জন্য সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন; স্বাস্থ্য ব্যবস্থায়ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা; পরিকল্পনাগুলিকে কর্মে রূপান্তরিত করার দক্ষতা; এবং অবিচ্ছিন্ন শিক্ষার মাধ্যমে বিকশিত হওয়া।

একটি গতিশীল খাত হিসেবে স্বাস্থ্যের জন্য ক্রমাগত সংস্কার প্রয়োজন, কারণ স্বাস্থ্যে ক্রমাগত নতুন জ্ঞান তৈরি হয়এবং সমাজ এবং সুবিধাভোগীরা তাদের জ্ঞান-ভিত্তিক চাহিদাগুলি ক্রমাগত সময়োপযোগী হতে থাকে। স্বাস্থ্যসেবার জন্য মানুষের চাহিদা এবং চাহিদাগুলির ধরণ এবং পরিমাণ সে অনুসারে পরিবর্তিত হয়। পরিষেবা প্রদানকারীদের দক্ষতা এবং জ্ঞান সাম্প্রতিকীকরণ করার জন্য উদ্ভাবন প্রয়োজন, কারণ স্বাস্থ্য খাত যে পরিবেশে কাজ করে তা তরল অবস্থায়থাকে। এই খাতকে এই বাহ্যিক পরিবেশের সাথে ক্রমাগত সামঞ্জস্য ও সমন্বয়করতে হয়, যা বিভিন্ন ধরনের সুযোগ এবং হুমকি, বহুমুখী শক্তি এবং দুর্বলতার মধ্যে কাজ করে, যা এই খাত এবং এর অঙ্গ এবং উপাদানগুলির মধ্যেও উদ্ভূত হয়।

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকালে সাম্য, সামাজিক ন্যায্যতা, মৌলিক অধিকার, স্বাধীনতা, চিন্তা ও প্রকাশের স্বাধীনতা, বহুত্ববাদ ও সেবাগ্রহীতাদের বৈচিত্র্য, ন্যায়ও সত্যাশ্রই ক্রিয়াকলাপ, সম্পদের অধিকার, বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া, পরিবেশ স্বাস্থ্যের এবং প্রাকৃতিক

সম্পদের উপর অধিকার, রাষ্ট্র প্রদত্ত সাংবিধানিক অধিকার ও অযাচিত নিয়ন্ত্রণমূলক সিদ্ধান্তের সংস্কৃতি ইত্যাদি স্মরণে রাখতে হবে।

স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশনের প্রতিটি সুপারিশ দুটি মৌলিক লক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত হয়েছে। এগুলো হলো: (১) বর্তমান অবস্থা ও প্রকৃত বর্তমান প্রয়োজন এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে ভবিষ্যত প্রয়োজন; এবং (২) সুদক্ষ আর্থিক সংশ্লেষ, অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে জাতীয়ও আন্তর্জাতিক লক্ষ্য, অগ্রগণ্যতা এবং একমত হওয়া বিষয়াদির আলোকে এসব সুপারিশ প্রস্তুত করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকালে সাম্য, সামাজিক ন্যায্যতা, মৌলিক অধিকার, চিন্তা ও প্রকাশের স্বাধীনতা, বহুত্ববাদ ও সেবাগ্রহীতাদের বৈচিত্র্য, ন্যায়ও সত্যাশ্রই ক্রিয়াকলাপ, সম্পদের অধিকার, বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া, পরিবেশ স্বাস্থ্যের এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার, রাষ্ট্র প্রদত্ত সাংবিধানিক অধিকার ও অযাচিত নিয়ন্ত্রণমূলক সিদ্ধান্তের সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়মাথায়রাখা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এসব লক্ষ্য অনুসৃত হয়েছে এবং তা নিশ্চিত করার মানসে এই সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবার উপর চাপ সৃষ্টিকারী চ্যালেঞ্জগুলি, যা স্বাস্থ্যখাতের সংস্কারের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত বিষয়াদির জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা হল: নিম্নমানের এবং অসম সেবা, অপর্যাপ্ত মানব সম্পদ এবং দুর্বল দক্ষতা মিশ্রণ, পরিষেবা প্রদানকারী এবং খাতগুলির মধ্যে দুর্বল সমন্বয়, অদক্ষ লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া, চিকিৎসা পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের অভাব, অকার্যকর অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা, অপ্রতুল সম্পদ, দুর্বল রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা, অনিয়ন্ত্রিত বেসরকারি খাত, দুর্বল জবাবদিহিতা এবং পুরষ্কার বা শাস্তির সংস্কৃতির অভাব।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে জাতীয়ও আন্তর্জাতিক লক্ষ্য, অগ্রগণ্যতা এবং একমত হওয়া বিষয়াদির আলোকে এসব সুপারিশ প্রস্তুত করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য সুপারিশের ক্ষেত্রে এসব লক্ষ্য অনুসৃত হয়েছে। নীতি, কৌশল ও কর্মসূচি প্রণয়নে দরিদ্র, অশিক্ষিত ও সমাজে নিম্নস্তরের কোনও ভূমিকা থাকে না। সেবাপ্রাপ্তি ও সেবাগ্রহণ সমাজের সবার জন্য সমানুপাতিক নয়। এই সমানুপাতিকতার অভাব ঘটে নীতি, কৌশল ও কর্মসূচি প্রণয়নে দরিদ্র, অশিক্ষিত ও সমাজে নিম্নস্তরের কোনও ভূমিকা থাকে না, তাই। এই ফলাফলগুলি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায়কাঠামোগত সংস্কারের জরুরি প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়, যার মধ্যে রয়েছে উন্নত কর্মশক্তি ব্যবস্থাপনা, উন্নত সম্পদ বরাদ্দ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি। এই সমস্যাগুলি সমাধান না করে, স্বাস্থ্যসেবা লক্ষ্য অর্জন এবং সকল নাগরিককে মানসম্পন্ন পরিষেবা প্রদান একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবেই থেকে যাবে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার অনুপান এবং সংজ্ঞা কি হবে এবং কোন পর্যায়পর্যন্ত তা নির্ধারিত হবে এসব নিয়েঅনেক সময়েই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এখানে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করব। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বলতে বুঝাবে: (১) গণ যোগাযোগ: বিভিন্ন শ্রেণীর জনমিতি সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনের নিরীখে জনগণকে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, ও পরিবার পরিকল্পনা ভিত্তিক স্বাস্থ্যতথ্য প্রদান; (২) স্বাস্থ্য উন্নয়ন- শিশু ও মাতৃমঙ্গাল সেবা (যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকবে শিশুর স্বাভাবিক প্রসব), কৈশোরকালীন সেবা, পুষ্টি ও বইয়োজ্যেষ্ঠভিত্তিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নমূলক সেবা; (৩) সীমিত পর্যায়রোগের চিকিৎসা- নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, গোদরোগ, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, যক্ষা, আমাশয়, চোখ উঠা, কানের প্রদাহ, ত্বকের খোস-পাঁচড়া ও অন্যান্য রোগ, দাঁতের মাড়ির ও নাকের প্রদাহ, সাধারণ জ্বর, বমি, মাথা ব্যথা, পাকিস্থলীতে অ্যাসিডের আধিক্য, কুকুর বা সাপের দংশন, পানিতে ডুবা, গলায়কিছু আটকে যাওয়া, দুর্ঘটনা জনিত সাধারণ জখম ও রক্তপাত এবং হাড় ভাঙার চিকিৎসা, কৃমি, রক্তস্বল্পতা, জটিলতাবিহীন ডায়াবিটিস ও উচ্চ রক্তচাপ এবং দীর্ঘস্থায়ী স্বাসতন্ত্রের রোগ, অস্থিসন্ধির ক্ষয়ও ব্যথা, মানসিক সমস্যা, জননেন্দ্রীয়ের ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগ; (৪) পরিবার পরিকল্পনাভিত্তিক সেবা; (৫) রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণমূলক সেবা: ইপিআই, রোগ পরিবীক্ষণ/ নজরদারী, বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সহ অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণমূলক সেবা ও কার্যক্রম।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উপরে বর্ণিত (২.১) সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবনা এবং নিম্নে বর্ণিত (২.২) বিশদ আকারে প্রদত্ত স্বাস্থ্য সেবা ও সেবা ব্যবস্থাপনা নিয়েদ্বিতীয়পরিচ্ছেদের এই প্রস্তাবনাসমূহ তৈরি হয়েছে, যা নিম্নে বিধৃত হয়েছে তিনটি অংশে: ১) বিদ্যমান প্রেক্ষাপট, ২) স্বাস্থ্য সেবায়বিদ্যমান সমস্যা ও ঝুঁকি, এবং ৩) মূল প্রস্তাবনা ।

সংস্কারের প্রেক্ষাপট

স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশনের স্বাস্থ্যসেবা সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবনা বারোটি মূল লক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত হয়েছে। এগুলো হলো: (১) বর্তমান অবস্থা ও প্রকৃত প্রয়োজন এবং জনসংখ্যা এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত রোগতাত্ত্বিক অবস্থার ভিত্তিতে ভবিষ্যত প্রয়োজন; (২) সুদক্ষ অবকাঠামো ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নির্ধারিত লক্ষ্য নির্ধারণ ও অর্জন, (৩) সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেবা সহজলভ্য তথা জনমুখী করা, (৪) স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে জাতীয়ও আন্তর্জাতিক লক্ষ্য, অগ্রগণ্যতা এবং একমত হওয়া বিষয়াদি, (৫) সাম্য, সামাজিক ন্যায্যতা, মৌলিক অধিকার, চিন্তা ও প্রকাশের স্বাধীনতা, সেবাগ্রহীতাদের বৈচিত্র্য, ন্যায়ও সত্যাশ্রয়ী ক্রিয়াকলাপ, (৬) সম্পদের অধিকার, বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া, পরিবেশ স্বাস্থ্য, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার, রাষ্ট্র প্রদত্ত সাংবিধানিক অধিকার ও অযাচিত নিয়ন্ত্রণমূলক সিদ্ধান্তের সংস্কৃতি, (৭) ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগত উন্নয়ন, যেমন, সম্পদ বরাদ্দ এবং ব্যবহারে দক্ষতা, কাগজহীন তথ্যের ব্যবস্থাপনা, পরিষেবা এবং সেবা প্রক্রিয়ার সময়কমাতে ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার, স্বচ্ছতা, (৮) অংশীদারদের দক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি, ব্যবস্থাপনায়সমন্বয়এবং সহযোগিতা, (৯) সঠিক দৃষ্টিকল্প এবং ভৌত ও ব্যবস্থাপনা কাঠামোর প্রয়োজনীয়পুনর্গঠন, (১০) স্বার্থের সংঘাত (কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট) এড়ানো, (১১) জনগণের স্বাস্থ্যের দায়ীত্ব থাকবে জনগণের হাতে- স্বাস্থ্যসেবা সংগঠনের ক্ষেত্রে এই নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা, এবং (১২) সেবা প্রদানে অনুপাতিকতা অর্থাৎ যার যা এবং যতটুকু প্রয়োজন তা প্রদানের নিশ্চয়তা।

এই সুপারিশমালা প্রস্তুতিতে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন এর সেই বিখ্যাত উক্তি স্মরণে রাখা হয়েছে। যা নিম্নরূপ "যে মানস বা চিন্তাভঙ্গী সমস্যার কারণ সেই মানস বা চিন্তাভঙ্গী দিয়েসমস্যার সমাধান হবে না"।

এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত ও উল্লেখিত প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়িত করা শুধু তখনই সম্ভব হবে যখন নীতিনির্ধারকরা, বিশেষত: অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়দ্বয়সংশ্লিষ্টরা অনুধাবন করবেন যে স্বাস্থ্যসেবার উদ্দেশ্যে ব্যয়কৃত অর্থ একটি সর্বোত্তম বিনিয়োগ এবং জাতীয়উন্নতির প্রথম সোপান।

সংস্কারের উদ্দেশ্য/ দৃষ্টিকল্প

একটি জনকেন্দ্রিক সুস্থতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

সংস্কারের লক্ষ্য

ন্যায়সঙ্গত এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবায়সর্বজনীন প্রবেশাধিকার, অর্থাৎ এমন একটি পরিষেবা যা হবে:

১. ব্যাপক, সময়োপযোগী, নিরাপদ, কার্যকর, দক্ষ, গ্রহণযোগ্য এবং সাশ্রয়ী মূল্যের পরিষেবা;

২. মানুষের জীবনযাত্রার চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ;

৩. সেবাপ্রার্থীদের প্রয়োজন ও পছন্দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং

৪. ব্যক্তিগত, সামাজিক, সামষ্টিক ও জাতীয়কল্যাণমুখী সেবা এবং তার নিশ্চয়তাবিধানের ব্যবস্থাপনা।

সংস্কারের লক্ষ্যে প্রণীত প্রস্তাবনার কৌশল

সামগ্রীকভাবে ছয়টি পরস্পর নির্ভরশীল কৌশলের প্রস্তাব করা হয়েছে:

১. কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে জনগণ ও সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত ও ক্ষমতায়িত করা;

২. বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং সেক্টরের মধ্যে পরিষেবার সমন্বয়সাধন;

৩. শাসন ও জবাবদিহিতা জোরদার করা;

৪. স্বাস্থ্য সাক্ষরতা উন্নত করা এবং সেবাপ্রার্থীদের ক্ষমতায়ন করা;

৫. স্বাস্থ্য সংকট মোকাবেলায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালী করা;

৬. দক্ষ পরিকল্পনা, কার্যকর তত্ত্বাবধান, দক্ষ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে সেবার মান এবং ন্যায্যতার উন্নয়ন;

৭. দক্ষ সেবাপ্রণালী ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা এবং শক্তিশালী করা;

৮. সমানুপাতিক সেবা এবং সমাজের দুর্বল অংশের প্রতি বিশেষ বিবেচনা;

৯. পর্যানুসরণ, নজরদারি, পরিবীক্ষণের মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণ; এবং

১০. সৃজনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, আধুনিক কারিগরি জ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়ার অনুসরণ, পরিকল্পনা, সেবা ও ব্যবস্থাপনা

১১. অর্থের যথেষ্টতা ও যথার্থতা।

১) বিদ্যমান প্রেক্ষাপট

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের একটি বিশাল স্বাস্থ্যকর্মী দলের ব্যবস্থাপনা করে থাকে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে বর্তমানে (২০২৪) নিয়োজিত মোট চিকিৎসক হচ্ছে ৩৪ হাজার ৪৩৫ জন। এর মধ্যে ২৯ হাজার ৭৪৩ জন হচ্ছেন বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের কর্মকর্তা। এ ছাড়া পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে রয়েছে আরো এক হাজার ১২০ জন কর্মকর্তা (কারিগরি) এবং ৬০৩ জন সাধারণ (জেনারেল) ক্যাডারের কর্মকর্তা- যার মধ্যে কর্মরত আছেন ৩৩০ জন। বাংলাদেশের সরকারি স্বাস্থ্য খাতে প্রথম থেকে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত অনুমোদিত পদ দুই লক্ষ ৩৬ হাজার ৮২৮ টি। এর মধ্যে কর্মরত মোট জনবল হচ্ছে এক লক্ষ ৭৩ হাজার ২৬১। মোট ৬৩ হাজার ৫৭১টি পদ শূন্য রয়েছে, যা মোট পদের শতকরা ২৭ ভাগ। কোনও কোনও শ্রেণীর কর্মচারীরের পদের শূন্যতার হার গ্রামীণ এলাকায় ৪০ শতাংশ। পক্ষান্তরে শহর এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য প্রদানের জন্য রয়েছে নাম মাত্র অবকাঠামো।

প্রতিটি বিভাগে একটি করে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার বিভাগীয় পরিচালকের দপ্তর, প্রতিটি জেলা সদরে একটি করে ৬৪টি সিভিল সার্জন ও পরিবার পরিকল্পনার উপপরিচালকের দপ্তর, ৬৩টি জেলায়সদর হাসপাতাল, ৪৩২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ১,৩৬২টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্র ও ৩,২৯১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র, ও ১৩,৯২৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। দুর্গম অঞ্চলে আরও ১,০০০ নতুন কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠিত হলে যার চূড়ান্ত সংখ্যা হবে প্রায় ১৫,০০০। অপরদিকে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের হাতে আছে ২৮৮টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র যার ১৬২টিই রয়েছে ইউনিয়ন পর্যায়ে। এর প্রতিটি ১০ শয্যা বিশিষ্ট (যেগুলোকে এখন ক্রমাগত ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হচ্ছে), যার প্রতিটিতে দুজন চিকিৎসক থাকার কথা। যদিও এসব সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরস্থ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে (জেলা সদরে সদর হাসপাতালে) সেবাগ্রহীতা প্রেরণই এখন এসব প্রতিষ্ঠানের মুখ্য দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের হাতে আরো আছে ঢাকা শহরের চারটি বিশেষায়িত হাসপাতাল । উল্লেখ্য যে এসব হাসপাতালে ,মা ও শিশু কল্যাণ ক্লিনিকে ক্লিনিক্যাল সেবা প্রদানকারীগণ মূলত: চিকিৎসক, যাদের সম্পর্ক সাধারণ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের সাথে ,তাদের দায়ীত্ব পালনের জন্য সহায়ক ও অনুকূল নয়। এছাড়াও নগর এলাকায় অন্যান্য কিছু মন্ত্রণালয়ের ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ, নার্সিং ও প্যারামেডিক ইনস্টিটিউট, প্রাথমিক স্বাস্থ্য প্রদানের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যদি ও এসবের অবস্থান জনগণের বা নগর এলাকার আয়োজনের সমানুপাতিক নয়।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার প্রান্তিক পর্যায়ে আছে ২৬,০০০ স্বাস্থ্য সহকারী, ২৩,৫০০ পরিবার কল্যাণ সহকারী, ১৫,০০০ কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার, ৫,০০০ এর মতো মেডিক্যাল সহকারী, ৫,০০০ এর মতো পরিবার কল্যাণ পরিদর্শীকা, ৫,০০০ মিডওয়াইফ (প্রশিক্ষিত ধাত্রী), ৪,২০০ এর মতো সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক, ৪,৫০০ এর মতো পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক। প্রতি উপজেলা পর্যায়ে আছে ৪/5 জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক, একজন স্যানিটারি পরিদর্শক, একজন উপজেলা সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা

পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (যার পরিবার পরিকল্পনা ভিত্তিক কোনও দায়ীত্ব নাই)। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মোট কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ৫৫,০০০। এতদ্ব্যাতীত স্বাস্থ্য বিভাগের উপজেলা পর্যায়ে আছে একটি করে ৫০ শয্যার অন্ত: বিভাগসহ অন্যান্য সেবার ব্যবস্থা, যেমন, দন্ত চিকিৎসা, রোগ নির্ণয়ের মৌলিক ব্যবস্থা ইত্যাদি। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দশজন ক্লিনিক্যাল কনসালট্যান্ট, দুজন মেডিক্যাল অফিসার ও দুজন করে মেডিক্যাল সহকারী ছাড়া আছেন ২২ জন নার্স। এই জনবল পরিপূর্ণ থাকলেও তা দিয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পর্যায়ে সব রোগের চিকিৎসা, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্ভব নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ মোতাবেক এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা-৩ অর্জনের জন্য প্রতি ১০ হাজার জনগণের জন্য ২০২৫ সালে ৩১.৫ এবং ২০৩০ সালে ৪৪.৫ জন সেবা প্রদানকারী থাকার কথা, অথচ বাংলাদেশের এক তথ্য অনুযায়ী ২০২২ সালে প্রতি ১০ হাজারে কর্মরত ছিলেন ১১.৭০ জন।

চিকিৎসাসেবা বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক, জটিল ও টেকনিকাল। অন্য বিষয়ে অধ্যায়নকারী কারো পক্ষে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া অনুচিত। কিন্তু স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক সিদ্ধান্তসমূহ চূড়ান্ত করেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা। তাই এসব সিদ্ধান্ত অগ্রগণ্যতা ও প্রায়োগিক বিচারের আলোকে অভ্রান্ত হয়না। পক্ষান্তরে, বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবার চেয়ে ব্যবসায়ের প্রতি আকর্ষণ বেশি। দালালের মাধ্যমে রোগীকে বিভ্রান্ত করা, প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত সেবা বিক্রয়, সেবার উচ্চ মূল্য অনেক রোগীকে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত করে। এসব সেবা প্রতিষ্ঠানের তদারকি করা এবং লাইসেন্সের শর্তাবলী প্রতিপালিত হচ্ছে কি না তা দেখার সামর্থ্য লাইসেন্স প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাই। সরকারি হাসপাতালে সেবার মান এবং বেসরকারি হাসপাতালে সেবার মূল্য এবং অপ্রয়োজনীয় সেবা প্রদান নিয়ে প্রচুর সমালোচনা আছে। হাসপাতালের সেবার মান উন্নয়ন করার পৃথিবী-স্বীকৃত পদ্ধতি হলো সেবার মানের পদ্ধতিগত স্বীকৃতি তথা এক্রেডিটেশন। যার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ১. ব্যবস্থাপনা, ২. রোগীকে প্রদত্ত সেবার ফলাফল এবং ৩. আনুষঙ্গিক পরিষেবা সমূহ। তবে এসব থেকে প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করতে কমপক্ষে ৫ বছর সময় লাগে। এক্রেডিটেশন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের মানভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এই প্রশিক্ষকরা প্রমাণ-ভিত্তিক মানদন্ডের মাধ্যমে এবং অনুমোদিত চেকলিস্টের ভিত্তিতে হাসপাতাল এবং ক্লিনিক নিরীক্ষা করেন। নিরীক্ষার স্কোর কার্ড অনলাইনে প্রকাশিত হয়, এবং সংশোধনমূলক কর্ম পরিকল্পনা ও প্রকাশ করা হয়। উন্নতির জন্য বার্ষিক পর্যবেক্ষণ, এবং পর্যবেক্ষিত ফাঁকগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন-ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দের জন্য আলোচনা করা হয়। সমস্ত প্রক্রিয়া অনলাইনে স্বচ্ছতার সাথে প্রকাশিত হয়, যা প্রতিটি সেবার ব্যবস্থাপনাকে উচ্চতর স্কোরের দিকে এগিয়ে নেয়, যা পরিষেবার জন্য গৃহীত ফি-এর সঠিকত্ব প্রমাণ করতে সহায়তা করে। এসব পদ্ধতি প্রতিপালিত না হবার কারণেই বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবার মান, বিশেষত: ক্লিনিক্যাল সেবার মান সন্তোষজনক নয়।

বর্তমান স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা, সহজলভ্যতা, সমানুপাতিকতা ও ন্যায্যতা (সবার প্রতি সমান সন্মান প্রদর্শন) সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। চিকিৎসাসেবা বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক, জটিল ও টেকনিকাল। অন্য বিষয়ে অধ্যায়নকারী কারো পক্ষে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া অনুচিত। কিন্তু স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক সিদ্ধান্তসমূহ চূড়ান্ত করেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা। তাই এসব সিদ্ধান্ত অগ্রগণ্যতা ও প্রায়োগিক বিচারের আলোকে অভ্রান্ত হয়না। অন্য দিকে বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবার চেয়ে ব্যবসায়ের প্রতি আকর্ষণ অনেক বেশি। দালালের মাধ্যমে রোগীকে বিভ্রান্ত করা, প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত সেবা বিক্রয়, সেবার উচ্চ মূল্য অনেক রোগীকে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত করে। এসব সেবা প্রতিষ্ঠানের তদারকি করা এবং লাইসেন্সের শর্তাবলী প্রতিপালিত হচ্ছে কি না তা দেখার সামর্থ্য লাইসেন্স প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাই। প্রশাসনের কর্মকর্তারাও এসবের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথেষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন নন।

বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে তথা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞান সীমিত। যে রোগগুলো বাংলাদেশে অহরহ ঘটে সে সম্পর্কে জ্ঞানের ঘাটতি লক্ষ্যণীয়। যেমন, মা ও শিশুর হাতের পরিচ্ছন্নতার অভাবের কারণে পরিবেশ থেকে ব্যাকটেরিয়া শোষণ এবং সে কারণে আন্ত্রিক সংক্রমণ ও প্রদাহ, যা দীর্ঘায়িত হলে শিশুর অপুষ্টি ঘটে।। প্রায়২০% গর্ভবতী মহিলার ওজন কম, ৫০% এরও বেশি রক্তাল্পতা বা অন্যান্য অনুপুষ্টির ঘাটতিতে ভোগেন। আয়রন, ভিটামিন এ, জিঙ্ক, ফলিক অ্যাসিড এবং ক্যালসিয়ামের মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টি গ্রহণ কাঙ্ক্ষিত গ্রহণের ১০% থেকে ৪০% পর্যন্ত। খাদ্যতালিকা মূলত শর্করা ভিত্তিক এবং খাদ্যে মানসম্পন্ন প্রোটিনের অভাব থাকে। এটি মহিলাদের স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার উপর প্রভাব ফেলে, গর্ভাবস্থায় ওজন কম বৃদ্ধি পায় এবং পরিণামে নবজাতকরা কম ওজন (২৫০০ গ্রামের কম) নিয়েজন্ম এবং অপুষ্টির দিকে পরিচালিত করে। আইসিডিডিআরবি-র তথ্য অনুসারে,

পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের ১১% এরও বেশি তীব্র অপুষ্টিতে ভুগছে। সারা দেশে প্রায়৩,৫০,০০০ শিশু তীব্র অপুষ্টিতে ভুগছে। সুস্থ শিশুদের তুলনায়এই শিশুদের মৃত্যুর ঝুঁকি ১২ গুণ বেশি। এই শিশুদের সনাক্তকরণ এবং তাদের চিকিৎসার জন্য দেশে কোনও সম্প্রদায়-ভিত্তিক কর্মসূচি নেই। বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের ২৪% খর্বকায়। এই শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশ ব্যাহত হয় এবং সুস্থ সমবয়সীদের তুলনায় তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি। গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স ২০২৪ অনুযায়ী, বাংলাদেশে শতকরা ১১.৯ ভাগ শিশু অপুষ্টির শিকার, ২৩.৬ ভাগ খর্বাকৃতি এবং শতকরা তিন ভাগ শিশু জন্মের পাঁচ বছর বয়সের মধ্যেই মারা যাচ্ছে। ২০২৪ সালের এই রিপোর্টতে বাংলাদেশকে একটি মাঝারি মাত্রার ক্ষুধা পীড়িত দেশরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্যের মাত্রা কোন স্তরে আছে (The Global Positioning of Health Status) সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে। গ্লোবাল কোয়ালিটি অফ লাইফ ইনডেক্স ২০২৪ এর জরীপ অনুযায়ী বিশ্বের ৮৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শুধু নাইজেরিয়ার উপরে! অন্যপক্ষে লন্ডনভিত্তিক একটি ইকোনোমিস্ট গ্রুপ কর্তৃক পরিচালিত “ইনক্লুসিভ হেলথ সিস্টেম স্কোর” জরীপের তথ্যমতে পৃথিবীর ৪০ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান সর্বনিম্নে। তিনটি বিষয়ভিত্তিক এই জরীপের একটা ছিলো জনগণকে ক্ষমতায়ন করা।

বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে মূল স্বাস্থ্যগত সমস্যাগুলি বস্তুত: অসংক্রামক রোগভিত্তিক। শতকরা ৬৭ ভাগ মৃত্যু ঘটছে এই রোগগুলো থেকে। এর মধ্যে বিশিষ্ট কয়টি হলো: বার্ধক্যজনিত সমস্যা, স্ট্রোক, প্যারালাইসিস, সেরিব্রাল পলসি, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ক্যানসার, স্থূলতা, মানসিক সমস্যা, শ্বাসতন্ত্রের মেয়াদী রোগ। সড়ক দুর্ঘটনা, শারীরিক প্রতিবন্ধিতা, বিকলাঙ্গতা, পক্ষাঘাত এবং বড় কোনো অস্ত্রোপচারের পর রোগীর স্বাভাবিক জীবনে ফিরা খুবই জটিল। হাড় ও মাংসপেশীর ক্ষয়জনিত রোগ ছাড়া কিছু সংক্রামক রোগ ও বাংলাদেশের জন্য ব্যাপক সমস্যার কারণ। কিছু উল্লেখযোগ্য অসংক্রামক রোগের মধ্যে রয়েছে:

- বয়স-জনিত জটিলতা;
- হৃদরোগ;
- ডায়াবেটিস;
- ক্যান্সার;
- দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রের রোগ;
- স্ট্রোক;
- পক্ষাঘাত;
- স্নায়ুবিকাশজনিত রোগ, যেমন সেরিব্রাল পালসি, বুদ্ধি উদ্যমে (কগ্নিটিভ দক্ষতা) বিলম্ব; বাক ও ভাষার প্রতিবন্ধকতা; অটিজমের মতো সামাজিক যোগাযোগ ব্যাধি; এডিএইচডি; দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা; আচরণগত সমস্যা; ইত্যাদি;
- মানসিক ব্যাধি;
- স্থূলতা।

অন্যান্য প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে প্রতিরোধযোগ্য মাতৃ, নবজাতক এবং শিশু মৃত্যুহার; অপুষ্টি; স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব; সড়ক দুর্ঘটনা; শারীরিক অক্ষমতা এবং অস্ত্রোপচার পরবর্তী পুনর্বাসনের অসুবিধা। মানসিক ও চক্ষুরোগ, ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট ইত্যাদির জন্য যেসব সেবা, উপকরণ ও সেবা প্রদানকারী প্রয়োজন দেশে সেসবের ঘাটতি আছে ।

ক্রয়ও সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষন; ইন্টারনেট ভিত্তিক তথ্য প্রবাহ ও তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ; কর্মসূচি বাস্তবায়নের পর্যানুসরণ, তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন কার্যক্রম সঠিক, সময়োপযোগী, কার্যকরী ও শক্তিশালী নয়। এসব কার্যক্রমে অর্থায়নও অতি অল্প। জনবল ও কর্মসূচীর ব্যবস্থাপনা, বাজেট ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নেতৃত্ব তৈরীর যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয় না। ভালো কাজের পুরস্কার এবং খারাপ কাজের তিরস্কার না থাকার কারণে এবং রাজনৈতিক জবরদস্তির কারণে কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সততার অভাব দেখা গিয়েছে।

অতিরিক্ত ঔষধ ও অন্যান্য সেবার মূল্য দেশে অনেক মানুষকে দরিদ্রতর করে দেয়। স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের জন্য সরকারের বরাদ্দ অত্যন্ত কম। এই উপমহাদেশে শুধু আফগানিস্তান ও মিয়ানমারই স্বাস্থ্য সেবার জন্য এত কম বরাদ্দ দেয়। জনগণকে নিজের পকেট

থেকে ব্যয় করতে হয় স্বাস্থ্যসেবার খরচের বিশাল অংশ। চিকিৎসা সেবার মান নিয়ে দেশের মানুষের মধ্যে অসন্তুষ্টি আছে; বিশেষত: হাসপাতালভিত্তিক সেবা নিয়ে। স্বীয় অর্থায়নে (আউট অফ পকেট) স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের কারণে দারিদ্র্যের মুখে পড়তে হয় দেশের শতকরা ৩.৩৪ টি পরিবারকে (বিআইডিএস ২০২৪)। বিআইডিএস কর্তৃক সম্পাদিত এই জরিপে দেখা যায় শুধু একবার হাসপাতালে ভর্তি হয়ে সেবা নেয়ার প্রেক্ষিতে নিজস্ব খাত থেকে ব্যয় করতে হয় গড়ে ৫৫,১৩৪ টাকা। বাংলাদেশে প্রতি ছয়জনের একজন অর্থের অভাবে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে অপারগ হয় (স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়,গণপ্রজাতন্ত্রি বাংলাদেশ সরকার)।

নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে স্বাস্থ্য সেবাদানকারীদের ভুল চিকিৎসার কারণে বিশ্বে প্রতিবছর ২৬ লাখ মানুষ মারা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর ২.৫ লাখ রোগী মারা যায় স্বাস্থ্যসেবা দানকারীদের ভুল চিকিৎসার কারণে। যার ৭০ শতাংশ মারা যায় ডাক্তার, নার্স, সেবা সাহায্যকারী ও রোগীর মাঝে তথ্যভিত্তিক ভুল বুঝাবুঝির কারণে। অথচ বাংলাদেশে চিকিৎসক ও নার্সদের কাজের নিয়ন্ত্রণ করে দুটি পৃথক অধিদপ্তর, যাদের মধ্যে নাই কোনও সমন্বয়ও পেশাভিত্তিক সম্পর্ক। অন্যদিকে সরকারি চিকিৎসকগণ ব্যক্তিগত সেবায়নিযুক্ত হন, যা স্বাস্থ্যসেবার মানকে দূর্বল করছে এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সেবাগ্রহীতাদের প্রতি সামাজিক প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার এবং সততাকে করছে প্রশ্নবিদ্ধ। আর এ বিষয়ে রয়েছে পরিষ্কার নীতিমালার অভাব।

আমাদের দেশে ডাক্তাররা রোগীদের পর্যাপ্ত সময় দিতে চান না বলে একটা অভিযোগ আছে। ভারত, সিঙ্গাপুর বা থাইল্যান্ডের হাসপাতালের চিকিৎসকরা বেশি ফি নিলেও রোগীকে বেশি সময় দেন। বিদেশীরা বাংলাদেশের মানুষের সাইকোলজি স্টাডি করে। তারা জানে কী করলে বাংলাদেশীরা খুশি হন এবং তারা সেটাই করে। ফলে রোগীরা বিদেশে যান। ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে দেশটিতে চিকিৎসার জন্য যাওয়া বাংলাদেশীর সংখ্যা বেড়েছে ৪৮ শতাংশ। এর মধ্য দিয়ে দেশটিতে চিকিৎসা পর্যটনে আসা মোট বিদেশীর মধ্যে বাংলাদেশীর হার দাঁড়ায় ৭০ শতাংশের কাছাকাছিতে। তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ সালে ভারতে চিকিৎসা নিতে যাওয়া পর্যটকের সংখ্যা ছিল ৪ লাখ ৯৪ হাজার ৭৬৫ জন। এর মধ্যে বাংলাদেশীর সংখ্যা ছিল ২ লাখ ২১ হাজার ৬৯৪ জন, যা ওই বছরের মোট চিকিৎসা পর্যটকের ৪৪ দশমিক ৮ শতাংশ। ২০২২ সালের মধ্যে চিকিৎসা পর্যটকের সংখ্যা কিছুটা কমে নেমে আসে ৪ লাখ ৭৪ হাজার ৬৮১ জনে। ২০২২ সালে এ সংখ্যা ছিল ৩ লাখ ২৭ হাজার ৫৫। চিকিৎসা পর্যটনে আসা মোট বিদেশীর মধ্যে এ হার দাঁড়ায় ৬৯ শতাংশে। আর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে দেশটিতে মোট চিকিৎসাসেবা নিতে যাওয়া পর্যটকের সংখ্যা ছিল কমবেশি ৬ লাখ ৩৫ হাজার। এর মধ্যে বাংলাদেশী চিকিৎসা পর্যটক ছিল ৪ লাখ ৪৯ হাজার ৫৭০ জন, যা দেশটিতে চিকিৎসাসেবা নিতে যাওয়াদের মোট সংখ্যার প্রায় ৭০ দশমিক ৮ শতাংশ। তবে এ চিত্রের আমূল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের পর। ভারতের চিকিৎসা ভিসা চালু করা হলেও তা পাচ্ছে কম সংখ্যক আবেদনকারী। এ অবস্থায় ভারতের পরিবর্তে বিদেশে চিকিৎসা গ্রহণের জন্য থাইল্যান্ড-সিঙ্গাপুরের মতো দেশগুলোকে বেছে নিচ্ছে বাংলাদেশীরা।

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে দুটি পৃথক বিভাগ—স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ এবং চিকিৎসা শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে ভাগ করা হয়। এ বিভাজন ব্যবস্থাপনার উন্নতি করার পরিবর্তে বেশ কিছু সমস্যা তৈরি করেছে। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং তৃতীয়স্তরের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পূর্বের মত বহাল রেখেছে। অপরদিকে, চিকিৎসা শিক্ষা, ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ চিকিৎসা শিক্ষা এবং পরিবার পরিকল্পনার জন্য দায়িত্ব পালন করছে। উল্লেখ্য যে, চিকিৎসা শিক্ষার প্রায় পুরোটাই স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত, যা স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ থেকে নিয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের বিভাজনের ফলে নতুন পদ তৈরি হয়েছে, অথচ কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়নি। দুই বিভাগের মধ্যে দায়িত্ব পুনর্বণ্টনের ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। যা ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়নে দ্বৈততা ও দীর্ঘসূত্রীতার সৃষ্টি করেছে। প্রশাসনিক কাঠামোর দ্বৈততার ফলে সম্পদের অহেতুক অপচয়এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে যুক্তিপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রথম দিকে একজন সচিব, একজন অতিরিক্ত সচিব এবং দুজন যুগ্ম সচিবের পদ ছিলো। খ্রিষ্টাব্দ দুহাজার সালেও ছয়জন যুগ্ম সচিবের পদ ছিলো। তারপর খুব দ্রুত একটির স্থলে ১১টি অতিরিক্ত সচিব পদের সৃষ্টি হয়! আর সমানুপাতিকভাবে বাড়ে অন্যান্য পদ। এরপর ২০১৯ সালে সৃষ্টি হয়স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ। এই বিভাগেও স্বাস্থ্য বিভাগের অনুরূপ

সংখ্যায় পদ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ শুধু অতিরিক্ত সচিবের পদই সৃষ্টি হয় এক মন্ত্রালয়ে ২২টি। যেখানে একজন সচিব, একজন অতিরিক্ত সচিব ও ছয়জন যুগ্ম সচিব কোনও সমস্যা বা দীর্ঘসূত্রিতা ছাড়াই সব ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন সেখানে এখন অনেক ফাইলের হদিস পাওয়া যায় না। এটি সুস্পষ্ট যে, এই বিরাট অবকাঠামো দেশের কোন প্রয়োজনে সৃষ্ট নয়।

বাংলাদেশে নগরায়ন অপরিকল্পিত, খাপছাড়া এবং কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যতিরেকে রাজনৈতিকভাবে নির্ধারিত। দেশের প্রায় ৩১.৬৬ শতাংশ মানুষ শহরাঞ্চলে বাস করে, যেখানে ২০৩০ সালের মধ্যে জনসংখ্যা ৬ কোটি ৫০ লক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শহরে দরিদ্রদের জীবনযাত্রার অবস্থা খুবই করুণ। উদাহরণস্বরূপ, বস্তিতে প্রতি ব্যক্তির থাকার জায়গা ৬৭ বর্গফুট এবং বাকি শহরাঞ্চলে ১৩৫ বর্গফুট. অন্য এক জরীপ মতে নগর অঞ্চলের জনসংখ্যা বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার ৩৭.২ ভাগ। ধারণা করা হচ্ছে ২০৩০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৪ ভাগ হবে। দেশে নগরায়নের হার বর্তমানে শতকরা ৩.২৭ ভাগ।

আরবান হেলথ সার্ভে ২০২১ থেকে জানা যায়যে শহর বা নগর এলাকায় শতকরা শুধু ৬০ ভাগ মানুষ তাদের বাসস্থানের এক কিলোমিটারের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের নাগাল পান। শহর বা নগর এলাকায় যথাক্রমে শতকরা ৫৩.৫ ও ৭৪.৭ ভাগ বস্তিবাসী, ও শহর ও নগর এলাকার অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসকারী গর্ভবতী নারীরা তাঁদের গর্ভকালীন সেবা নিয়েথাকেন, ব্যক্তিখাতের সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে। বলা বাহুল্য এসব সেবা নিখরচায় পাওয়া যায়না। ২০২১ সালের আরবান হেলথ সার্ভে অনুযায়ী বাংলাদেশে নবজাতক, অনূর্ধ্ব এক ও পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের মৃত্যুহার, প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্ম গ্রহনকারীদের আলোকে যথাক্রমে ২৭, ৩৫ ও ৪১। এসডিজি-৩ এর সূচকের আলোকে যা হতে হবে নবজাতকের জন্য ১২ ও অনূর্ধ্ব ৫ বছরের জন্য ২৫। গড়ে সমগ্র বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ও যা লক্ষ্যণীয়ভাবে বেশি। মাতৃমৃত্যু হার ও বর্তমানে প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্ম গ্রহণকারীর আলোকে ১৬৫, যা ২০৩০ এর মধ্যে হতে হবে ৭০। যদিও শিশুপুষ্টির অবস্থা গড়ে অনেকটা আশাব্যঞ্জক, পাঁচ বছর বয়সীদের মধ্যে তা শতকরা ২৩.৬ ভাগ। তবে এরও ব্যত্যয় আছে, যেমন, এর হার ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে যথাক্রমে শতকরা ২৫.৬ ও ৩৫.৯ ভাগ।

পৌর বা নগর এলাকায় কখনোই প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার কোনও অবকাঠামো গড়ে উঠে নাই। তবে ১৯৭৫ সালের পৌরসভা আইন, ১৯৮৩ সাল থেকে প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন সৃষ্টির আইন এবং ২০০৯/২০১০ খ্রিস্টাব্দ সালের স্থানীয় সরকার (পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন) আইন এসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে জনস্বাস্থ্য এবং প্রাথমিক/ মাধ্যমিক স্তরের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের দায়ীত্ব প্রদান করেছে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের এই আইন প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সক্ষমতা নাই।

১৯৯৮ সাল থেকে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিস ডেলিভারি প্রকল্প দেশীয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ১১টি সিটি কর্পোরেশন ও আরও ১৮টি পৌর এলাকায় সেবা দেয়। সেখান থেকে যে উৎসাহ ব্যঞ্জক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে তা কিছুটা নিম্নরূপ: প্রাতিষ্ঠানিক শিশু প্রসবের হার শতকরা ৭২ ভাগ, যা সমগ্র দেশের গড় থেকে অনেক বেশি। শতকরা ৬৯ ভাগ স্বামী স্ত্রী যে কোনও একটি আধুনিক গর্ভনিরোধক ব্যবহার করেন, যা দেশের সামগ্রিক গড় শতকরা ৫৪ ভাগের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। গড়ে অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে টিকা গ্রহণের হার শতকরা ৯১.৩ ভাগ, যার সমগ্র দেশের গড় হলো শতকরা ৮৪ ভাগ। এছাড়াও কৌশোরকালীন বিয়ে ও গর্ভের হারও প্রকল্প এলাকায় উল্লেখ্যযোগ্যভাবে কম।

স্মর্তব্য যে, ২০০৯/২০১০ এর স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা) আইনের বলে সব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান স্বাধীনভাবে তাদের নিজস্ব এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারবে, এজন্য তারা স্থানীয়ভাবে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে এবং প্রয়োজনবোধ করলে সরকার বা সরকার বহির্ভূত কোনও বিশেষজ্ঞকে কো-অপ্ট করতে পারবে। এছাড়াও প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি আছে। যার কার্যকারিতা অবশ্য প্রশ্নসাপেক্ষ। যদিও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিজ নিজ এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমানে অন্যান্য ক্ষেত্র ছাড়াও ব্যক্তিখাতের হাসপাতাল, ফার্মাসি, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, রোগ নির্ণয়কারী

পরীক্ষাগার ইত্যাদি থেকে কর সংগ্রহ এই গুরুদায়িত্ব বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট নয়। এছাড়া নির্ধারিত সেবাসমূহ প্রদানের জন্য এসব প্রতিষ্ঠানের কারিগরি ও নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতা নাই বললেই চলে।

জাতীয় আরবান হেলথ স্ট্রাটেজি ২০২০ শহর/নগর স্বাস্থ্যসেবায় বিভিন্ন অংশীজনের ও অবকাঠামোর ভূমিকা বিধৃত হয়, সেবা ব্যবস্থাপনা উল্লেখিত হয়এবং অর্থায়নের কৌশল প্রস্তাবিত হয়। তবে এই কৌশলপত্র আরও সুস্পষ্ট করণের এবং আইন সিদ্ধ করার প্রয়োজন রয়েছে। এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন যে, উক্ত প্রকল্পে স্থানীয় সরকারের ব্যবস্থাপকদের ভূমিকা নগণ্য ও প্রান্তিক এবং এসব প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য শক্তিশালী করার কখনো কোনও পদক্ষেপ নেয়া হয় নাই। যদিও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যসেবার জন্য সেবাপ্রদানকারী পদায়ন করার কথা, মন্ত্রণালয় সেবাপ্রদানকারীর সংখ্যার স্বল্পতার কারণে এই দায়ীত্ব গ্রহণ করে নাই। এরই আলোকে বর্তমানে যেভাবে আরবান হেলথ প্রকল্পটির অধীন পৌর ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় স্থানীয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হচ্ছে ও সেভাবেই সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম চালু রাখার পক্ষে জনমত আছে। এ লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ে একটি অর্থনৈতিক কোড তৈরি করে অর্থ প্রদান করছে। কিন্তু সরকারের রুলস অফ বিজনেসে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়কে এখনও স্বাস্থ্য সেবার জন্য কোনও দায়িত্ব দেওয়া হয় নাই। এরই মধ্যে আরেকটি কৌশল নিয়েও একটি তৃতীয় ধারা রয়েছে। আর সেটা হলো পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপের মাধ্যমে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে শহর ও নগর এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের দায়িত্ব দেয়া। তবে আর্থিক দায়িত্বের শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ এসব অংশীদার প্রদান করবে। যা প্রকৃতপক্ষে রাজস্ব ব্যয়ের হিসাব মাত্র। ২০১৫ সালে স্থানীয় সরকারসমূহের আয়ত্বাধীন এলাকার স্বাস্থ্যসেবা সমন্বয়ের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ও স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়কে নিয়ে একটি সমন্বয়কমিটি এবং একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ করা হয়েছিল যা কখনোই কার্যকরী হয় নাই।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরস্থ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার পরিচালক কর্তৃক ১৯৯৩ থেকে ২০০২ পর্যন্ত থানা ফাঙ্কশনাল ইমপ্রুভমেন্ট পাইলট প্রজেক্ট নামে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অনুদানে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। বাংলাদেশের ছয়টি জেলায় এবং এর সব উপজেলা ও ইউনিয়নে। প্রকল্পটির বিশেষত্ব ছিলো প্রণিধানযোগ্য। প্রতিটি উপজেলা ও জেলার জন্য নির্ধারিত বাজেটের আলোকে ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলা-ভিত্তিক কর্মকান্ডের পরিকল্পনা গৃহীত হত, যা উপজেলা পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগদ্বয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত একটি পর্ষদ অনুমোদন করলে জেলায় প্রেরিত হত। জেলাতে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগদ্বয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত একটি পর্ষদ সমুদয় উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ের পরিকল্পনা অনুমোদন করলে তা প্রকল্প পরিচালকের কাছে প্রেরিত হতো। প্রকল্প পরিচালকের অনুমোদনের পর প্রকল্পের নামে পরিচালিত ব্যাংক একাউন্ট থেকে বাজেট বরাদ্দ সরাসরি উপজেলা ও জেলায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তাদের যুক্ত একাউন্টে প্রেরণ করা হতো, বিভাগীয় পরিচালকদ্বের কাছে অনুলিপিসহ। সেবার জন্য বাজার দরের চেয়ে কম দামে সেবা প্রদান করা হতো। তবে অতি দরিদ্ররা বিনামূল্যে সেবা পেত। সেবা থেকে সংগৃহীত অর্থের ৩০% সেবাপ্রদানকারীদের দেওয়া হত সম্মানী হিসেবে। এর ফল ছিলো এই যে, প্রকল্পের অন্তর্গত ৫৫টি উপজেলা ও ছয়টি জেলায় কখনও অ্যাম্বুলেন্স নষ্ট হয় নাই, পরীক্ষাগারে কখনও কোনও কিছুর অভাব হয় নাই, এক্সরে মেশিন নষ্ট হয় নাই, এক্সরে করার কোনও উপকরণ শেষ হয় নাই, সেবা প্রদানকারীরা অনুপস্থিত থাকে নাই। রোগীরা অর্থের বিনিময়ে সেবা পেয়েছিলো সন্তুষ্ট। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বপ্রথম উপজেলা ও ইউনিয়নের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে পরিচালিত অটোরিক্সা অ্যাম্বুলেন্স এবং প্রায়োগিক স্থলে ইঞ্জিন নৌকার অ্যাম্বুলেন্স পরীক্ষিত হয়। এছাড়া বৈকালিক ক্লিনিক এবং কমিউনিটি ক্লিনিক সর্বপ্রথম পাইলটিং করা হয়।

সম্প্রতি জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন কর্তৃক বিবিএস-এর মাধ্যমে একটি জরীপ পরিচালনা করে। জরীপ থেকে লব্ধ তথ্যাদির সারাংশ নিম্নরূপ:

- শতকরা ৬১ ভাগ চিকিৎসক ও ব্যবস্থাপক মনে করেন যে, বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের পরিবর্তে স্বতন্ত্র বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সার্ভিস গঠন করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত এবং তাদের নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কাজ সম্পাদনের জন্য আলাদা একটি স্বাস্থ্য সার্ভিস কমিশন গঠন করা প্রয়োজন;

- শতকরা ৯৮ ভাগ চিকিৎসক ও ব্যবস্থাপক মনে করেন যে, স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে স্বাস্থ্য প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তাদের আরো প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রত্যর্পন করা প্রয়োজন;
- শতকরা ৮২ ভাগ চিকিৎসক তাদের কর্ম পরিবেশের উন্নতি ও নিরাপত্তা বিধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন;
- শতকরা ৮২ ভাগ চিকিৎসক ও ব্যবস্থাপক মনে করেন যে, তাদের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হলে স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে;
- শতকরা ৯০ ভাগ চিকিৎসক ও ব্যবস্থাপক মনে করেন যে, তাদের জন্য সময়মত ও নিয়মিত পদোন্নতির ব্যবস্থা করা উচিত;
- শতকরা ৭৮ ভাগ চিকিৎসক ও ব্যবস্থাপক মনে করেন তাদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

পক্ষান্তরে বিবিএস এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন পরিচালিত জরিপলব্ধ তথ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- বিগত এক বছরে যে সমস্ত সেবাপ্রদানকারীর কাছ থেকে সেবা নেওয়া হয়েছে:

  ১) এমবিবিএস ডাক্তার: ৭৮.২%

  ২) ফার্মাসির ঔষধ বিক্রেতা: ৫.৭%

  ৩) কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী: ৪.৮%

  ৪) পল্লী চিকিৎসক: ৪.৭%

  ৫) স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার পরিকল্পনা সহকারী: ১.৯%

  ৬) মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট: ১.৭%

  ৭) এফডব্লিউভি: ১.৬%

  ৮) হোমিওপ্যাথি: ১.১%

  ৯) আয়ুর্বেদী/ ইউনানী: ০.২%

- ঔষধের মূল্য, রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষার মূল্য ও ডাক্তারের পরামর্শ ফী বা অস্ত্রোপচারের ফি নির্দিষ্ট করার পক্ষে মত দিয়েছেন যথাক্রমে ৯৭%, ৯৬%, ৯৬% ও ৯৫% উত্তর দাতা;
- ৯৭% উত্তরদাতা জানিয়েছেন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিনা মূল্যে দেয়া প্রয়োজন;
- শহর অঞ্চলের ওয়ার্ডগুলোতে গ্রামীণ ইউনিয়ন পর্যায়ের মত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার কেন্দ্র তৈরী করার পক্ষে মত দিয়েছেন ৯২% উত্তর দাতা;
- চিকিৎসা, স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম তথা জনস্বাস্থ্য সেবা পৃথক অবকাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া উচিত, এ বিষয়ে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন ৭২% উত্তর দাতা;
- হাসপাতাল, মেডিক্যাল-নার্সিং ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন চেয়েছেন ৬৬% উত্তর দাতা। একই সংখ্যক উত্তর দাতা চান যে স্বাস্থ্যসেবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো প্রশাসনিক ক্যাডারের বাইরে স্বাধীন একটি অবকাঠামো দ্বারা পরিচালিত হোক;
- প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে মত দিয়েছেন ৬৪% উত্তর দাতা;
- শূন্যপদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের পক্ষে মত দিয়েছেন ৭৬% উত্তর দাতা;
- সহায়ক পদে কর্মরতদের বদলির পক্ষে মোট দিয়েছেন ৭৬% উত্তর দাতা;

- ৪৫% ও ৩১% উত্তর দাতা চিকিৎসক কর্তৃক যথাক্রমে ঔষধের জেনেরিক নাম ও জেনেরিক এবং ব্র্যান্ড নামে লিখার পক্ষে মত দিয়েছেন;
- ৬৮% উত্তর দাতা এমবিবিএস ডাক্তার ছাড়া অন্য কারো প্রেসক্রিপশনে এন্টিবায়োটিক বিক্রী না করার পক্ষে মত দিয়েছেন;
- ৭২% উত্তর দাতা চান একজন ডাক্তার এক জন রোগীকে কম পক্ষে ১০ মিনিট থেকে ২০ মিনিট সময়দিবেন। যার বেশির ভাগ চেয়েছেন ২০ মিনিট (২৮(%৫.;
- এক মাত্র জরুরী কারণ ছাড়া রেফারেল না হলে কোন বিশেষজ্ঞ সেবা দেয়া যাবে না- এ বিষয়ে একমত ৭২% উত্তর দাতা;
- জরুরী সেবার জন্য সপ্তাহের সাতদিনই সার্বক্ষণিকভাবে সরকারিভাবে অ্যাম্বুলেন্স সেবার ব্যবস্থা থাকতে হবে, এ বিষয়ে ৯৯% উত্তর প্রদানকারী একমত;
- স্বাস্থ্যসেবা ব্যয়ের বেশির ভাগের দায়িত্ব থাকা উচিত সরকারের-এই মত ৯২% উত্তর প্রদানকারীর;
- স্বাস্থ্যহানিকর খাদ্য, পানীয়ও ভোগ্যপণ্যের উপর উচ্চহারে কর প্রয়োগ করা উচিত- এই বিষয়ে একমত ৭৯% উত্তরদাতা;
- স্বাস্থ্যবীমা গ্রহণে আগ্রহী ৭১% উত্তরদাতা;
- দেশের সব মানুষের জন্য স্বাস্থ্যকার্ড প্রচলনের পক্ষে মত দিয়েছেন ৯৩% উত্তরদাতা;
- স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিচালিত একই ধরনের সেবাক্রম একীভূত করা উচিত বলে মনে করেন ৬৭% উত্তরদাতা।

২) স্বাস্থ্যসেবায় বিদ্যমান সমস্যা ও ঝুঁকি

চাহিদা মোতাবেক উৎপাদনে অক্ষমতা, প্রয়োজনীয় নীতিমালার অভাব এবং উপকরণের সীমাবদ্ধতার কারণে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা-৩ অর্জন করা কঠিন। তদুপরি, কর্মীদের বিতরণেও বৈষম্য রয়েছে, যেখানে শহরে এলাকায় প্রতি ১৫০০ জনে একজন চিকিৎসক সেবা দেন সেখানে গ্রামীণ এলাকায় এই অনুপাত ১৫ হাজারে একজন। অনুমোদিত পদের বিপরীতে সাধারণ এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ঘাটতি যথাক্রমে ২৫ শতাংশ এবং ৫৮ শতাংশ। এসব ঘটছে নিয়োগ প্রক্রিয়ার জটিলতা, স্বচ্ছতার অভাব, পদায়ন ও পদোন্নতিতে স্থবিরতার ফলে। যে কারণে বিদ্যমান কর্মীদের উপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, সেবার মান কমে যাচ্ছে, এবং গ্রামীণ জনগণ সন্তুষ্টজনকভাবে কাঙ্খিত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সেবার মান ও পরিমাণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সেবা ব্যবস্থাপনার অতীতে অবলোকিত দুর্বল দিকগুলো হলো: অবকাঠামোগত দ্বৈততা; ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা; উপকরণের অভাব; ঔষধের, সেবার ও উপকরণের অহেতুক উচ্চ মূল্য; ভুল সিদ্ধান্ত তথা অগ্রগণ্যতা ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের অভাব; সেবা প্রদানকারীদের সময়ও সেবাকাজে পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগের অভাব; প্রশংসনীয় সেবার জন্য পুরস্কারের এবং অসন্তোষ উদ্রেককারী সেবা প্রদানের জন্য শাস্তি প্রদানের সংস্কৃতির অনুপস্থিতি; স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সময়মত বদলি, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না করা; উচ্চশিক্ষিত জনস্বাস্থ্যবিদদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোনও সুবিধা না দেয়া; জনগণের মধ্যে তথ্য প্রচারে দুর্বলতা; সেবা প্রদানকারীদের পরিপূর্ণ দলের অভাব; উচ্চপরিমাণে পদ শূন্যতা; স্বাস্থ্য প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা; সেবা কাজে সুচারু পদ্ধতি অনুসরণের অভাব; রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষাগারের দুর্বলতা; আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব, নেতৃত্ব ও পরিচালনায় দক্ষতার অভাব এবং দক্ষ সেবা প্রদানকারীর স্বল্পতা; কর্মসূচি পরিচালনায় অর্থের অভাব; সংরক্ষণ ও মেরামতে বিলম্বসূত্রীতা; ক্রয়ও সংগ্রহ কাজে অপরাধ প্রবণতা; স্বাস্থ্যসেবা কাজে দালালের ও ঔষধ কোম্পানিগুলির প্রতিনিধিদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ইত্যাদি।

শহর এলাকার স্বাস্থ্য সমস্যা গ্রামীণ এলাকা থেকে কিছুটা ভিন্ন । হৃদরোগ, হাঁপানি, ক্যান্সার এবং ডায়াবেটিসের মতো রোগগুলি আরও জটিল হয়অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং কর্মপরিবেশ, অপর্যাপ্ত সবুজ স্থান, শব্দ, পানি এবং মাটি দূষণ, শহরে তাপ দ্বীপপুঞ্জ, এবং হাঁটা, সাইকেল চালানো এবং সক্রিয় জীবনযাপনের জন্য জায়গার অভাবের কারণে। উন্নত পরিবহন এবং হাঁটা/সাইকেল চালানোর অবকাঠামোর অভাব শহরগুলিতে স্থূলতা এবং শারীরিক নিষ্ক্রিয়তার সঙ্গে যুক্ত। নগরায়ন হতাশা, উদ্বেগ এবং মানসিক

অসুস্থতার উচ্চ হারের সাথেও যুক্ত। কোভিড-১৯ এর মতো যক্ষ্মা, ডেঙ্গু এবং ডায়রিয়া এসব দরিদ্র জনাকীর্ণ পরিবেশে বৃদ্ধি পায়এবং এসব রোগ অস্বাস্থ্যকর আবাসন এবং দুর্বল স্যানিটেশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। দুর্বল নগর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা জিকা এবং ইবোলা ভাইরাসের মতো রোগের সংক্রমণকে বৃদ্ধি করে। শহরগুলি বিশ্বের ৬০% এরও বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের জন্য দায়ী। নগর অঞ্চলে বৃহৎ এলাকা জুড়ে কংক্রিট বিস্তৃতির কারণে তাপ দ্বীপ সৃষ্টি হয়; এর প্রভাবে এবং সবুজ আচ্ছাদনের অভাবের কারণে শহরগুলির অভ্যন্তরে আশেপাশের গ্রামীণ এলাকার তুলনায় ৩-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি তাপমাত্রা অনুভূত হয়। শহর অঞ্চলে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর চলাচলের ব্যবস্থা; সহিংসতা ও আঘাত প্রতিরোধ; স্বাস্থ্যকর খাদ্য, খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং খাদ্যাভ্যাস; ভেক্টর-বাহিত রোগের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা; নগরে দুর্যোগের জন্য জরুরি প্রস্তুতি এবং ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ। শিশু, বয়স্ক এবং আশ-পাশ থেকে দৈনিক ভাবে শহরে আসা অভিবাসীদের মতো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং চাহিদা মোকাবেলা করাও একটি অগ্রাধিকার। নগর স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পদক্ষেপ অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের জন্য সুবিধাজনক হতে পারে।

স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনায় অংশীদারদের দুর্বল সম্পৃক্ততা উদ্বেগের বিষয়। ব্যবস্থাপনা এবং নেতৃত্বের দুর্বলতাও স্বাস্থ্য খাতের অদক্ষতায় অবদান রাখে। মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, চক্ষু চিকিৎসা, নিবিড় পরিচর্যা ইউনিট (আইসিইউ) বিষয়ে প্রশিক্ষিত পেশাদারদের অভাব রয়েছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা দুর্বল, যার ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন অকার্যকর হয়েপড়ে। তাছাড়া, এই কার্যক্রমের জন্য তহবিল ন্যূনতম। কর্মী ব্যবস্থাপনা, বাজেট এবং কৌশলগত পরিকল্পনায়নেতৃত্বের বিকাশ অপর্যাপ্ত। দুর্বল কর্মক্ষমতার জন্য জবাবদিহিতার অভাব রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের সাথে মিলিত হয়ে, ঐতিহাসিকভাবে কর্মসূচী বাস্তবায়নকে অদক্ষতার দিকে পরিচালিত করছে। উপরন্তু, দুর্বল নীতি ও কৌশলের জন্য এবং অভিজ্ঞতার অভাব স্বাস্থ্যসেবা প্রশাসনে অব্যবস্থাপনার জন্ম দিচ্ছে।

বিবিএস-এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন পরিচালিত জরীপ মতে স্বাস্থ্যখাত এবং এর ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াগুলিকে যে চ্যালেঞ্জগুলি ক্লিষ্ট করে, সেগুলি হল:

১. নিম্নমানের পরিষেবা এবং অসফল মান উন্নয়ন প্রক্রিয়া;

২. পরিষেবা প্রদানকারীর অপর্যাপ্ত সংখ্যা;

৩. স্বাস্থ্যসেবা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের মানের স্বীকৃতি অভাব;

৪. রোগীর নিরাপত্তা এবং পরিষেবা প্রদানকারীর সুরক্ষার জন্য আইনের অভাব;

৫. অপর্যাপ্ত পরিষেবা এবং ব্যবস্থাপনা প্রোটোকল, এবং স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি;

৬. তত্ত্বাবধান, পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা এবং মূল্যায়নের অভাব;

৭. রোগীর প্রতিক্রিয়া এবং অভিযোগ পাঠাবার ব্যবস্থার অভাব;

৮. পরিষেবা প্রদানের অস্বচ্ছ আউটসোর্সিং পদ্ধতি;

৯. বিভিন্ন অধিদপ্তরের মধ্যে দূর্বল সমন্বয়;

১০. জেলা এবং নিম্নস্তরে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা পরিষেবার দ্বৈততা;

১১. একাধিক মন্ত্রণালয়এবং বিভাগ (যেমন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয়সরকার প্রতিষ্ঠান, পুলিশ, রেলওয়ে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, শ্রম মন্ত্রণালয়) দ্বারা সমন্বয়হীনভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান যা সম্পদের আর্থিক অদক্ষতার কারণ;

১২. ব্যবস্থাপক এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ;

১৩. অকার্যকরী রেফারেল ব্যবস্থা;

১৪. অদক্ষ লাইসেন্সিং, নবায়ন এবং স্বীকৃতি ব্যবস্থা;

১৫. ঔষধ, ডায়াগনস্টিক পরিষেবা, হাসপাতালে ভর্তির মূল্য নির্ধারণ এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাব;

১৬. জনস্বাস্থ্য সেবার গুরুত্ব এবং উপযোগিতার প্রতি উদাসীনতা;

১৭. জরুরি সেবা প্রদানে অব্যবস্থাপনা;

১৮. দূরবর্তী এলাকায়দুর্বল সেবা প্রদান এবং দক্ষ টেলিমেডিসিন পরিষেবার অভাব;

১৯. অনুপযুক্ত দক্ষতার মিশ্রণ এবং ইনপুট মিশ্রণ;

২০. অকার্যকর অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা;

২১. অপর্যাপ্ত ওষুধ, মেশিন, সরঞ্জাম, সরবরাহ এবং প্রযুক্তি;

২২. দুর্বল রোগ নির্ণয়ের উপকরণ ও দক্ষতা;

২৩. ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ; হৃদরোগ, ফুসফুস, কিডনি এবং লিভারের জটিলতা; স্ট্রোক; পক্ষাঘাত, জন্মগত রোগ, থ্যালাসেমিয়া ইত্যাদি জটিল রোগের চিকিৎসার অপ্রতুলতা;

২৪. বার্ধক্যজনিত চিকিৎসা, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা, চোখের রোগ, পুনর্বাসন এবং রোগের যন্ত্রণা উপশমকারী চিকিৎসার অভাব;

২৫. বেসরকারি খাতের স্বাস্থ্যসেবার নিয়ন্ত্রক কাঠামো এবং নিয়ন্ত্রণের অভাব;

২৬. সরকারি চিকিৎসকগণ ব্যক্তিগত সেবায় নিযুক্ত হন, এ বিষয়ে পরিষ্কার নীতির অভাব।

এছাড়া স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় যেসব সমস্যা বা ঝুঁকি মোকাবিলা করতে হবে সেগুলি হলো:

১. স্বাস্থ্যসেবার জন্য মানব সম্পদের অপ্রতুলতা, এর অকার্যকর বণ্টন এবং অদক্ষ ব্যবহার;

২. অসংক্রামক রোগ, বার্ধক্যজনিত সমস্যা, গর্ভাবস্থাজনিত প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যু এবং পুষ্টির অভাবে স্বাস্থ্যের অগ্রহণযোগ্য ফলাফল;

৩. স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার জন্য পকেট থেকে ব্যয়ের কারণে দরিদ্রকে হতদরিদ্র হওয়া;

৪. স্বাস্থ্যসেবার মান অসন্তোষজনক, এটা মনে করে সম্পন্ন মানুষকে দেশের বাইরে চিকিৎসা নিতে উৎসাহিত হওয়া;

৫. চিকিৎসার মান নিম্নমুখী, তদুপরি যার পরিমাণ বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাহিদা অনুসারে পরিকল্পিত নয়;

৬. স্বাস্থ্য পরিকাঠামো দক্ষ নয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নয়; এর বন্টন ন্যায়সঙ্গত এবং লিঙ্গ সংবেদনশীল নয়;

৭. প্রশাসনের নীতি স্তরে এবং বিভাগীয়স্তরে বিভাজন সৃষ্টির ফলে অবকাঠামোর দ্বৈত ব্যবহার, সম্পদের অদক্ষ এবং অকার্যকর ব্যবহার;

৮. বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা অনিয়ন্ত্রিত, যার ফলে দরিদ্রদের উপর প্রতিকূল অর্থনৈতিক প্রভাব;

৯. দেশের শহরাঞ্চল, জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে পারে না, কারণ শহরাঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের অবকাঠামোর অভাব;

১০. দুর্গম এলাকায় সেবা প্রদানকারীদের লক্ষ্যণীয় অনুপস্থিতি বা শূন্যতা;

১১. ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্বের দুর্বলতা;

১৩. সেবার দ্বৈততার কারণে বাজেট ও আর্থিক অপচয়;

১৪. অনভিজ্ঞতার কারণে সৃষ্ট অদক্ষতা;

১৫. স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনার নীতি ও কৌশল পর্যায়েদুর্বলতা;

১৬. প্রতিরোধযোগ্য মাতৃ, নবজাতক ও শিশু মৃত্যু, অপুষ্টি, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় অংশীজনদের সম্পৃক্ত না করা সেবা ও ব্যবস্থাপনার দূর্বল দিক।

৩) মূল প্রস্তাবনা

ক) জনস্বাস্থ্য সেবাভিত্তিক সংস্কার প্রস্তাবনা

১) মৌলিক তথ্যের অসম্পূর্ণতা দূরীকরণের জন্য প্রস্তাবনা

১. তথ্য, তথ্য সংগ্রহ , তথ্য ব্যবহার পদ্ধতি এবং ব্যবহার: (১). জনসংখ্যাতাত্ত্বিক, জনমিতিক, শারীরিক এবং ক্লিনিকাল বৈশিষ্ট্য অনুসারে পরিবারের সদস্যদের অন্যান্য পরিচয়পত্র সহ, যেমন, জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্মসনদ বা অন্য কোনও একক সংখ্যক পরিচয়সহ, অনলাইন নিবন্ধনের জন্য মাঠকর্মীদের বাড়ি পরিদর্শন করতে হবে; (২). সকল স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে পরিষেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতার সাপ্তাহিক মূল্যায়ন করতে হবে, (৩). প্রতি দশ বছরে একবার করে উপজেলা-ওয়ারি রোগতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা করে জনগণের স্বাস্থ্য (যথা পূর্ববর্তী বছরে জন্ম, বয়স ও লিঙ্গ ভিত্তিক মৃত্যু- মৃত্যুর কারণ এবং ওই সময়ের জনমিতি জনিত অবস্থা, যেমন, গর্ভকালে, বা শিশু প্রসব কালে, শিশু প্রসবের অব্যাহত পরে, বৃদ্ধ বয়সে), বিয়ের বয়স, প্রথম গর্ভের বয়স ও পুষ্টির অবস্থা); রোগ ও জটিলতা সহ সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের ধরন; রোগের লক্ষণ এবং কারণ সম্পর্কে জনগণের জ্ঞান; রোগীদের ব্যক্তিগত আচরণ, অভ্যাস ও বৈশিষ্ট্য; পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, (৪). ব্যবস্থাপনা এবং পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তথ্যের ব্যবহার এবং তথ্যের ব্যবহারে সহায়তা করার জন্য সময়োপযোগী কার্যক্রম নির্ধারণ করতে হবে, (৫). সেবার মান ও পরিমাণ মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ সেবার সূচক (কি পারফরমেন্স ইন্ডিকেটর) ব্যবহার করতে হবে।

২) স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, ও পুষ্টি সম্পর্কিত পরিষেবা এবং যোগাযোগ কার্যক্রমের দুর্বলতা দূরীকরণের জন্য প্রস্তাবনা

১. গ্রামীণ পর্যায়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি: (১). মাতৃত্ব, শৈশবকালীন ও কৈশোরকালীন পুষ্টি এবং বিকাশ, বয়স্কদের স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য, রোগের সংক্রমণ ও অসংক্রামক রোগের কারণ, রোগীর অধিকার, পরিবেশগত বিষয়, এবং যানবাহন ও নির্মাণ কাজ থেকে শব্দ দূষণের ক্ষতি সম্পর্কে সম্ভাব্য সকল পর্যায়ে জনগণের মধ্যে কার্যকরী ও সৃজনশীল পন্থায় সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে, (২). জুলাই আন্দোলনে আহতদের স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ, সব ধরনের হাসপাতালে তাদের জন্য বিনা মূল্যে প্রয়োজনীয় সেবা এবং পোস্ট ট্রমাটিক ডিসঅর্ডার-এর জন্য বিশেষ সেবার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে, (৩). পরিত্যক্ত শিশুদের জন্য প্রতিটি মা এবং নবজাতক/শিশু বিভাগে দুধ-ব্যাংক স্থাপন করতে হবে, (৪). স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচিতে নতুন দৃষ্টান্ত বাস্তবায়ন, যেমন, স্বাস্থ্য যোগাযোগ প্রদানের সময় একজন ব্যক্তির সামগ্রিকতা, অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক/ধর্মীয়এবং সামাজিক স্বাস্থ্য বিবেচনা করতে হবে, (৫). মাতৃত্ব, কৈশোরকালীন ও শৈশবকালীন সেবা ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত সচেতনতামূলক কার্যক্রমকে অগ্রগণ্যতা দিতে হবে, (৬). মৎস্য আইন ১৯৫০, ১৯৮৫ ও ২০০০ অনুযায়ী মাছের পোনা ধরা শাস্তিযোগ্য অপরাধ (এমনকি ব্রিটিশ ভারতের Indian Fisheries Act 1897 অনুযায়ীও এটি নিষিদ্ধ ছিল)। পুষ্টির নিশ্চয়তার জন্য এসব আইনের কার্যকরী প্রয়োগ করতে হবে এবং পোনা ধরা থেকে বিরত থাকার জন্য এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পুষ্টির জন্য কার্যকরী জন অবহিতি কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে, (৭). আইসিডিডিআর,বি - র এক জরিপ অনুযায়ী গত এক দশকে ফাস্ট-ফুড খাওয়ার হার বেড়েছে দ্বিগুণ, আর কমেছে ডাল, ছোট মাছ ও সবুজ পাতার সবজি ভক্ষণের হার, (৮). বিদ্যালয়ে, গ্রামে-গঞ্জে, রাস্তার ধারের ছোট টংঘরগুলিতে ও এখন দেদারসে বিক্রি হয় কার্বনেটেড পানীয়এবং প্যাকেটকৃত চিপস, যাতে আছে অতিরিক্ত লবণ, চিনি ও ট্রান্সফ্যাট, (৯). বিদ্যালয়ে অনুপুষ্টি আছে এরকম শাক- সবজি ও ফলদ গাছের বাগান করতে হবে এবং স্কুলের মধ্য-দিবসের খাবারে এই শাক- সবজি দিতে হবে, (১০). বিশ্বস্বাস্থ্য দিবসে অথবা প্রতি ছয়মাসে একবার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পুষ্টিমেলার আয়োজন করবে, যা সিভিল সার্জন উদ্বোধন করবেন এবং যেখানে উপজেলা ও ইউনিয়ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিরা অতিথি হয়ে আসবেন, (১১), মেলায় স্থানীয় চাষীরা তাঁদের উৎপাদিত তালিকাভুক্ত পন্যাদি- মিষ্টি আলু, বরই, বেল, আম, কাঁঠাল, দেশী কমলা, তরমুজ, পেয়ারা, পেঁপে, লেবু, বাতাবি লেবু, আনারস, জাম, কলা ইত্যাদি, ডিম, দুধ, ছোট মাছ ও মুরগি এবং দেশে উৎপাদিত মৌসুমী শাক-সবজি প্রদর্শন ও বিক্রী করবেন, বাজারের চেয়েকিছু কম মূল্যে, (১২). মেলায়এসব

ফল-ফলাদি এবং শাক-সবজির পুষ্টিগুণ মানুষকে জানাতে হবে, এসব খাওয়ার উপর জোর দিয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং বিক্রেতারা যাতে এসব খাবার বাজারে এনে চাহিদা বাড়ান এবং চাহিদা পূরণ করেন তাতে উৎসাহ দিতে হবে, (১৩). মেলায় কোন ফাস্ট ফুড, কোমল পানীয়, প্যাকেট করা বা টিনজাত খাবার থাকবে না এবং এসব খাদ্য এবং কড়া ভাজা খাবারের ক্ষতি সম্পর্কে ও আলোচনা করতে হবে, (১৪). বসতবাড়ীর আশে পাশের পতিত জায়গা থাকলে সেখানে হাঁস-মুরগীর চাষ এবং শাকসবজি ও পুষ্টিকর ফলদ গাছের চাষ করার জন্য কার্যকরীভাবে উৎসাহ দিতে হবে এবং এ কাজে পশুপালন ও মৎস এবং কৃষি বিভাগের সাথে উৎসাহীদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে হবে;

২. সম্প্রদায় পর্যায়ে এবং সম্প্রদায়ের সহায়তায় পরিচালিত সেবা কার্যক্রম: (১). সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধভিত্তিক এবং মাতৃত্ব ও পুষ্টি সম্পর্কিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা, (২). শৈশবকালীন শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ এবং পুষ্টির জন্য এনজিওর সহযোগিতায় স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্যকর যোগাযোগের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক কৌশল গ্রহণ, (৩). প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব (বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে), (৪). পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয়গুলি হবে, যেমন: কৈশোরকালীন বিয়ে বা গর্ভধারণের ক্ষতি, কিশোরীদের ঋতু এবং কিশোর-কিশোরীদের যৌনরোগ সম্পর্কে জ্ঞান-উন্মেষের জন্য তথ্য, সিজারিয়ান অপারেশন হ্রাস; বৃদ্ধ, শিশু এবং লিঙ্গ সহিংসতা প্রতিরোধ; বার্ধক্যজনিত যত্ন; গর্ভাবস্থায় অনুপুষ্টি পরিপূরক; বুকের দুধ খাওয়ানো; অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার; ফাস্টফুড, টিনজাত এবং প্যাকেজজাত খাবার প্রতিরোধ; অসংক্রামক রোগের কারণ নিয়ন্ত্রণ; মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং আত্মহত্যা প্রতিরোধ; বাল্যবিবাহ এবং গর্ভাবস্থা প্রতিরোধ; তামাক, চিনি, লবণ এবং ট্রান্স-ফ্যাট প্রতিরোধ; পুষ্টিকর খাবার; ক্ষতিকারক বিজ্ঞাপন প্রতিরোধ; কোমল পানীয়ের ক্ষতি প্রতিরোধ; স্বাস্থ্যকর জীবনধারা; খাওয়ার আগে, মলাগার ত্যাগের পর বা সংক্রমিত দ্রব্য স্পর্শ করার পর সঠিকভাবে হাত ধোয়া, সংক্রমিত হাতে টিউবওয়েল স্পর্শ না করা ইত্যাদি, (৫). ধাত্রীসেবা, স্ক্যানু (SCANU), প্রত্যাশিত শারীরিক এবং ওজন বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মাতৃ, নবজাতক, শিশু এবং শিশু স্বাস্থ্যের এবং পুষ্টির উপর জোর প্রদান, (৬). শুধুমাত্র নির্দিষ্ট পরিষেবার জন্য বাড়ি পরিদর্শন পরিচালনা করা, যেমন বার্ধক্যজনিত রোগী, চিকিৎসা থেকে বাদ পড়া রোগী, প্রসবোত্তর যত্ন থেকে বাদ পড়া নারী, টিকা থেকে বাদ পড়া শিশু, মানসিক রোগী, উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ নবজাতক, (৭). (ক). শিশুদের বিকাশগত বিলম্ব ও উদ্বেগ, কর্মসম্পাদনে সীমাবদ্ধতা, ও বিশেষ চাহিদা থাকতে পারে, যেমন, প্রতিবন্ধীত্ব; তাই তাদের জন্য সর্বজনীন ও সমন্বিত সেবাদান ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং স্বগৃহে স্ক্রীনিং সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে এই সেবার শুরু হবে, (খ). শিশুদের কর্মক্ষমতার সীমাবদ্ধতা স্ক্রিনিংয়ের জন্য মাতা-পিতা বা প্রাথমিক সেবা প্রদানকারীদের জন্য সহজে ব্যবহারযোগ্য প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে, (গ). স্ক্রিনিংয়েকোন শিশু পজিটিভ হলে নিকটস্থ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্রের সহায়তা নিতে হবে, (ঘ). মোবাইল ফোনের মাধ্যমে শিশু- কিশোরদের বিকাশ সম্পর্কে মাতা-পিতাকে জ্ঞান ও তথ্য প্রদান এবং সার্বিক ধারণা প্রদান করতে হবে ও সচেতনতা তৈরী করতে হবে, (৮). প্রাথমিক পরিচর্যায় নিয়োজিত সকল স্বাস্থ্যকর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে, (৯). বর্জ্য দ্বারা দূষণ সহ পরিবেশগত বিষয়গুলি সম্পর্কে জনস্বাস্থ্যভিত্তিক প্রচারণা পরিচালনা করতে হবে, বিশেষত প্লাস্টিক বোতলজাত পানীয়ের ক্ষতি সম্পর্কে জন অবহিতকরণ করতে হবে;

৩. জাতীয় পর্যায়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় ও অন্যান্য কার্যক্রম: (১). দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য পরিষেবা প্রদানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে; (২). বর্তমান প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল এবং মডিউলগুলির চাহিদা মূল্যায়ন এবং পর্যালোচনার পর বর্তমান ম্যানুয়াল এবং মডিউলগুলিকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংক্ষিপ্ত করে এবং শুধু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে নতুন ম্যানুয়াল বা মডিউল তৈরি করে কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, (৩). সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, মিডিয়া, শিক্ষা, ক্রীড়া এবং অন্যান্য নেটওয়ার্কগুলির সঙ্গে জন অবহিতকরণের ক্ষেত্রে সমন্বিত কার্য সম্পাদন করতে হবে, (৪). সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, মৎস্য, পশুপালন বিভাগের সাথে আন্তঃক্ষেত্রীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করতে হবে, (৫). খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চয়তার জন্য নিয়মিতভাবে এবং মাঝে মাঝে প্রচার প্রচারণাকৃত খাদ্যের গুণাগুণ পরীক্ষা করতে হবে, (৬). যেহেতু ইতঃপূর্বে স্বাস্থ্য বিভাগের স্যানিটারি পরিদর্শকরা দেশব্যাপী নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তার জন্য কাজ করতেন এবং যেহেতু তাঁদের এই বিষয়েশিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা আছে তাই নতুন করে কোনও অবকাঠামো তৈরি না করে পূর্বের মত তাঁদের মাধ্যমেই নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে এবং এই দায়িত্ব জাতীয়ভাবে প্রস্তাবিত

জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে দিতে হবে। উল্লেখ্য যে খাদ্যের গুণাগুণ পরীক্ষা বর্তমানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরস্থ জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের একটি ঐতিহ্যবাহী কাজ।

৩) রোগ প্রতিরোধ, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, সীমিত প্রতিকার এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ক্রিয়াশীল করার জন্য প্রস্তাবনা

১. প্রাথমিক স্তরের কার্যক্রম: (১). পরিষেবার মান বজায় রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে, (২). গুরুত্বপূর্ণ মাতৃ-শিশু পরিষেবাগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যেমন শিশুদের স্নায়বিক এবং শারীরিক বিকাশের ফলো-আপ, নবজাতকের জীবন রক্ষায় প্রয়োজনীয় সেবা সমষ্টি, জাতীয় সুস্থ শিশু দিবস উদযাপন, (৩). টিকা এবং ওষুধ সংগ্রহের পূর্বে এসবের কার্যকারিতা পরীক্ষা এবং সংগ্রহে দক্ষতা অর্জন করতে হবে, (৪). সব পর্যায়ে জরুরী ও অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে, (৫). স্নায়বিক গড়ন- ভিত্তিক (নিউরোডেভেলপমেন্টাল) তথ্য সন্নিবিষ্ট করার লক্ষ্যে AI সফটওয়্যার ভিত্তিক প্রশ্নাবলী ব্যবহারের জন্য প্রতিটি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং ঝুঁকিতে থাকা গর্ভবতী মহিলাদের সহায়তা করতে হবে, (৬). ই পি আই কার্ড প্রদর্শনের ভিত্তিতে স্কুলে শিশুদের ভর্তি করতে হবে, (৭). বিদ্যালয় সম্পর্কিত এবং বিদ্যালয়ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবাকে শক্তিশালী করতে হবে, যেমন, শারীরিক এবং স্নায়বিক গড়ন বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ এবং ও শারীরিক বৃদ্ধি মনিটরিং, (৮). বিদ্যালয়ে মধ্য দিবস খাবার দেয়া নিয়মিত ও সর্বজনীন করতে হবে এবং দৃষ্টান্ত হিসেবে স্বল্পমূল্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে, যে দায়ীত্ব যুক্তভাবে নিতে হবে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে, (৯). শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কর্মক্ষেত্রে, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়স্থলে, পরিবহন অপেক্ষা কেন্দ্রে এবং জনসাধারণের সমাগম আছে এমন সকল স্থানে ভেন্ডিং মেশিন বা অন্য সুলভ উপায়েমাসিক স্বাস্থ্য পণ্যের ব্যবস্থা রাখতে হবে, (১০). লিঙ্গ-ভিত্তিক পরিষেবাগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যেমন, সর্বাধিক প্রান্তিক পর্যায়ের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে জরুরি গর্ভনিরোধক বড়ি প্রাপ্তি, গর্ভাবস্থা পরীক্ষা ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে, (১১). ইউনিয়ন স্বাস্থ্য অবকাঠামো এবং বর্তমানের পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরস্থ মাতৃত্ব ও শিশুসেবা অবকাঠামোকে একত্রিত করে ইউনিয়ন পর্যায়ের সেবা অবকাঠামোকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং এখান থেকে প্রথম স্তরের জরুরি প্রসূতি সেবা প্রদান করতে হবে, (১২). ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবা প্রদানের জন্য ইউনিয়ন স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রগুলিকে শক্তিশালী করতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ অনুযায়ী এসডিজি-৩ অর্জন করতে হলে প্রতি ১০,০০০ জনগণের জন্য ৪.৪৫ জন সেনা প্রদানকারী প্রয়োজন। যার দক্ষতা মিশ্রণ হতে হবে একজন চিকিৎসক, তিনজন নার্স এবং পাঁচজন প্যারামেডিক। সে হিসেবে বাংলাদেশের প্রতি ইউনিয়নে প্রয়োজন ১৩৩ জন সেবাপ্রদানকারী; যার অনুপাত হবে ১৫ জন চিকিৎসক, ৪৪ জন নার্স এবং মিডওয়াইফ এবং ৭৪ জন প্যারামেডিক। এই মুহূর্তে এত সেবাপ্রদানকারী নিয়োগে যে অর্থের প্রয়োজন তা দেশের জন্য সহজসাধ্য নয়। কিন্তু বর্তমান আর্থিক সামর্থ্যের আলোকে অন্তত: দুজন এমবিবিএস চিকিৎসক, একজন মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, দুজন নার্স ও একজন মিডওয়াইফ, একজন মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট, একজন বি অথবা সি গ্রেডের ফার্মাসিস্ট, একজন সহকারী ও একজন দারোয়ান নিয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবা প্রদানের জন্য একটি কার্যকরী দল তৈরি করা একটি অতি আবশ্যকীয় পদক্ষেপ। উল্লেখ করতে হবে যে, এই প্রয়োজনীয় দলকে সেবাস্থলে সর্বক্ষণ রাখতে হলে তাদের জন্য প্রাপ্যতা অনুযায়ী উৎসাহ উদ্রেককারী এবং সম্মানজনক বাসস্থান নিশ্চিত করতে হবে, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও পরিচালন ব্যয়ের জন্য অর্থায়ন করতে হবে; যার মধ্যে থাকবে সংস্করণ, মেরামত, তত্ত্বাবধান, পর্যানুসরণ ও জনগণকে সম্পৃক্তকরণের জন্য অর্থের সংস্থান, (১৩) ইউনিয়ন পর্যায় থেকে একজন চিকিৎসক সপ্তাহে দুদিন কমিউনিটি ক্লিনিকে গিয়ে অপেক্ষমান রোগীর তালিকায় থাকা রোগীদের সেবা দিবেন এবং কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবাপ্রদানকারী সিএইচসিপি, স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার পরিকল্পনা সহকারীদের তত্ত্বাবধান ও পর্যানুসরণ করবেন এবং প্রয়োজনে তাদের ওরিয়েন্টেশন এবং ছোটখাটো প্রশিক্ষণ দিবেন, (১৪). সমস্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে ছেলে এবং মেয়েদের জন্য টয়লেট সুবিধা এবং মেয়েদের জন্য স্যানিটারি প্যাড প্রাপ্তি, এবং ব্যক্তিগত মর্যাদা এবং গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে, (১৫). বিদ্যমান সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (বিশেষত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে) পরিচ্ছন্নতা ও উন্নত পানি ও পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে, বিশেষত: নারী ও কিশোরীদের জন্য, (১৬). দূর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে প্রয়োজনীয়ঔষধের পর্যাপ্ত মজুদ এবং স্যানিটারি প্যাড থাকতে হবে, (১৭). স্বাস্থ্যসেবার সকল স্তরে যোগ্যতা অনুযায়ী ক্লিনিকাল, শারীরিক এবং মনোসামাজিক সেবা প্রদানের সক্ষমতা থাকতে হবে, (১৮). স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের মধ্যে সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিরোধ করতে হবে, (১৯). গর্ভাবস্থার অস্বাভাবিক উপস্থাপনা, গর্ভাবস্থা এবং নবজাতকের বিপদজনক লক্ষণ, ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিসের

জটিলতা নির্ণয়, সাধারণ মানসিক রোগ নির্ণয়, দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণ সমস্যা নির্ণয়, অপুষ্টি নির্ণয়, সাধারণ স্থানীয় রোগ নির্ণয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রান্তিক স্বাস্থ্যকর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে, (২০). দুর্গম এলাকায় পরিষেবাগুলিকে কৌশলগতভাবে অগ্রাধিকার দিতে হবে, (২১). প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবার জন্য সহযোগিতা এবং সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে, যেমন স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা এবং সম্প্রদায়-ভিত্তিক সংগঠন, সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী এবং ক্ষমতাবানদের সহায়তা গ্রহণ করতে হবে, (২২). উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আবাসিক মেডিক্যাল অফিসারের নেতৃত্বে যৌন নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের পরীক্ষা পরিচালনা করতে হবে এবং দু'জন মহিলা মেডিকেল অফিসারকে এসব মেডিকেল কেস পরীক্ষার প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে, (২৩). প্রান্তিক পর্যায়ের কর্মীদের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের পরিষেবা প্রদান করতে হবে, (২৪). শিশুদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির আলোকে তাদের বিষয়ে প্রাথমিক হস্তক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রান্তিক পর্যায়ের কর্মীদের মাধ্যমে পিতামাতাদের নির্দেশিকা প্রদান করতে হবে, (২৫). সন্তানের কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা এবং প্রতিবন্ধকতার জন্য সাহায্য চাওয়া পিতামাতাদের প্রাথমিক সেবা প্রদানকারী কর্তৃক মনোসামাজিক পরামর্শ প্রদান করতে হবে, (২৬). ইপিআই আউটরীচ সাইট এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিকসমূহ একত্রিত করে একই ধরনের সেবা দিতে হবে এবং কমিউনিটি ক্লিনিক এবং আউটপোস্টের সংখ্যা হবে জনসংখ্যা ও যাতায়াতের সুবিধার আলোকে, (২৭). কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী স্বল্পমূল্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ বিক্রীর সুযোগ থাকবে; এর পাশাপাশি এগুলোতে ওভার দ্যা কাউন্টার ঔষধ বিক্রীর ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে জরুরী অবস্থায়ঔষধ প্রাপ্তিতে বিলম্ব না ঘটে, (২৮). উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরীক্ষাগারকে শক্তিশালী করতে হবে যাতে রোগীদের জন্য নিত্যনৈমত্তিক যেসব পরীক্ষা প্রয়োজন তার সব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাওয়া যায়।

<u>২. জেলা পর্যায়ের কার্যক্রম :</u> (১) সকল ধরনের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, পুলিশ, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, মহাবিদ্যালয়ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, সিভিল ডিফেন্স ও রেড ক্রিসেন্ট কর্মী, শিল্প-শ্রমিকদের নেতা, অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার, গণপরিবহন (বাস, ট্রাক, লঞ্চ, নৌকা, ট্রেন, বিমান, জাহাজ) কর্মীদের প্রাথমিক চিকিৎসা এবং মৌলিক জীবন রক্ষাকারী পদ্ধতির উপর (সিপিআর, অবরুদ্ধ গলনালী, শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা ইত্যাদি) প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিতে হবে; স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, ডোপ এবং মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং কর্মীদের শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতার জন্য কর্মঘণ্টা নির্ধারণ করতে হবে, (২). শ্রমঘন এলাকায় শ্রমিকদের জন্য একনিষ্ঠ হাসপাতাল তৈরী করতে হবে, সেবাগ্রহণকারীদের উক্ত হাসপাতালে নিবন্ধন করতে হবে, এই হাসপাতাল থেকে শ্রম পেশার কারণে উদ্ভুত সমস্যার ও রোগের প্রয়োজনীয় সব ধরনের সেবা দিতে হবে (সেবার এক চতুর্থাংশ মূল্য সেবা গ্রহণকারী, অর্ধেক প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং বাকি মূল্য সরকার বহন করবে), (৩). মিল-ফ্যাক্টরিতে রোগ এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার নিশ্চয়তা দিতে হবে। কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে কর্মীদের কোনও শারীরিক বা মানসিক সমস্যা হলে তার চিকিৎসার ভার কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে, (৪). শিল্প বা নিকটবর্তী এলাকায় শ্রমিকদের জন্য থাকতে হবে নিবেদিত হাসপাতাল অথবা সরকারী হাসপাতাল থাকলে, সেখানে থাকতে হবে শ্রমিকদের জন্য শ্রম ও শ্রমিক সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কিত সেবা প্রদানের জন্য আলাদা বিভাগ, বৈকালিক সেবার ব্যবস্থা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, (৫). দেশের সব প্রতিষ্ঠানে, যেখানে নারীরা কাজ করেন সেখানে ব্যবস্থা থাকতে হবে, (৬). শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র এবং কারাগারে মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে, (৭). পুলিশ বিভাগে কর্মরতদের এবং গণপরিবহনের ড্রাইভারদের প্রতি বছর শারীরিক (দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি সহ) এবং মানসিক অবস্থা যাচাই করতে হবে এবং প্রয়োজনে যথাবিহিত ব্যবস্থা নিতে হবে, (৮). অন্যান্য পেশার কর্মী, যেমন, কৃষক, চা বাগানের শ্রমিক এবং মৎসজীবী, ইত্যাদির কার্যক্ষেত্রে তাঁদের শারীরিক এবং জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে, (৯). কার্যক্ষেত্রে কর্মীরা কোনও দুর্ঘটনায় পতিত হলে দুর্ঘটনার কারণ, ক্ষতির পরিমাণ, চিকিৎসার ব্যবস্থা, ফলাফল, এবং প্রয়োজনে তাঁদের পুনর্বাসনে কি ব্যবস্থা নেয়া হলো এসব নথিভূক্ত হতে হবে, (১০). এসব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রস্তাবিত জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরে একটি আলাদা দপ্তর থাকতে হবে। নিরাপদ হাসপাতালের জন্য এসব দায়িত্ব থাকবে হাসপাতাল সেবার মান-উন্নয়ন পর্ষদের কাছে;

<u>৩. জাতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম :</u> জাতীয় পর্যায়ে যেসব সমস্যা বা রোগের জন্য অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মসূচি ও কার্যক্রম নির্ধারণ করা হবে, সেগুলো হলো: ১. শৈশবকালীন শারীরিক ও মানসিক বিকাশ; স্থানীয় রোগ; প্রশিক্ষণ; সম্পদ ও সমন্বয়ের বর্তমান ঘাটতি পর্যালোচনা ও সমাধান; গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ; অবহেলিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগের নিয়ন্ত্রণ; অসংক্রামক রোগ; রোগের

নজরদারি; ২. উদ্ভাবনী কার্যক্রম: স্কুল স্বাস্থ্য কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাবা-মা ও বয়স্কদের স্কুলে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য একটি প্রকল্প তৈরি করতে হবে এবং স্কুলে কিছু মা-বাবার জন্য নাস্তার ব্যবস্থা করতে হবে। খাবার খাওয়ার আগে শিক্ষার্থীরা সাবান দিয়ে বাবা-মায়ের হাত ধুয়ে নিবে। খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য একটি বাজেট লাইন তৈরি করতে হবে; ৩. আপৎকালীন সেবার জন্য থাকতে হবে উপযুক্ত কার্যক্রম ও পরিষেবা এবং জাতীয় বাফার তহবিল; ৪. এখন পর্যন্ত অগ্রাধিকারহীন আইন ও কৌশলগুলোর বাস্তবায়নের জন্য কৌশলপত্র তৈরি করতে হবে, যেমন: জাতীয় আত্মহত্যা প্রতিরোধ ও অন্যান্য মানসিক স্বাস্থ্যভিত্তিক কৌশল, মানসিক স্বাস্থ্য আইন ২০১৮, জাতীয় মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাটেজি ২০২১, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা) আইন ২০০৯/২০১০, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুলস ২০২১, বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট কনজার্ভেশন আইন ১৯৯৫, এনভায়রনমেন্ট কোর্ট আইন ২০১০, দ্য মেডিক্যাল ওয়েস্ট (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড প্রসেসিং) রুলস অফ বাংলাদেশ ২০০৮ তথা চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি এবং শিল্প বর্জ্য ও বর্জ্য নিষ্কাশন আইন, মহামারী প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও বিধি ২০০৮ ইত্যাদি; ৫. (ক) আইডিসিআরকে সম্পূর্ণরূপে রোগ নজরদারি ও রোগের প্রাদুর্ভাব সতর্কতা প্রদানকারী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে; (খ) আইডিসিআর সারাদেশে উপজেলা পর্যন্ত রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষাগারের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করবে; (গ) তবে আইডিসিআর পরিচালিত বর্তমান প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোকে নিপসমে হস্তান্তর করতে হবে; ৬. আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক চুক্তি বাস্তবায়নে গুরুত্ব দিতে হবে; ৭. বার্ধক্য ও পুনর্বাসন পরিষেবাগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে এবং তাদের 'স্ব-স্বাস্থ্য মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন' প্রদানে সহায়তা করার জন্য সম্প্রদায় স্তরের কর্মীদের সক্ষম করতে হবে; ৮. প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগে লিঙ্গভিত্তিক স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি পালনে সকল শ্রেণীর ও পর্যায়ের স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠানকে সক্ষম করে তুলতে হবে এবং প্রয়োজনে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের নকশা পুনর্গঠন করতে হবে; ৯. স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক নিরাপদ খাদ্য কার্যক্রম জোরদার করতে হবে, যেমন: জাঙ্ক খাবার, ভেজাল খাবার, ক্ষতিকারক সংরক্ষণকারী পদার্থের জরিপ এবং দ্য পিওর ফুড অর্ডিন্যান্স ১৯৫৯, পিওর ফুড অ্যাক্ট ১৯৬৬, দ্য ফুড সেফটি অ্যাক্ট ২০১৩ আইন অনুযায়ী বিশুদ্ধ খাদ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। উল্লেখ্য যে ২০১৩ সালের আইনটি বিশুদ্ধ ও নিরাপদ খাদ্যের দায়িত্বে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে নিয়ে তা খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে দেয়া হয়েছে, যা এই মন্ত্রণালয়ের কার্যবিধির সংশ্লিষ্ট নয় এবং ব্রিটিশ আমল থেকেই এই দায়িত্ব স্বাস্থ্য বিভাগ বাস্তবায়ন করছিল মন্ত্রণালয়ের অধীন স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের মাধ্যমে; ১০. কিডনি, লিভার, পাকস্থলী ও শরীরে নিসৃত হরমোনের প্রচন্ড ক্ষতি করে এই জন্য খাদ্যে ভেজাল কঠোরভাবে প্রতিহত করতে হবে এবং ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, যার মধ্যে থাকবে রোগীর চিকিৎসার ব্যয়বহন; ১১. স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে এমন কারণগুলোর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশগত কারণগুলো নিয়ে গবেষণা করতে হবে, যেমন: পানিতে অ্যান্টিবায়োটিক ও স্বাস্থ্যের উপর এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব, উপকূলীয় অঞ্চলে উচ্চ রক্তচাপ, একলাম্পসিয়া ও বন্ধ্যাত্ব, মাছ, হাঁস-মুরগি ও গো-খাদ্যের বিশুদ্ধতা ও স্বাস্থ্যের উপর এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব; ১২. মানুষের মধ্যে জেন্ডার-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি, দরিদ্র-বান্ধব স্বাস্থ্য ও সমাজসেবা, শিশু ও মাতৃমঙ্গল, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক সেবাকে জনগণের কাছে নিয়ে যেতে হবে; ১৩. পুষ্টিকর শস্য ও খাদ্য উৎপাদন, অস্বাস্থ্যকর ও ক্ষতিকর খাবার ও পানীয় প্রতিরোধ, কীট-পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজের জন্য কৃষি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, শিক্ষা, শিল্প, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ, সমাজকল্যাণ বিভাগ, শিশু ও মহিলা বিষয়ক বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতার আবহ সৃষ্টি করতে হবে; ১৪. কৃতজ্ঞতার স্মারকস্বরূপ বয়স্ক ভাতা চালু রাখতে হবে এবং দেশের উন্নয়নের নিশ্চয়তা ও একটি উৎপাদনশীল জাতি গঠনের লক্ষ্যে গর্ভবতী নারী ও বস্তির অপুষ্ট শিশু-কিশোরদের জন্য অবিলম্বে পুষ্টিভাতা চালু করতে হবে। ১৫.তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। অপরাধীদের নিরুৎসাহিত করার জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৩ এবং বিধি, ২০১৫ লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে জরিমানা বৃদ্ধি করতে হবে এবং তামাক বিরোধী এনজিওসমূহকে সহায়তা প্রদান করতে হবে। ১৬. স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে সম্পৃক্ত, তথা হাসপাতাল পরিচালনাকারী অন্যান্য সরকারি খাতের সঙ্গে স্বাস্থ্য খাতের সমন্বয় ও সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে অন্যান্য খাতের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতালের একটি অংশ থেকেও নগর এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা সম্ভব হয়। এ জন্য ব্যক্তিখাতের হাসপাতালগুলোর সহযোগিতা নিতে হবে এবং যেসব ওয়ার্ডে কোনো হাসপাতাল বা ক্লিনিক নেই, সেখানে নতুন ভৌত অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। ১৭. মাঠপর্যায়ের কর্মীদের জন্য একটি সমন্বিত ও মডুলার ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্স প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। ১৮. (ক) তামাকবিরোধী প্রচারণা আরও জোরদার করতে হবে এবং ২০০৫, ২০১৩ ও ২০১৫ সালের আইন ও বিধিতে উল্লিখিত অনুচ্ছেদগুলোর বিষয়ে জনগণকে অবহিত করতে হবে, যাতে তারা আইন

বাস্তবায়নের জন্য সক্রিয় সমর্থন প্রদান করে। প্রস্তাবিত জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে এ বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। (খ) ২০০5 ও ২০১৩ সালে অনুমোদিত আইন এবং ২০15 সালের অনুমোদিত বিধিমালায় কিছু অপূর্ণতা রয়েছে বিধায়, ২০২৪ সালে প্রণীত খসড়া *Smoking and Tobacco Products Usage (Control) (Amendment) Ordinance* অনতিবিলম্বে আইনে পরিণত করতে হবে। (গ) জনসেবায় সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা কোনো প্রকার ধূমপান, নিষিদ্ধ বস্তু ব্যবহার বা নেশা উদ্রেককারী দ্রব্য গ্রহণ করতে পারবেন না। (ঘ) কোনো স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান বা সরকারি প্রতিষ্ঠান—যেমন: পুলিশ বিভাগ, প্রতিরক্ষা বিভাগ, মিল-কারখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা আশপাশের এলাকায় ধূমপান বা তামাক চর্বণ না হয়—তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে। (ঙ) সন্দেহজনক কর্মচারী, শিক্ষার্থী, বিট পুলিশ, ফ্যাক্টরি কর্মচারী ও চাকরিতে প্রবেশরত ব্যক্তিদের ডোপ এবং নিকোটিন পরীক্ষা করতে হবে। (চ) বর্তমান তামাকবিরোধী আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো ভুক্তভোগী সাহায্য চাইলে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে যথাযথভাবে সাহায্য প্রদান করতে হবে।

৪) সঠিক কাঠামো অনুযায়ী পর্যানুসরণ, তত্ত্বাবধায়ন, কর্মসূচির মূল্যায়ন ও শিক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে তথ্যের ব্যবহার

১. তত্ত্বাবধান, পর্যানুসরণ (মেনিটরিং), মূল্যায়ন ও শিক্ষণ কার্যক্রম : (১). তত্ত্বাবধায়ন, পর্যানুসরণ ও মেন্টরিং কার্যক্রমকে সেবার মানোন্নয়ের জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান ব্যবস্থাপনার একটি অগ্রগণ্য কাজ হবে, (২) সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান ও পর্যানুসরণ। এজন্য তত্ত্বাবধায়নকারী এবং যাঁদের তত্ত্বাবধায়ন করা হবে তাঁদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, সহায়ক উপকরণ ও অর্থায়ন করতে হবে, (৩). কর্মসূচির পর্যানুসরণ ও মূল্যায়ন হতে হবে নির্মোহ এবং সঠিক। এজন্য প্রত্যেক কর্মসূচির জন্য একটি পর্যানুসরণ ও মূল্যায়ন এবং শেখার কাঠামো (ফ্রেম) তৈরী করতে হবে এবং লক্ষ্য এবং লক্ষ্য অর্জনের মূল্যায়নের জন্য সম্পদ ও উপকরণ (ইনপুট), প্রক্রিয়া, ফলাফল, তাৎক্ষণিক এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাব নিরূপণের জন্য একটি পর্যবেক্ষণ কাঠামো তৈরি করতে হবে এবং তা ব্যবহার করতে হবে সঠিকভাবে, তৃতীয়কোনো পক্ষের মাধ্যমে, (৪). স্বাস্থ্য সমস্যা লব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবার ধরন, পরিমাণ, বিভিন্ন কার্যক্রম - উপকরণ এবং সরঞ্জাম ক্রয়-সংগ্রহ, রক্ষনা-বেক্ষন, তত্ত্বাবধায়ন, পর্যানুসরণ, দক্ষতা-মিশ্রিত জনবলের জন্য বেতন-ভাতাদি ইত্যাদি কার্যক্রমের জন্য অর্থের প্রয়োজন এবং সে অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, (৫). সাম্প্রতিকতম তথ্যের ভিত্তিতে সেবা, প্রশাসন, বাজেট এবং পরিকল্পনার সংস্কৃতি তৈরি করতে হবে, (৬). নিয়মিত-ভিত্তিতে তথ্য ও সেবাভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং তথ্য ও সংবাদকর্মীদের সাথে সহযোগিতা মূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, যাতে করে তাঁদের সাহায্যে সেবা কাজের মান ও পরিমাণকে এগিয়েনিয়েযাওয়া যায়, অর্থাৎ স্বাস্থ্যসেবাকে সর্বজনীন করা যায়;

৩. হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক ও ইউনানি চিকিৎসা কার্যক্রম : জাতীয় পর্যায়ে গবেষণার ভিত্তিতে হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক ও ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতির প্রভাব এবং ফলাফল মূল্যায়ন এবং প্রমাণ-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি করতে হবে;

৪.তথ্য-ভিত্তিক কর্মসূচি ও কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ও সহায়তা সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ কার্যক্রম: (১). ডিএইচআইএস-২ বা এর বিকল্প সফটওয়্যারে সেবাপ্রদানকারীদের অনুপস্থিতির তথ্য, প্রশংসনীয় কাজ বা অপরাধের তথ্য, বিভিন্ন পদের দায়ীত্বসমূহ/ কাজের বিবরণ, এসবের জন্য উপযুক্ততা (শিক্ষার স্তর বা নাম, চাকুরীর মেয়াদ) এবং দায়ীত্ব পালনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইন, সহায়ক উপকরণ/ কাজের সরঞ্জাম, আর্থিক সংশ্লেষ উল্লেখ করতে হবে, (২). প্রত্যাশিত ফলাফল প্রদর্শন করে নাই বা ক্ষতি করেছে এমন কর্মসূচিগুলি পর্যালোচনা করতে হবে, যেমন মাতৃত্বকালীন ভাউচার, যা অনৈতিক সিজারিয়ানের হার অনেক বৃদ্ধি করেছে। এসব সেবার অপব্যবহার এবং নৈতিক ঝুঁকির কারনে এ ধরনের কর্মসূচিগুলি কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করে, ফলাফল সন্তোষজনক না হলে বন্ধ করে দিতে হবে।

৫) সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করে স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা এবং সেবা ব্যবস্থা কার্যক্রমে গণ জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তাবনা

১. উপজেলা-ভিত্তিক পরিষেবাগ্রহীতার আকার এবং প্রকারের মানচিত্র তৈরি : *(১).* প্রতি দশ বছর পর পর যে জরিপের প্রস্তাব করা হয়েছে সেটা থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে উপজেলা-ওয়ারী জনমিতির প্রকৃতি অনুযায়ী সম্ভাব্য স্বাস্থ্যসেবা গ্রহীতাদের সংখ্যাভিত্তিক মানচিত্র তৈরী করতে হবে, (২). এই মানচিত্র পরে এমআইএস এর অন্তর্ভুক্ত হবে, (৩). সম্প্রদায়কে নিয়ে সম্প্রদায়ভিত্তিক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

গ্রহণ করে এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পরে তার মূল্যায়নের জন্য পূর্বাহ্নেই সংশ্লিষ্ট সূচকসমূহ নির্ধারণ করে নিতে হবে এবং এর ভিত্তিতে গণ জবাবদিহিতার ব্যবস্থা ও করতে হবে;

২. সম্প্রদায়-নেতৃত্বাধীন কর্মসূচি বাস্তবায়নের পর্যালোচনা এবং তাতে সহযোগিতা প্রদান : (১). নারী-কেন্দ্রিক সেবা, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ এবং দরিদ্রদের প্রতি সেবাকে অগ্রগণ্যতা দিতে হবে এবং এজন্য প্রতিটি হাসপাতালে অগ্রগণ্য দায়িত্ব হিসেবে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, যেমন, ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার থাকতে হবে, (২). পুষ্টি, দুর্যোগ এবং মানসিক স্বাস্থ্য রোগীদের জন্য বহু-ক্ষেত্রীয় সহযোগিতা এবং যত্নশীলদের ফোরাম তৈরি করতে হবে, (৩). মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত কলঙ্ক এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে, (৪). সম্প্রদায়-ভিত্তিক কার্যক্রমে নারীর প্রতিনিধিত্ব জোরদার করতে হবে, যেমন, মহিলাদের মধ্য থেকে অগ্রাধিকারমূলকভাবে কমিউনিটি গ্রুপের চেয়ারপারসন নির্বাচন করতে হবে এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় তাদের মধ্যে থেকে নারী কর্মীদের নিয়োগে অগ্রাধিকার দিতে হবে, (৫). উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের বিদ্যমান কমিটিগুলিকে সক্রিয় এবং গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলে জনস্বাস্থ্য ও হাসপাতাল পরিষেবা পরিচালনার জন্য সম্প্রদায়-ভিত্তিক কমিটি করতে হবে বা সক্রিয় করতে হবে এবং এ জন্য আর্থিক সংশ্লেষ নিশ্চিত করতে হবে, (৬). স্বাস্থ্যসেবা একটি বহুমাত্রিক অংশীজনভিত্তিক ব্যবস্থা বিধায় এ জন্য একটি সর্বজনীন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে ও বাস্তবায়নের জন্য এতে স্থানীয় জনগণ ও অন্যান্য সেক্টর ও সেবাপ্রদানকারীদের সম্পৃক্ত করতে হবে, (৭). প্রতি বছর একবার জনপ্রতিনিধিদের নেতৃত্বে এবং প্রস্তাবিত জনস্বাস্থ্য বিভাগের সাচিবিক সহায়তায় উপজেলা, জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে জন অবহিতি এবং গণ জবাবদিহিতার মেলার আয়োজন করতে হবে, (৮). অপরাধ সংগঠন সমাজের অপরাধ প্রবণতারই একটি বহিঃপ্রকাশ। তবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বা অবকাঠামোতে অপরাধ একটি সমাজ ও দেশের জন্য সর্বাধিক ক্ষতিকর। তাই নিকট অতীত এবং চলমান সময়ে সংগঠিত সব অপরাধের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে এমনভাবে যথাবিহিত শাস্তির বিধান করতে হবে যাতে একের দোষে ওপর একজন বা একজনের কারণে অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যে সিদ্ধান্ত সামষ্টিক জনগোষ্ঠীর জন্য ক্ষতিকর বলে প্রতীয়মান হতে পারে তা জনগণের মতামত ব্যতিরেকে গ্রহণ একটি গর্হিত অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হতে হবে।

৬) জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী, দক্ষ ও যুগোপযোগী করার জন্য ব্যবস্থাপনার অবকাঠামো এবং কার্যধারা ও প্রণালীকে পুনর্গঠন ও বিকেন্দ্রী করার প্রস্তাবনা

১. সেবা ব্যবস্থাপনার অবকাঠামো শক্তিশালীকরণে গৃহীতব্য কার্যাবলী : (১). (ক) জাতীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ (ন্যাশনাল হেলথ অথরিটি) প্রতিষ্ঠা এবং এর কাঠামো এবং কার্যাবলী অনুমোদন এবং এতে পরিবার পরিকল্পনা এবং নার্সিং বিভাগের অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে, (খ) স্বাস্থ্য সেবার জন্য জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রধান (চিফ) সচিবকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সকল সেবা ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালকবৃন্দদের নিয়ে একটি পরিচালনা পরিষদ গঠন করার সুপারিশ করা হলো (বিশদ সুশাসন অংশে দেখুন), (২). জনগণের চাহিদার আলোকে জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর গঠন করতে হবে, যার সংশ্লিষ্ট পরিচালকবৃন্দ হবেন: পরিচালক, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, আইইডিসিআর, আইপিএইচ, এবং আইপিএইচএন; লাইন পরিচালক: এমএনসিএএইচ, সিডিসি, এনসিডিসি, এনএনএস; উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (UzHC), কমিউনিটি-ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা (CBHC), কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট (এ জন্য ২০১৮ সালের ট্রাস্ট আইনটি একটি অর্ডিনেন্সের মাধ্যমে বাতিল করতে হবে), টিবি-কুষ্ঠ, এইডস-এসটিডি নিয়ন্ত্রণ; স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরস্থ আইইসি (দুটি প্রতিষ্ঠানই গণ যোগাযোগের কাজ করে- একটি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি আরেকটি পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রচার করে), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরস্থ পরিচালক এমসিএইচ; এবং লাইন পরিচালক এমসিআরএএইচ এবং এফপিএফএসডি, এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, (৩). বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরস্থ টেকনিকাল ক্যাডারের কর্মকর্তারা স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে একাত্ম হতে চান যা যুক্তিযুক্ত। কারণ তাঁরা যে সেবা দেন সেটা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বর্তমান কাজেরই দ্বৈতরূপ। তাদের সেবাগ্রহণকারীদের রেফারেল সেবা নিতে হয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সেবা প্রতিষ্ঠান থেকেই। দ্বৈততা পরিহার ব্যাপকভাবে অর্থের সাশ্রয় ঘটাবে। আবার পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ প্রদত্ত সেবার সূচক ও ২০১১ সাল থেকেই আর উন্নয়নের মুখ দেখছে না, বরং কিছুটা কমেছে, যেমন, গর্ভবনিরোধক এবং মাতৃদুগ্ধ প্রদানের হার। এমতাবস্থায় অধিদপ্তরস্থ টেকনিকাল ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রস্তাবিত জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরে একীভূত করার জন্য সুপারিশ করা হলো। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরস্থ সাধারণ ক্যাডারে যে ৩৩০ জন কর্মরত আছেন তাঁদের (ক) প্রশাসনিক ক্যাডারে আত্মীকৃত করা যেতে পারে, অথবা (খ) তাঁদের বর্তমান পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর এই পদগুলো

বিলুপ্ত করা যায়। পরিবার পরিকল্পনার অন্যান্য কর্মচারীদের প্রস্তাবিত জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে একীভূত করলে কর্মসূচির দ্বৈততা পরিহার হবে যা কর্মসূচিকে আরও সাশ্রয়ী, লক্ষ্যভেদী ও বেগবান করবে খুব সহজে; কারণ, তারা মূলত প্রাথমিক স্বাস্থ্য স্তরে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার পরিবার পরিকল্পনা অংশেরই কাজ করে, (৪). নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর প্রশাসনিক ক্যাডারের কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। যে কারণে হাসপাতালে কাজ করলেও হাসপাতালে সেবাপ্রদানকারী অন্যান্য কর্মচারীদের কাছে নার্সদের কোন জবাবদিহিতা আছে বলে প্রতিভাত হয় না। হাসপাতাল সেবাব্যবস্থাপনা শুধু একারণেই খন্ডিত হয়ে গেছে; ফলে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনও সম্মিলিত ও সমন্বিত প্রচেষ্টা নাই। যার ফলে হাসপাতালের সেবার মান রোগীদের জন্য সম্মানজনকতো নয়ই, সন্তোষজনক বা সাফল্যমন্ডিত ও নয়। এই চালচিত্রের আলোকে উভয় পক্ষ সম্মত হলে, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা স্তরে মিডওয়াইফারি পরিষেবাকে প্রস্তাবিত জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরে এবং ক্লিনিক্যাল তথা হাসপাতাল সেবা প্রদানকারী নার্সিং ও মিডওয়াইফ পরিষেবা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোকে ক্লিনিক্যাল তথা হাসপাতাল অবকাঠামোর সাথে একীভূত করা সমীচীন হবে। এ সেবাদ্বয়কে সুগঠিত এবং মান সম্পন্ন করার জন্য এবং সেবাগ্রহীতাদের সম্মান ও সন্তুষ্টির জন্য নার্সিং এবং মিডওয়াইফারি সেবার মানকে আরও উচ্চস্তরে নিতে হবে এবং সে জন্য উভয় অধিদপ্তরে তাদের সর্বোচ্চ পদ বর্তমানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক পদের সমান হবে, (৫). সকল সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ একটি শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে একে অপরের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এলজিআই) স্বাস্থ্য ও সহায়ক কর্মকর্তারা তাদের মধ্যে বিনিময় যোগ্য হবেন। বৃহত্তর এলজিআইতে সিনিয়র কর্মকর্তাদের নিয়োগ করা হবে। জনস্বাস্থ্যের একটি অতিরিক্ত মহাপরিচালক হবেন জেষ্ঠ্যতম একজন প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা। এই পদের জন্য জনস্বাস্থ্যের শিক্ষাগত পটভূমিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, (৬). ১৯৯৮ সাল থেকে যেভাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেটের কর্মসূচী পরিচালিত হচ্ছে, তার পরিবর্তে এখন থেকে অপারেশনাল প্ল্যান এবং লাইন পরিচালকের স্থলে রাজস্বখাতের পরিচালকগণই তাঁদের সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনা করবেন এবং তাঁদের দায়িত্ব-সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালনা করবেন। তাঁদের সহায়তা করবেন উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালক। প্রয়োজনে নিম্নতর স্তর থেকে উপযুক্ত কর্মকর্তাদের প্রেষণে পদায়ন করা যেতে পারে। তবে একজন পরিচালকের পক্ষে বিভিন্ন অর্থ সহায়তাকারীর জন্য আলাদা আলাদা প্রকল্প তৈরী করলে, যে কারণে স্বাস্থ্যখাতে উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য সেক্টর-ওয়াইড পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে এবং একজন পরিচালকের পক্ষে দুটি বা তিনটি প্রকল্পের বেশি বাস্তবায়ন করা দুরূহ হবে।অন্য পক্ষে একই লাইনের সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি যদি বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালকদ্বারা পরিচালিত হয়বাস্তবায়নের দ্বৈততা অর্থের অপচয় ঘটাবে এবং সমন্বয়হীন বাস্তবায়ন ও বিভিন্ন সমস্যা ঘটাবে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, সেক্টর-ওয়াইড পন্থার পূর্বে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে ১১০ টার মত প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে হত। যা প্রকল্পগুলি দক্ষতার সাথে পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করত, (৭). স্বাস্থ্যখাতের কর্মীদের প্রতি বছর কাজের পর্যালোচনা করতে হবে, (৮). জেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো শক্তিশালী করার জন্য (ক). সিভিল সার্জন পদকে ৪র্থ গ্রেডে উন্নীত করতে হবে, (খ) প্রতিটি জেলায় পর্যালোচনা, তদারকি পরিদর্শনের জন্য চতুর্থ গ্রেডে একটি অতিরিক্ত সিভিল সার্জনের পদ সৃষ্টি করতে হবে। এছাড়া অতিরিক্ত সিভিল সার্জন ক্লিনিক্যাল সেবা প্রদানকারীদের ক্রয়-সংগ্রহ, সেবার পরিমাণ, সেবার শর্তাবলীর নিয়ন্ত্রণ (রেগুলেশান), সেবা কাজে কোনও সমস্যা বা অভিযোগ থাকলে তা অনুসন্ধান করে সমস্যার সমাধান করতে এবং অন্যান্য কাজেও তিনি সিভিল সার্জনকে সহযোগিতা করবেন। জেলা পর্যায়ের ব্যাপক স্বাস্থ্য-কর্মযজ্ঞ পরিচালনার জন্য প্রতি জেলায় স্বাস্থ্য বিভাগের জন্য দুটি করে উপ-প্রধানের নতুন পদ সৃষ্টি করতে হবে অথবা কিছু জেলায় একটি করে নতুন পদ সৃষ্টি করতে হবে। তাঁদের একজন রোগ নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন এবং আরেকজন সেবা সংশ্লিষ্ট কাজের তত্ত্বাবধান, পর্যানুসরণ, প্রশিক্ষণ কাজে সিভিল সার্জনকে সহযোগিতা করবেন, (৯). সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগে কর্মরতদের যাতে অন্যত্র আংশিক সময়ে গিয়ে সেবা দিতে না হয়সে জন্য তাঁদের ইনস্টিটিউশনাল প্র্যাকটিসের ব্যবস্থা করা যায় কি না তা অভিজ্ঞতার আলোকে সৃজনশীলতার সাথে উপজেলা থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত পাইলটিং করতে হবে, (১০). কমপক্ষে ৫০ শয্যা রয়েছে এ রকম সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালে, প্রশাসন/ব্যবস্থাপনায় কমপক্ষে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা সমমানের ডিগ্রি (অগ্রগণ্য হিসেবে একজন চিকিৎসক) থাকা ব্যক্তিদের মধ্য থেকে পরিচালক/সুপারিনটেন্ডেন্ট নির্বাচন করার সুপারিশ করা হলো, (১১). জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকদের ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, আউট সোর্সিং এর কর্মী প্রযোজ্য ব্যবস্থাপক সরাসরি একটি কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন করবেন, যাতে উপরস্থ কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ থাকবে এবং নিয়োগের চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হবে আরো এক ধাপ উপর থেকে, দুই বছরের জন্য। তবে তা নবায়ন হবে প্রতি বছর, (১২). প্রতিটি পদোন্নতির জন্য প্রথমে

বিভাগীয় পর্যায়ে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা দিতে হবে। এই পরীক্ষাগুলো পদোন্নতির জন্য তালিকাভুক্ত একজন প্রাক যোগ্য কর্মকর্তার ব্যক্তিত্ব, দক্ষতা, মানসিকতা যাচাই করবে। এরপর পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দু'সপ্তাহের জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে, (১৩). প্রান্তিক ও দুর্গম এলাকায় অন্য এলাকার সেবা প্রদানকারী নিয়োজিত হলে, সেবাস্থলে তাদের দুই বছরের জন্য সার্বক্ষণিকভাবে বসবাস করতে হবে এবং তাদের জন্য সম্মানজনক এবং উৎসাহব্যঞ্জক বিনামূল্যের বসতবাড়ী এবং তাদের মৌলিক বেতনের চেয়ে ৩০% থেকে ১০০% বেশি বেতন দিতে হবে। এরপরও সেবা স্থলে রাতদিন অবস্থান না করলে তাদের বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য কমিশনের মাধ্যমে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, (১৪). প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা স্তরে পুনর্গঠন: (ক). প্রতিটি উপজেলা, জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে রোগ নিয়ন্ত্রণ/মহামারীবিদ্যা/জনস্বাস্থ্য; পুষ্টি; এবং যোগাযোগ কর্মকর্তার জন্য ৩টি মেডিকেল অফিসার/ অফিসারের পদ তৈরি করতে হবে। প্রস্তাবিত জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অবকাঠামোর অংশ হিসেবে, প্রতিটি অনুমোদিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্কুল পাবলিক হেলথ নার্সের পদ তৈরি করতে হবে, (খ). উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা/ পঞ্চম গ্রেডের প্রধান উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার সাথে দুজন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট থাকতে হবে - রোগ, খাদ্যের মান এবং নিরাপত্তা নজরদারিতে সহায়তা করার জন্য। (১৫). স্বাস্থ্যসেবা অধিদপ্তরের মালিকানাধীন জমিতে NIPORT এর RTC এবং FWVTI পরিচালনার দায়িত্ব প্রস্তাবিত স্থানীয় জনস্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃপক্ষের উপর ছেড়ে দিতে হবে। নিপোর্ট প্রয়োজনে এগুলি বিনামূল্যে ব্যবহার করবে; তবে নিপোর্ট প্রস্তাবিত স্থানীয় জনস্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃপক্ষকে খাদ্য, আনুষঙ্গিক বিষয় এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ প্রদান করবে। যখন নিপোর্ট এর প্রয়োজন হবে না তখন স্থানীয় জনস্বাস্থ্য ইউনিটগুলি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধার্থে অন্যান্য আগ্রহী ব্যবহারকারীদের কাছে এগুলি ভাড়া দিতে পারবে, (১৬). স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে সম্পৃক্ত তথা হাসপাতাল পরিচালনাকারী অন্যান্য সরকারী খাতের সাথে স্বাস্থ্য খাতের সহযোগিতা ও সমন্বয় প্রয়োজন, যাতে অন্যান্য খাতের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান থেকে তথা হাসপাতালের একটা ছোট অংশ থেকে নগর এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা যায়, (১৭). চিকিৎসা সহকারীরা ইউনিয়ন স্তরে গ্রেডেড মেডিকেল সহকারী হিসেবে শুরু করে উপজেলা স্তরে প্রধান, উপ-প্রধান এবং সহকারী প্রধান চিকিৎসা সহকারী এবং তারপর জেলার সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট এবং তৃতীয় স্তরের হাসপাতালের গ্রেডেড সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট পদ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবেন, (১৮). প্রতিটি ইউনিয়নের জন্য একটি করে স্বাস্থ্য পরিদর্শক পদ তৈরি করতে হবে, পাশাপাশি প্রতিটি ইউনিয়নে দুজন সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক/ পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক এবং উপজেলা পর্যায়ে (আট থেকে আটটির বেশি ইউনিয়ন থাকলে) চার থেকে ছয়টি সিনিয়র স্বাস্থ্য পরিদর্শকের পদ তৈরি করতে হবে, (১৯). সরকারি সেবা প্রদানকারীরা সপ্তাহে দুই দিন ছুটি সহ নয়টা থেকে পাঁচটা কাজ করার সুযোগ পাবেন। ছুটির এই দুই দিন, পূর্বে তালিকাভুক্ত পরিষেবা প্রদানকারীরা ঘূর্ণায়মানভাবে (রোস্টার করে) কাজ করবেন, যাদের অন্য দিনগুলিতে সাপ্তাহিক ছুটি দেওয়া হবে। সরকারি সেবা প্রদানকারীরা বিকাল ও রাতের শিফটের দায়ীত্ব ঘূর্ণায়মানভাবে নির্ঘণ্ট করে পালন করবেন এবং সপ্তাহে দুই দিন ছুটি পাবেন এবং অতিরিক্ত সময় কাজ করার জন্য বিশেষ ভাতা পাবেন, (২০). কমিউনিটি পর্যায়ের (স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার কল্যাণ সহকারী বা কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী) মধ্যে সেবা গ্রহনকারীদের সম্ভাব্য জনসংখ্যা সমানভাবে ভাগ করতে হবে, যাদের কাজ থাকবে একই এবং তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও থাকবেন একই। তাঁরা সকাল নয়টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করবেন- বাড়ি বাড়ি যাবেন একদিন, মাঠে দুই দিন এবং কমিউনিটি ক্লিনিকে দুই দিন, (২১). কমিউনিটি পর্যায়ে নিয়োগের শর্তাবলী পুনঃ নির্ধারণ করতে হবে, এবং প্রান্তিক পর্যায়ের কর্মচারীদের জন্য পর্যাপ্ত এবং উপযুক্ত কর্মজীবনের পথ (ladder) থাকতে হবে, যেমন, স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার কল্যাণ সহকারী বা কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী উপজেলাবং জেলা স্তরের পদে পৌঁছাবেন এবং অভিজ্ঞতা এবং চাকুরির দৈর্ঘ্যের আলোকে ক্রমশ অন্তত জেলা পর্যন্ত পদোন্নতি দিতে হবে, (এ বিষয়ে কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্টের প্রবিধান ও প্রশাসনিক কাঠামো দ্রষ্টব্য), (২২). সম্প্রদায় তথা কমিউনিটি পর্যায়ে এসব কর্মীদের বেতন ভাতা পুনঃমূল্যায়ন করে তাদের মধ্যে যারা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রী ধারী তাদের বেতন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সমান করতে হবে। কারণ এই কর্মচারীরা সব শ্রেণীর, সব বয়সের এবং সব পেশার মানুষকে শুধু স্বাস্থ্যসেবাই দেন না বরং তাদের স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষা ও দেন। এছাড়াও তাঁদের কাজ মানসিক ও শারীরিকভাবে বেশ ক্লান্তিকর, (২৩). উল্লেখ্য যে,দেশে প্রতিদিন ১৫,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে গড়ে ৬০০,০০০ থেকে ৭০০,০০০ মানুষ সেবা নিয়ে থাকেন। এই সেবার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে সাধারণ সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ চিহ্নিতকরণ, ঔষধ প্রদানসহ রোগের চিকিৎসা ও রেফারেল, শিশু পরিচর্যা, কৈশোরকালীন ও গর্ভবতীর সেবা, শিশুর এবং গর্ভকালে নারীর শারীরিক বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ, স্বাস্থ্য বার্তা, রোগীর সংখ্যা ও সেবার তথ্য সংরক্ষণ এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে

প্রেরণ, কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচ্ছন্ন রাখা, মেরামত ও সংরক্ষণ, পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং বৈদ্যুতিক বিল প্রদান। এসব সেবার ক্রমশ ধরন এবং পরিমাণের দিক দিয়ে বর্ধিত হচ্ছে যা একজনের পক্ষে মানবিক ভাবেই সম্ভব নয়। এজন্য প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে সপ্তাহে ছয় দিন কাজ করার জন্য একজন সহকারী কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে, (২৪). স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সাফল্যের জন্য ভালো কাজকে পুরস্কৃত এবং খারাপ বা অবহেলাজনিত কাজকে তিরস্কার করার সংস্কৃতি অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে, (২৫). স্থানীয়ভাবে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী নিয়োগ এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বদলী না করে আইনানুগ অন্য কোনও শাস্তি প্রদান;

<u>২. পৌর ও নগর এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার সংগঠন</u>: (১). গ্রামের ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার যে অবকাঠামো সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে নগরের ওয়ার্ড পর্যায়েও একই ধরনের অবকাঠামো তৈরী করতে হবে, (২). সর্বপ্রথম স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (গভর্নমেন্ট আউটডোর ডিসপেনসারি, হাসপাতাল), সরকারের অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী খাতের/ মন্ত্রণালয়ের ভৌত অবকাঠামো/ হাসপাতালের একটা অংশে এবং ব্যক্তিখাতের/ বেসরকারি হাসপাতালের সহযোগিতা পেলে সেসব ব্যক্তিখাতের/ বেসরকারি হাসপাতালের একটা অংশে ওয়ার্ডভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যাকেন্দ্র স্থাপিত হবে, (৩). এসব কেন্দ্রে দুজন প্রাথমিক স্বাস্থ্য/ পারিবারিক স্বাস্থ্য চিকিৎসক দায়িত্বে থাকবেন। তার সাথে থাকবেন গ্রামীণ ইউনিয়ন সদৃশ্য দক্ষতা-মিশ্রিত দলের সদস্যরা, (৪). কোনও ওয়ার্ড যদি এরপরও বাদ থাকে সেখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভৌত কাঠামো ও সামগ্রীক অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। যতদিন এটা প্রস্তুত না হয়ততদিন যোগ্যতার বিচারে (প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচিত) স্থানীয় কোনও ব্যক্তিগত প্রাক্টিশনারকে তার চেম্বারসহ প্রাথমিকভাবে দুবছরের জন্য চুক্তি দেয়া হবে এবং তাঁর মাধ্যমে ওই কেন্দ্রের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা মিশ্রিত দল ও চুক্তির মাধ্যমে নিয়োগ দিতে হবে, (৫). বিকল্প হিসেবে কোনও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে ও নিয়োজিত করা যাবে, (৬). যথেষ্ট স্থানের সংকুলান না হলে স্থানীয়ভাবে কোনও ভৌত কাঠামো ভাড়া করতে হবে, (৭). এসব সেবাপ্রদানকারী এবং অবকাঠামো এসব নগরের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, অন্যথায় সিভিল সার্জন/ প্রধান জেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

<u>৩. ভৌত কাঠামো</u>: (১). স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে দূর্যোগকালে প্রয়োজনীয় সেবা দিতে ব্যর্থ না হয়, অর্থাৎ পানি, বিদুৎ, পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা যাতে অকেজো না হয়েযায় তার উপর এবং এসব প্রতিষ্ঠান যাতে বন্যার পানিতে নিমজ্জিত না হয়সেদিকে সে জন্য প্রয়োজন হলে এসব প্রতিষ্ঠানের ভৌত কাঠামো ও নকশাকে পূর্ণাঙ্গ বা আংশিকভাবে পুন:নির্মাণ করতে হবে, (২) হাসপাতালের ডিজাইন হতে হবে এমন যাতে এক ডিপার্টমেন্টের রোগীকে অন্য ডিপার্টমেন্টের ভিতর দিয়েযেতে না হয়সেটা নিশ্চিত করতে হবে, (৩). স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী এবং গ্রহীতা-বান্ধব হাসপাতালের নকশা এবং পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, যেমন: গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদানকারী মা, কিশোর-কিশোরী, শিশু, অসংক্রামক রোগিদের জন্য সুযোগ-সুবিধা; অপেক্ষা কক্ষ এবং স্বাস্থ্যশিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি; বিশেষ প্রয়োজন এরকম রোগীর জন্য সুবিধাজনক পরিবেশ সৃষ্টি, (৪). ইউনিয়ন পর্যায়েদুজন মেডিক্যাল অফিসার, একজন নার্স, একজন মিডওয়াইফ (প্রশিক্ষিত ধাত্রী), একজন ল্যাবরেটরি টেকনোলজিস্ট, একজন বি বা সি গ্রেড এর ফার্মাসিইস্ট, একজন সহকারী ও একজন গার্ড এর পদ সৃষ্টি করে তাদের নিয়োগ দিতে হবে, তাদের উৎসাহ নিয়েকাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো থাকতে হবে এবং তাদের জন্য মর্যাদা সম্পন্ন এবং স্বস্তিদায়ক আবাসিক ব্যবস্থা থাকতে হবে, (৫). কমিউনিটি ক্লিনিকে অন্তত চারটি কক্ষ থাকতে হবে- দুটি কর্মচারীদের সেবা কাজে ব্যবহারের জন্য, একটি রোগীদের অপেক্ষা করার জন্য এবং একটি ঔষধ ও সরঞ্জাম রাখার জন্য;

<u>৪. জলবায়ু, পরিবেশ এবং দুর্যোগ সংক্রান্ত সেবা কার্যক্রম</u>: (১). শহর ও নগরের সর্বত্র সঠিকভাবে বর্জ্য এবং পানি ও পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং একটি পৃথক বিভাগ বা তৃতীয় কোনও পক্ষের সাথে চুক্তির মাধ্যমে বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা করতে হবে, (২). শহর ও নগরের সর্বত্র পর্যাপ্ত সংখ্যক ব্যায়াম ও খেলাধুলার জন্য পার্ক থাকতে হবে, (৩). শহরে উত্তপ্ত অঞ্চল (হিট আইল্যান্ড) সৃষ্টি প্রতিরোধ করতে হবে, (৪). সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করতে হবে, (৫). অনানুষ্ঠানিক পুনর্ব্যবহারযোগ্য ব্যাটারি গুলি বন্ধ করতে হবে এবং নিরাপদ বর্জ্য হিসেবে অপসারণ এবং টেকসই বিকল্পের ব্যবস্থা করতে হবে। সময়োপযোগী পদক্ষেপ বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ পরবর্তী প্রজন্মের নাগরিককে সীসার বিষক্রিয়া থেকে রক্ষা করবে এবং পরিবেশগত ক্ষতি কমাবে, (৬). প্রতিটি হাসপাতাল ও ফ্যাক্টরিতে এফলুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট থাকতে হবে। এটি নিশ্চিত করার জন্য এবং বর্জ্য যাতে প্রকৃতিতে না মিশে এজন্য কার্যকরী শাস্তির বিধান রেখে আইন প্রণয়ন করতে হবে, (৭). National Guideline for Medical Waste Management (Revised) এবং

Waste Management and Processing Rule ২০০৮ যে উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে সেই উদ্দেশ্য সফলভাবে কার্যকরী করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরকে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সহায়তা দিতে হবে, (৮). মহামারী সংক্রান্ত আইন ছাড়াও আপৎকালীন স্বাস্থ্যসমস্যার ব্যাপক ও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাপনা ও সমাধানের জন্য ও একটি আইন প্রণয়ন করতে হবে যা প্রস্তাবিত জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকদের সব স্তরে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দিবে, যেমন, স্থানীয় প্রজ্ঞাপন জারী করে ব্যক্তিখাতের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য খাতের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও উপকরণ যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাঠ, যানবাহন, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যবহারের ক্ষমতা;

৫. ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রস্তাবিত কার্যাবলী এবং দায়ী-দায়ীত্ব নির্ধারণ: (১). হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য ক্লিনিক্যাল ব্যবস্থাপনা বা ক্রয়ে সিভিল সার্জন তথা প্রধান জেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা তথা প্রধান উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার কোনও ভূমিকা থাকবে না, যা আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও)/ হাসপাতাল সুপারিনটেনডেন্ট/পরিচালক ও তাঁদের দলের হাতে থাকবে, (ক) তবে, সকল সরকারি খাতের ক্রয়কৃত পণ্য ও ব্যবহারের, এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের পরিষেবা এবং কাজের তদারকি, এবং (খ) স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন করবেন সংশ্লিষ্ট স্তরের জনস্বাস্থ্য ইউনিট (বিভাগীয় পরিচালক তথা প্রধান বিভাগীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, সিভিল সার্জন তথা প্রধান জেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা তথা প্রধান উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্মিলিতভাবে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রতিনিধিরা, (২). বিভাগীয় পরিচালক তথা প্রধান বিভাগীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, সিভিল সার্জন তথা প্রধান জেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা তথা প্রধান উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের আর যেসব দায়ীত্ব পালন করতে হবে সেগুলো হলো: সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর উপস্থিতি; লিঙ্গ সংবেদনশীল পরিষেবা; বর্জ্য ব্যবস্থাপনা; স্বাস্থ্যবিধি ও স্যানিটেশন; পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ; নিরাপত্তা; রোগী ও সেবাপ্রদানকারীদের নিরাপত্তা; সেবাপ্রদানকারীদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা; রোগী ও সেবাপ্রদানকারীদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা; রোগীদের বা কর্মীদের অভিযোগ; 'দালাল', সিন্ডিকেট এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া, (৩). মানুষের অভিযোগ করার অধিকার এবং অভিযোগ কোথায় এবং কিভাবে করতে হবে সে সম্পর্কে জনসচেতনতা, (৪). বেসরকারি খাত থেকে প্রয়োজনীয় সেবা এবং সেবাপ্রদানকারী সম্পর্কিত ও ব্যবস্থাপনা তথ্য প্রতিবেদন জমা দেওয়া সহ লাইসেন্সের শর্তাবলী মেনে চলছে কি না তা দেখা ও নিশ্চিত করা, (৫). প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, ওরিয়েন্টেশন, (৬). পর্যালোচনা, গবেষণা, অধ্যয়ন, মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা, (৭). হাসপাতালে ভর্তির সময়কালের যৌক্তিকতা; চিকিৎসার খরচ এবং মূল্য এবং অর্থপ্রদানের পদ্ধতি; (৮). হাসপাতাল পরিষেবার জন্য বেসরকারি খাত/এনজিও থেকে পণ্য ও সেবা ক্রয়, (৯). রোগ এবং টিকা ও ওষুধের প্রতিকূল প্রভাবের উপর নজরদারি; (১০). শ্রমিক, কারাবন্দী, বন্দর/ বিমানবন্দরের কর্মী, পুলিশ ও শিক্ষার্থীদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের (চোখের ও শ্রবণের সূক্ষ্মতা, রক্তচাপ, নিদ্রা ইত্যাদি) নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ, (১১). সংগৃহীত সম্পদের ব্যবহার ও দক্ষতা পর্যবেক্ষণ; (১২). শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ, (১৩). ভৌত ও আর্থিক কর্মক্ষমতা এবং লক্ষ্য অর্জনের বার্ষিক মূল্যায়ন/ প্রতিবেদন এবং এসবের অনলাইন/ ওয়েব-ভিত্তিক পাবলিক প্ল্যাটফর্ম-ভিত্তিক প্রকাশ, (১৪). এই ইউনিটগুলির কর্মকর্তারা সরাসরি ক্রয় কার্যক্রমে জড়িত থাকবেন শুধু প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে, তবে যার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বিভাগীয় পর্যায়ে, (১৫). কর্ম কমিশন কর্তৃক বা অন্যান্যভাবে নির্বাচিত কর্মচারীদের প্রথমে বিভাগীয় পর্যায়ে ন্যস্ত করতে হবে, (১৬). বিভাগীয় একটি বোর্ডের মাধ্যমে তাদের বেতন কাঠামো নির্ধারণ, পদায়ন, বদলি, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন, পুরস্কার, তিরস্কার এবং শাস্তির নিশ্চয়তা নির্ধারণ,পদায়ন করা হবে, প্রথমবার নিয়োগ ও পদায়নকালে বর্তমানে প্রচলিত বেতন কাঠামোর গ্রেড, স্কেল বিবেচনা করা হবে। পরবর্তীতে এক বছর চাকুরি সমাপনের পর শিক্ষার স্তর ও শিক্ষাকালে ছাত্রত্বের মান, চাকুরিকালীন যোগ্যতা, দায়-দায়ীত্বের প্রতি প্রতিশ্রুতি ইত্যাদির আলোকে প্রাপ্ত গ্রেডের উপযুক্ত স্কেলে বা উচ্চতর গ্রেডে বেতন-ভাতা দিতে হবে। এ লক্ষ্যে বিভাগীয় দপ্তর থেকে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে প্রস্তাব যাবে এবং অধিদপ্তর তথা বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সার্ভিস প্রশাসন এবং যুক্তিযুক্ত হলে, স্বাস্থ্য কমিশন থেকে এ বিষয়ে চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে (১৭) পদায়নের পূর্বে প্রত্যেক কর্মচারীর সাথে বিভাগীয় দপ্তর পদায়নকৃত কর্মচারীদের সাথে একটি কর্মসূচি, দায়-দায়ীত্ব ও কর্ম সম্পাদন চুক্তি করবে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে তাদের মূল্যায়নের সূচক ও প্রক্রিয়া, পুরস্কার বা তিরস্কারের কারণ এবং ধরন, পদোন্নতির জন্য এই বোর্ড প্রথমে একটি তালিকা করবে। (১৮). সংশ্লিষ্ট এলাকার মধ্যে বদলি এবং পদায়ন কর্তৃপক্ষ হবেন উপজেলা ও জেলার কর্মকর্তারা, (১৯). প্রতিটি স্তরে ব্যবস্থাপকরা এক বা একাধিক ব্যবস্থাপনা দল গঠন করবেন।

এই দল(গুলি) কাজ করবে: (ক) মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য যথা, বদলি; পদায়ন; পদোন্নতির জন্য পরীক্ষার (বিভাগীয় পরীক্ষার মাধ্যমে এবং প্রতি বছর ডোপ পরীক্ষার) ফলাফল দেখার পর গ্রেডেশন এবং পদোন্নতির জন্য বার্ষিক মূল্যায়ন । তবে পদোন্নতি এবং বিদেশী প্রশিক্ষণের জন্য চূড়ান্ত নির্বাচন নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/ সচিবালয় অনুষ্ঠিত সাক্ষাৎকার এবং এসিআর এর উপর, (খ) কর্মসূচীর ব্যবস্থাপনা; পরিকল্পনা, বাজেট এবং ব্যয় ট্র্যাকিং; (গ) অভ্যন্তরীণ মান উন্নয়ন, ন্যায়সঙ্গত এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবার তত্ত্বাবধান, পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা, পর্যানুসরণ/ মনিটরিং (ঘ) তথ্য ও গবেষণা এবং মূল্যায়ন, (২০). কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেবাপ্রদানকারীদের বা সরকারের পক্ষ থেকে কোন অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হবে না। এ ক্ষেত্রে দাতা সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান স্থানীয় পর্যায়ে সরকারকে সমন্বিতভাবে সহায়তা করতে পারে, (২১). ইপিআই আউটপোস্ট নির্মাণ করার পূর্বে স্থানীয় কোনও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এসব অস্থায়ী স্থানে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান তৈরী করে সেবা দিতে চাইলে সেটাকে উৎসাহিত করা হবে;

<u>৬. লজিস্টিক ব্যবস্থাপনা</u> : (১). সরঞ্জামের তালিকায় যানবাহনকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, (২). উপজেলা বা নগর ওয়ার্ডে ভবিষ্যৎ মহামারী সংক্রান্ত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয়তার আলোকে, সরঞ্জাম এবং যানবাহনের তালিকা হালনাগাদ করতে হবে এবং সরঞ্জাম এবং যানবাহনের মধ্যে যদি কোন ফাঁক থাকে, তাহলে তা পূরণ করতে হবে, (৩). AI-এর মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে বস্তুগত সম্পদের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ পরীক্ষা করতে হবে, (৪). রোবোটিক্স-এর ব্যবহার উৎসাহিত করতে হবে, বিশেষত ফিজিওথেরাপিতে, (৪). স্টেন্টিং, ট্রান্সপ্লান্টেশন, ঔষধ, রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষা, প্রেসক্রিপশন ন্যায্য, স্বচ্ছ, আইনানুগ এবং যুক্তিসঙ্গত মূল্যের মধ্যে সীমিত করতে হবে, (৫). প্রতিটি ক্রয় ও সংগ্রহ হতে হবে ‘টার্ন কি’ পদ্ধতিতে। ব্যবহারকারী না থাকলে ওই ক্রয়-সংগ্রহকে বিধিবদ্ধ বলে স্বীকৃতি দেওয়া যাবে না, (৬). কোন সরঞ্জাম/ উপকরণ/ যন্ত্র/ ভবন/ যানবাহন কৃত বা সংগৃহীত হলে তার মূল্যের ১৫% এসবের মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষনের জন্য বছর বছর বরাদ্দ রাখতে হবে, (৭). কোনও ক্রীত বা সংগৃহীত সরঞ্জাম যদি তার আয়ু-অবসানের (এক্সপাইরি তারিখ) অর্ধেক সময়ের মধ্যেই নষ্ট হয় তাহলে প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য কমিশন এর তদন্ত করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিবে, (৮). স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে ও ব্যবস্থাপনায়, যেমন, নিদান (প্রেসক্রিপশন) এবং তার তত্ত্বাবধান ও পর্যানুসরণে (মনিটরিং) রিমোট সেন্সিং ও তথ্যের স্বয়ংক্রিয়তা, দূর-চিকিৎসা (টেলিমেডিসিন) ও শল্যসেবার উন্নয়নের সাহায্যে দূর-চিকিৎসা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে সৃজনশীলতা ও গবেষণার উপর নজর দিতে হবে, (৯). দেশে চিকিৎসার যন্ত্রপাতির উৎপাদন ও প্রযুক্তিবিদ্যা (টেকনোলজি) আবিষ্কার ও সৃজনশীল আধুনিকায়নে উৎসাহ প্রদান করার জন্য আগ্রহী উৎপাদনকারীদের আর্থিক প্রণোদনা ও সহায়তা প্রদান করতে হবে;

<u>৭. অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার দক্ষ ব্যবস্থাপনা</u> : (১). অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা একটি স্বাধীন চুক্তিবদ্ধ তৃতীয় পক্ষ দ্বারা পরিচালিত হবে যা একটি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে অথবা চুক্তিবদ্ধতার মাধ্যমে কার্যকরী হতে পারে, (২). পিপিপি চুক্তি জাতীয় পর্যায়ে অথবা জেলা পর্যায়ে হতে পারে, (৩). বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বা সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর দেশব্যাপী অ্যাম্বুলেন্স সেবা বিস্তৃত করতে আগ্রহী হলে প্রতিষ্ঠানটিকে অগ্রগণ্যভাবে সহায়তা দিতে হবে, (৪). এছাড়াও জরুরী ফোন লাইন ১৬২৬৩ এর মাধ্যমে যে অ্যাম্বুলেন্স সেবা পাওয়া যায় সব গণযোগাযোগের মাধ্যমে সেটার ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কল সেন্টার ১৬২৬৩ কে একটি স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে; (৫) নৌ পথের জরুরী অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য নৌ এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা থাকতে হবে, যার ব্যবস্থাপনা করবে ডাঙায় পরিচালিত এম্বুলেন্সের ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠান, (৬). প্রতিটি অ্যাম্বুলেন্সে একজন (প্রশিক্ষিত) প্যারামেডিক থাকতে হবে এবং অ্যাম্বুলেন্সে সব জরুরি সরঞ্জাম থাকতে হবে;

<u>৮. স্বাস্থ্যসেবার জন্য বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা এবং বাজেট প্রণয়ন ও বরাদ্দ পদ্ধতি</u>: (১). জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা কর্তৃপক্ষ অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে স্বাস্থ্য খাতের জন্য বার্ষিক বরাদ্দ পাবে, (২). লব্ধ অর্থ তিন অংশে বিভাজন করতে হবে- হাসপাতাল/ ক্লিনিক্যাল সেবা, জনস্বাস্থ্য, ও মেডিক্যাল ও সম্বন্ধযুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। যা সংশ্লিষ্ট তিনটি অধিদপ্তর থেকে বিভাজিত হবে নিম্নোক্তভাবে: (ক) উপজেলা এবং শহর/নগরের জনসংখ্যা, ভূ-অবস্থান, পরিবেশগত এবং রোগতাত্ত্বিক বা মহামারী সংক্রান্ত পরিস্থিতির আলোকে, (খ) হাসপাতালের প্রাক্কলিত রোগীর সংখ্যা ও সেবার ধরন, ডায়াগনস্টিক পরিষেবা এবং নার্সিং পরিষেবার আলোকে, এবং (গ) মেডিক্যাল ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের নিরিখে, (৩). এই বিভাজনের আলোকে প্রতিটি উপজেলা বা শহর/নগর; হাসপাতাল; ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের বাজেট তৈরী করবে। (ক) জনস্বাস্থ্য/ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি ও কার্যক্রমের জন্য গ্রামীণ এলাকার বাজেট তৈরি করবেন যথাক্রমে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও তাঁর দল এবং ও শহর/নগর

এলাকার জন্য সম্মিলিতভাবে সিভিল সার্জন নেতৃত্বাধীন তাঁর দল এবং পৌরসভা/ সিটি করপোরেশনের যথোপযুক্ত স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দ, (খ) হাসপাতাল-সেবা, যা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে শুরু হবে, তার বাজেট করবেন হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার/ তত্ত্বাবধায়ক/ পরিচালক ও তাঁর দল এবং (গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেট তৈরি করবেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও তাঁর দল, (৪). এই বাজেটসমূহ প্রথমে বিভাগীয় পরিচালক এবং তাঁর দল দ্বারা সমর্থিত হবার পর স্বস্ব অধিদপ্তরে/ সচিবালয়ে প্রেরিত হবে এবং সেখানে অনুমোদনের পর অনুমোদিত অর্থ বাজেট প্রণয়নকারী দলের যুক্তভাবে পরিচালিত তফসিলি ব্যাংক একাউন্টে প্রেরীত হবে, (৫). এই একাউন্ট তিনজন কর্মকর্তার নামে খুলতে হবে এবং যে কোনো দুজনের স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে, (৬). বাজেটের প্রতিটি অংশে বেতন ও ভাতা, সেবা কর্মসূচী, গণযোগাযোগ, গবেষণা/মূল্যায়ন; পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধান; সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা; মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ; ক্রয় (ব্যক্তিখাতের পরিষেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে চুক্তি সহ পণ্য এবং পরিষেবা ক্রয়) এবং জাতীয় পর্যায়ের নিয়ন্ত্রক পরিষদের জন্য বাজেট লাইন থাকবে, (৭). এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, একজন কর্মচারীর বেতন ও আনুষঙ্গিক ভাতা ও সুবিধাদি নির্ভর করবে প্রতিযোগিতামূলক পারিশ্রমিক অর্থাৎ যোগ্যতার ভিত্তিতে (চাকুরির মেয়াদ, শিক্ষার মান ও স্তর, ব্যক্তিত্ব, দৃষ্টিভঙ্গী, নেতৃত্বের গুণ, কার্যক্ষেত্রে অবদান ইত্যাদি); যা হবে প্রযোজ্য গ্রেডের সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ যে কোন ধাপে বা তার উর্ধ্বতন গ্রেডের যে কোন ধাপে, (৮). হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা নয় বরং প্রকৃত ভর্তি রোগীর সংখ্যার আলোকে বাজেট বরাদ্দ করতে হবে, (৯). বাজেট প্রাক্কলনে উন্নয়ন এবং চলিত/রাজস্ব/অনুন্নয়ন উভয় খাতের লাইন আইটেম-ওয়ারী অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে (১০). স্বাস্থ্যসেবা বাজেট তৈরীর জন্য, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারি খাত, ব্যক্তিখাত, সম্প্রদায়/ সমাজভিত্তিক সেবা খাত এবং বেসরকারী খাত প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবার প্রতি ইউনিট/এককের যে বাজেট বরাদ্দ হয়বা অর্থ ব্যয় হয়তা সংশ্লিষ্ট প্রতিটি স্তরের আলোকে জানতে হবে, বিশেষত: প্রতিটি অসংক্রামক রোগের প্রথম পর্যায়ের সেবা মূল্য থেকে শুরু করে জটিল পর্যায় পর্যন্ত সেবা মূল্য কত সেটা জানতে হবে, (১১.) আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস বা ন্যাশনাল হেলথ কমিশন একটি পৃথক অর্থ ব্যবস্থাপনা পরিচালনা পর্ষদ তৈরী করবে, যে পর্ষদে স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত সব খাতের অংশগ্রহণ থাকতে হবে এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা থাকবেন, (১২). নীতিগতভাবে সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিনামূল্যে প্রদান করা হবে। তবে ধারণা করা হয়য়ে সম্ভবত শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ মানুষ বিভিন্ন কারণে বিনা মূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নাও নিতে পারে, যেমন, যে সেবা প্রয়োজন সেটা কাছাকাছি পাওয়া যাবে না, বা প্রয়োজনীয় সময়ে পাওয়া যাবে না, বা ব্যক্তিখাতের সেবার প্রতি আগ্রহের কারণে। তাই বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দিতে যে বাজেট প্রাক্কলন করা হবে তাতে এই সম্ভাবনাটি স্মরণ রাখতে হবে।

৯. সেবার জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি: (১) ব্যক্তিখাত থেকে সেবা ক্রয়ের পদ্ধতি হতে পারে যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস কর্তৃক বাস্তবায়িত বেভারিজ মডেলের মত, যেখানে সরকারী কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সেবা সেবাপ্রদানকারীদের সরাসরি সেবার মূল্য প্রদান করে, অথবা, (২) জার্মানি এর বিসমার্ক মডেল, অর্থাৎ সোশ্যাল হেলথ ইন্সুরেন্স (সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা) ব্যবস্থা, যেখানে সরকার বা সরকার কর্তৃক নির্বাচিত একটা তৃতীয়পক্ষ অর্থ সংগ্রহ করে এবং তৃতীয় পক্ষই সেবা ক্রয় করে বা নির্বাচিত তৃতীয় পক্ষকে সেবা ক্রয়ের জন্য সরকার অর্থ প্রদান করে, (৩) আর্থিক দায়িত্ব পালনের জন্য বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সার্ভিসের অধীন একটি পৃথক অর্থ ব্যবস্থাপনা পরিচালনা পর্ষদ থাকবে, যা চাহিদাকৃত বাজেট পর্যালোচনা করবে, বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সার্ভিস কর্তৃক বাজেট অনুমোদনের পর বিভিন্ন কস্ট সেন্টারে অনুমোদিত অর্থ ছাড় করবে এবং অন্তবিভাগ নিরীক্ষা পরিচালনা করবে; (৪). উপরের দুটি পদ্ধতিই পাইলটিং করা যেতে পারে।

৭) জনস্বাস্থ্যভিত্তিক অন্যান্য সুপারিশ

১. সেবা প্রদানকারীর সংজ্ঞা এবং পুনঃনামকরণ: (১). কমিউনিটি ক্লিনিকগুলিকে গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র হিসেবে নামকরণ করতে হবে, (২). ইউনিয়ন স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্রগুলিকে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র হিসেবে নামকরণ করতে হবে, এবং (৩). উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে প্রাথমিক রেফারেল স্বাস্থ্য কেন্দ্র হিসেবে নামকরণ করতে হবে, (২). স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার কল্যাণ সহকারী এবং কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর (সি এইচ সি পি) নামকরণ করতে হবে একটাই – গ্রামীণ স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মী;

২. উত্তম সেবা প্রদানে উৎসাহ প্রদান: (১). ভালো কাজকে পুরস্কৃত এবং খারাপ বা অবহেলাজনিত কাজকে অবমূল্যায়ন এবং তিরস্কার করার সংস্কৃতি গড়ে তুলতেই হবে, (২). পুরস্কার দিতে হবে জনসমক্ষে এবং যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক;

৩) স্বাস্থ্য নীতি হালনাগাদ করতে হবে।

খ) হাসপাতাল এবং রোগ নির্ণয় পরিষেবা ভিত্তিক সংস্কার প্রস্তাবনা

১) সেবার মান উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবনা

১. সর্বক্ষেত্রে এবং সর্বস্তরে সেবাগ্রহীতা কেন্দ্রীক সেবা ব্যবস্থাপনার নিশ্চয়তা প্রদান: (১). রোগীকে রোগের চিকিৎসা তথা ঔষধ, পরীক্ষা নিরীক্ষা ও চিকিৎসক এবং হাসপাতালে নির্বাচনের সুযোগ দিতে হবে, (২). রোগীকে যথেষ্ট সময় দিতে হবে যাতে রোগী তাঁর প্রয়োজনীয় অসুবিধাগুলোর কথা বলতে পারেন, তাঁকে যাতে পরিপূর্ণ এবং সঠিকভাবে পরীক্ষা করা হয়, প্রয়োজনীয় নিদান ও ল্যাবরেটরি পরীক্ষার জন্য পরামর্শ লিখা হয়, রোগীকে/ রোগীর সঙ্গীকে প্রেসক্রিপশন ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়, ঔষধ সেবনের নিয়ম বুঝিয়ে দেয়া হয়, ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া জানান হয় এবং এই অবস্থায় কি করতে হবে তা জানান হয়, পরবর্তী পদক্ষেপ বলে দেয়া হয় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ বিশদভাবে জানান হয়, (৩). রোগীদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে এবং রোগীদের আশেপাশে রোগীর সেবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের ছাড়া অন্যদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ করতে হবে, (৪). রোগী কেন্দ্রিক সেবার জন্য প্রতিটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে পর্যাপ্ত দিকনির্দেশনামূলক বোর্ড, হেল্প-ডেস্ক এবং হট-লাইন স্থাপন করতে হবে, (৫). চিকিৎসক, ঔষধ, হাসপাতাল এবং হাসপাতালে ভর্তি এবং রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে রোগীদের বিকল্প নির্ধারণ করতে দিতে হবে, (৬). রোগী চিহ্নিত করণের এবং চিকিৎসার নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে হবে, (৭). প্রতিটি হাসপাতালে দীর্ঘস্থায়ী রোগে ভোগা রোগী, মৃত্যুসজ্জাশায়ী রোগী, দুর্ঘটনায় পতিত রোগী, গর্ভবতী মহিলা, অপুষ্ট রোগী, কিশোর-কিশোরীদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক কাউন্সেলর থাকতে হবে, (৮). কার্যকরী রোগী সেবার জন্য কাউন্সেলর পদে নারীদের অগ্রগণ্যভাবে নিযুক্ত করতে হবে, (৯). হাসপাতালের যে স্থানে শিশু ভূমিষ্ট হয়সেটার পাশে বেসিনসহ টয়লেট থাকতে হবে, মহিলার স্বামীকে/ শাশুড়িকে/ মাকে পাশে থাকতে দিতে হবে, শিশু ভূমিষ্ট হবার সময় ব্যক্তিগত গোপনীয়তা মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে, এবং শিশু ভূমিষ্টকরন ট্রায়ালের মাধ্যমে যেতে হবে, (১০). হাসপাতালে প্রদত্ত সেবার মানের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য হাসপাতালে একটি কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট টিম থাকতে হবে । ব্যক্তিখাতের হাসপাতালের নিবন্ধনের জন্য এটি একটি শর্ত হিসেবে পরিগণিত হবে, (১১). প্রতিটি হাসপাতালে একটি বায়োমেডিক্যাল প্রকৌশল বিভাগ ও প্রতিটি ফার্মাসিতে একজন নিবন্ধিত (গ্রেড এ, বি, সি, ডি)/ ডিপ্লোমা / গ্রাজুয়েট থাকতে হবে; যাঁরা সরকারের নীতি অনুযায়ী ফার্মাসি ভিত্তিক সেবা দিবেন এবং এর অন্যথা হলে লাইসেন্স হারাবেন;

২. জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে ক্লিনিকাল সেবার মান এবং পরিমাণ উন্নয়ন : (১). মেডিকেল কলেজে যে সব সেবা দেওয়া হয়, তার সবই পরবর্তিতে জেলা সদর হাসপাতালে দিতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা নিয়ে ভৌত অবকাঠামো তৈরি/বৃদ্ধি করতে হবে, (২). জেলা সদর হাসপাতালে পদ বিন্যাস অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক সেবা প্রদানকারী থাকতে হবে, (৩). প্রয়োজনীয় সব উপকরণ ও সরঞ্জাম এবং অন্যান্য সহায়তা ও অর্থ থাকতে হবে (৪). উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শুধুমাত্র কনসাল্টেশন, অবজারভেশন, এবং রেফারেল রোগীরা ভর্তি হবেন;

৩. হাসপাতাল মর্গে প্রদত্ত কার্যক্রমের উন্নয়ন : (১). প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামসহ আধুনিক মর্গ স্থাপন করে চিকিৎসা আইন ব্যবস্থা এবং এর পরিষেবাগুলিকে আধুনিকীকরণ করতে হবে, (২). ফরেনসিক পরীক্ষা, প্রমাণ সংগ্রহ, সুরক্ষা এবং পরিবহন সম্পর্কে প্রতিটি উপজেলায় কমপক্ষে ২ জন ডাক্তারকে (একজন হবেন মহিলা) প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে, (৩). মেডিকো-লিগাল পরীক্ষা এবং এই কাজের জন্য পারিশ্রমিক প্রদান করতে হবে - পারিশ্রমিকের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকবে প্রতিটি ঘটনার পরীক্ষা, প্রতিবেদন লেখা এবং আদালতে হাজিরা। মেডিকো-লিগাল কাজ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব কিন্তু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ডাক্তাররা পরিচালনা করছেন। এই জন্য ডাক্তারদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে;

৪. ক্লিনিক্যাল ও জনস্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে কারিগরী ও প্রশাসনিক কার্যাবলী : (১). সেবা প্রদানকারীদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন: রোগ নয় বরং সুস্থতা-কেন্দ্রিক স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, (২). প্রতিটি নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যসেবা ইউনিটের জন্য পরিষেবা গ্রহণকারী এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের অনুপাত এবং দক্ষতা মিশ্রণের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে মান তৈরি করার জন্য একটি প্রযুক্তিগত কমিটি তৈরী করতে হবে, (৩). বিশ্বব্যাপী এক্রেডিটেশন প্রক্রিয়া হাসপাতাল সেবার মানের স্তর নির্ণয় ও স্বীকৃতির একটি স্বীকৃত পন্থা। তাই সরকারী এবং বেসরকারী উভয় ধরনের হাসপাতালের জন্য এক্রেডিটেশন পদ্ধতি সূচনা করতে হবে। সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলির স্বীকৃতির জন্য একটি অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড গঠন করতে হবে, (৪). ২০০ শয্যার চেয়ে বড় হাসপাতালে নগদ ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ পরিমাণ প্রতি দশ বছর পর পর শতকরা ৮০ ভাগ বৃদ্ধি করতে হবে এবং রাজস্ব খাত থেকে কোটেশনের মাধ্যমে ক্রয়ের পরিমাণ তিন বারে শতকরা ১৫০ ভাগ বৃদ্ধি করতে হবে, (৫). হাসপাতালে প্রদত্ত সেবা থেকে সংগৃহীত অর্থের অর্ধেক ট্রেজারিতে জমা না দিয়ে হাসপাতালে মান সম্পন্ন সেবা চালু রাখার কাজে ব্যবহৃত হবে। যেমন, পরীক্ষাগার, রেডিওলোজি সেবা, অ্যাম্বুলেন্স চালু রাখা (স্বাস্থ্য অধিদপ্তরস্থ সমাপ্ত প্রকল্প টিএফআইপিপি এর অভিজ্ঞতা দ্রষ্টব্য), (৬). মান উন্নয়নের জন্য প্রতিটি হাসপাতালে একটি মানোন্নয়ন পর্ষদ গঠন করতে হবে, যার দায়ীত্ব হবে: হাসপাতালের সেবার মান ও দক্ষতা মূল্যায়ন এবং উন্নত করা; পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান, প্রেসক্রিপশন প্যাটার্ন নিরীক্ষা; সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ; রোগীর প্রতি সম্মান, রোগীদের মধ্যে সামাজিকীকরণের পরিবেশ উন্নয়ন; সেবার অর্থায়ন; সেবার স্তর, ধরণ, গভীরতা, জটিলতা, কর্মক্ষমতা এবং মৃত্যুর (ডেথ অডিট) পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন এবং নিরীক্ষা করা; পরিষেবা গ্রহণকারী এবং প্রদানকারীদের সুরক্ষা এবং ব্যবস্থাপনার দক্ষতা যাচাই এর জন্য নিরীক্ষা করা; পরিষেবা গ্রহণকারী এবং প্রদানকারীদের জন্য উত্তম পরিচর্যার পরিবেশ সৃষ্টি করা; স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী এবং স্বাস্থ্যসেবা সহায়ক ও উপকরণগুলির ব্যবহার এবং ব্যবহারের উপযুক্ততা নির্ধারণ, মূল্যায়ন, নিরীক্ষা এবং অর্থায়ন করা; পর্যবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধান করা; ডিজিটাল প্রেসক্রিপশন পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার সাহায্যে প্রেসক্রিপশন আচরণ ট্র্যাক করা, নৈতিক ও ক্লিনিকাল নির্দেশিকা মেনে চলা নিশ্চিত করার জন্য প্রেসক্রিপশন প্যাটার্নের উপর নিরীক্ষা পরিচালনা করা; সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ প্রোটোকলের অনুশীলন করা; হাসপাতালে চিকিৎসা ত্রুটি হ্রাস নিরীক্ষা করা; স্বল্পব্যয়ে ওষুধের ও রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা; রোগী এবং সেবা সরবরাহকারীর মধ্যে সম্মানজনক সম্পর্কের জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি তৈরী করা; রোগীদের মধ্যে সামাজিকীকরণের পরিবেশ তৈরীর জন্য হাসপাতালের ভবিষ্যত নকশার উন্নয়ন করা; অপ্রয়োজনীয়/প্ররোচিত যত্ন, অ্যান্টিবায়োটিক বিতরণ এবং পলিফার্মাসি নিয়ন্ত্রণ করা; হাসপাতাল থেকে সেবা প্রদানকালে সৃষ্ট সংক্রমণ (আইট্রোজেনিক রোগ) নিয়ন্ত্রণ করা, (৭). প্রতিটি ব্যক্তিখাতের হাসপাতাল থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস শাখায় তাদের সেবা ও সেবা প্রদানকারীদের তথ্য পাঠাতে হবে নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে, (৮). নীতিগতভাবে একজন চিকিৎসক নিয়োগ হলে তার জন্য নিয়োগ করতে হবে অন্তত দুজন নার্স এবং তিনজন প্যারামেডিক (প্রশিক্ষিত ধাত্রী- মিডওয়াইফ, কাউন্সেলর, নার্সের সহযোগী, রোগীকে প্রাথমিক ভাবে গ্রহণ করার জন্য স্টাফ)। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার সুপারিশ হলো একজন চিকিৎসকের জন্য তিনজন নার্স ও পাঁচজন প্যারামেডিক নিয়োগ করা;

৫. স্বাস্থ্যসেবার মান (ক্লিনিক্যাল ও জনস্বাস্থ্য) উন্নয়নের জন্য গৃহীতব্য অন্যান্য কার্যাবলী: (১). চিকিৎসক, নার্স এবং প্যারামেডিকদের জন্য অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের (অনুমোদিত) একটি মডিউল তৈরি করতে হবে, যাতে তারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে পরামর্শ দিতে পারেন: অ্যান্টিবায়োটিক এবং সিজারিয়ান অপারেশনের অপব্যবহার; ওষুধের ডোজ; ঔষধ, টিকা, গর্ভনিরোধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিকূল প্রভাব; ক্লিনিকাল এবং শরীরবৃত্তীয় অবস্থা এবং বয়স-ভিত্তিক পুষ্টি; গর্ভাবস্থা; গর্ভনিরোধ; বার্ধক্যজনিত সমস্যা; দুর্ঘটনা, আঘাত, মানসিক স্বাস্থ্য, এবং মনোসামাজিক উদ্বেগ সহ অসংক্রামক রোগ; অস্ত্রোপচার এবং অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি-ভিত্তিক কাউন্সেলিং; (২). ফিটনেস/কার্যকলাপ/খেলাধুলার উপর স্ব-মূল্যায়নের জন্য প্রতিটি রোগীকে সহায়তা করা; মোটর ফাংশন (পেশীর ব্যবহার, সঙ্কোচন, প্রসারণ ইত্যাদি), দৃষ্টি, শ্রবণশক্তি, ভাষা এবং আন্ত:ব্যাক্তিক যোগাযোগের বয়স অনুসারে দক্ষতা, জ্ঞান, আচরণ, মনো-সামাজিক সুস্থতা (সুখের অনুভূতি); বন্ধুত্ব/সামাজিক পরিবেশ; পরিবার; খাদ্য; সেবা গ্রহীতাদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন সংশ্লিষ্ট সহায়ক সেবা নিশ্চিত করা, (৩). সকল মান সংশ্লিষ্ট কমিটিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

৬. হাসপাতালে রোগী বান্ধব পরিবেশ উন্নয়নের জন্য গৃহীতব্য কার্যাবলী : (১). নারী-বান্ধব হাসপাতালের উদ্যোগ পর্যালোচনা করে এই কর্মসূচি পুনরায় গ্রহণ করতে হবে, (২). স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী এবং গ্রহীতা-বান্ধব হাসপাতাল তৈরী করতে হবে, (৩). হাসপাতালের

ফার্মাসি, রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষাগার ও রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখা নিশ্চিত করতে হবে, (৪). হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ পানি, বায়ু, স্বস্তিদায়ক পরিবেশ, পয়:প্রণালী, রোগীর শয্যার পাশে যথেষ্ট স্থানের শর্ত পূরণ করতে হবে;

৭. রোগ নির্ণয়ের ক্ষমতা উন্নয়নের জন্য গৃহীতব্য কার্যাবলী : (১). বর্তমান পরিস্থিতির উন্নতির জন্য জাতীয় রেফারেন্স ল্যাবরেটরিকে শক্তিশালী করতে হবে। এটি করতে হবে ল্যাবরেটরির রোগ নির্ণয়ের প্রক্রিয়াগুলিকে সঠিকভাবে যাচাই এবং যাচাই করার মাধ্যমে, (২) দেশে সামগ্রিক ভাবে রোগ নির্ণয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে, (৩). বিপজ্জনক রাসায়নিকের সংস্পর্শে আসার ফলে উদ্ভূত রোগ নির্ণয়ের জন্য দেশে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ল্যাবরেটরি মেডিসিন এবং রেফারেল সেন্টার, এবং সেলুলার এবং মলিকুলার ল্যাবকে শক্তিশালী এবং বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে, (৪) রোগ নির্ণায়ক কেন্দ্র থেকে ফলাফলের প্রতিবেদন স্বাক্ষর করবেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষিত/ স্বীকৃত পেশাজীবীরা;

৮. সিজারিয়ান অপারেশনের হার নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রস্তাবিত পদক্ষেপ সমূহ: (১). ডিমান্ড সাইড ফিনান্সিং (ডিএসএফ) প্রকল্প সিজারিয়ান অপারেশনের হার বাড়িয়েছে। ডিএসএফ জাতীয় কর্মসূচি যাতে অহেতুক সিজারিয়ান সেবা গ্রহণ বৃদ্ধি না করে সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, (২). স্বাভাবিক শিশুপ্রসব যাতে দুর্ঘটনায় পর্যবসিত না হয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। কারণ এটা অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান উৎসাহিত করে, (৩). দেশের সব স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে শিশুপ্রসব যাতে মিডওয়াইফদের হাতে হয় সম্ভাব্য সব ক্ষেত্রে সেটা নিশ্চিত করতে হবে, (৪). অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান অপারেশন নিয়ন্ত্রণে ২০২৩ সালের উচ্চ আদালতের নির্দেশনা সকল সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতে মেনে চলা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৯. সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা : (১). কোন সরকারি সেবা প্রদানকারী দ্বারা কোন রোগীকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও বেসরকারি হাসপাতাল থেকে কোন ধরণের পরিষেবা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া যাবে না, (২). কোন ওষুধ প্রস্তুতকারকের প্যাডে প্রেসক্রিপশন লেখা যাবে না, (৩). কোন অপ্রয়োজনীয় ওষুধ লেখা যাবে না এবং কোনও অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া যাবে না, (৪). প্রতিটি ওটিতে সিসিটিভি ক্যামেরা রাখতে হবে, শল্য চিকিৎসার প্রতিটি পদক্ষেপ শল্যদলের প্রধানকে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে হবে এবং তার রেকর্ড থাকতে হবে, যে কোন সেবাই সেখানে দেওয়া হোক তার রেকর্ড রাখতে হবে এবং সেবা গ্রহণকারী চাইলে যুক্তিসঙ্গত অর্থের বিনিময়ে তা রোগী বা রোগীর পক্ষকে দিতে হবে; এর অন্যথা হলে উপযুক্ত বিভাগীয় শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, (৫) পরিষেবা প্রদান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ বা/ ও পরিচালনার জন্য বেসরকারি খাতের ঝুঁকি ভাগাভাগি নিশ্চিত করে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব চুক্তিকে উৎসাহিত করতে হবে, (৬). সংশ্লিষ্ট জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তারা যাতে দক্ষতার সাথে চুক্তি ব্যবস্থাপনা পরিচালিত করতে পারেন তাদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে, (৭). ক্লিনিক্যাল সেবায় দুর্ঘটনা- ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ব্যবহার করতে হবে ।

২) সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চয়তার লক্ষ্যে গৃহীতব্য কার্যাবলীর প্রস্তাবনা

১. শিশু ও মহিলা রোগীদের অগ্রাধিকার প্রদান : (১). সকল হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সরবরাহ ও সরঞ্জামের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে বন্ধ্যাত্ব, গর্ভপাত-পরবর্তী যত্ন এবং যৌনবাহিত রোগকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, (২). প্রতিটি রেফারেল হাসপাতালে স্পেশাল কেয়ার নিউবর্ন ইউনিট (SCANU) প্রতিষ্ঠা/শক্তিশালী করতে হবে, (৩). প্রসবের দুই সপ্তাহ আগে দূর্গম এলাকায় গর্ভবতী মহিলাদের হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে, (৪). প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিশু ও মহিলা রোগীদের পুনর্বাসন এবং 'সামাজিক সংহতকরণ' করতে হবে;

২. শিশু বিকাশ কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার প্রদান : (১). শিশু বিকাশ কেন্দ্রগুলিকে তাদের মূল ধারণা অনুসারে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। কেন্দ্রগুলিকে শিশুদের কোনও রোগ বা ব্যাধির আলোকে চিহ্নিত করা হবে না; কারণ (রোগ বা ব্যাধির কেন্দ্রগুলি প্রতিটি শিশুর সীমাবদ্ধতাগুলিকে সামনে নিয়ে আসে এবং তাদের শক্তি নয় দুর্বলতাগুলি নিয়ে কাজ করে, (২). সকল জেলা ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি সেবার অংশ হিসেবে মাল্টি- ডিসিপ্লিনারি 'শিশু বিকাশ কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা এবং মান উন্নয়ন করতে হবে, (৩). প্রতিষ্ঠিত শিশু বিকাশ কেন্দ্রগুলিতে একজন অভিজ্ঞ শিশুস্বাস্থ্য চিকিৎসক, শিশু মনোবিজ্ঞানী এবং উন্নয়ন-থেরাপিস্ট সহ বিশেষজ্ঞদের একটি প্রশিক্ষিত দল দ্বারা শিশুদের পরিষেবার মান নিশ্চিত করতে হবে, (৪). কিছু কিছু শিশুর প্রয়োজনের ভিত্তিতে

মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারি ও উচ্চতম (টারশিয়ারি) শিশু বিকাশ কেন্দ্রে রেফারেলের মাধ্যমে যথাযথ রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা থাকতে হবে, (৫). শিশুর স্নায়বিক বিকাশের দ্রুত মূল্যায়ন ও প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, (৬). শিশু বিকাশ কেন্দ্রগুলিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, জনবল সৃষ্টি, ও এ সকল বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করতে হবে, (৭). শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপনে এবং তার কার্যক্রম ও কর্মসূচিতে সহায়তার জন্য একটি যুগোপযোগী আইন তৈরী করতে হবে;

৩. জরুরি চিকিৎসার সহায়তা : (১). দেশব্যাপী একটি জরুরি চিকিৎসা পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সকল স্তরের যত্নের জন্য জরুরি পরিষেবার অবকাঠামো উন্নত করতে হবে, যেখানে আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম, জরুরি রোগ নির্ণয়ের সুবিধা, জীবন রক্ষাকারী ওষুধের পর্যাপ্ত মজুদ এবং রোগীদের পর্যবেক্ষণে রাখার জন্য পর্যাপ্ত এবং উপযুক্ত ভৌত কাঠামো থাকবে, (২). জরুরি/ক্রিটিকাল কেয়ার সেবা পৃথক বিভাগ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, (৩). প্রতিটি হাসপাতালের জরুরী বিভাগকে সহজে, জরুরীভাবে এবং দক্ষভাবে সেবা দেয়ার সুবিধার জন্য পুনঃনকশা করে পুনঃনির্মাণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত জনসম্পদ ও সরঞ্জাম দিয়ে কার্যকরী করতে হবে, (৪). সকল মহাসড়কের কাছাকাছি অবস্থিত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে উপযুক্ত জরুরী বিভাগ/ কার্যকরী ট্রমা সেন্টার থাকতে হবে এবং প্রতিটি ট্রমা সেন্টারে রক্ত সঞ্চালনের ব্যবস্থা এবং অ্যাম্বুলেন্স থাকতে হবে, (৫). জরুরি প্রয়োজনে অতিরিক্ত সেবা প্রদানকারীর প্রয়োজন হলে তাৎক্ষণিকভাবে যাতে জরুরী সেবার জন্য চুক্তির ভিত্তিতে স্থানীয় ব্যক্তিখাত থেকে দক্ষতা-মিশ্রিত সেবাপ্রদানকারী নিয়োগ করা যায়, সেজন্য এলাকার ব্যক্তিখাতের সেবাপ্রদানকারীদের সাথে একটি স্ট্যান্ডিং ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি থাকবে, এবং (৬). স্থানীয় ব্যবস্থাপকদের হাতে বছর-ওয়ারি প্রয়োজনীয় অর্থ থাকতে হবে। যার পরিমাণ স্থানীয়ভাবে তৈরী বাজেট-লাইনে উল্লেখ করতে হবে;

৪. উপজেলা স্তরের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম : (১). সকলের জন্য প্রাথমিক স্তরের পরিষেবা বিনামূল্যে প্রদান করতে হবে, (২). (ক) দীর্ঘ সময় ধরে শূন্য থাকা পদের বিপরীতে দক্ষতা-মিশ্রিত প্রদানকারী দল নিয়োগ করতে হবে, (খ). শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলে যেখানে পদ এক বছরেরও বেশি সময় ধরে শূন্য থাকে, সেখানে পারিবারিক চিকিৎসক/ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা চিকিৎসক/ জেনারেল প্র্যাকটিশনারদের চুক্তিবদ্ধ করা একটি বিকল্প হতে হবে, (৩). প্রতিটি হাসপাতালে নারীর প্রতি সহিংসতা জনিত সেবার জন্য সকল উপকরণসহ অনূন্য ৫ শয্যা বিশিষ্ট একটি করে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার থাকতে হবে, (৪). প্রতিটি থানার পুলিশ সদস্যদের দুর্ঘটনার শিকার মানুষের প্রাথমিক সেবা দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং এ জন্য থানায় প্রয়োজনীয় উপকরণাদীর সার্বক্ষণিক ব্যবস্থা থাকতে হবে;

৫. স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান/ হাসপাতাল নির্মাণের মান এবং সেবা চালু করার শর্ত: (১). প্রয়োজন নির্ধারণ ছাড়া কোনও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র নির্মাণ করা যাবে না; প্রয়োজন অনুভূত হলে তা একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার অধীনে করতে হবে এবং প্রয়োজনীয়সকল সম্পদ অন্তর্ভূক্ত করে করতে হবে, (২) আবেদনের চার সপ্তাহের মধ্যে বেসরকারি হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারের লাইসেন্স নবায়ন করতে হবে এবং এই ধরনের প্রতিটি লাইসেন্সের আগে লাইসেন্সিং অফিসের কর্মকর্তাদের এসব প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে হবে, (৩). উপজেলা হাসপাতালগুলিতে সার্জারি, স্ত্রীরোগ-প্রসূতি ও অ্যানেস্থেসিয়ার পরিপূর্ণ দল নিশ্চিত করতে হবে, (৪). অদক্ষভাবে চালু করা হাসপাতালগুলিকে (যথা, ১০ এবং ২০ শয্যাবিশিষ্ট) দক্ষভাবে চালু করার জন্য পরিকল্পনা, কৌশল, পরিষেবার তালিকা, পরিষেবা প্রদানকারী এবং সরঞ্জাম তালিকা তৈরি করতে হবে এবং এসব সম্পদের ব্যবস্থা করতে হবে, (৫). যাঁরা অতি দরিদ্র তাঁরা যে কোনও কাছাকাছি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে সব ধরনের সেবা পাবেন- তথা প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে ১০ শতাংশ দরিদ্র রোগীকে বিনামূল্যে অন্ত:বিভাগ ও বহির্বিভাগ পরিষেবা, ওষুধ, এবং ডায়াগনস্টিক পরীক্ষা প্রদান করতে হবে এবং ১০ শতাংশ দরিদ্র রোগীকে বেসরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে অন্ত:বিভাগ ও বহির্বিভাগ পরিষেবা, ওষুধ এবং ডায়াগনস্টিক পরীক্ষা প্রদান করতে হবে (এটি নতুন কোনো শর্ত নয়; এটি ব্যক্তিখাতে হাসপাতাল পরিচালনার একটি প্রচলিত প্রাথমিক শর্ত যা রাজনৈতিক ও অন্য কোনো কারণে অতীতে বাস্তবায়ীত হয়নাই), (৬). প্রতিটি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান এবং তার বিস্তৃতি তার ক্যাচমেন্ট জনসংখ্যা এবং তার রোগতাত্ত্বিক অবস্থার ভিত্তিতে নির্মিত হতে হবে, (৭). হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা রোগী (বয়স ও লিঙ্গ) এবং রোগের ধরনের আলোকে প্রাক্কলিত সম্ভাব্য হার বা সংখ্যা অনুযায়ী হতে হবে, (৮). প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক পূর্ণাঙ্গ আইসিইউ স্থাপন করতে হবে যার সংখ্যা

আঞ্চলিক মানের আলোকে প্রাক্কলিত হতে হবে, এবং (৯). জেলা ও উর্ধ্বতন হাসপাতালে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির (ইকোকার্ডিওগ্রাম, ব্রঙ্কস্কোপি, এন্ডোস্কোপি, ডায়ালাইসিস মেশিন ইত্যাদি) সংকট থাকতে পারবে না;

৬. জনমুখী ক্লিনিক্যাল এবং ডায়াগনস্টিক সেবা : (১). দরিদ্রদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ভ্রমণ খরচ বহন করা কঠিন, বিশেষ করে দূর্গম অঞ্চলে। তাই বিশেষজ্ঞরা যাতে উচ্চতর স্তরের হাসপাতাল থেকে জেলা হাসপাতালে এবং জেলা হাসপাতাল থেকে উপজেলা হাসপাতালে এসে সেবা প্রদান করেন এ জন্য একটি ঘূর্ণনমূলক ডিউটি রোস্টার তৈরি করতে হবে, (২). সকল জরুরী সেবাগ্রহীতাসব হাসপাতালে প্রথমে বিনামূল্যে সেবা পাবেন। তবে হাসপাতাল থেকে ছাড় পাওয়ার সময় সামর্থ্যবান রোগী সেবার মূল্য পরিশোধ করবেন; দরিদ্ররোগীকে ব্যয় পরিশোধে চাপ দেওয়া অন্যায় ও অপরাধ বলে গণ্য হবে, (৩). সবার জন্য স্বাস্থ্য অর্থাৎ জনমুখী স্বাস্থ্যসেবা দিতে গেলে সেবার মূল্য হ্রাস করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে, যা প্রয়োগ করতে হবে ঔষধ, সেবা উপকরণ বা সরঞ্জাম, রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষা, কনসালটেশন ফী ও হাসপাতালে ভর্তি জনিত সেবার ক্ষেত্রে, (৪). ক্লিনিক্যাল সেবা সর্বজনীন করতে হলে সব প্রয়োজনীয় সেবার জন্য যথোপযুক্ত সামর্থ্য সৃষ্টি করতে হবে এবং এজন্য প্রয়োজন হবে সব ধরনের ক্যাটেগরিভিত্তিক এবং দক্ষতা-মিশ্রিত জনবল এবং অন্যান্য সম্পদ ও কার্যক্রমের জন্য যথার্থ এবং যথেষ্ট অর্থায়ন, (৫). উপজেলা থেকে শুরু করে জেলা, ও বিভাগ পর্যায়ে তৈরি করতে হবে প্রস্তাবিত জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন শক্তিশালী পর্যানুসরণকারী/ মনিটরিং দল যারা সবার সাথে সাথে দরিদ্রদের সর্বাঙ্গীন এবং মান সম্পন্ন সেবা দেয়া হচ্ছে কি না সেটা তদারকি করবে, (৬). প্রতিটি হাসপাতাল স্বাস্থ্যসেবা সমন্বয় কমিটিকে সক্রিয় করার জন্য কৌশল উদ্ভাবন ও কার্যকরী করতে হবে এবং এজন্য আর্থিক সংশ্লেষের ব্যবস্থা করতে হবে, (৭). স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে/ প্রস্তাবিত ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তরে একটি পরিচালকের পদ সৃষ্টি করে তাঁর নেতৃত্বে একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইউনিয়ন/ নগরের ওয়ার্ড পর্যন্ত প্রতিটি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধিত ফার্মাসিস্ট পরিচালিত ২৪ ঘণ্টা উন্মুক্ত ফার্মাসি থাকবে এবং এখান থেকে যে কেউই স্বল্পমূল্যে প্রেসক্রিপশন আইন অনুযায়ী ঔষধ কিনতে পারবেন, (৮). একই ভাবে একজন পরিচালকের অধীন সকল হাসপাতালে ২৪ ঘন্টা রক্ত পরিসঞ্চালনের নিশ্চয়তা থাকতে হবে, এবং (৯). ন্যাশনাল রেফারেন্স ল্যাবরেটরী এর নিয়ন্ত্রণে হাসপাতাল গুলিতে ২৪ ঘণ্টা পরীক্ষাগার খোলা রাখতে হবে;

৭. ইন্টারনেট ভিত্তিক সেবা সম্প্রসারণ এবং হালনাগাদ করণ : (১). রিয়েল-টাইম টেলিমেডিসিন/ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে চিকিৎসকদের কাছ থেকে চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে পরামর্শ পেতে বর্তমান হেল্পলাইনগুলি আপডেট এবং জোরদার করতে হবে, (২). রক্ত এবং অঙ্গগুলির জন্য একটি উপজেলা-ওয়ারী দাতা ডেটাবেস তৈরি করতে হবে, যেমন চক্ষু, কিডনি, যকৃৎ ও হৃদপিন্ড দাতার তথ্য ইত্যাদি, (৩). সহজ ভাষায়বিজ্ঞানভিত্তিক স্বাস্থ্য তথ্য ও চিকিৎসা পরামর্শ দেওয়ার জন্য ডিজিটাল স্বাস্থ্য প্ল্যাটফর্ম চালু করতে হবে; যাতে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেন কখন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন এবং কোন চিকিৎসা বিজ্ঞানসম্মত ও নিরাপদ। এই প্ল্যাটফর্মটি সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গেও সংযুক্ত থাকবে, যাতে রোগীরা সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় চিকিৎসা নিতে পারেন, (৪). সমস্ত ইনডেন্টিং, ক্রয়, সংরক্ষণ, এবং বিতরণ ইলেকট্রনিকভাবে অনলাইনে করতে হবে, এজন্য প্রয়োজনে হলে প্রশিক্ষণ দিতে হবে, (৫). দূরবর্তী/দুর্গম জনগোষ্ঠীকে স্থানীয় হটলাইন এবং টেলিমেডিসিন পরিষেবা দিতে হবে;

৮. বিশেষ ধরনের সেবার চাহিদা পুরণ: (১). বয়স্কদের বিভিন্ন রোগের মধ্যে ডিপ্রেশন, আলঝাইমার ও ডিমেনশিয়াকে অগ্রাধিকার দিয়ে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য আবাসিক/ প্রাতিষ্ঠানিক যত্ন চালু করতে হবে, সকল অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে; (২). স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে, বিদ্যালয়ে, প্রতিষ্ঠান বা বড় বড় ভবনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী অবকাঠামো (ওয়াশরুম, র‍্যাম্প, নির্দেশনা) তৈরি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা (ইশারা ভাষা, ব্রেইল) রাখতে হবে, (৩) প্রত্যেক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে কর্মরত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবার জন্য বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি (ফোকাল পারসন) রাখতে হবে এবং তাঁকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে, (৪) অর্গ্যান ট্রান্সপ্লান্ট, রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি, কিডনি ডায়ালিসিস, ক্যান্সারের কার্যকরী চিকিৎসা ইত্যাদি স্বল্পমূল্যে প্রদান নিশ্চিত করতে হবে;

৯. দুর্যোগ কালে নারীবান্ধব সেবা প্রদান : (১). স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সমূহে দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ প্রদানে প্রজনন স্বাস্থ্য ও মাতৃ স্বাস্থ্য বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় উপকরণ ত্রাণে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে, (২). দুর্যোগের আশ্রয়স্থল নারীবান্ধব ও নিরাপদ করতে হবে; যৌন নির্যাতন

প্রতিরোধে নারীদের জন্য পৃথক স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে; (৩). দূর্যোগকালে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা খালি করার সময় গর্ভবতী নারীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে হবে; (৪). সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় লবণাক্ততার প্রভাব নারীদের জন্য ক্ষতিকর এবং লবণাক্ত পানি শরীরে অনুপ্রবেশে জরায়ু রোগের ঝুঁকি বাড়ে এজন্য উচ্চ রক্তচাপ এবং বন্ধ্যাত্বকে গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ স্বাস্থ্য কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে;

***১০. অলাভজনক বেসরকারি খাতের হাসপাতাল বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলিকে সহায়তা প্রদান*:** বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি, হার্ট ফাউন্ডেশন, কিডনি ফাউন্ডেশন, এমএএমএম এর ফিস্টুলা ইনস্টিটিউট এন্ড উইমেনস হেলথ (এমআইএফডাবলুওএইচ) ইত্যাদি সেবা প্রতিষ্ঠানকে দেশব্যাপী সেবা দেবার জন্য সহযোগিতা করতে হবে (তবে এসব যাতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে);

১১. অসংক্রামক এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগের ব্যবস্থাপনা : (১). ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস এবং দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসতন্ত্রের রোগ, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার শনাক্তকরণ, পুনর্বাসন এবং আত্মহত্যা প্রতিরোধ এবং এসবের জটিলতার সুরাহা করার জন্য কৌশল তৈরি/হালনাগাদ করতে হবে প্রতি দশ বছর অন্তর, (২). স্বাস্থ্যসেবার সকল স্তরে সেবাপ্রদানকারীর প্রশিক্ষণ অনুযায়ী অসংক্রামক রোগের ওষুধপ্রাপ্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, (৩). জেলা পর্যায়ে নিবিড় পরিচর্যা ইউনিটের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য একটি জরিপের আয়োজন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যা নির্ধারণ করে এই ইউনিটগুলির জন্য উপযুক্ত জনবল প্রযুক্তি/সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে হবে, (৪). প্রতিটি জেলা হাসপাতালে কার্ডিওলজি, কার্ডিয়াক সার্জারি, মনোরোগবিদ্যা, নিউরোলজি, পালমোনলজি, অনকোলজি, নেফ্রোলজি, হেপাটোলজি, ট্রমাটোলজি, ইউরোলজি, বয়স্কদের যত্ন এবং হেল্প-লাইন স্থাপন করতে হবে, যেখানে উপযুক্ত এবং নিশ্চিত দক্ষ-মিশ্র মানবসম্পদ, অপারেশনাল তহবিল এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি/সরঞ্জাম এবং ঔষধ সহ অন্যান্য সংস্থান থাকবে;

***১২. নারীদের জন্য হাসপাতাল সেবা*:** (১). প্রতিটি হাসপাতালে বা ১০০ জন বা বেশি কর্মচারী আছে এরকম প্রতিষ্ঠানে নারী ও শিশুবান্ধব পরিষেবা নির্মাণ ও পরিচালনা করতে হবে, যেখানে কর্মী এবং পরিষেবা গ্রহীতার জন্য বুকের দুধ খাওয়ানো এবং ডায়াপার পরিবর্তনের সুবিধা সহ ডে কেয়ার সেন্টার থাকবে, (২). প্রয়োজনের নিরীখে বিভাগীয় পর্যায়ে নারী ও শিশুদের জন্য হাসপাতাল নির্মাণ করা যেতে পারে, (৩). বিকল্প হিসেবে নতুন ভবন নির্মাণ না করে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মাতৃ ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্রগুলোকে সেবা প্রদানকারীসহ জেলা ও উপজেলার ক্লিনিক্যাল ধারার সাথে যুক্ত করে সেবা দিতে হবে;

***১৩. চাহিদা সম্পন্ন সেবার জন্য আরও পদ সৃষ্টি*:** (১). প্রতিটি হাসপাতালে পর্যাপ্ত সংখ্যক হিস্টোপ্যাথোজিস্ট, মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ, চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ, ফিজিওথেরাপিস্ট, বায়োমেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট, বায়োমেডিক্যাল প্রকৌশলী, ক্যান্সার, আইসিউ এর জন্য ইন্টারভেনিস্ট, কাউন্সিলর এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক রোগ নির্ণয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করার জন্য কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে;

***১৪. বিশ্ব মানের উৎকর্ষতা সম্পন্ন হাসপাতাল স্থাপন*:** (১). দেশে চিকিৎসা-পর্যটন কেন্দ্র তৈরির জন্য আকর্ষণীয় ভৌগোলিক স্থানে বিশ্ব মানের হাসপাতাল স্থাপন করতে হবে এবং স্বাস্থ্য সেবার সম্পূর্ণ সমাধান প্রদানের জন্য তথা সকল ধরণের প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদানের জন্য সকল অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত চিকিৎসা শহর গড়ে তুলতে হবে, (২). সেন্টার অফ এক্সেলেন্স তৈরি করার জন্য যেসব সহযোগী কার্যক্রম লাগবে সেটা হলো: হাসপাতাল থেকে আশ-পাশের এলাকায় যাতায়াতের জন্য গণ-পরিবহণ বা ভাড়ায় প্রাপ্ত যানবাহন এবং আশে/পাশে সমীচীন মূল্যেও খাবারের ব্যবস্থা, রোগীর সাথে আগতদের নিরাপত্তা ও স্বস্তিদায়ক এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ, (৩). বাংলাদেশে চিকিৎসা গ্রহণকারী বিদেশীদের চিকিৎসা পরবর্তী ফলোআপের জন্য টেলি-মেডিসিন পরিষেবা জোরদার করতে হবে, (৪). সাফল্যমন্ডিত হবার পর প্রথমে প্রতিবেশী দেশগুলোতে এবং আরো পরে অন্যান্য দেশে বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোর সাহায্যে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবার মূল্য, গুণ ও মান সম্পর্কে প্রচার করতে হবে, এবং (৫). উদ্বৃত্ত থাকলে দেশের চিকিৎসক, নার্স এবং প্যারামেডিকদের ও এসব দেশে চাকুরির ব্যবস্থা করা পরিকল্পনার মধ্যে রাখতে হবে। তবে এজন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে;

১৫. ব্যক্তিখাতে হাসপাতাল তৈরীতে সরকারী সহযোগিতা : (১). পাবলিক-প্রাইভেট অংশীদারিত্ব চুক্তির মাধ্যমে সরকার ব্যক্তিখাতে হাসপাতাল তৈরীতে সহায়তা দিতে পারে, (২). ব্যক্তিখাতের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের এক্রেডিটেশন, সুশাসন, পর্যানুসরণ, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন পরবর্তী পদক্ষেপ হতে পারে ব্যক্তিখাতের হাসপাতালের দুর্বলতাগুলি দূরীকরণে সরকারিভাবে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান, যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকবে চাহিদা সম্পন্ন হাসপাতাল তৈরী, প্রশিক্ষণ, হাসপাতালের ভিতর জন-অবহিতিকরণ কার্যক্রম, জাতীয় নীতি ও

কৌশলপত্র সম্পর্কে ব্যক্তিখাতের ব্যবস্থাপকদের অবহিতি, হাসপাতালের নিজস্ব নীতি ও কৌশলপত্র তৈরীতে সহায়তা, মান উন্নয়নে সহায়তা ইত্যাদি;

***১৬. অঙ্গদান সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োগ*:** অনাত্মীয় ব্যক্তি অঙ্গ দাতা হতে পারবেন এ বিষয়ে ২০১৯ সালের এক রীট আবেদনের প্রেক্ষিতে উচ্চ আদালতের (হাইকোর্ট) নির্দেশনা অনুযায়ী আইন সংশোধন করতে হবে।

৩). কার্যকর রেফারেল সেবা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাবনা

***১. রেফারেল সেবা এবং প্রাসঙ্গিক পরিষেবা শক্তিশালীকরণ*:** একটি কার্যকর রেফারেল সিস্টেম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো এবং পরিষেবার মান শক্তিশালীকরণ প্রয়োজন, যাতে রোগীরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে প্রয়োজনীয় পরিষেবা অর্জনের জন্য আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলে;

***২. রেফারেল সিস্টেমের জন্য কৌশলগত ও আর্থিক সিদ্ধান্ত*:** ১). প্রতিটি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের ক্যাচমেন্ট এলাকার জনসংখ্যা ও সেবার প্রয়োজনীয়তার আলোকে উপজেলা, জেলা এবং উচ্চতর স্তরের হাসপাতালে উপলব্ধ পরিষেবাগুলির যথার্থতা ও যথেষ্টতা নির্ণয় এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের দক্ষতার স্তর নির্ণয় করে প্রতিষ্ঠানগুলিকে রেফারেল সেবার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে, (২). জনগণকে রেফারেল ব্যবস্থার সুবিধা ও সুফল সম্পর্কে জানাতে হবে, (৩). রেফার করা রোগীদের জন্য রেফারকারী এবং রেফারকৃত রোগীদের গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান উভয়েরই পৃথক পৃথকভাবে রেফারেল পরিষেবা ইউনিট পরিচালনা করতে হবে, (৪). সেবা গ্রহণকালে নৈতিক ঝুঁকি প্রতিরোধ এবং ঔষধের অপব্যবহার রোধে কমিউনিটি/গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৫ টাকা, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ১০ টাকা এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ২০ টাকা ফী নিতে হবে (স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার কল্যাণ সহকারী বা কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (CHCP) কর্তৃক দরিদ্র হিসেবে প্রত্যয়িত ব্যক্তিদের জন্য বিনামূল্যে পরিষেবা প্রদান করতে হবে)। রোগী রেফারেল ছাড়াই এলে উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, জেলা পর্যায়ে বা টারশিয়ারি পর্যায়ে ব্যক্তিখাতের হাসপাতালের মত ফী নিতে হবে।

পরিচ্ছেদ ৪

নেতৃত্ব, সুশাসন ও কর্মসংস্কৃতি

১. ১ ভূমিকা

স্বাস্থ্য একটি মৌলিক রাজনৈতিক পছন্দ। কার্যকর স্বাস্থ্য শাসন এবং বৃহত্তর স্বাস্থ্যসমর্থক শাসন কাঠামো নিশ্চিত করতে হলে সরকারকে নিয়মিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং কখনো কখনো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এসব সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার, প্রদত্ত সেবার মান এবং রোগীর আর্থিক বোঝার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। কিন্তু এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া প্রায়ই বিদ্যমান কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে জটিল হয়ে পড়ে।

আধুনিক বিশ্বে স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে যে বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে, তার প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিকে বাস্তব পদক্ষেপে রূপান্তর করা অত্যন্ত জরুরি। এর জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা—যার মাধ্যমে জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি, সেবার মানোন্নয়ন এবং আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে।বিশ্বজুড়ে বহু সদিচ্ছাপূর্ণ স্বাস্থ্যনীতি ব্যর্থ হয়েছে—নীতির গঠনগত ত্রুটির কারণে নয়, বরং তা বাস্তবায়নে ঘাটতি, অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফল, দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক অদক্ষতার কারণে। কখনো ব্যর্থতার কারণ রাজনৈতিক বা আর্থিক, আবার কখনো তা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার গভীরে—অর্থাৎ শাসনের মধ্যেই নিহিত।

শাসন কাঠামো বুঝে তা শক্তিশালী করা অপরিহার্য, কারণ শাসনের মাধ্যমেই একটি সমাজ ও তার স্বাস্থ্যব্যবস্থা দ্বন্দ্ব মোকাবিলা করে, সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত নেয় এবং কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে। শাসনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো—বহুস্তরীয় ও বৈচিত্র্যময় অংশীজনদের (যেমন—সামাজিক বীমা তহবিল, পেশাজীবী সংগঠন, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, বিভিন্ন স্তরের সরকার, এনজিও এবং বেসরকারি খাত) একটি অভিন্ন লক্ষ্য, সমন্বিত পদক্ষেপ ও জবাবদিহিতার কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসা। দুর্বল শাসন থেকে যে সমস্যা দেখা দেয়, তার মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি, প্রণোদনার বিকৃতি, নীতিগত দখলদারিত্ব, ভুলভাবে পরিকল্পিত নীতি, স্বজনপ্রীতি, অদক্ষতা, জনবিশ্বাসের ঘাটতি এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অভাব।

ভাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শাসনের জন্য কয়েকটি মৌলিক নীতিমালা গুরুত্বপূর্ণ, যার মধ্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ, সততা এবং সক্ষমতা অন্যতম। **স্বচ্ছতা** নিশ্চিত করে যে নীতি, সিদ্ধান্ত এবং সম্পদের ব্যবহার জনগণের কাছে উন্মুক্ত ও সহজবোধ্য হয়, যা বিশ্বাস গড়ে তোলে এবং দুর্নীতির সুযোগ কমায়। **জবাবদিহিতা** হলো স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, নীতিনির্ধারক এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজের জন্য দায়বদ্ধ থাকা, যাতে সেবা মানসম্পন্ন হয় এবং সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার হয়। **অংশগ্রহণ** জনগণ, সুশীল সমাজ এবং অন্যান্য অংশীজনদের স্বাস্থ্যনীতি গ্রহণ ও পরিকল্পনার প্রক্রিয়ায় যুক্ত করার মাধ্যমে সেবাকে আরও প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর করে তোলে। **সততা** মানে হচ্ছে নৈতিকতা বজায় রাখা এবং স্বার্থের সংঘাত থেকে বিরত থাকা, যা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা রক্ষা করে। সর্বশেষে, **সক্ষমতা** নির্দেশ করে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নীতি বাস্তবায়ন, সেবা ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সামর্থ্যকে। এই পাঁচটি নীতির সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী, ন্যায্য, দক্ষ ও জনগণের চাহিদা অনুযায়ী সাড়া দেওয়া স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

স্বাস্থ্যখাতে দীর্ঘমেয়াদি, ন্যায়ভিত্তিক ও টেকসই শাসন কাঠামো গঠনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে একটি সুসংগঠিত সংস্কার প্রক্রিয়া প্রয়োজন, যা শাসনের মৌলিক নীতিসমূহ—স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ, সততা ও সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে। এই কাঠামোর মূল লক্ষ্য হবে "জনমুখী" স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, অর্থাৎ একটি এমন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেখানে সেবা সহজলভ্য, মানসম্পন্ন, সমতাভিত্তিক এবং জনগণের আস্থার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। এতে করে জনগণের স্বাস্থ্যসেবার প্রতি বিশ্বাস বাড়বে, এবং স্বাস্থ্য খাতে বিদ্যমান দুর্বলতা ও অসাম্য দূর করে একটি টেকসই ও মানবিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

১. ২ বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত: **শাসন ব্যবস্থার** দুর্বলতার বাস্তব চিত্র

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় উপরে এইসব শাসনসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জের প্রায় সবগুলোই প্রতিফলিত হয়। যদিও সংবিধানের ১৫ ও ১৮ অনুচ্ছেদে স্বাস্থ্যসেবাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, বাস্তবতা হলো—স্বাস্থ্যখাত দীর্ঘদিন ধরেই অর্থনৈতিক সংকট, অতিনিয়ন্ত্রণ, এবং দুর্বল প্রশাসনিক কাঠামোর শিকার। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় যদিও খাতটির প্রশাসনিক দায়িত্বে, তবে এর কার্যকারিতা রাজনৈতিক প্রভাব, কর্তৃত্বের খণ্ডতা এবং স্বাধীন পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে বারবার প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারি এই কাঠামোগত দুর্বলতাগুলিকে আরও প্রকট করে তোলে। এটি স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ চেইন, ক্রয় প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুতর দুর্বলতা প্রকাশ করে। অতিরিক্ত ব্যয়, ভুয়া নথিপত্র, এবং অসৎ কার্যকলাপের অভিযোগ জনমনে ব্যাপক অনাস্থার সৃষ্টি করে। যদিও কয়েকটি উচ্চপ্রোফাইল মামলায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তা মূলত প্রতীকী ছিল এবং ব্যবস্থাগত ব্যর্থতার মূলে কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি।

১. ৩ শাসন ব্যবস্থার ঘাটতির পথসমূহ :

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে শাসন ব্যবস্থার ব্যর্থতা ব্যাপক এবং তা ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক—উভয় স্তরেই বিদ্যমান:

১. ব্যক্তিগত স্তরের ব্যর্থতা: সরকারি খাতের সকল স্তরে—উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা যেমন মহাপরিচালক থেকে শুরু করে নিম্নস্তরের কর্মচারী পর্যন্ত—দুর্নীতি, অবহেলা এবং পেশাদারিত্বের অভাব মারাত্মক অদক্ষতার সৃষ্টি করেছে। এই ধরনের অসদাচরণ স্বাস্থ্যসেবার মান হ্রাস করেছে এবং জনগণের আস্থা নষ্ট করেছে।

২. প্রাতিষ্ঠানিক স্তরের ব্যর্থতা: ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতার মধ্যে রয়েছে বাজেট পরিকল্পনা, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ, ক্রয় প্রক্রিয়া এবং লজিস্টিক ব্যবস্থাপনার অসঙ্গতি। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবে সরঞ্জাম ক্রয়ে বিলম্ব, সম্পদের অপব্যবহার এবং গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে ব্যর্থতা দেখা গেছে। এর ফলে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সময়মত ও মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

১. ৪ শাসন ব্যবস্থার ঘাটতির কারণসমূহ:

১. প্রাতিষ্ঠানিক ও নেতৃত্বের ব্যর্থতা: নেতৃত্বের দুর্বলতা নীতি বাস্তবায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকে ব্যাহত করেছে। গ্লোবাল হেলথ সিকিউরিটি ইনডেক্স ২০২৩ অনুযায়ী, স্বাস্থ্য শাসনের দিক থেকে বাংলাদেশ ১৯৫টি দেশের মধ্যে ১১৩তম, যা ভারতের (৬৬তম) ও শ্রীলঙ্কার (৭২তম) তুলনায় অনেক পিছিয়ে।

- রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ: ২০২২ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ এর এক গবেষণায় দেখা যায়, ৬০% স্বাস্থ্য নেতৃত্বের পদ রাজনৈতিক প্রভাবে পূরণ হয়েছে, যোগ্যতার ভিত্তিতে নয়।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে ধীরতা: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বিভিন্ন সংকটে যেমন—ডেঙ্গু মহামারী কিংবা কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন সংগ্রহে—বিলম্বে সাড়া দিয়েছে।

১. ৫ স্বাস্থ্য অর্থায়নের অব্যবস্থাপনা চিত্র:

ক. অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা ও ক্রয় দুর্নীতি: ক্রয় ব্যবস্থায় দুর্নীতি বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের অন্যতম বড় ব্যর্থতা। বিশ্বব্যাংক (২০২৩)- এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই খাতে অনিয়মের কারণে প্রতি বছর প্রায় ৩০% বাজেট অপচয় হয়।

- মূল্য স্ফীতি: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ জানিয়েছে, কোভিড-১৯ চলাকালীন কিছু হাসপাতালে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামের দাম ৩০০% পর্যন্ত বেড়েছিল।
- অব্যবহৃত যন্ত্রপাতি: এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর ২০২৪ সালের এক গবেষণায় দেখা যায়, নতুন কেনা ৪০% চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়নি। উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাবে এই সরঞ্জামগুলো পড়ে ছিল।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেটের বড় অংশই বিদেশি মুদ্রায় যন্ত্রপাতি ও ওষুধ ক্রয়ে ব্যয় হয়। তথাকথিত প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়া থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় এজেন্ট ও রাজনৈতিক প্রভাবশালীরা এই প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে থাকে।

উচ্চমূল্যের যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে—যেমন ক্যান্সার চিকিৎসার কোবাল্ট মেশিন বা লিনিয়ার অ্যাক্সেলারেটর—অনেক সময় মন্ত্রণালয় নিজেই চাহিদা তৈরি করে, যদিও সংশ্লিষ্ট হাসপাতালগুলো এমন যন্ত্রপাতির প্রয়োজন জানায়নি। উদাহরণস্বরূপ:

- খুলনার একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দশ বছর ধরে অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পড়ে ছিল।
- বরিশালের একটি হাসপাতালে একটি কোবাল্ট মেশিন নয় বছর ধরে মেরামত ছাড়াই পড়ে ছিল।
- ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউট, ঢাকা-তে শেষ কার্যকর মেশিনটির কার্যক্ষমতা শেষ হওয়ায় রেডিওথেরাপি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

এই ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, ব্যবস্থাপনার ঘাটতি ও জবাবদিহিতার অভাব কীভাবে জনগণের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবাকে ব্যাহত করে।

খ. ক্রয় অনিয়মের একটি দৃষ্টান্ত: একটি বড় দাতাসমর্থিত প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালকের অনভিজ্ঞতা এবং সরকারি আর্থিক নিয়ম না জানার কারণে বড় ধরনের অনিয়ম ঘটে। এই ব্যর্থতার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হয় এবং প্রকল্প পরিচালককে অপসারণ করা হয়। এই অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দেয়, দক্ষ ব্যবস্থাপক ও নেতৃত্বের অভাবে স্বাস্থ্য খাত কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গ. পরিবার পরিকল্পনা উপকরণ ঘাটতি: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনে দেরি হওয়ায় পরিবার পরিকল্পনার উপকরণ, বিশেষত কনডমের সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে নিয়মিত গ্রাহকরা বাজার থেকে ক্রয় করতে বাধ্য হন। এই পরিস্থিতি দেখায় যে, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া না থাকলে বহুদিনের সফল কর্মসূচিও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ঘ. স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নয়নে অনিয়ম ও অকার্যকারিতা:বিশ্বব্যাংকের ২০২৪ সালের পাবলিক এক্সপেনডিচার রিভিউ অনুযায়ী, নবনির্মিত হাসপাতালগুলোর প্রায় ৪৫% জনবল ও মৌলিক ইউটিলিটির অভাবে চালু হতে বিলম্ব ঘটে। অবকাঠামো উন্নয়ন অনেক সময় জনস্বাস্থ্য চাহিদার পরিবর্তে রাজনৈতিক বিবেচনায় পরিচালিত হয়।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৩০% এর বেশি ব্যয় হয় নতুন ভবন নির্মাণে, যেখানে বিদ্যমান অবকাঠামোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় অনেক কম। যদিও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং বৃহৎ প্রকল্পে গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়, তবুও স্বাধীন পর্যালোচনাকারী দলগুলোর সুপারিশ সত্ত্বেও পরিকল্পিত ও চাহিদাভিত্তিক কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি।

১.৬ **রাজনৈতিক প্রভাব ও দুর্নীতি** :

এই অনিয়ম রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি করেছে, ফলে অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় স্থানে হাসপাতাল নির্মাণ হয়েছে যেখানে চিকিৎসক, যন্ত্রপাতি বা কর্মী নেই। অনেক স্থাপনাই কাগজে সম্পূর্ণ হলেও ব্যবহারযোগ্য নয়, যার ফলে জনগণ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয়, আর ঠিকাদারসহ সংশ্লিষ্ট পক্ষ লাভবান হয়।

ক. **রাজনৈতিক দুর্নীতির চক্র:** স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেট বেড়ে যাওয়ায় প্রভাবশালী মহল নির্মাণ প্রকল্প নিয়ে লবিং শুরু করে। মন্ত্রণালয়ের শীর্ষপর্যায়ে এমনকি মন্ত্রী পর্যায়ে এসব সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক সুবিধা বিতরণ করার অভিযোগ রয়েছে। এর ফলে নির্মাণের স্থান ও প্রকৃতি নির্ধারণে রাজনৈতিক প্রভাবশালীরা ও ঠিকাদাররা প্রভাব বিস্তার করে, যার ফলে নিম্নমানের ও অপ্রয়োজনীয় স্থাপনা তৈরি হয়। এভাবে নতুন স্থাপনার সংখ্যা বাড়লেও বিদ্যমানগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে বরাদ্দ না থাকায় বহু প্রতিষ্ঠান অচল হয়ে পড়ে। এই বরাদ্দের ভারসাম্য নতুন নির্মাণ বনাম মেরামত—পুনর্বিবেচনা করা জরুরি।

খ. **যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণে অব্যবস্থা:** জাতীয় ইলেক্ট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট ওয়ার্কশপের পর্যাপ্ত সম্পদের অভাবে দেশব্যাপী হাসপাতালের যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে, যার ফলে প্রায় ৩৫% যন্ত্রপাতি অচল **(বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা -বাংলাদেশ, ২০২৩)**।

এই সংস্থাটি ঢাকাভিত্তিক হওয়ায়, এবং স্থানীয় হাসপাতালে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা না থাকায়, সব মেরামতের প্রস্তাব মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। এই ব্যবস্থায় শুধু সামান্য সমস্যার স্থানীয় সমাধান সম্ভব হয়। সর্বশেষ আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা হালনাগাদ হয়েছে ২০১5 সালে, যা বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মূল্য কাঠামোও পরিবর্তিত হয়েছে, ফলে এখনই রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার ঢেলে সাজানো প্রয়োজন।এই বাস্তবতা দেখায় যে, যন্ত্রপাতি সচল না থাকলে সরকারি সেবা অকার্যকর হয়ে পড়ে, আর রোগীদের প্রাইভেট সেবা নিতে বাধ্য করে—অনেক সময় সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দালালদের সহায়তায়।

গ. স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আর্থিক অনিয়মের চিত্র:

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা থাকলেও বাস্তবে বহু অনিয়ম বিদ্যমান। সরকারি নিরীক্ষা ব্যবস্থা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষা ইউনিট এবং ফিডিউশিয়ারি অ্যাকশন প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও বহু নিরীক্ষা আপত্তি অমীমাংসিত থেকে গেছে।

বিশ্বব্যাংকের পাবলিক ফিন্যান্স ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে একটি গবেষণায় দেখা যায়, ৮,০০০-এর বেশি নিরীক্ষা আপত্তি এখনও নিষ্পত্তি হয়নি, যার মধ্যে অনেকগুলো ১৯৯৮-২০০৩ সালের প্রথম সেক্টর প্রোগ্রামের সময়কার। এই আপত্তিগুলোর আর্থিক মূল্য বিশাল,রাজস্ব বাজেটে ৬,৬৩,০৫৯ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন বাজেটে ৩,৪৭০ কোটি টাকা। এর প্রায় ৯৫% আপত্তি রাজস্ব বাজেট সম্পর্কিত, যার বেশিরভাগই স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর আওতাধীন।

এই পরিস্থিতি মন্ত্রণালয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং জবাবদিহিতার ঘাটতির একটি পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরে।

ঘ. **অর্থ ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট এর ভূমিকা**

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সেক্টরওয়াইড প্রোগ্রামের শুরু থেকেই **অর্থ ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট** সক্রিয় রয়েছে। উন্নয়ন সহযোগীদের চাপের ফলে, ইউনিটটি এর কাঠামো আনুষ্ঠানিকভাবে গঠনের দিকে কিছু অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং জনবলও বৃদ্ধি পেয়েছে।**৪র্থ** স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচি **(২০২৪)** এর শেষ নাগাদ, পূর্বে যেসব অভ্যন্তরীণ অডিট আউটসোর্স করা হতো, সেগুলো এখন **অর্থ ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট** নিজেই সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। তবে, বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিশেষ করে **স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের** আর্থিক ও হিসাব সংক্রান্ত অনিয়মের কারণে এখনও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অডিট আপত্তি রয়ে গেছে।

বিভাগীয় সচিব, যিনি প্রধান হিসাব কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত, তিনিই সরকারী অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য চূড়ান্তভাবে দায়ী। কিন্তু অডিট আপত্তিগুলোর সুষ্ঠু নিষ্পত্তি না হওয়ায় এই দায়িত্ব আরও জটিল ও চাপপূর্ণ হয়ে উঠছে।অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে এই ব্যর্থতা অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার দুর্বলতাকেও নির্দেশ করে, যা পুরো স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় একটি বড় ঝুঁকির ইঙ্গিত দেয়।

ঙ. **ফিডিউশিয়ারি অ্যাকশন প্ল্যান**

ফিডিউশিয়ারি ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে, **স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়)** ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচি (২০১৭-২০২৪) এর সময়ে **ফিডিউশিয়ারি অ্যাকশন প্ল্যান** গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল **মন্ত্রণালয়** ও উন্নয়ন সহযোগীদের যৌথভাবে নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।তবে **জানুয়ারি ২০২৫** পর্যন্ত, মোট **৫৪৪টি অমীমাংসিত অডিট আপত্তি** থেকে যায়, যার আর্থিক মূল্য **৩০১,২৫৯ কোটি টাকা**। এমনকি বিশ্বব্যাংক - আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা -এর মতো প্রধান উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়িত প্রকল্পগুলিতেও অডিট সম্মতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়নি।এটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, **ফিডিউশিয়ারি অ্যাকশন প্ল্যান কিছু প্রচেষ্টা করলেও আর্থিক জবাবদিহিতা ও অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মূল সমস্যাগুলো** যথাযথভাবে সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পরও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না হওয়া, একটি **ফলাফলভিত্তিক ও কার্যকর কৌশলগত হস্তক্ষেপের** প্রয়োজনীয়তাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে।

চ. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের **-এর আর্থিক তদারকি ব্যবস্থা দুর্বল**

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক তদারকি ব্যবস্থাগুলো বর্তমান আর্থিক অনিয়ম ও অডিট আপত্তিগুলো যথাযথভাবে মোকাবিলা করতে পারছে না। যদিও সরকারী অডিট এবং **ফিডিউশিয়ারি অ্যাকশন প্ল্যান** এর মতো ব্যবস্থা চালু আছে, তবুও বহু সমস্যার অমীমাংসিত রয়ে যাওয়া ইঙ্গিত দেয় যে সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনা এখনো নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

১.৭ বেসরকারি স্বাস্থ্যখাতের দুর্বল শাসনব্যবস্থা

১. বেসরকারি খাতের লাইসেন্সিং এবং চিকিৎসা অবহেলা পর্যালোচনা :২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ একটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। **স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের** তথ্য অনুযায়ী, দেশের ১৫,২৩৩টি বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের মধ্যে মাত্র **৪,১২৩টি তাদের লাইসেন্স নবায়ন করেছে**, এবং **১,০২৭টি প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছে**।এটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দুর্বল এবং আইন লঙ্ঘনের মাত্রা অত্যন্ত উদ্বেগজনক, যা **রোগীদের নিরাপত্তা এবং পুরো স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাকে হুমকির মুখে ফেলছে**।

২. লাইসেন্সিং প্রক্রিয়ায় চ্যালেঞ্জসমূহ

- **জটিল অনুমোদন প্রক্রিয়া:** বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের অনুমতি নিতে গিয়ে মালিকদের বারবার অফিস করতে হয়।
- **বিভ্রান্তিকর চাহিদা:** উদাহরণস্বরূপ, **স্বাস্থ্য অধিদপ্তর** পরিবেশ লাইসেন্স চায়, অথচ পরিবেশ অধিদপ্তর প্রথমে হাসপাতাল লাইসেন্স চায়।
- **উচ্চ ফি:** সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ফি বেড়ে যাওয়ায় ছোট ক্লিনিকগুলো লাইসেন্স করতে আগ্রহ হারাচ্ছে।
- **লাইসেন্স পেতে বিলম্ব:** অনেক সময় কাগজপত্র ঠিক থাকলেও ২-৩ বছর পর্যন্ত লাইসেন্স পেতে বিলম্ব হয়, এবং **অননুমোদিত অর্থের দাবি** নিয়ে অভিযোগ রয়েছে।

১.৮ স্বাস্থ্যখাতে দুর্বল অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে এখনো একটি **কার্যকর ও সুলভ অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা** গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি, যা জনসাধারণের স্বাস্থ্যসেবা-সংক্রান্ত অভিযোগগুলো যথাযথভাবে সমাধান করতে পারে—চাই সেটা সরকারি হোক বা বেসরকারি খাতে।

বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল হলো দেশের চিকিৎসক ও দন্তচিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা এবং এদের পেশাগত আচরণ সম্পর্কিত অভিযোগ নিষ্পত্তির এখতিয়ারও এই সংস্থার রয়েছে। তবে, বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল **অভিযোগ নিষ্পত্তিতে খুবই দুর্বল** কর্মদক্ষতা **দেখিয়েছে**, যার ফলে রোগী ও তাদের পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবার মান নিয়ে **বিশ্বাসের ঘাটতি তৈরি হয়েছে**।এই ব্যর্থতা বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় জনগণের আস্থাকে **বিরূপভাবে প্রভাবিত** করছে। বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল -কে **পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করা জরুরি,** যেখানে **চিকিৎসক ও আইনবিদ—উভয়**

ক্ষেত্রের পেশাজীবীদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যেন প্রতিষ্ঠানটি আরও কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে এবং জনগণের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জনগণের অভিযোগ গ্রহণের জন্য **'খুদে বার্তা'-এর মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ ব্যবস্থা** চালু করে এবং পরে **জাতীয় কল সেন্টার (১৬২৬৩)** স্থাপন করে। তবে, এই কল সেন্টার **হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর -এর কাঠামোগত অংশ নয়**, বরং একটি স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত উদ্যোগ। এর ফলে **সমন্বয়ের অভাব ও সীমিত কার্যকারিতা** স্পষ্ট হয়।

১. ৯ প্রতিশ্রুতিশীল নীতি ও বাস্তব ব্যর্থতা

স্বাস্থ্য খাতে শাসনকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করা মানে একক ব্যক্তি বা বিচ্ছিন্ন নীতির পরিবর্তে বৃহত্তর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া। কেবলমাত্র আদর্শ নেতার ওপর নির্ভরতা বা বাজারভিত্তিক ব্যবস্থার সফলতা আশা করা বাস্তবসম্মত নয়। স্বাস্থ্যসেবা একটি সমতা-নির্ভর, টেকসই এবং মানসম্পন্ন ক্ষেত্র—যেখানে সুপরিকল্পিত শাসন কাঠামো ছাড়া গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

স্বাস্থ্য খাতে শাসনের পথে যেসব চিরস্থায়ী বাধা রয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে পর্যাপ্ত অর্থের অভাব, রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি, আইনি জটিলতা, নীতিগত ভুল, শাসনযোগ্যতার সীমাবদ্ধতা এবং মতপার্থক্যের অমোচনীয়তা।এমনকি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত নীতিও ব্যর্থ হতে পারে যদি তার ধারণাগত ভিত্তি দুর্বল হয় অথবা জনগণের মঙ্গল ব্যতিরেকে অন্য স্বার্থে গৃহীত হয়। সুতরাং, শাসন কখনোই দ্বন্দ্ব নির্মূল করতে পারে না; বরং তা সুসংহত ও ন্যায়সংগত উপায়ে দ্বন্দ্ব মোকাবিলার রূপ দিতে পারে।

২ . আগামীর পথে রূপরেখা

এই পরিস্থিতির উত্তরণে বাংলাদেশকে কয়েকটি কৌশলগত সংস্কারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে—পরিষ্কার ও বাধ্যতামূলক নীতিমালা প্রণয়ন, আর্থিক ও কর্মসম্পাদন নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা, প্রমাণ-ভিত্তিক সম্পদ বণ্টন নিশ্চিত করা, এবং নেতৃত্ব গঠনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি জোরদার করা। এই পদক্ষেপগুলো একটি জবাবদিহিমূলক, দক্ষ ও প্রতিক্রিয়াশীল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

সবশেষে, স্বাস্থ্যখাতের শাসন কাঠামোকে একটি প্রতিক্রিয়াশীল সংকট-নির্ভর মডেল থেকে রূপান্তর করে একটি পূর্বপ্রস্তুতিমূলক, অভিযোজনযোগ্য এবং জনবিশ্বাসনির্ভর কাঠামোয় নিয়ে যেতে হবে। স্বাস্থ্য কেবল ঘোষিত অগ্রাধিকার নয়—বরং তা যেন একটি নিশ্চিত অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেজন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও গঠনমূলক প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার।

২.১ নীতিগত ঘাটতি

২.১.১ সকল নীতিতে স্বাস্থ্য অন্তর্ভুক্তি

স্বাস্থ্য একটি বহুমাত্রিক বিষয়, যা কেবল স্বাস্থ্যসেবা খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি শিক্ষা, আবাসন, পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক নীতিসহ একাধিক খাতের দ্বারা প্রভাবিত। বাংলাদেশে "সকল নীতিতে স্বাস্থ্য (HiAP)" বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য হলো—স্বীকার করা যে স্বাস্থ্য এর ফলাফল এসব আন্তঃসম্পর্কিত খাতের ওপর নির্ভরশীল। জাতীয় ও খাতভিত্তিক নীতিগুলোর সঙ্গে স্বাস্থ্যকে সংযুক্ত করতে হলে সরকারকে "সমগ্র সরকারভিত্তিক" দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে।

এই লক্ষ্যে বাংলাদেশে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় করা প্রয়োজন, যেখানে নগর পরিকল্পনা, শিক্ষা, কৃষি, পরিবেশ ও পরিবহন মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট প্রধান খাতসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই নীতিমালাকে স্বাস্থ্য লক্ষ্যসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করবে এবং বিভিন্ন নীতির স্বাস্থ্যগত প্রভাব নিরীক্ষণ করবে ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণের সুপারিশ করবে।এ উদ্যোগ সফল করতে হলে উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক অঙ্গীকার অত্যাবশ্যক। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় সকল মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাস্থ্য অগ্রাধিকার নির্ধারণ নিশ্চিত করতে হবে।

এছাড়াও, সকল নীতিতে স্বাস্থ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হলে স্বাস্থ্যকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জনগণের সক্রিয় সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তারা স্বাস্থ্য নির্ধারকের সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দিকসমূহ বুঝে এবং নগর পরিকল্পনা,

পরিবেশনীতি, শিক্ষা ও অন্যান্য খাতের সঙ্গে সমন্বয় করতে পারে। জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় পর্যায়ে প্রচারাভিযান পরিচালনা করতে হবে, যাতে মানুষ বুঝতে পারে অন্য খাতের নীতির প্রভাব তাদের স্বাস্থ্যেও পড়ে। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি হালনাগাদ করে HiAP নীতিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং একটি শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যা আন্তঃখাতীয় নীতির স্বাস্থ্যগত প্রভাব মূল্যায়ন করবে।সর্বশেষে, HiAP-এর দীর্ঘমেয়াদী বাস্তবায়নের জন্য টেকসই অর্থায়ন কাঠামো যেমন— সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই ও কার্যকর স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবে, যা সমাজের সকল খাতকে উপকৃত করবে।

২.১.২. বাংলাদেশে সংবিধান ও আইনি পর্যায়ে স্বাস্থ্য অধিকার

বাংলাদেশে স্বাস্থ্যকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে, যেখানে বলা হয়েছে— রাষ্ট্র তার নাগরিকদের জন্য মৌলিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, যার মধ্যে স্বাস্থ্যসেবাও অন্তর্ভুক্ত। অনুচ্ছেদ ১৫-এ বলা হয়েছে: "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে জনগণের পুষ্টির মানোন্নয়ন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধন।" এছাড়াও, অনুচ্ছেদ ১৮-এ বলা হয়েছে: "পুষ্টির মানোন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নকে রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য হিসেবে গণ্য করা হবে।"

যদিও এ অনুচ্ছেদদ্বয়ের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকে মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তবুও এগুলোতে সুস্পষ্টভাবে স্বাস্থ্যকে একটি প্রযোজ্য বা বাস্তবায়নযোগ্য অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি—যার ফলে কার্যত এগুলোর প্রয়োগ সীমিত।

সরকারি ব্যবস্থায় বাংলাদেশ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকলেও তা নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি—যেমন পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের অভাব, অতিরিক্ত ভিড়, এবং দুর্বল অবকাঠামো। এসব কারণে দেশের সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্যকে একটি কার্যকর সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কোভিড-১৯ মহামারি এই সীমাবদ্ধতাগুলিকে আরও প্রকট করে তোলে—বিশেষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি কঠিন হয়ে পড়ে। এছাড়াও, বাংলাদেশে এখনো একটি সমন্বিত আইনি কাঠামো নেই, যেমনটি অনেক দেশে আছে যেখানে সার্বজনীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা বা জাতীয় স্বাস্থ্যবীমা কার্যকর রয়েছে।

২.১.৩ আন্তর্জাতিক কাঠামো ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ

আন্তর্জাতিকভাবে স্বাস্থ্যকে একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন চুক্তি ও ঘোষণার মাধ্যমে। জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত ১৯৪৮ সালের "সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা"-র ২৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: "প্রত্যেক মানুষের খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবাসহ এমন এক জীবনযাত্রার অধিকার আছে যা তার এবং তার পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য যথোপযুক্ত।" একইভাবে, "আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সনদ" এর ১২ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রকে জনগণের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সর্বোচ্চ মান অর্জনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা দেওয়া হয়েছে।

অনেক দেশে সংবিধান বা আইনি কাঠামোর মাধ্যমে স্বাস্থ্যকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের সংবিধানে জীবনধারার অধিকার (অনুচ্ছেদ ২১) অন্তর্ভুক্ত করে স্বাস্থ্যকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং "আয়ুষ্মান ভারত" কর্মসূচি চালু করা হয়েছে দরিদ্র জনগণের জন্য। নেপালের সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদে স্বাস্থ্য অধিকার স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয়েছে এবং সরকার সকলের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করেছে। ভূটান ও থাইল্যান্ডের মতো দেশগুলোতে আরও গঠনমূলক ব্যবস্থা রয়েছে—যেমন ভূটানে প্রতিরোধমূলক যত্ন-ভিত্তিক বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং থাইল্যান্ডের "সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা"।

বাংলাদেশের তুলনায় দক্ষিণ এশিয়া ও আসিয়ান অঞ্চলের অনেক দেশ স্বাস্থ্যসেবায় অধিক অগ্রসর। যেমন—ইন্দোনেশিয়ার "জে কে এন " ব্যবস্থা সর্বজনীন স্বাস্থ্যসুরক্ষা নিশ্চিত করে এবং মালয়েশিয়ায় সরকারি ও বেসরকারি উভয় সেবা ব্যবস্থা রয়েছে। কিউবা বিশিষ্ট একটি উদাহরণ, যেখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ও প্রতিরোধভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। চীনের ব্যাপক স্বাস্থ্য বীমা কর্মসূচির মাধ্যমে ব্যাপক জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হয়।

বাংলাদেশে যদিও সংবিধানের ১৫ ও ১৮ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকে কল্যাণমূলক দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তবুও এটি নেপাল বা ভারতের মতো বাস্তবায়নযোগ্য অধিকার নয়। অর্থ বরাদ্দের ঘাটতি, দুর্বল অবকাঠামো এবং গ্রামীণ জনগণের সীমিত প্রবেশাধিকার—এই চ্যালেঞ্জগুলো বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিকারকে বাস্তবায়নের পথে বড় বাঁধা হয়ে আছে। সফল মডেল—যেমন কিউবা, ভূটান এবং থাইল্যান্ড—থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশকে একটি ন্যায়সংগত, কার্যকর ও সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

২.১.৪ সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা

একটি দেশের আইনি কাঠামোর মধ্যে স্বাস্থ্যকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলে তা জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে ১৫ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকে মৌলিক অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে রাষ্ট্র নাগরিকদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করবে।এই সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য একটি পৃথক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা আইন প্রণয়ন করতে হবে, যা নাগরিকদের অধিকার ও রাষ্ট্রের কর্তব্য নির্ধারণ করবে, এবং স্বাস্থ্যখাতে দীর্ঘমেয়াদে ন্যায্যতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে,যাতে এই সেবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা যায়।

এ ধরনের সাংবিধানিক ও আইনি স্বীকৃতি সব শ্রেণির নাগরিককে—আয়ের অবস্থা, সামাজিক অবস্থান বা ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা নির্বিশেষে—গুণগত স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করে। এর ফলে শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার কমে, আয়ু বাড়ে, এবং স্বাস্থ্যগত সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা দীর্ঘমেয়াদে চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস করে এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমায়—যা সামগ্রিকভাবে জনজীবনের মানোন্নয়নে সহায়ক।

২.১.৫ আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ও কৌশলপত্র

বাংলাদেশে বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আধুনিক স্বাস্থ্য চাহিদা, সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও বৈশ্বিক স্বাস্থ্য প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ও কৌশলপত্র পুনর্বিবেচনা ও হালনাগাদ করা জরুরি। এসব হালনাগাদ উদ্যোগ দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর করে তুলবে। নিচে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ আইন, বিধিমালা ও কৌশলপত্রের তালিকা দেওয়া হলো, যা পর্যালোচনা ও হালনাগাদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে:

সকল নীতিতে স্বাস্থ্য (HiAP) এমন একটি নীতি যা স্বীকার করে যে স্বাস্থ্য কেবল স্বাস্থ্যখাতে সীমাবদ্ধ নয় বরং শিক্ষা, আবাসন, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক নীতির মতো অন্যান্য খাত দ্বারা প্রভাবিত। বাংলাদেশে HiAP কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য স্বাস্থ্যকে জাতীয় ও খাতভিত্তিক নীতিমালার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

HiAP বাস্তবায়নে স্বাস্থ্যকর্মীদের সামাজিক স্বাস্থ্য নির্ধারক সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আন্তঃখাতীয় সমন্বয় সক্ষমতা বাড়াতে হবে। একইসঙ্গে, জনগণের মাঝে সচেতনতা বাড়াতে জাতীয় প্রচারাভিযান চালানো জরুরি যাতে তারা অন্যান্য খাতের নীতিমালার স্বাস্থ্য প্রভাব বুঝতে পারে। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি হালনাগাদ করে HiAP নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত, শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি, এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে টেকসই অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই এই উদ্যোগ সফল হবে।

১. বাংলাদেশে চিকিৎসা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, জনস্বাস্থ্য ও ওষুধ সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বিস্তৃত আইন কাঠামো বিদ্যমান। তবে আধুনিক স্বাস্থ্য চাহিদা মোকাবিলায় এসব আইন ও কৌশলপত্রসমূহ হালনাগাদ করা জরুরি। নিম্নোক্ত আইনসমূহ পর্যালোচনার আওতায় আনা প্রয়োজন:

- ড্রাগ কন্ট্রোল অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২

- প্রাইভেট ক্লিনিক ও হাসপাতাল অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২
- নার্সিং কাউন্সিল অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩
- ব্লাড ট্রান্সফিউশন সেফটি আইন, ২০০২
- বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮
- হিউম্যান অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশন আইন, ১৯৯৯
- বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০
- *বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন,২০২৩*
- জাতীয় ঔষধ নীতি, ২০১৬
- কমিউনিটি ক্লিনিক ট্রাস্ট আইন, ২০১৮
- মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৮
- পাবলিক হেলথ (ইমার্জেন্সি প্রভিশন) অর্ডিন্যান্স, ১৯৪৪
- বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স অ্যান্ড সার্জনস আইন, ২০১৮
- জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, ২০১১
- জাতীয় পুষ্টি নীতি, ১৯৯৭ (পরিবর্তিত ২০১৫)
- জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি, ২০২০
- জনসংখ্যা নীতি, ২০০৪ ও ২০১২
- পাবলিক হেলথ অ্যাক্ট, স্থানীয় সরকার আইন ও ফুড সেফটি অ্যাক্ট
- জাতীয় ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ কৌশলপত্র, ২০০৯
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০৫

অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইনসমূহ:

- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫
- বায়ু (দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯
- মোটরযান অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩
- পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭
- বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩
- খাদ্য নিরাপত্তা আইন, ২০১৩
- সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ আইন
- সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা আইন (২০০৯ ও ২০১০)
- বিষ আইন, ১৯১৯
- শ্রম আইন, ২০০৬
- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন আইন, ১৯৯৬

২. আইনের সংস্কার:

সকল সংশ্লিষ্ট পুরাতন আইন পর্যালোচনা ও যুগোপযোগী করা, এবং নতুন আইন প্রণয়ন জরুরি। এতে রোগী সুরক্ষা, আর্থিক স্থায়িত্ব, জবাবদিহিতা ও জরুরি প্রস্তুতি নিশ্চিত হবে। প্রস্তাবিত নতুন আইনসমূহ: **বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন আইন, বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস আইন,জনস্বাস্থ্য অবকাঠামো আইন**, বাংলাদেশ ফুড, ড্রাগ ও মেডিকেল ডিভাইস আইন, ঔষধের মূল্য নির্ধারণ ও প্রবেশাধিকার

আইন, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী ও রোগী নিরাপত্তা আইন, হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক এক্রেডিটেশন আইন, স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন, নারী স্বাস্থ্য আইন, ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ আইন, শিশু বিকাশ কেন্দ্র আইন, বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল আইন। এছাড়াও নিম্নলিখিত আইনের সংশোধন করা প্রয়োজন: বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, মেডিকেল শিক্ষা এক্রেডিটেশন আইন, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন, ফার্মেসি কাউন্সিল আইন, অ্যালায়েড হেলথ প্রফেশনাল কাউন্সিল আইন ইত্যাদি।

উপরোক্ত প্রস্তাবিত ও বিদ্যমান আইনসমূহ সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে একটি সমন্বিত কাঠামো গড়ে তুলতে পারে। এ আইনসমূহ শুধু স্বাস্থ্যখাতেই নয়, বরং পরিবেশ, খাদ্য নিরাপত্তা ও সামাজিক ন্যায়বিচারেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে স্বাস্থ্যখাত আরও নিরাপদ, সমতা ভিত্তিক ও টেকসই হবে এবং বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বিকেন্দ্রীভূত স্বাস্থ্য শাসন কাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

৩.বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন (BHC)

মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

একটি স্বাধীন, শক্তিশালী তদারকি প্রতিষ্ঠান যা স্বাস্থ্যসেবার মান, নিরাপত্তা,দক্ষতা, স্বচ্ছতা, নীতিগত তত্ত্বাবধান, সেবা নিয়ন্ত্রণ এবং রোগীর অধিকার রক্ষা, স্বাস্থ্যকর্মীদের মানদন্ড নির্ধারণ এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করে। একটি **স্থায়ী স্বাস্থ্য কমিশন** সক্রিয়ভাবে স্বাস্থ্যসেবা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে নাগরিকদের মানসম্পন্ন চিকিৎসা প্রাপ্তি নিশ্চিত করে এবং সেবাদানকারীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনে।বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন বর্তমান স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশনের একটি আধুনিক ও স্থায়ী রূপ হিসেবে কাজ করবে। এর প্রধান হবেন একজন স্বনামধন্য **চিকিৎসক,** যার মর্যাদা থাকবে **আপিল বিভাগের বিচারপতির সমতুল্য**। এটি সরাসরি সরকার প্রধানের কাছে রিপোর্ট করবে এবং জবাবদিহিতার জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন সংসদে জমা দেবে।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা যদি প্রয়োজন মনে করেন, তবে বর্তমান স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশনের কার্যক্রম চলমান রাখা যেতে পারে, যতক্ষণ না একটি নতুন, স্থায়ী স্বাস্থ্য কমিশন গঠিত হয়। এই নতুন কমিশন স্বাস্থ্যখাতের সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং নীতিগত পরিবর্তন কার্যকর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মূল কার্যাবলি: স্বাস্থ্যসেবা, চিকিৎসা শিক্ষা ও আর্থিক স্বচ্ছতা নিয়ন্ত্রণ; নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোর শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী করা; মানসম্পন্ন সেবা নিশ্চিত করা এবং স্বাধীন নিরীক্ষা ও তদন্তের মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস করা।

শাসন কাঠামো : একজন সিনিয়র আপিল বিভাগীয় বিচারপতির স্তরের চিকিৎসককে চেয়ারম্যান করা হবে, এবং সদস্যদের মধ্যে চিকিৎসক, অর্থনীতিবিদ, আইনজীবী ও সমাজকর্মী থাকবেন, যারা হাইকোর্ট বিভাগের সিনিয়র বিচারপতির স্তরের হবেন, যা আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিত করবে।

৩.১. মেডিকেল এডুকেশন বিভাগ

বাংলাদেশ হেলথ কমিশনের অধীনে আলাদা অ্যান্ডারগ্র্যাজুয়েট ও পোস্টগ্র্যাজুয়েট শাখার মাধ্যমে মেডিকেল শিক্ষার তত্ত্বাবধান।

অ্যান্ডারগ্র্যাজুয়েট শাখা: স্বায়ত্তশাসিত মেডিকেল কলেজগুলোর তত্ত্বাবধান করবে।

পোস্টগ্র্যাজুয়েট শাখা: স্বায়ত্তশাসিত বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস (BCPS) ও মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের

ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রম তদারকি।

৩.২. ক্লিনিক্যাল কেয়ার বিভাগ

রোগীর জন্য মানসম্পন্ন চিকিৎসা, কার্যকর চিকিৎসা প্রক্রিয়া এবং স্বাস্থ্যসেবার মানসমতা নিশ্চিত করে। BICE ও BHCA একত্রে কাজ করবে সেবার গুণগত মান উন্নয়নে এবং **ক্লিনিক্যাল** সেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রম তদারকি।

৩.৩. বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব হেলথ এন্ড কেয়ার এক্সেলেন্স (BICE)

১. যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্যসেবায় NICE (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর হেলথ অ্যান্ড কেয়ার এক্সেলেন্স) এবং CQC (কেয়ার কোয়ালিটি কমিশন) উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশেও অনুরূপ একটি কাঠামো গড়ে তোলা যেতে পারে, যদিও নাম ভিন্ন হতে পারে, যা স্বাস্থ্যসেবার দক্ষতা বাড়াতে সহায়ক হবে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব হেলথ এন্ড **কেয়ার এক্সেলেন্স (BICE)** NICE-এর মতো একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে পারে, যা প্রমাণভিত্তিক দিকনির্দেশনা ও সুপারিশ প্রদান করবে স্বাস্থ্যনীতি, চিকিৎসা প্রয়োগ এবং সেবা প্রদানের মানোন্নয়নের জন্য।BICE এর লক্ষ্য হলো প্রমাণভিত্তিক গাইডলাইন তৈরি ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান পর্যবেক্ষণ। যুক্তরাজ্যের NICE-এর আদলে এটি ক্লিনিকাল কেয়ার, সম্পদ বণ্টন ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার দক্ষতা উন্নত করবে।

২. চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ, স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদ এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি বহুমাত্রিক দল বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উপযোগী গাইডলাইন তৈরি করবে, যেখানে বৈশ্বিক ভালো অনুশীলন অন্তর্ভুক্ত থাকবে। মূল ফোকাস: মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, সংক্রামক রোগ, অসংক্রামক রোগ, শিশু বিকাশ, নারী স্বাস্থ্য, পেশাগত স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা সেবা ও স্যানিটেশন।
৩. কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য দরকার হবে গাইডলাইনের ডিজিটাল প্রচার, স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ ও কমিউনিটি সম্পৃক্ততা, যার মাধ্যমে প্রমাণভিত্তিক ও রোগী-কেন্দ্রিক সেবা নিশ্চিত হবে।

৩. ৪. বাংলাদেশ হেলথ কেয়ার ইমপ্রুভমেন্ট (BHCI) বিভাগ

১. **বাংলাদেশ হেলথ কেয়ার ইমপ্রুভমেন্ট (BHCI)** একটি স্বাধীন নিয়ন্ত্রক সংস্থা, যা রোগী নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবার গুণমান এবং নৈতিকতা নিশ্চিত করে। এটি হাসপাতাল, ক্লিনিক, কেয়ার হোম ও ডেন্টাল সেবা তদারকি করে BICE-এর মানদণ্ড অনুযায়ী।
২. স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিরাপত্তা, কার্যকারিতা, সাড়া দেয়ার ক্ষমতা, সেবার গুণমান এবং নেতৃত্বের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে। BHCI -এর থাকবে প্রয়োগ ক্ষমতা—যেমন সতর্কতা, জরিমানা বা প্রতিষ্ঠান বন্ধ—রোগীর নিরাপত্তা নিশ্চিত ও সেবার মান বজায় -এর মতো ভূমিকা পালন করতে পারে, যা স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করবে, মান নিশ্চিত করবে এবং রোগীর নিরাপত্তা রক্ষা করবে।

এই দুটি সংস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাস্থ্যনীতি সুসংহত করতে পারবে, সেবা প্রদানের মানোন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারবে এবং সার্বিকভাবে স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান উন্নত করতে পারবে, যেমনটি যুক্তরাজ্য NICE এবং CQC-এর মাধ্যমে করেছে।

৩.৫. রেগুলেটরি ওভারসাইট বিভাগ

BMDC, BMEAC, BMRC, স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি এবং PCB সহ প্রধান নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোকে শক্তিশালী করে চিকিৎসা শিক্ষা, লাইসেন্সিং ও গবেষণায় মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা। BMRC ও NIPORT-এর অধীনে একটি জাতীয় গবেষণা নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করে এটিকে স্বাস্থ্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে উন্নীত করা হবে।

৩.৬/ পাবলিক হেলথ বিভাগ

সারাদেশব্যাপী ক্যাম্পেইন, ডিজিটাল সচেতনতা এবং কমিউনিটি কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও রোগ প্রতিরোধে কাজ করে। মূল উদ্যোগ: বিদ্যালয়ভিত্তিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি, টিকাদান কার্যক্রম, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সচেতনতা, এনসিডি প্রতিরোধ, পরিবেশ স্বাস্থ্য; এবং জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কার্যক্রম তদারকি।

৩.৭. হেলথ ল্যাবরেটরি ও ডায়াগনস্টিকস বিভাগ

দেশব্যাপী ডায়াগনস্টিক সেবার মান নিয়ন্ত্রণ, স্বীকৃতি, ও মানদণ্ড ও মানসম্পন্নকরণ নিশ্চিত করে, ফলে নির্ভরযোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৩.৮. খাদ্য, ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম বিভাগ

ওষুধ নিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপত্তা ও চিকিৎসা সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণ করে।জাতীয় ফার্মেসি নেটওয়ার্ক পরিচালনা করবে।

৩.৯. এনজিও, নন-প্রফিট ও প্রাইভেট হাসপাতাল বিভাগ

বাংলাদেশজুড়ে স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার ও মানোন্নয়নে এনজিও, নন-প্রফিট এবং বেসরকারি হাসপাতালসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। এনজিও, নন-প্রফিট ও বেসরকারি হাসপাতালের মধ্যে সমন্বয় করবে স্বাস্থ্যসেবার গুণমান ও প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য।

৩. ১০. স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিভাগ

সেবাগ্রহীতার অভিযোগ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে একটি আধুনিক ডিজিটাল অভিযোগ নিষ্পত্তি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হবে। বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল, বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল, বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল, বাংলাদেশ অ্যালাইড হেলথ প্রফেশনালস কাউন্সিল (প্রস্তাবিত) -এর আইনগত ক্ষমতা ও কাঠামোকে আরও কার্যকর করে শুধু নিবন্ধন নয়, বরং নীতি প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা হবে। বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল, - এর তত্ত্বাবধানে একটি ডিজিটাল অভিযোগ প্ল্যাটফর্ম চালু করতে হবে, ১৬২৬৩ কল সেন্টারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া।

৩. ১১ অ্যালায়েড এবং ট্র্যাডিশনাল হেলথ প্রফেশনাল বিভাগ

অ্যালায়েড হেলথ পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন এবং পেশাগত মান নিয়ন্ত্রণ করে উচ্চমানের রোগীসেবা নিশ্চিত করে।

৩. ১২. বাংলাদেশ হেলথ টেকনোলজি অ্যাসেসমেন্ট (HTA) বিভাগ

স্বাস্থ্য তথ্য বিশ্লেষণ এবং প্রমাণভিত্তিক নীতিনির্ধারণ তদারকি করে। স্বাস্থ্য ইনফরমেটিক্স, অর্থনৈতিক মূল্যায়ন ও পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের সমন্বয়ে উন্নত স্বাস্থ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। ক্যান্সার, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, কিডনি রোগ ও সংক্রামক রোগের ব্যাপক রেজিস্ট্রি গড়ে তোলে। এটি গবেষণা, নীতিনির্ধারণ ও সম্পদ বরাদ্দে সহায়ক। স্বাস্থ্য অর্থনীতি কার্যক্রম তদারকি করে।

৩. ১৩. সেক্টোরাল হেলথ কোঅর্ডিনেশন বিভাগ

স্থানীয় সরকার, প্রতিরক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্বরাষ্ট্র, রেলপথসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রায়শই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়হীনভাবে কাজ করে। এটি তথ্যভিত্তিক নীতিনির্ধারণ, সম্পদ বণ্টন এবং জরুরি সাড়া প্রদানে সহায়ক হবে।

সকল সেক্টোরাল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান এবং চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় -এর অধীন সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থা থেকে জাতীয় লাইসেন্স নিতে হবে।এই লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া স্বাস্থ্যসেবায় মানসম্পন্নতা, অভিন্ন শিক্ষানীতি এবং নিয়ন্ত্রণ তদারকি নিশ্চিত করবে, যা জাতীয় স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থার একীকরণে সাহায্য করবে। এতে প্রমাণভিত্তিক নীতিনির্ধারণ, সম্পদ বণ্টন ও জরুরি সাড়াদানে সক্ষমতা বাড়বে। রোগী সেবার সমন্বয় বাড়বে, তথ্য বিচ্ছিন্নতা রোধ হবে, এবং সার্বিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার দক্ষতা বাড়বে।

৩. ১৪. সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্পেশালাইজড হেলথকেয়ার (CASH) বিভাগ

বিদেশে চিকিৎসার জন্য রোগী অভিবাসন হ্রাস করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের লক্ষ্যে একটি পৃথক উইং গঠন করা হবে। এটি ক্যান্সার, ট্রান্সপ্লান্ট, হৃদরোগ, বন্ধ্যাত্ব এবং উন্নত ডায়াগনস্টিকের জন্য সেন্টার অব এক্সেলেন্স গড়ে তুলবে।
পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP), দক্ষ জনবল উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি (JCI, ISO) অর্জনের মাধ্যমে দেশীয় স্বাস্থ্যসেবায় রোগীদের আস্থা বাড়াবে এবং বাংলাদেশকে আঞ্চলিক মেডিকেল ট্যুরিজম কেন্দ্রে রূপান্তরিত করবে।

৩. ১৫. আইন বিভাগ : সকল সংশ্লিষ্ট পুরাতন আইন পর্যালোচনা ও যুগোপযোগী করা, এবং নতুন আইন প্রণয়ন জরুরি। এতে রোগী সুরক্ষা, আর্থিক স্থায়িত্ব, জবাবদিহিতা ও জরুরি প্রস্তুতি নিশ্চিত হবে।

৩. ১৬. স্বাস্থ্য অর্থ ও ক্রয় বিভাগ

স্বাস্থ্যসেবা খাতে কার্যকর তহবিল ব্যবস্থাপনা ও ক্রয় প্রক্রিয়া তদারকি করে।

৩. ১৭. স্বাস্থ্য নিরীক্ষা ও দুর্নীতি দমন বিভাগ

নিয়মিত নিরীক্ষা পরিচালনা ও দুর্নীতিবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সততা নিশ্চিত করে।

৪. স্বাস্থ্যখাতে স্বাধীন পাবলিক সার্ভিস কমিশন:

স্বাস্থ্য খাতে প্রথম শ্রেণি, দ্বিতীয় শ্রেণি এবং গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে নিয়োগ ও পদোন্নতির প্রক্রিয়া পরিচালনা করবে এই কমিশন। নিয়মিত নিয়োগ প্রক্রিয়া ও স্বচ্ছতা আনয়ন করার লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) গঠন করতে হবে। এতদ্ব্যতীত একটি উচ্চপর্যায়ের সার্চ কমিটি গঠন করা হবে, যা BHS প্রধান, উপপ্রধান, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ, মহাপরিচালক, মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ চিকিৎসা ও দন্ত চিকিৎসা পরিষদ,চেয়ারম্যান ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগ্যতা, স্বচ্ছতা ও রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রেখে নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও নিয়োগের সুপারিশ পরিচালনা করবে। গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ জাতীয় সংসদকে অবহিত করবে।এই উদ্যোগ জনস্বাস্থ্য ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৫. বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস (Bangladesh Health Service) গঠন :

পেশাদারিত্ব, দক্ষতা ও জবাবদিহিমূলক সেবার মান নিশ্চিত করতে বিদ্যমান স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ক্যাডারকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে প্রশাসনিকভাবে স্বায়ত্তশাসিত ও পেশাভিত্তিক একটি নতুন সিভিল সার্ভিস ক্যাডার- বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস (BHS) গঠন করতে হবে। স্বাস্থ্যসেবাকে বিকেন্দ্রীকরণ করে বিভাগীয় ,জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্বশাসিত স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে। বিভাগীয় পর্যায়ে ১১ টি আঞ্চলিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ থাকবে এর মধ্যে থাকবে ঢাকা মেট্রোপলিটন , চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম। বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস এর জন্য একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় গঠন করা হবে, চিফ অব হেলথ, যার নেতৃত্বে থাকবেন একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক, যিনি মুখ্য সচিব পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবেন। তাঁর অধীনে ক্লিনিকাল সেবা, জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা—এই তিনটি প্রধান খাত পরিচালনার জন্য তিনজন ডেপুটি চিফ অব হেলথ নিযুক্ত হবেন, যাঁরা প্রত্যেকে জ্যেষ্ঠ সচিব পদমর্যাদার হবেন। প্রতিটি খাতের অধীনে একজন করে মহাপরিচালক পদ সৃষ্টি করা হবে, যাঁরা সচিব-সমমানের পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং কার্যক্রম পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট ডেপুটি চীফ অব হেলথ অধীন কাজ করবেন।কর্মরত জনবলের জন্য একটি স্বতন্ত্র চাকরি বিধি ও পৃথক বেতন কাঠামো প্রণয়ন করতে হবে, যাতে পেশাদারিত্ব, দক্ষতা ও জবাবদিহিমূলক সেবার মান নিশ্চিত হয়। সর্বজনীন ও সহজলভ্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য সংশ্লিষ্ট খাতের সাথে এবং জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে সমন্বিত ভাবে সেবার ব্যবস্থাপনা করতে হবে। বাংলাদেশ হেলথ সাভিস গঠনের জন্য স্বাস্থ্য সেবা,পরিবার পরিকল্পনা সেবা,নার্সিং সেবা ও নগর পৌর স্বাস্থ্য সেবার অবকাঠামোর পুন:গঠন করতে হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন মহাপরিচালকত্ব (যেমন DGHS, DG মেডিকেল এডুকেশন, পরিবার পরিকল্পনা, নার্সিং, টোব্যাকো কন্ট্রোল, হেলথ ইকোনমিক্স, TEMO ও NEMEW) একত্র করে একটি একক সংস্থা — বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস (BHS) গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে আলাদা সেক্রেটারিয়েট থাকবে না; বরং একটি কেন্দ্রীয় BHS সেক্রেটারিয়েট থাকবে, যেখান থেকে প্রশাসনিক কাজ পরিচালিত হবে। DG পর্যায় থেকে সব ফাইল সরাসরি BHS-এর Deputy Chief ও Chief-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি হবে। এই কাঠামো স্বাস্থ্যখাতে দক্ষতা, সমন্বয় ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে।

বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন

চেয়ারম্যান

বিভাগীয় সদস্য (১৬জন)

০১	মেডিকেল এডুকেশন বিভাগ
০২	ক্লিনিক্যাল কেয়ার বিভাগ
০৩	বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব হেলথ এন্ড কেয়ার এক্সেলেন্স (BICE) বিভাগ
০৪	বাংলাদেশ হেলথ কেয়ার ইমপ্রুভমেন্ট (BHCI) বিভাগ
০৫	রেগুলেটরি ওভারসাইট বিভাগ
০৬	পাবলিক হেলথ বিভাগ
০৭	হেলথ ল্যাবরেটরি ও ডায়াগনস্টিকস বিভাগ
০৮	খাদ্য, ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম বিভাগ
০৯	এনজিও, নন-প্রফিট ও প্রাইভেট হাসপাতাল বিভাগ
১০	সেবাগ্রহীতার অভিযোগ নিষ্পত্তি বিভাগ
১১	অ্যালায়েড এবং ট্র্যাডিশনাল হেলথ প্রফেশনাল বিভাগ
১২	বাংলাদেশ হেলথ টেকনোলজি অ্যাসেসমেন্ট (HTA) বিভাগ
১৩	সেক্টোরাল হেলথ কোঅর্ডিনেশন বিভাগ
১৪	সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্পেশালাইজড হেলথকেয়ার (CASH) বিভাগ
১৫	আইন বিভাগ
১৬	স্বাস্থ্য অর্থ ও ক্রয় বিভাগ
১৭	স্বাস্থ্য নিরীক্ষা ও দুর্নীতি দমন বিভাগ

বাংলাদেশ হেল্থ সার্ভিস (বিএইচএস)

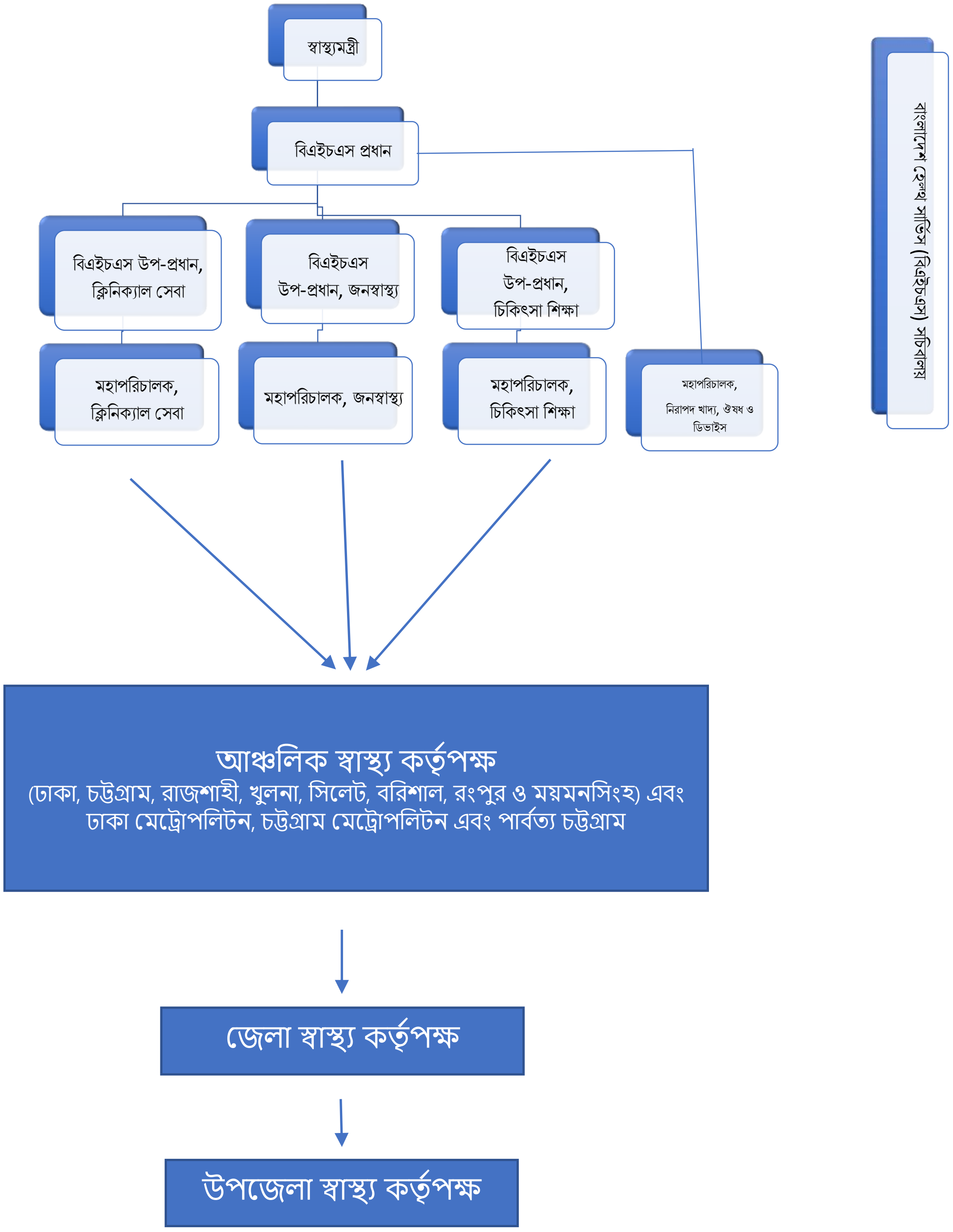

Note: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন মহাপরিচালকত্ব যেমন)DGHS, DG মেডিকেল এডুকেশন, পরিবার পরিকল্পনা, নার্সিং, টোব্যাকো কন্ট্রোল, হেলথ ইকোনমিক্স, TEMO ও NEMEW) একত্র করে একটি একক সংস্থা — **বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস)BHS)** গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে আলাদা সেক্রেটারিয়েট থাকবে না; বরং একটি কেন্দ্রীয় BHS সেক্রেটারিয়েট থাকবে, যেখান থেকে প্রশাসনিক কাজ পরিচালিত হবে। DG পর্যায় থেকে সব ফাইল সরাসরি BHS-এর Deputy Chief ও Chief-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি হবে। এই কাঠামো স্বাস্থ্যখাতে দক্ষতা, সমন্বয় ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে।

বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস সচিবালয়ের কাঠামো (অর্গানোগ্রাম):

বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস সচিবালয়:

- **স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় (Ministry of Health) – মন্ত্রী**
- **প্রধান হবেন** মুখ্য **সচিবের সমমানের একজন চিকিৎসক (চিকিৎসক হওয়া বাধ্যতামূলক)** ।
- **তিনজন** ডেপুটি চিফ অব হেলথ **হবেন** সিনিয়র সচিব সমমান **(চিকিৎসক বাধ্যতামূলক) – চিকিৎসা শিক্ষা, ক্লিনিকাল কেয়ার এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য।**
- **তিনটি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রধান (সচিব সমমানের পদে) – চিকিৎসা শিক্ষা, ক্লিনিকাল কেয়ার এবং জনস্বাস্থ্য।**

ডেপুটি চিফ অব হেলথ (সিনিয়র সচিব সমমান):

১. ডেপুটি চিফ, ক্লিনিকাল সেবা

২. ডেপুটি চিফ, চিকিৎসা শিক্ষা

৩. ডেপুটি চিফ, জনস্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রধান (সচিব সমমান):

১. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রধান, ক্লিনিকাল সেবা

২. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রধান, চিকিৎসা শিক্ষা

৩. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রধান, জনস্বাস্থ্য ও প্রাথমিক সেবা

ক্লিনিকাল সেবা অধিদপ্তরের প্রধানের অধীনঃ

১ অতিরিক্ত প্রধান (মানব সম্পদ)

২ অতিরিক্ত প্রধান (এনজিও ও অলাভজনক স্বাস্থ্য সেবা)

৩ অতিরিক্ত প্রধান (বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেবা)

৪ অতিরিক্ত প্রধান (ক্লিনিকাল নার্সিং)

৫ অতিরিক্ত প্রধান (অর্থ ও ক্রয়)

৬ অতিরিক্ত প্রধান (স্বাস্থ্য অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান)

- যুগ্ম প্রধান – প্রয়োজনে
- উপ প্রধান – প্রয়োজনে
- সহকারী প্রধান – প্রয়োজনে

চিকিৎসা শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধানের অধীনঃ

১ অতিরিক্ত প্রধান (মানব সম্পদ)

২ অতিরিক্ত প্রধান (চিকিৎসা শিক্ষা)

৩ অতিরিক্ত প্রধান (নার্সিং শিক্ষা)

৪ অতিরিক্ত প্রধান (**অ্যালায়েড এবং ট্র্যাডিশনাল** স্বাস্থ্য শিক্ষা)

৫ অতিরিক্ত প্রধান (স্বাস্থ্য অর্থ ও ক্রয়)

৬ অতিরিক্ত প্রধান (স্বাস্থ্য অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান)

- যুগ্ম প্রধান – প্রয়োজনে
- উপ প্রধান – প্রয়োজনে
- সহকারী প্রধান – প্রয়োজনে

জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রধানের অধীনঃ

১ অতিরিক্ত প্রধান (শহরভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা)
২ অতিরিক্ত প্রধান (গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা)
৩ অতিরিক্ত প্রধান (জনস্বাস্থ্য নার্সিং)
৪ অতিরিক্ত প্রধান (পরিবার পরিকল্পনা)
৫ অতিরিক্ত প্রধান (মানব সম্পদ)
৬ অতিরিক্ত প্রধান (স্কুলভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা)
৭ অতিরিক্ত প্রধান (স্বাস্থ্য অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান)
৮ অতিরিক্ত প্রধান (সংক্রামক রোগ)
৯ অতিরিক্ত প্রধান (অসংক্রামক রোগ)
১০ অতিরিক্ত প্রধান (জনস্বাস্থ্য অর্থ ও ক্রয়)

- যুগ্ম প্রধান – প্রয়োজনে
- উপ প্রধান – প্রয়োজনে
- সহকারী প্রধান – প্রয়োজনে

বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস বিকেন্দ্রীকৃত কাঠামো

১. বিভাগীয় পর্যায়ে, ঢাকা মহানগরী, চট্টগ্রাম মহানগরী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম: আঞ্চলিক স্বাস্থ্যসেবা বিভাগীয় প্রধান, বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস **(অতিরিক্ত সচিব সমতুল্য) - ১১ জন**

২. জেলা পর্যায়ে: জেলা স্বাস্থ্যসেবা প্রধান, বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস **(**যুগ্ম সচিব **সমতুল্য)**

৩. উপজেলা পর্যায়ে: উপজেলা স্বাস্থ্যসেবা প্রধান, বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস **(উপসচিব সমতুল্য)**

উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ যা জনস্বাস্থ্য ও প্রাথমিক সেবা অধিদপ্তরের প্রধানের অধীনে থাকবে: মাতৃ, নবজাতক, শিশু ও কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্য, মাতৃ, শিশু, প্রজনন ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা - মাঠপর্যায়ে সেবা প্রদান, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কমিউনিটি বেইজড হেলথ কেয়ার), কমিউনিটি ক্লিনিক হেলথ সাপোর্ট ট্রাস্ট, জাতীয় পুষ্টি সেবা, যক্ষ্মা-কুষ্ঠ এবং এইডস-এসটিডি নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও প্রচার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ।

জনস্বাস্থ্য কর্মীবাহিনী ও অবকাঠামো শক্তিশালীকরণের জন্য উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে রোগ নিয়ন্ত্রণ, পুষ্টি ও জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তার নতুন পদ সৃষ্টি করা হবে, এবং প্রতিটি অনুমোদিত স্কুলে পাবলিক হেলথ নার্স নিয়োগ দেওয়া হবে। রোগ নজরদারি ও খাদ্য নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণে ল্যাবরেটরি টেকনোলজিস্ট নিয়োগ দেওয়া হবে। আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট র মতো প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় জনস্বাস্থ্য বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হবে। স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার কল্যাণ সহকারী ও কমিউনিটি মেডিকেল সহকারীদের জন্য স্পষ্ট ক্যারিয়ার পথ তৈরি হবে এবং ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে নতুন স্বাস্থ্য পরিদর্শকের পদ সৃষ্টির মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য তত্ত্বাবধান জোরদার করা হবে।

হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায় জেলা ও উপজেলা প্রধানরা ক্লিনিকাল ম্যানেজমেন্টে যুক্ত থাকবেন না, বরং এটি পরিচালনা করবেন আবাসিক মেডিকেল অফিসার ও হাসপাতাল পরিচালক। জনস্বাস্থ্য ইউনিট হাসপাতালের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা ও আইনি ব্যবস্থা তদারকি করবে। কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার, স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারী -দের 'কমিউনিটি হেলথ প্রোমোটার' হিসেবে নাম পরিবর্তন করে মাঠ ও ক্লিনিক পর্যায়ে নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করা হবে।

পেশাগত বিকাশ ও কর্মে উৎসাহ বাড়াতে মেডিকেল অফিসার, কনসালট্যান্ট ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য আলাদা ক্যারিয়ার রোডম্যাপ তৈরি করা হবে ।

৬. প্রস্তাবিত রূপান্তর প্রক্রিয়া

১. পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য অর্থনীতি, নার্সিং, তামাক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কশপ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ অ্যান্ড টিসি)**এবং** যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো) **কে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে একীভূত** করা হবে । এইসব সংস্থার সেবা প্রস্তাবিত বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিসেস-এর সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসমূহের সাথে উপযুক্তভাবে একীভূত করা হবে।

২. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস **স্বাস্থ্য ক্যাডারকে একটি স্বতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসিত ক্যাডারে রূপান্তর:** এই ক্যাডারটি বিচারিক ক্যাডারের ন্যায় একটি স্বাধীন সিভিল সার্ভিস ক্যাডার হবে এবং এর নাম হবে **বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিসেস**। প্রত্যেক কর্মকর্তাকে বিকল্প বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।

৩. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস **পরিবার পরিকল্পনা - মেডিকেল (প্রযুক্তিগত) কর্মকর্তাদের বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিসেস - এ একীভূত করা হবে।**

৪. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস **পরিবার পরিকল্পনা (সাধারণ) কর্মকর্তাদের শিক্ষা, দক্ষতা ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিফর্ম কমিশনের প্রস্তাবিত নতুন ক্যাডারে একীভূত করা হবে। তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থাও থাকবে।**

৫. মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের সেবায় শিক্ষা, দক্ষতা ও পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে একীভূত করা হবে। তাদেরও বিকল্প বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকবে।

৬. রূপান্তর প্রক্রিয়া : রূপান্তর প্রক্রিয়াটি সম্পন্নে প্রায় ২ বছর লাগবে এবং একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন প্রয়োজন। স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন এ পরিকল্পনায় কার্যকর সহযোগিতা দিতে পারে।

৭. **নিয়ন্ত্রক সংস্থা (Regulatory Bodies)**

বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল, বাংলাদেশ মেডিকেল এডুকেশন অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল, বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল, স্টেট মেডিকেল **ফ্যাকাল্টি** এবং বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল এর মতো নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি সরকারি, বেসরকারি এবং এনজিও স্বাস্থ্যসেবার ওপর তদারকি করে। তবে, সম্পদের ঘাটতি এবং ব্যাপক পর্যবেক্ষণের অভাবের কারণে তাদের কার্যকারিতা প্রায়ই বাধাগ্রস্ত হয়।

সমস্ত নিয়ন্ত্রক সংস্থা প্রতিবছর জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশনের কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন জমা দেবে। জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন সমস্ত নিয়ন্ত্রক সংস্থার কার্যক্রম তদারকি করবে।

ক. **বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (BMDC):**

বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল এর শাসন ব্যবস্থায় বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যা স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের কার্যকারিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যদিও মেডিকেল শিক্ষা ও চিকিৎসা পেশাজীবীদের লাইসেন্স প্রদান নিয়ন্ত্রণ করে, তবুও এটি পর্যাপ্ত তদারকির অভাবে ভুগছে।

বর্তমানে দেশে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৭২-এ দাঁড়িয়েছে, যেখানে প্রায় ৫০% শিক্ষার্থী পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছাড়াই পাশ করছে (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ২০১৯)। এছাড়াও, লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়া ধীরগতির, যা প্রায়ই ছয় মাসের বেশি সময় নেয়, ফলে খাতে দক্ষ পেশাজীবীর ঘাটতি আরও বাড়ে (BMDC বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২০)। চিকিৎসা কলেজগুলোর জন্য জার্নালে গবেষণা প্রকাশ বাধ্যতামূলক করার ফলে অনেক নিম্নমানের গবেষণা হচ্ছে, যা সম্পদের অপচয় এবং দেশের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে কার্যকর অবদান রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে।

বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল বাংলাদেশের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের মেডিকেল ডিগ্রির পাঠ্যক্রম অনুমোদনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। কিন্তু দেশে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে পাঠ্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য ও কার্যকারিতার ঘাটতি রয়েছে,

যার ফলে চিকিৎসা শিক্ষার মান অসম হয়ে পড়ছে। এই শাসন ঘাটতির পাশাপাশি দুর্বল পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার কারণে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করা স্বাস্থ্যসেবাকর্মীদের মানেও বৈষম্য দেখা যায়। এছাড়াও, মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা ও অন্যান্য পরীক্ষার শাসনব্যবস্থা প্রায়ই স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতার অভাবে সমালোচিত হয়, যা দুর্বল মানের শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার একটি বড় কারণ। বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল, মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল (MATS)-এর মতো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত যোগ্যতাগুলোর ওপর কর্তৃত্ব রাখতেও সমস্যায় পড়ে, যার ফলে স্বাস্থ্যসেবাকর্মীদের মান নিয়ন্ত্রণ আরও জটিল হয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি স্বীকৃত MBBS বা BDS ডিগ্রি প্রাপ্ত নন, তিনি যদি চিকিৎসা অনুশীলন করেন, তবে তা আইনত বেআইনি কার্যক্রম হিসেবে গণ্য হবে। MBBS বা BDS ডিগ্রি ব্যতীত কেউ নিজেকে 'চিকিৎসক' পরিচয়ে রোগী দেখতে পারবেন না। BMDC এ বিষয়ে একটি চিঠি প্রদান করে বিষয়টি অবহিত করবে এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানাবে। কোনো বিদেশি চিকিৎসক যদি বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল -র অনুমতি ব্যতিরেকে বাংলাদেশে চিকিৎসা অনুশীলন করেন, তবে তা অননুমোদিত ও বেআইনি কার্যক্রম হিসেবে গণ্য হবে। বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল কারও ডিগ্রির স্বীকৃতি ও পেশাগত যোগ্যতা যাচাই না করা পর্যন্ত কাউকে চিকিৎসা প্রদানের অনুমতি দিতে পারে না।

মেডিকেল এথিকস কমিটি এবং রিপোর্টিং গাইডলাইন থাকা সত্ত্বেও, অনিয়ম ও অনৈতিক আচরণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল -এর প্রয়োগক্ষমতা দুর্বল। দেরি ও জবাবদিহিতার অভাবে বহু অনিয়মের অভিযোগ নিষ্পত্তি হয় না।এছাড়া, বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল একটি বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থায় কাজ করে যেখানে অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার সাথে সমন্বয় অত্যন্ত দুর্বল, ফলে অকার্যকারিতা আরও বাড়ে।

চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াকে দ্রুত, স্বচ্ছ এবং কার্যকর করতে একটি আধুনিক ডিজিটাল অভিযোগ নিষ্পত্তি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা জরুরি। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অভিযোগকারীরা সহজে অনলাইনে অভিযোগ দায়ের এবং প্রতিটি অভিযোগের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। এতে স্বয়ংক্রিয় অভিযোগ শ্রেণিবিন্যাস, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে। পাশাপাশি, তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সেবাপ্রদানকারীর এবং অভিযোগকারীর পরিচয় গোপন রেখে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা যাবে। এই প্ল্যাটফর্ম স্বাস্থ্য খাতের জবাবদিহিতা ও নৈতিকতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি জনগণের আস্থা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল -এর আইনগত ক্ষমতা ও কাঠামোকে আরও কার্যকর করে শুধু নিবন্ধন নয়, বরং নীতি প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা। বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল - এর তত্ত্বাবধানে একটি ডিজিটাল অভিযোগ প্ল্যাটফর্ম চালু করতে হবে, ১৬২৬৩ কল সেন্টারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া,আইনগত ক্ষমতা প্রদান করা এবং বিকেন্দ্রীকরণ করে বিভাগীয় পর্যায়ে অফিস চালু করা।

রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল এর স্বাধীনতা ও কার্যকারিতাকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করে। BMDC-এর বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২০) অনুযায়ী, ১০০টিরও বেশি অনিয়মসংক্রান্ত অভিযোগের মধ্যে মাত্র ৩৫% সময়মতো নিষ্পত্তি হয়েছে।এই শাসনসংক্রান্ত সমস্যাগুলো, এবং অনিয়ম ও নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ ব্যবস্থার কেন্দ্রীভূত কাঠামো, স্বাস্থ্য খাতে জরুরি প্রতিক্রিয়া প্রদানের পথে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। জবাবদিহিতার অভাব, সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব এবং মান বজায় রাখার অনির্ধারিত প্রয়োগ রোগীর নিরাপত্তা এবং দেশের স্বাস্থ্যসেবার সামগ্রিক মানকে ব্যাহত করে।তাই স্বাস্থ্যখাতে ভাল ফলাফল নিশ্চিত করতে প্রক্রিয়া সহজীকরণ, সমন্বিত মানদণ্ডের প্রয়োগ এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবিলম্বে সংস্কার প্রয়োজন।

খ.বাংলাদেশ মেডিকেল এডুকেশন অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (BMEAC)

বাংলাদেশ মেডিকেল এডুকেশন অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল দেশের চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুণগত মান এবং পেশাগত অখণ্ডতা নিশ্চিতকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।কাউন্সিলের প্রধান দায়িত্ব হলো দেশের মেডিকেল স্কুলগুলোর জন্য মানদণ্ড নির্ধারণ ও তা পর্যবেক্ষণ করা, যাতে শিক্ষার্থীরা এমন শিক্ষা পায় যা তাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও পেশাগত আচরণে প্রস্তুত করে, এবং তারা দেশের স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা পূরণে কার্যকরভাবে অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

পাঠ্যক্রম, শিক্ষক যোগ্যতা, অবকাঠামো এবং ক্লিনিক্যাল প্রশিক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তদারকির মাধ্যমে এই কাউন্সিল নিশ্চিত করে যে প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় মান রক্ষা করছে এবং দক্ষ স্বাস্থ্যসেবাকর্মী তৈরি করছে।বাংলাদেশে চিকিৎসা শিক্ষার গুণগত মান আরও উন্নত করতে হলে, এই কাউন্সিলের এখতিয়ার ও দায়িত্বের পরিধি সম্প্রসারণ জরুরি। শুধুমাত্র স্নাতক পর্যায়ের চিকিৎসা শিক্ষার ওপর সীমাবদ্ধ না রেখে, এর কার্যক্রম স্নাতকোত্তর মেডিকেল প্রোগ্রাম, নার্সিং ইনস্টিটিউট এবং অন্যান্য সহযোগী স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও সম্প্রসারিত করতে হবে। এর ফলে দেশের বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্যশিক্ষা উচ্চ মানে উপনীত হবে এবং পরিবর্তনশীল স্বাস্থ্যচাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখা সম্ভব হবে।

এছাড়া, বাংলাদেশ মেডিকেল এডুকেশন অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল -এর কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য এর শাসন কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করা, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কমানো অত্যন্ত প্রয়োজন। এর ফলে কাউন্সিলটি স্বাধীনভাবে এবং কার্যকরভাবে কাজ করতে পারবে। এই বর্ধিত ভূমিকা বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা খাতের পেশাজীবীদের সামগ্রিক মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।শিক্ষাগত দায়িত্ব ছাড়াও, এই কাউন্সিল চিকিৎসকদের চলমান শিক্ষাক্রম (Continuing Medical Education - CME)—যেমন মেডিকেল কনফারেন্স—তদারকির দায়িত্বও নিতে পারে এবং নিশ্চিত করতে পারে যে সকল পেশাগত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, বিশেষত যেগুলো ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির অর্থায়নে পরিচালিত হয়, তা কঠোর অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড অনুসরণ করছে। এর ফলে স্বার্থসংঘাত কমে আসবে এবং চিকিৎসকরা প্রমাণভিত্তিক ও উচ্চমানের শিক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

এছাড়া, সংগঠনসমূহের ব্যয়ের বিবরণ এবং অর্থায়নের উৎস সম্পর্কিত বিস্তারিত প্রতিবেদন বাধ্যতামূলক করলে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে এবং দুর্নীতির সম্ভাবনা কমবে। চলমান শিক্ষা ও নৈতিক আচরণের সঙ্গে লাইসেন্স নবায়নকে সম্পৃক্ত করলে, এই কাউন্সিল বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

গ.বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল (BNMC)

বাংলাদেশে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষার মান এবং পেশাগত অনুশীলন উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল এর উচিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব নার্সেস (ICN)-এর মতো সংগঠনের গ্লোবাল কম্পিটেন্সি ফ্রেমওয়ার্ক গ্রহণ করা। এই সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করবে যে দেশের নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তর্জাতিক মান পূরণ করছে এবং স্বাস্থ্যসেবাকর্মীদের এমন জ্ঞান ও দক্ষতায় প্রশিক্ষিত করছে, যা জাতীয় এবং বৈশ্বিক উভয় পর্যায়ের স্বাস্থ্যচ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কার্যকর।

এছাড়া, বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল –এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদানকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে নিয়মিত মূল্যায়ন ও অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়া চালুর মাধ্যমে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নে একটি ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব।শাসন কাঠামো ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ক্ষেত্র। এর কার্যক্রম যেন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত ও অধিকতর স্বায়ত্তশাসিত হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য আন্তর্জাতিক অনুকরণে একটি স্বাধীন তদারকি সংস্থা গঠন করা যেতে পারে। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি প্রতিষ্ঠানসমূহে উচ্চমান বজায় রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত অডিট ও মূল্যায়ন চালু করা উচিত।

তদুপরি, আন্তর্জাতিক নির্দেশিকা অনুসারে, নার্স ও মিডওয়াইফদের জন্য চলমান পেশাগত উন্নয়ন কর্মসূচি (CPD) বাধ্যতামূলক করতে হবে, যাতে তারা সর্বশেষ চিকিৎসা প্রয়োগ ও নীতিমালার সঙ্গে হালনাগাদ থাকতে পারে।বাংলাদেশের নার্সিং ও মিডওয়াইফারি খাতের অগ্রগতির জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। এর উচিত অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগ্যতার পারস্পরিক স্বীকৃতি অর্জনে কাজ করা, যাতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব মিডওয়াইভস ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা –এর মতো সংগঠনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে জ্ঞান বিনিময় ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

এছাড়াও, নেতৃত্ব বিকাশ কর্মসূচি চালুর মাধ্যমে নার্স ও মিডওয়াইফদের স্বাস্থ্যব্যবস্থাপনা ও নীতিনির্ধারণে সক্রিয় ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলা উচিত। এর ফলে তারা স্বাস্থ্যখাতে বৈষম্য দূরীকরণ এবং জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থা উন্নয়নে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারবে।

ঘ.স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি

(নতুন নাম: অ্যালায়েড হেলথ প্রফেশনাল কাউন্সিল)

বাংলাদেশের **স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি** স্বাস্থ্যসেবার সহায়ক চিকিৎসা পেশাজীবীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিয়ন্ত্রণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ফ্যাকাল্টি সহায়ক চিকিৎসা পেশাজীবীদের জন্য শিক্ষাগত মান নির্ধারণ, লাইসেন্স প্রদান এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা-সম্পর্কিত কোর্সের পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। এর প্রধান লক্ষ্য হলো—এই পেশাজীবীদের এমন জ্ঞান ও দক্ষতায় প্রশিক্ষিত করা, যাতে তারা নিরাপদ ও কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে পারে।ফ্যাকাল্টিটি চলমান পেশাগত উন্নয়নেও ভূমিকা রাখে, যেমন: সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি।

তবে এর কার্যকারিতা আরও জোরদার করতে **স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি**–র ভূমিকা ও শাসন কাঠামোর সম্প্রসারণ জরুরি। এই সম্প্রসারণের আওতায় মেডিকেল ইনস্টিটিউটের অ্যাক্রেডিটেশন, স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম তদারকি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বিশেষ করে—পুষ্টিবিদ, চিকিৎসা পদার্থবিদ (Medical Physicists), ফিজিওথেরাপিস্ট, ফিজিওথেরাপি সহকারী, ফ্লেবোটোমিস্ট, মেডিকেল অফিস সহকারী, বায়োমেডিকেল টেকনিশিয়ান, বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ার, নার্স সহকারী, কেয়ারগিভার, কাউন্সেলর এবং অন্যান্য সহায়ক স্বাস্থ্যসেবা পেশাজীবীদের (যারা MATS ও IHT–এর মতো প্রোগ্রামে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) ইত্যাদির জন্য মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ ও তদারকি নিশ্চিত করতে হবে।

ফ্যাকাল্টির স্বায়ত্তশাসন শক্তিশালী করা, মানদণ্ড প্রয়োগে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাও অত্যাবশ্যক, যাতে উচ্চমানের স্বাস্থ্যশিক্ষা বজায় রাখা যায়। এর কার্যপরিধি সম্প্রসারণের মাধ্যমে, ফ্যাকাল্টি জাতীয় জনস্বাস্থ্যব্যবস্থাকে আরও বেশি কার্যকরভাবে সমর্থন দিতে পারবে এবং ভবিষ্যতের জনস্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত জনবল তৈরি করতে পারবে।

স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি এর পরিবর্তে একটি অ্যালায়েড হেলথ প্রফেশনাল কাউন্সিল গঠন করলে এই খাতের শাসন ও তদারকি আরও কার্যকর হবে। এই কাউন্সিলের দায়িত্ব হবে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অনুমোদন, পেশাজীবীদের লাইসেন্স প্রদান এবং নির্ধারিত মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়া নিশ্চিত করা।প্রস্তাবিত এই কাউন্সিলের ক্ষমতা ও পরিধি সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাংলাদেশ আরও দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী তৈরি করতে পারবে, রোগীসেবার মান উন্নত হবে, এবং দেশের জনস্বাস্থ্যসেবার অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব হবে।

ঙ. বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল

বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল (PCB) দেশের ফার্মেসি শিক্ষা ও পেশাগত অনুশীলন নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও স্বায়ত্তশাসনের অভাব এই সংস্থার কার্যকারিতা ব্যাহত করতে পারে।

লাইসেন্স প্রদান, অ্যাক্রেডিটেশন এবং ফার্মেসি অনুশীলন নিয়ন্ত্রণের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সুবিচার ও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তগ্রহণ নিশ্চিত করতে PCB–এর স্বাধীনতা জোরদার করা জরুরি। রাজনৈতিক প্রভাব হ্রাস এবং একটি সুস্পষ্ট ও কার্যকর শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কাউন্সিল আরও কার্যকরভাবে কাজ করতে পারবে, যা দেশের ফার্মেসি পেশার বিশ্বাসযোগ্যতা ও গুণগত মান রক্ষায় সহায়ক হবে।

স্বাস্থ্যখাতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে ফার্মেসি কাউন্সিলের ভূমিকাকে সময়োপযোগীভাবে প্রসারিত করাও আবশ্যক। বিশেষ করে, ফার্মাসিস্টদের জন্য **চলমান পেশাগত উন্নয়ন (CPD)** কর্মসূচি বাস্তবায়ন, অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়া উন্নয়ন, এবং শিক্ষার মানদণ্ড আধুনিকায়নের মাধ্যমে ফার্মেসি গ্র্যাজুয়েট ও পেশাজীবীদের সর্বশেষ জ্ঞান ও দক্ষতায় প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।

অ্যাক্রেডিটেশনের মানদণ্ড আধুনিকায়ন এবং ফার্মেসি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের তদারকি জোরদার করার মাধ্যমে, কাউন্সিল পেশাগত মান ধরে রাখতে পারবে, যা জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং রোগী নিরাপত্তা নিশ্চিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

চিকিৎসা গবেষণা সংস্থা

১. বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (BMRC)

বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে প্রমাণভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি জাতীয় গবেষণা নীতিমালা প্রণয়ন করে, গবেষণা প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থায়ন করে, গবেষণা সক্ষমতা গড়ে তোলে এবং নৈতিক মানদণ্ড নিশ্চিত করে। একই সঙ্গে, এটি আন্তর্জাতিক গবেষণা সহযোগিতা উৎসাহিত করে, যাতে বাংলাদেশ বৈশ্বিক চিকিৎসা গবেষণার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে।

তবে বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শাসনসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে অনেক সময় গবেষণার অগ্রাধিকার বিকৃত হয় এবং অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্নীতি সুষ্ঠু প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (২০১৯) এর এক জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ –এর ২৫% কর্মী অনুদান বরাদ্দে দুর্নীতির সম্মুখীন হয়েছেন, এবং অনুদানের ৮০% প্রদানে স্বচ্ছতা ছিল অত্যন্ত সীমিত। অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেও জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে—শুধু ১৫% অভিযোগ সময়মতো নিষ্পত্তি হয়েছে।

বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ সংক্রান্ত **অর্ডিন্যান্সটি হালনাগাদ** করে একটি **নতুন আইন ও বিধিমালা** প্রণয়ন করতে হবে, যাতে উন্নত চিকিৎসা গবেষণা, উচ্চতর প্রশিক্ষণ, এবং দেশে বিশেষায়িত গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। এটি বিচারপতি পর্যায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি স্বাধীন ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুনর্গঠন করা হবে।একটি হালনাগাদ আইন বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ –এর অধিকার ও ক্ষমতা বাড়াবে, যাতে তারা ICDDR'B, NIPORT সহ সব প্রতিষ্ঠান পরিচালিত গবেষণার কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করতে পারে এবং জনগণের উপকারে আসে এমন ফলদায়ক গবেষণা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পারে।

এই শাসনসংক্রান্ত দুর্বলতাগুলো বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ –এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। রাজনৈতিক প্রভাব, স্বচ্ছতার অভাব ও সীমিত সম্পদের কারণে গবেষণার মান এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। তাই বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ –এর স্বায়ত্তশাসন জোরদার করা, অনুদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বাড়ানো, জবাবদিহিতা শক্তিশালী করা এবং আইনি কাঠামো সংস্কার করা এখন সময়ের দাবি। বাংলাদেশ স্বাস্থ্য গবেষণা নেটওয়ার্ক গঠন (বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ–এর নেতৃত্বে) ।

২. জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT)

(নতুন নাম: বাংলাদেশ স্বাস্থ্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট)

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে গবেষণা, স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ এবং নীতিমালা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।এটি প্রজনন, মৃত্যুহার, পরিবার পরিকল্পনা, অভিবাসনসহ জনসংখ্যা স্বাস্থ্যবিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করে, যা সরাসরি জাতীয় স্বাস্থ্য কৌশল নির্ধারণে প্রভাব ফেলে।NIPORT বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রস্তুত করে, যাতে তারা মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারে।এই গবেষণা ও প্রশিক্ষণ মিলেই প্রমাণভিত্তিক নীতিনির্ধারণে অবদান রাখে।

এই প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তন করে **"বাংলাদেশ স্বাস্থ্য গবেষণা** ও প্রশিক্ষণ **ইনস্টিটিউট"** রাখা হবে এবং এটি একটি **স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান** হিসেবে **BMRC–এর সাথে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে** কাজ করবে। এই পুনর্গঠন ইনস্টিটিউটকে স্বাস্থ্য নীতিতে আরও প্রভাবশালী অবদান রাখতে সক্ষম করবে।

প্রতিষ্ঠানটির কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি কৌশলগত সংস্কার প্রয়োজন:

- একটি **স্বাধীন তদারকি সংস্থা** গঠন করে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত সুশাসন কাঠামো গড়ে তোলা
- **আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থা ও এনজিওগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা** বৃদ্ধি
- সরকারি নির্ভরতা কমাতে **বহুমুখী অর্থায়ন উৎস** গড়ে তোলা
- **উন্নত প্রযুক্তি** (যেমন: বিগ ডেটা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) ব্যবহার করে গবেষণার দক্ষতা বৃদ্ধি
- **কমিউনিটি-ভিত্তিক গবেষণাকে উৎসাহিত** করা এবং **জাতীয় চাহিদানির্ভর গবেষণায় অগ্রাধিকার** দেওয়া

এই সংস্কারগুলোর মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের গবেষণার মান বৃদ্ধি পাবে এবং তা জাতীয় জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৩. আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (ICDDR'B)

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ দেশের অন্যতম প্রধান জনস্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যা বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের প্রধান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের একটি কমিটি বাংলাদেশ সরকারকে সুপারিশ করে যে কলেরা গবেষণা ল্যাবরেটরিকে একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে রূপান্তর করা হোক। এর ফলস্বরূপ, সরকার একটি **অর্ডিন্যান্স জারি করে** এবং ১৯৭৯ সালে সংসদে আইন পাস করে কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করে।২০২২ সালে, **বাংলাদেশ সংসদ একটি নতুন আইন (ICDDR'B Act) পাস করে,** যা পূর্ববর্তী অর্ডিন্যান্স প্রতিস্থাপন করে।

বর্তমান এবং ভবিষ্যতের স্বাস্থ্য চাহিদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ থাকার জন্য এই **আইনটিকে আরও হালনাগাদ** করতে হবে। হালনাগাদকৃত আইনটি **জাতীয়** স্বাস্থ্য গবেষণা কর্ম **কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ** হবে। এর মাধ্যমে গবেষণার শাসনব্যবস্থা উন্নত হবে, সমন্বয় বাড়বে এবং ICDDR'B আরও স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গে কাজ করতে পারবে।এই আইনি সমন্বয় গবেষণার অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও ফলাফলের জাতীয় লক্ষ্য অনুযায়ী প্রয়োগ নিশ্চিত করবে, এবং উদীয়মান স্বাস্থ্যচ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এটি কার্যকর সহায়ক হবে।

৮. চিকিৎসা শিক্ষার সুশাসনের জন্য সংস্কার:

বাংলাদেশে চিকিৎসা শিক্ষার গুণগত অবস্থা বর্তমানে উদ্বেগজনক। এই খাতে আন্তর্জাতিক মান অর্জন এবং জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজন মেটাতে একটি **সমন্বিত, নীতিনির্ভর ও কাঠামোগত সংস্কার** অত্যাবশ্যক। চিকিৎসা শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের জন্য একটি সমন্বিত, নীতিনির্ভর ও কাঠামোগত সংস্কার অপরিহার্য।জনস্বাস্থ্য চাহিদা, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, প্রতিষ্ঠান সক্ষমতা ও World Federation for Medical Education (WFME)-এর গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কার্যক্রম মূল্যায়ন করতে হবে।সেই অনুযায়ী পুনর্গঠন করে প্রতিষ্ঠান সংখ্যা ও আসন সংখ্যা পুনর্বিন্যাস করা । সাপ্তাহিক পাঁচ দিনের একাডেমিক সপ্তাহ চালু করে শিক্ষার কাঠামো উন্নত করা, ছাত্রদের সম্পৃক্ততা বাড়ানো ও শিক্ষকদের কাজের ভার হ্রাস করা ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের জন্য ভর্তি প্রক্রিয়ায় বাধা দূর করে 'ব্রেইন ড্রেইন' রোধ ও প্রবাসী বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের দেশে ফিরিয়ে আনার সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। FCPS ও MD/MS কোর্সসমূহে পাঠ্যক্রমে সমন্বয় (curricular alignment) আনা এবং দেশ-বিদেশে পারস্পরিক স্বীকৃতি (reciprocal recognition) নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে হবে। পাশাপাশি, Competency-Based Medical Education (CBME) এবং Community Oriented Medical Education(COME) চালুর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা এবং আচরণগত সক্ষমতা অর্জন নিশ্চিতে জোর দিতে হবে, বিশেষ করে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে।

৯. চিকিৎসা,জনস্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুশাসনের জন্য সংস্কার :

ক. মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় : বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি (BMU) বর্তমানে **গভীর দলীয়করণ, রাজনৈতিক প্রভাব, পক্ষপাতমূলক নিয়োগ এবং দুর্নীতিতে নিমজ্জিত** একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে হলে, একে গুরুত্বপূর্ণ উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন, অরাজনৈতিক ও পেশাদার নেতৃত্বাধীন কমিটির মাধ্যমে পুনর্গঠনের উদ্যোগ নিতে হবে।

সরকার ইতিমধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত গুণগত ফলাফল ও আন্তর্জাতিক মান অর্জনের ক্ষেত্রে এর অগ্রগতি দৃশ্যমান নয়। তাই প্রশাসনিক, একাডেমিক ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গকে সম্পৃক্ত করে নতুন কাঠামো তৈরি করতে হবে।মেডিকেল শিক্ষার কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মেডিকেল এডুকেশন উইং -কে জনস্বাস্থ্য চাহিদা, গুণগত মান, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ভিত্তিক একটি সক্ষম ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উপযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি , অন্যান্য মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস (BCPS), প্রাথমিক পর্যায়ে পর্যায়ে পুরানো আটটি সরকারি মেডিকেল কলেজ এবং পরবর্তীতে সকল মেডিকেল কলেজ, বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহের জন্য বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন (BHC)-এর মেডিকেল এডুকেশন উইং -এর অধীনে পৃথক ও স্বশাসিত শাসন কাঠামো গঠন করা । বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি আইনের সংস্কার করে কার্যকর পরিচালন কাঠামো নিশ্চিত করা।

খ. বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি ও অন্যান্য মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়-সংযুক্ত হাসপাতালসমূহ (University Hospitals) সরাসরি প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে নিজস্ব বোর্ড অব গভর্ন্যান্স-এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে, যাতে নীতিনির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত হয়।বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপার-স্পেশালাইজড হাসপাতাল একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তির আওতায় প্রথমে নির্মাতা দেশ কোরিয়ান কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পরিচালনার সম্ভাব্যতা যাচাই করে পরবর্তীতে বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি-এর অধীনে হস্তান্তর করা হবে, তবে তা একটি স্বশাসিত ইউনিট হিসেবে পরিচালিত হবে। প্রতিবছর বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং বিদেশগামী রোগীর সংখ্যা হ্রাসের লক্ষ্যে একটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি তে ক্যান্সার, ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারি, ইমেজিংসহ বিভিন্ন বিষয়ে স্বশাসিত ইনস্টিটিউট স্থাপন করা ।

গ. বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও **কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ :** বাংলাদেশে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, **উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ** নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন (BHC)-এর পোস্টগ্র্যাজুয়েট মেডিকেল উইং একটি সার্বজনীন বিজ্ঞাপন প্রচার করবে। এই বিজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার মানদণ্ড নির্ধারণ করে দেওয়া হবে, যাতে শুধুমাত্র যোগ্য ও অভিজ্ঞ প্রার্থীই আবেদন করতে পারেন। উপাচার্য প্রার্থীর অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে ন্যূনতম ১০ (দশ) বছর, **উপ-উপাচার্য** ও **কোষাধ্যক্ষ** প্রার্থীর **৭ বছর** অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং পিএইচডি ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আবেদনকারীর একাডেমিক নেতৃত্ব, গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ, উপাচার্য প্রার্থীদের ১০ **টি, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ ৭টি** আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকাশনা এবং প্রশাসনিক দক্ষতা যাচাই করা হবে। উপাচার্য পদের জন্য *অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিয়োগযোগ্য হবেন না* — আবেদনকারীদের অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ে সক্রিয় শিক্ষক হিসেবে কর্মরত থাকতে হবে।

বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন গঠিত না হওয়া পর্যন্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের এই কার্যক্রম সাময়িকভাবে University Grants Commission (UGC) কর্তৃক পরিচালিত হবে। UGC নির্ধারিত যোগ্যতার ভিত্তিতে একটি সার্চ কমিটি গঠন করবে, যারা আবেদনকারীদের মধ্য থেকে যাচাই-বাছাই করে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা (shortlist) প্রস্তুত করবে। উক্ত তালিকা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করা হবে, যিনি সংবিধান অনুযায়ী একজন উপযুক্ত প্রার্থীকে উপাচার্য, **উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ** পদে নিয়োগ প্রদান করবেন। শিক্ষকরা যদি শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম থাকেন, তাহলে ৬৭ বছর পর্যন্ত চাকরি করতে পারবেন।এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে স্বচ্ছ, যোগ্যতাভিত্তিক ও দক্ষ নেতৃত্ব নির্বাচন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে, যা শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশাসনিক কাঠামোর সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রশাসনিক পদে নিয়োগ : বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে **পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক** এবং **রেজিস্ট্রার** পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করতে হবে। এই পদগুলোর জন্য প্রার্থীদের **নির্দিষ্ট যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার মানদণ্ড** উল্লেখ করে বিজ্ঞাপন প্রদান করা হবে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও রেজিস্ট্রার এই পদগুলো শুধুমাত্র পূর্ণকালীন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য নির্ধারিত। এই পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখযোগ্য যে, **কোনো শিক্ষককে এই প্রশাসনিক পদগুলোতে নিয়োগ** দিলে শিক্ষা কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটবে। যথাযথ নিয়মে আবেদন সংগ্রহ করে, একটি নির্বাচন বোর্ড গঠনের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে **যোগ্য প্রার্থীকে নিয়োগ** প্রদান করতে হবে। নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির অবশ্যই প্রশাসনিক পরিচালনায় পূর্ব অভিজ্ঞতা, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে দক্ষতা থাকতে প্রতিটি পদে **মেয়াদ সর্বোচ্চ ৩ থেকে ৪ বছর** নির্ধারিত থাকবে, এবং মেয়াদ শেষে প্রয়োজন অনুযায়ী পুনঃনিয়োগ বা নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। একই ব্যক্তি**র** একাধিক প্রশাসনিক পদে বহাল থাকার সংস্কৃতির বাইরে সরে এসে **নেতৃত্ব এবং কাজের ভারসাম্য বজায় রাখা** সম্ভব হবে।এই ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে যে, প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরা একাগ্রভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবেন এবং শিক্ষাদান কার্যক্রমে স্বার্থসংঘাত এড়ানো যাবে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন হবে আরও দক্ষ, স্বচ্ছ ও পেশাদার। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর, ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যানসহ একাডেমিক ও প্রশাসনিক দায়িত্বপূর্ণ পদসমূহে নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতার ভিত্তিতে দায়িত্ব প্রদান নিশ্চিত **করতে** হবে, এবং **আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন আহ্বান করতে হবে,** এবং **একাধিক প্রার্থীর মধ্যে যাচাই-বাছাই ও আলোচনার মাধ্যমে** সর্বোত্তম প্রার্থীকে নিয়োগ প্রদান করতে হবে। **প্রার্থীদের** শিক্ষা ও গবেষণার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।বিভাগীয় **চেয়ারম্যান নিয়োগের যোগ্যতা:** চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের জন্য প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি (যেমন PhD/MD/MS/FCPS) থাকতে হবে এবং অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত কমপক্ষে ৫টি আন্তর্জাতিক গবেষণা থাকতে হবে। **প্রক্টর :** বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর হতে হলে প্রার্থীকে একজন জ্যেষ্ঠ শিক্ষক (সহযোগী অধ্যাপক বা অধ্যাপক), প্রশাসনিক অভিজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ, শৃঙ্খলা রক্ষায় দক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয় আইন-বিধিতে পারদর্শী হতে হবে।ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে কোনো শৃঙ্খলাভঙ্গের ইতিহাস থাকা চলবে না। **ডিন (Dean) পদে মনোনয়ন বা নিয়োগের যোগ্যতা:** বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক বিভাগ বা ফ্যাকাল্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনকারী ডিন পদে নিয়োগের জন্য কিছু নির্দিষ্ট যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। এই পদে মনোনয়ন প্রাপ্তির জন্য প্রার্থীকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিভাগে অধ্যাপক পদে ন্যূনতম ৫ বছরের শিক্ষা ও গবেষণার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অন্তত ৭ টি আন্তর্জাতিক জাতীয় জার্নালে গবেষণা প্রকাশনা থাকতে হবে। এছাড়া, উচ্চমানের গবেষণা কার্যক্রম এবং শিক্ষাগত নেতৃত্বে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।প্রার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হতে হবে। ডিন হিসেবে তিনি বিভাগীয় উন্নয়ন, শিক্ষার্থী পরিচালনা, ও প্রশাসনিক কাজের ওপর পূর্ণ দায়বদ্ধ থাকতে হবে।অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক একাডেমিক নেটওয়ার্কিংয়ে সক্রিয় থাকতে হবে এবং সেগুলির মাধ্যমে বিভাগের উন্নয়ন ও গবেষণা কার্যক্রমকে সহায়তা করতে হবে।প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক বা শৃঙ্খলাবিষয়ক অভিযোগ না থাকতে হবে এবং তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তি হতে হবে।প্রার্থীকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিরপেক্ষ হতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কর্মকাণ্ডে কোনো ধরনের রাজনৈতিক প্রভাবের মধ্যে পড়বে না। **সিন্ডিকেট সদস্য :**বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত সিন্ডিকেট সদস্য নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও নৈতিক নেতৃত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিন্ডিকেট সদস্য পদে মনোনয়নের জন্য নির্দিষ্ট ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ পদে মনোনয়ন পাওয়ার জন্য প্রার্থীকে অবশ্যই শিক্ষা ও গবেষণায় সক্রিয় থাকতে হবে এবং তাঁর গবেষণা প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত থাকতে হবে। প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা যেমন ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, প্রোক্টর, একাডেমিক কাউন্সিল সদস্য বা সমমানের পদে দায়িত্ব পালনকারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।এছাড়া, প্রার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণের পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কোনো শাস্তিমূলক কার্যক্রমে জড়িত ছিলেন না—এই মর্মে প্রমাণিত হতে হবে। প্রার্থীকে অবশ্যই নিরপেক্ষ মানসিকতা সম্পন্ন ও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে দায়বদ্ধ হতে হবে।সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ফ্যাকাল্টি/একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশ ছাড়া কাউকে মনোনয়ন দেওয়া যাবে না। এই নীতিগত কাঠামো বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে প্রজ্ঞাবান, অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব নিশ্চিত হবে।

বাংলাদেশের সকল মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় মিলে একটি সমন্বিত কাঠামো (ককাস) গঠন করা হবে, যাতে এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরেক বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক প্রয়োজনে, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন বা প্রশাসনিক কারণে বদলি (transfer) করা সম্ভব হয়। এই বদলি নীতিমালা সকল পদে (শিক্ষক, প্রশাসকসহ) প্রযোজ্য হবে। পুরো প্রক্রিয়া বাংলাদেশ হেলথ কমিশনের (BHC) মেডিকেল এডুকেশন বিভাগ-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। তবে বাংলাদেশ হেলথ কমিশন গঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত এই কাজ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC) পরিচালনা করবে।

এভাবে একটি স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক ও যোগ্যতাভিত্তিক নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো আরও শক্তিশালী ও কার্যকর হবে। এতে করে যোগ্যতার ভিত্তিতে দায়িত্ব প্রদান নিশ্চিত হবে এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা পাবে।

ঘ . বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস (বিসিপিএস)- এর সুশাসন :

বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস (বিসিপিএস)-কে একটি ‘Deemed University’ বা পরিগণ্য বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই স্বীকৃতি প্রদান করা হলে বিসিপিএস দেশের চিকিৎসা শিক্ষায় একটি নতুন যুগের সূচনা করতে পারবে এবং আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা সহজ হবে। এটি চিকিৎসা পেশাজীবীদের উচ্চতর ডিগ্রির স্বীকৃতি এবং মান নিশ্চিত করার পাশাপাশি বৈশ্বিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের অবস্থানকে সুদৃঢ় করবে। বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস এর আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করার জন্য যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড এবং কানাডার রয়্যাল কলেজসমূহের সঙ্গে পারস্পরিক ডিগ্রি স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের চিকিৎসকরা এই দেশগুলোতে আরও সহজে কাজ করতে পারবেন এবং আন্তর্জাতিকভাবে তাদের ডিগ্রির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। এজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবে পাঠ্যক্রমের সঙ্গতি, যৌথ পরীক্ষা পদ্ধতি উন্নয়ন, এবং পরীক্ষক বিনিময় কর্মসূচি চালু করা জরুরি। পাশাপাশি, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে তোলা হলে গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বিনিময় সম্ভব হবে, যা দেশীয় চিকিৎসা শিক্ষাকে আরও আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করে তুলবে।

প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে বিসিপিএস-এর সচিব এবং কন্ট্রোলার অব এক্সামিনেশন পদদ্বয়কে পূর্ণকালীন হিসেবে নিয়োগ দেয়ার প্রস্তাব করা হচ্ছে। পূর্ণকালীন নিয়োগের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরীক্ষা পরিচালনা এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও সময়মতো ও দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

বিসিপিএস -এর নীতিনির্ধারণী কাঠামোকে অধিক অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পেশাগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ করতে কাউন্সিল সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। প্রতিটি মেডিকেল বিশেষজ্ঞ শাখা থেকে প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করে নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় বহুমাত্রিকতা নিশ্চিত করতে হবে। এতে করে সকল বিষয়ের অভিজ্ঞতা ও মতামত যথাযথভাবে প্রতিফলিত হবে, যা নীতিমালাকে আরও বাস্তবমুখী করে তুলবে।বর্তমানে কেন্দ্রভিত্তিক ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতা দূর করে বিসিপিএস কাউন্সিলে প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগ থেকে নির্বাচিত কাউন্সিলর অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। এতে সারাদেশের চিকিৎসকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে এবং আঞ্চলিক বাস্তবতা ও চাহিদা নীতিনির্ধারণে যুক্ত হবে, যা প্রতিষ্ঠানকে অধিক কার্যকর ও গণতান্ত্রিক করে তুলবে।বিসিপিএস-এর নির্বাচন প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজ করার লক্ষ্যে অনলাইনভিত্তিক ই-ভোটিং পদ্ধতি চালু করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচনের স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা এবং সর্বজনীন অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। দেশে বা বিদেশে অবস্থানরত সকল সদস্য অনলাইনের মাধ্যমে সহজেই ভোট দিতে পারবেন, যা একটি আধুনিক ও সময়োপযোগী উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হবে।নীতিনির্ধারণে ভারসাম্য রক্ষার জন্য ‘রেফারেন্স কমিটি’গঠনের ক্ষেত্রে প্রতিটি চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ শাখা থেকে প্রতিনিধি রাখার প্রস্তাব রাখা হচ্ছে। এতে কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ আরও গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার College of Medicine,South Africa (CMSA) মত বিসিপিএস -এর অধীন প্রতিটি ফ্যাকাল্টিকে সাব-কলেজ [যেমন: মেডিসিন, সার্জারি, গাইনী, পেডিয়াট্রিক্স, ক্লিনিক্যাল অনকোলজি (রেডিওথেরাপির নতুন নাম হিসেবে) ইত্যাদি] হিসেবে গঠন করা, যেগুলোর একাডেমিক স্বায়ত্তশাসন

থাকবে। এসব সাব-কলেজ প্রশ্ন ব্যাংক গঠন, পাঠ্যক্রম উন্নয়ন এবং গবেষণা সমন্বয় কার্যক্রম পরিচালনা করবে, যা একাডেমিক কর্মকাণ্ডকে আরও আধুনিক ও গতিশীল করে তুলবে।

বিসিপিএস-এর কর্মকাণ্ডকে বিকেন্দ্রীকরণ করার অংশ হিসেবে দেশের ৬ টি পুরনো প্রশাসনিক বিভাগে পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক অফিস স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া। এসব অফিস প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা, একাডেমিক কর্মশালা ও অন্যান্য শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এতে কেন্দ্রীয় অফিসের চাপ কমবে এবং শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ অঞ্চলে মানসম্মত সেবা গ্রহণ করতে পারবে।

সবশেষে, বিসিপিএস-এর অধীনে একটি আধুনিক ও মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেয়া হচ্ছে। এই হাসপাতালটি ফেলো এবং শিক্ষানবিশ ডাক্তারদের জন্য একটি আদর্শ শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠবে, যেখানে আন্তর্জাতিক মানের ক্লিনিক্যাল প্রশিক্ষণ দেয়া যাবে। এতে চিকিৎসা শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে এবং জাতীয়ভাবে দক্ষ চিকিৎসক গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

ঙ. NICVD, NITOR, NIKDU, ICMH, NIMH, NICRH, NIDCH, NIPSOM, IEDCR, IPHN, IPH ইত্যাদি সহ জাতীয় বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ BHS-এর অধীনে স্বশাসিতভাবে পরিচালিত হবে এবং প্রধানদের সচিব পদমর্যাদায় নিয়োগ দেয়া হবে।

চ. স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলি স্থানীয় ও বিদেশি তহবিল গ্রহণ করতে পারবে এবং তা গবেষণা ও সেবা প্রদানে সঠিকভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের নিয়মিত অডিট কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

ছ. ভবিষ্যতে একক ও সমন্বিত কাঠামোর ভিত্তিতে একটি স্বাধীন মেডিকেল ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, যা দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়ন ও গবেষণাকে সুসংহতভাবে এগিয়ে নিতে ভূমিকা পালন করবে।

ঝ.টারশিয়ারি ও কোয়ার্টনারি সেবার শাসন কাঠামো: সকল টারশিয়ারি ও কোয়ার্টনারি হাসপাতালসমূহে ইলেকট্রনিক মেডিকেল রেকর্ড (EMR) চালু করে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় গতি, নির্ভুলতা ও ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে হবে। সেবা প্রদানকারী হাসপাতাল ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণ প্রদানকারী হাসপাতালকে পৃথকভাবে পরিচালনা করতে হবে।মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং অন্যান্য শিক্ষা-প্রশিক্ষণ হাসপাতালগুলোর কাঠামোগত সংস্কার করতে হবে, যাতে তাদের প্রধান কার্যক্রম শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের উপর কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে চিকিৎসা শিক্ষা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে উৎকর্ষতা অর্জনের পথ প্রশস্ত হবে এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থায় জ্ঞানভিত্তিক অগ্রগতি নিশ্চিত করা যাবে।জনসংখ্যাভিত্তিক ডেটা অনুসারে হাসপাতাল নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণে নিরীক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

ঞ.সরকারি মেডিকেল কলেজসমূহে অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার অধ্যক্ষের নেতৃত্বে একটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হবে, যা কলেজ ব্যবস্থাপনা, প্রেসক্রিপশন যাচাই, রোগী পরামর্শ সময় নির্ধারণ এবং সেবার গুণমান নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

ট. প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ আইন সংস্কার: স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সরকারি তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করতে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ আইনের আওতায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে মনোনীত অধাপক পদমর্যাদার একজন মেডিকেল কলেজ শিক্ষককে কো-চেয়ারপারসন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১০.প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবায় রেফারেল: সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি হাসপাতালের ওপর চাপ হ্রাস করতে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয় ,সেবার মান ও রেফারেল ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার কাঠামো শক্তিশালী করতে গ্রামাঞ্চলে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহকে একত্রিত করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে রূপান্তর করতে হবে এবং শহরাঞ্চলে ওয়ার্ডভিত্তিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রাথমিক সেবা চিকিৎসকের নেটওয়ার্ক গঠন করে শূন্যপদে প্রাথমিক স্বাস্থ্য চিকিৎসক/ জিপি/ পারিবারিক চিকিৎসক (Family Physician) -দের যুক্ত করা হবে, যা ইউনিয়ন থেকে উপজেলা পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবার প্রথম স্তরকে শক্তিশালী করবে।ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ঔষধ ও প্রয়োজনীয় পদসমূহ ও উপকরণ ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। প্রশিক্ষণের জন্য BCPS, BCGP ও মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফ্যামিলি মেডিসিন কোর্স প্রবর্তন করতে হবে। সরকারের অনুমোদন নিয়ে বাংলাদেশ কলেজ অব জেনারেল প্র্যাকটিশনার্স (BCGP) স্থাপিত হবে। রেফারেল

ব্যবস্থাকে কাঠামোবদ্ধ,কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বাধ্যতামূলক ও কার্যকর করতে হবে। এই বাধ্যবাধকতা জরুরি চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।স্থানীয় স্বাস্থ্যের অবস্থা, স্বাস্থ্য সমস্যার অবস্থা ও রোগতাত্ত্বিক প্রয়োজনের আলোকে বাজেট ও পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করতে হবে। উপজেলা পর্যায়ে কার্যক্রম স্বশাসিত স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ অধীনে পরিচালিত হবে, যা নিয়ন্ত্রণ করবে বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস ।

১১ .হাসপাতাল ভিত্তিক সেবায় সুশাসন :

ক. উপজেলা পর্যায়ে সেকেন্ডারি স্বাস্থ্যসেবা জোরদার করে জনগণের সেবা গ্রহণ সহজলভ্য করতে হবে। জেলা হাসপাতালগুলোতে বিশেষায়িত (টারশিয়ারি স্তরের) চিকিৎসাসেবা চালু করতে হবে, যাতে সেবার বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত হয়, মেডিকেল কলেজ ও জাতীয় ইনস্টিটিউটগুলোর ওপর রোগীর চাপ কমানো যায়, এবং ভৌগোলিক কারণে কেউ বিশেষায়িত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না হয়। সেবা মান বজায় রাখার জন্য সরকারি হাসপাতালগুলো-তে অতিরিক্ত রোগী ভর্তি করা যাবে না।যদি কোনও সরকারি হাসপাতালে রোগী সেবা প্রদান সম্ভব না হয়, তাহলে রোগীকে নিকটস্থ পরবর্তী সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হবে, অথবা যদি সেখানে কোনো ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে চুক্তিবদ্ধ বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা থাকবে। এতে রোগীদের সেবা কোনওভাবেই ব্যাহত হবে না এবং দ্রুত চিকিৎসা পাওয়া যাবে।বেসরকারি হাসপাতালগুলোর সাথে চুক্তি করার মাধ্যমে, নির্ধারিত চিকিৎসা খরচে (ন্যায্য মূল্য) রোগীদের চিকিৎসা দেওয়া হবে। যদি কোনো সরকারি হাসপাতালে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা না থাকে, তাহলে সরকারি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র**তে** রোগীকে পাঠানো হবে । যদি ওই সরকারি হাসপাতালেও না থাকলে সরকারি চুক্তিবদ্ধ বেসরকারি হাসপাতাল থেকে নির্ধারিত মূল্যে পরিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা নিতে পারেন। প্রয়োজনে সরকারি হাসপাতালগুলোর তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিসহ সকল স্তরের সেবাপ্রদানকারী কর্মচারীদের বিধি অনুযায়ী বদলি করা যাবে।জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কার্যক্রম সবকিছু স্বশাসিত জেলা ও উপজেলা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ অধীনে পরিচালিত হবে, যা নিয়ন্ত্রণ করবে বিভাগীয় পর্যায়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস।

খ. প্রতিটি বিভাগে অন্তত একটি পূর্ণাঙ্গ, সর্বাধুনিক সুবিধাসম্পন্ন ও বিশ্ব মানের টারশিয়ারি সেবা হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে—যা জটিল ও বিশেষায়িত চিকিৎসার জন্য একটি আঞ্চলিক রেফারেল কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে।যা নতুনভাবে গড়ে তোলা যেতে পারে, অথবা বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধাপে ধাপে উন্নীত করে করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ ও বিদেশি যৌথ বিনিয়োগ সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। বার্ধক্যজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা সংশ্লিষ্ট সেবা (Geriatric Care)– কে অগ্রাধিকার দিতে হবে।স্বাস্থ্যের অবস্থা, স্বাস্থ্য সমস্যার অবস্থা ও রোগতাত্ত্বিক প্রয়োজনের আলোকে উপজেলা-ওয়ারি বাজেট ও পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করতে হবে। বিভাগীয় পর্যায়ে কার্যক্রম স্বশাসিত আঞ্চলিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ পরিচালিত করবে, যা নিয়ন্ত্রণ করবে বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস।

গ. যে ব্যক্তি স্বীকৃত এমবিবিএস বা বিডিএস ডিগ্রি প্রাপ্ত নন, তিনি যদি চিকিৎসা অনুশীলন করেন, তবে তা আইনত বেআইনি কার্যক্রম হিসেবে গণ্য হবে। এমবিবিএস বা বিডিএস ডিগ্রি ব্যতীত কেউ নিজেকে 'চিকিৎসক' পরিচয়ে রোগী দেখতে পারবেন না। বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিবে।

ঘ. একজন রোগী একটি রোগের চিকিৎসার জন্য একজন চিকিৎসককেকেই দেখাবে একাধিক চিকিৎসক বা বিশেষজ্ঞকে নয় কারণ তা সার্ভিস এর ডুপ্লিকেশন হয়। একজন রোগী ও ডাক্তার উভয়রেই সময় ক্ষেপন হয় । রোগীর চিকিৎসাজনিত জটিলতা বা প্রয়োজন বিবেচনায়, প্রয়োজনে মেডিকেল বোর্ড গঠন করে সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে এবং চিকিৎসক রোগীকে উন্নততর চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত বিশেষায়িত কেন্দ্রে প্রেরণ করবেন। এটা সরকারি ও বেসরকারী সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। সরকারি আধা সরকারি হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক সে হাসপাতাল থেকে কোন রোগী ঐ চিকিৎসকের প্রাইভেট চেম্বারে যেতে পারবে না।হাসপাতালের কোন কর্মচারী চিকিৎসকের প্রাইভেট চেম্বারে রোগী প্রেরণ করলে তা শাস্তি যোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে। চিকিৎসকের ওপর অতিরিক্ত চাপ না দেওয়া এবং প্রতিটি রোগীর জন্য মানসম্মত সময় ও যত্ন নিশ্চিত করার জন্য একজন চিকিৎসক সর্বোচ্চ

দৈনিক ৫০ জন রোগী দেখতে পারবেন। প্রতি রোগীর জন্য অন্তত ১০ মিনিটের পরামর্শ সময় নিশ্চিত করতে হবে,এজন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সেবা প্রদান কারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং সাপ্তাহিকভাবে প্রেসক্রিপশন নমুনা যাচাই পদ্ধতি চালু করা হবে।

ঙ. কোনো বিদেশি চিকিৎসক যদি বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল -র অনুমতি ব্যতিরেকে বাংলাদেশে চিকিৎসা অনুশীলন করেন, তবে তা অননুমোদিত ও বেআইনি কার্যক্রম হিসেবে গণ্য হবে। বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল কারও ডিগ্রির স্বীকৃতি ও পেশাগত যোগ্যতা যাচাই না করা পর্যন্ত কাউকে চিকিৎসা প্রদানের অনুমতি দিবে না।

চ. প্রতিটি হাসপাতালে নিরাপদ ও কার্যকর ওষুধ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে **ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্ট** পদ সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্যে, প্রতিটি সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রে **ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্ট পদের সুযোগ ও পদোন্নতির সুনির্দিষ্ট কাঠামো** তৈরি করতে হবে। এতে ওষুধের সঠিক ব্যবহার, রুগীর প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন, ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশনের ঝুঁকি কমানো এবং মাল্টিডিসিপ্লিনারি চিকিৎসা সেবায় ফার্মাসিস্টদের ভূমিকা সুসংহত হবে। এই পদ সৃষ্টি করলে চিকিৎসা সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে এবং রোগীর নিরাপত্তা আরও নিশ্চিত হবে।

১২. জরুরি স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা সহায়ক নেটওয়ার্ক সুশাসন:

সরকারি-বেসরকারি সর্বত্র জরুরি চিকিৎসা প্রাপ্তি রোগীর অধিকার – এটি নিশ্চিত করতে একটি জরুরি স্বাস্থ্যসেবা নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে।পরিসেবাগুলোর প্রাপ্যতা, মান ও পরিব্যাপ্তি নিশ্চিত করতে জাতীয় ফার্মেসি নেটওয়ার্ক, জাতীয় ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি নেটওয়ার্ক ,জাতীয় রক্ত সঞ্চালন নেটওয়ার্ক এবং জাতীয় অ্যাম্বুলেন্স নেটওয়ার্ক গঠন করতে হবে। এই পরিষেবাগুলো নির্ধারিত মানদন্ড অনুযায়ী,স্ব স্ব ক্ষেত্রে একটি একীভূত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সারাদেশে সংযুক্ত থাকবে এবং পরিচালিত হবে, যাতে জনগণ সহজে, দ্রুত ও নির্ভরযোগ্যভাবে এই পরিসেবাগুলো পেতে পারেন।

১৩. স্বাস্থ্য সুরক্ষা:

সেবাগ্রহীতার অভিযোগ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে একটি আধুনিক ডিজিটাল অভিযোগ নিষ্পত্তি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হবে। BMDC,BNMC, Pharmacy Council, Allied Health Professional Council- এর আইনগত ক্ষমতা ও কাঠামোকে আরও কার্যকর করা হবে ।

চিকিৎসা প্রদানকারীদের নিরাপত্তা ও পেশাগত সুরক্ষা (স্বাস্থ্য সুরক্ষা নীতির অংশ)**১.** মেডিকেল প্রফেশনাল ইন্স্যুরেন্স: চিকিৎসক, নার্স, টেকনোলজিস্ট ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য মেডিকেল প্রফেশনাল ইন্স্যুরেন্স চালু করা হবে**,** যাতে কর্মজীবনে আইনি ঝুঁকি বা অপ্রীতিকর ঘটনার ক্ষেত্রে তাদের আর্থিক ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত হয়।**২.** পেশাগত অবহেলা (professional negligence) বিষয়ে সুরক্ষা: BMDC,BNMC,Pharmacy Council, Allied Health Professional Council এর পূর্বানুমতি ছাড়া কোনো চিকিৎসক,নার্স, টেকনোলজিস্ট ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের গ্রেফতার করা যাবে না।শুধুমাত্র অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য হবে, নব্বই দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা: বাংলাদেশ পুলিশের অধীনে একটি নির্দিষ্ট ইউনিট থাকবে যেখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সংরক্ষিতকিছু পুলিশ থাকবেন (যাদের মেডিকেল পুলিশ বলা যেতে পারে) যারা জরুরী পরিস্থিতিতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। হাসপাতাল ও ক্লিনিকে অনাকাঙ্ক্ষিত হামলা, হুমকি ও সহিংসতা প্রতিরোধে এই ইউনিট কাজ করবে।

১৪.বেসরকারি ও সামাজিক **স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালীকরণ ও সুশাসন**

ক. চিকিৎসা এমন একটি সামাজিক প্রতিশ্রুতি , যা সমাজের প্রয়োজন মেটাতে উদ্ভাবনী ও টেকসই উপায়ে পরিচালিত হয়, আর্থিক লাভের চেয়েও সামাজিক চুক্তি যেখানে মুখ্য।বাংলাদেশে একটি কার্যকর ও টেকসই স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে, সরকারি ও

বেসরকারি খাতের সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ, মান ও দক্ষতা বাড়াতে সামাজিক ব্যবসার মডেল প্রয়োগের জন্য সঠিক নীতিমালা ও অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে।এতে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে, স্বাস্থ্যসেবা জনমুখী ও সহজলভ্য হবে এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা আরও কার্যকর ও টেকসই হবে।

খ. বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক কেন্দ্র ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইসেন্সিং ও প্রশাসনিক কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য একটি "একক সেবা কেন্দ্র" চালু করতে হবে। বেসরকারি হাসপাতালগুলোর মতো সরকারী হাসপাতালগুলোকেও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে লাইসেন্স নেয়ার এবং একই ধরনের এক্রেডিটেশন সার্ভিস স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করবে। করছাড়, প্রণোদনা ও সহজতর নীতিগত সহায়তার মাধ্যমে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে হবে। মাননির্ভর গ্রেডিং (A–D) ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং এজন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সেবার স্বীকৃতিতে অ্যাক্রিডিটেশন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে ,যেখানে ICU ব্যবহারের মান,হাসপাতালে সংক্রমণ হার ও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবস্থাপনার ওপর নজরদারি থাকবে এবং প্রতিটি ৫০ শয্যার অধিক হাসপাতালে একজন সিনিয়র চিকিৎসক নেতৃত্বে ব্যবস্থাপনা বোর্ড গঠনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সেবার মান ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে । এই বোর্ডে যাঁরা থাকবেন, তাঁদের মধ্যে অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ চিকিৎসা পেশাজীবী হতে হবে।পূর্ণকালীন, খণ্ডকালীন এবং ফি-ভিত্তিক সেবার জন্য সেবা, নিয়োগ নীতিমালা, অসুস্থতাজনিত ছুটিতে ন্যূনতম বেতন (৭৫%) ও ছুটির নিয়মাবলী অতিরিক্ত মহাপরিচালক দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে এবং তা আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী কর্মীদের বার্নআউট এড়ানোর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। চিকিৎসক ও হাসপাতালের অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব সম্পর্কিত নির্দেশনাও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। চাকুরিচ্যুত কোনো কর্মকর্তা সুবিচার পাওয়ার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে প্রস্তাবিত অতিরিক্ত মহাপরিচালক (হাসপাতাল) কাছে অভিযোগ বা আবেদন করতে পারেন।

সারাদেশের সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের নিয়মিত ও গুণগত প্রশিক্ষণের সুযোগ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। স্বাস্থ্যখাতের টেকসই উন্নয়ন ও মানসম্মত সেবাদান নিশ্চিত করতে পোস্টগ্র্যাজুয়েট ট্রেইনি চিকিৎসকগণসহ সকল পর্যায়ের চিকিৎসক, নার্স, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও প্রশাসনিক স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ **কার্যক্রম** চালু রাখতে হবে।প্রতিটি হাসপাতালে CME (Continuing Medical Education) বিভাগ থাকতে হবে, যেখানে নিয়মিত বৈজ্ঞানিক সভা, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম আয়োজন করা হবে। তবে, এই ধরনের বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম আয়োজনের ক্ষেত্রে **ফার্**মাসিউটিক্যাল কোম্পানির আর্থিক বা প্রচারমূলক সহায়তা গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে**,** যাতে পেশাদারিত্ব ও নৈতিকতা অক্ষুণ্ন থাকে।স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশিক্ষণকালীন পোস্ট রাখতে হবে, যেখানে BCPS বা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত ট্রেইনি চিকিৎসকরা কাজ করতে পারবেন। এর ফলে সারা দেশে চিকিৎসকদের একসঙ্গে সেবা ও শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই সক্ষমতা বাড়বে।

এ সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের তদারকি ও সেবার পরিমাণ, মান ও সেবামূল্য নিয়ন্ত্রণ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে হবে, যা সাশ্রয়ী, ন্যায্য অর্থনৈতিক চর্চা এবং দরিদ্রদের জন্য কমপক্ষে ১০% শয্যা বিনামূল্যে রাখার নিশ্চয়তা দেবে এবং অপ্রয়োজনীয় সেবা ও প্রেসক্রিপশন মান নিয়ন্ত্রণে, অন্যন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সাথে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের (প্রস্তাবিত) অতিরিক্ত মহাপরিচালক মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন ।

গ . প্রাইভেট হাসপাতাল সম্প্রসারণ: রোগীদের বিদেশমুখিতা রোধ ও দেশে আত্মনির্ভরশীল চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন (ক্যান্সার, অঙ্গ প্রতিস্থাপন, বন্ধ্যত্ব, ও দুর্লভ রোগ ইত্যাদি উন্নত চিকিৎসায় করছাড়, আমদানিতে সুবিধা ও অর্থনৈতিক প্রণোদনা দেয়া হবে। প্রয়োজনে সরকার বেসরকারি খাতের সাথে জন-স্বাস্থ্য অংশীদারিত্ব (PPP) ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন, ঝুঁকি বণ্টন ও সেবার মান উন্নয়ন করতে হবে।

১৫. সরকার-এনজিও খাতের সহযোগিতা শক্তিশালীকরণ ও সুশাসন :

এনজিও গুলো বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবার ২০-২৫ শতাংশ প্রদান করে, বিশেষত গ্রামীণ ও প্রান্তিক এলাকায়। এরা মাতৃস্বাস্থ্য, রোগ প্রতিরোধ, ক্যান্সার চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য জ্ঞানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি (BADAS), গণস্বাস্থ্য

কেন্দ্র, গ্রামীণ কল্যাণ, আহসানিয়া মিশন ও MAMM's Institute of Fistula and Women's Health ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সরকার, বেসরকারি, এনজিও ও অলাভজনক খাতকে সমন্বিতভাবে তদারক করবে BHC।এই পদক্ষেপগুলো বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবাকে আরও স্বচ্ছ, উচ্চমানের ও নিয়ন্ত্রিত খাতে পরিণত করবে।

১৬. বিশ্বব্যাপী মরণ ব্যাধি ক্যান্সার রোগের হার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ 'ক্যান্সার রেজিস্ট্রি' না থাকায় প্রকৃত পরিসংখ্যান পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আজ প্রায় প্রতিটি বৃহত্তর পরিবারেই কেউ না কেউ ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছেন। রোগ নির্ণয়ে দেরি হচ্ছে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায়, জেলা ও উর্ধ্বতন সকল সরকারি হাসপাতাল এবং ১০০ শয্যার অধিক বেসরকারি হাসপাতালে প্রাথমিক ক্যান্সার শনাক্তকরণ কেন্দ্র স্থাপন এবং ক্যান্সার রেজিস্ট্রি চালু,নিয়মিত স্ক্রিনিং কর্মসূচি চালু (হেড-নেক, ফুসফুস, স্তন, জরায়ু ও বৃহদান্ত্র ক্যান্সার), ক্যান্সার শনাক্তকরণ ও চিকিৎসার জন্য হিস্টোপ্যাথোলজিস্ট, ক্লিনিক্যাল অনকোলজিস্ট (রেডিওথেরাপি/রেডিয়েশন অনকোলজি এর নতুন নাম হিসেবে), গাইনি অনকোলজিস্ট, মেডিক্যাল অনকোলজিস্ট, নার্স, টেকনোলজিস্টসহ প্রয়োজনীয় জনবল গড়ে তুলতে হবে এবং ক্যান্সার ট্রাস্ট ফান্ড সৃষ্টি করতে হবে।ক্যান্সার চিকিৎসার আধুনিক যন্ত্রপাতি ও ডায়াগনস্টিক টেস্টের উপর করছাড়, প্রণোদনা ও সহজতর নীতিগত সহায়তার মাধ্যমে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে হবে। এর মাধ্যমে ক্যান্সার দ্রুত নির্ণয়, দ্রুত চিকিৎসা এবং মৃত্যুহার কমানো সম্ভব হবে।

১৭ .**কাগজবিহীন (Paperless) ডিজিটাল স্বাস্থ্যব্যবস্থা সুশাসন :**

বাংলাদেশে একটি সম্পূর্ণ কাগজবিহীন স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্যখাতের সব সেবা ও ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রূপান্তর করতে হবে। প্রতিটি নাগরিকের জন্য ইউনিক স্বাস্থ্য আইডি ও স্মার্ট স্বাস্থ্য কার্ড চালু করতে হবে। সেবার ধারাবাহিকতা ও তথ্য সংরক্ষণের জন্য ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ড সিস্টেম চালু করা জরুরি। সরবরাহ ও মজুত ব্যবস্থাপনার জন্য আধুনিক ডিজিটাল লজিস্টিক সিস্টেম এবং প্রক্রিয়াগত স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ডিজিটাল প্রোকিউরমেন্ট ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। জাতীয় ফার্মেসি নেটওয়ার্ক-কে ডিজিটাল ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। এই সমন্বিত ডিজিটাল ব্যবস্থা দেশীয় প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের নেতৃত্বে স্থানীয়ভাবে তৈরি ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৮. **আর্থিক শাসন ও সরবরাহ শৃঙ্খলা:**

- ডিজিটাল প্রোকিউরমেন্ট (e-GP), থার্ড-পার্টি অডিট, রিয়েল-টাইম বাজেট ট্র্যাকিং
- কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে প্রণোদনা ও পদোন্নতি
- কেন্দ্রিয় ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা, AI ভিত্তিক চাহিদা বিশ্লেষণ, পরিবার পরিকল্পনার সরবরাহের স্বচ্ছতা

১৯. **অবকাঠামো উন্নয়ন ও সুশাসন :**

- চাহিদাভিত্তিক হাসপাতাল নির্মাণ (জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ও রোগতাত্ত্বিক তথ্য অনুযায়ী)
- নিয়মিত যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ

এই ব্যবস্থাগুলো স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন নিশ্চিত করবে।

২০. সেইফ **ফুড, ড্রাগ ও আইভিডি-মেডিকেল ডিভাইস প্রশাসন গঠন:**

একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে তিনটি শাখা থাকবে: ঔষধ-টিকা-প্রসাধনী, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, ও খাদ্য নিরাপত্তা।

ক. ঔষধ-টিকা-প্রসাধনী খাতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।এর মধ্যে রয়েছে প্রতি দুই বছর অন্তর অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের তালিকা পর্যালোচনা, অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (API)-এর মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ, স্থানীয় রোগীদের উপর ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বাধ্যতামূলক করা, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত নিরপেক্ষ নিরীক্ষা কমিটি গঠন এবং বৈদেশিক যৌথ বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদান।

খ. আইভিডি-মেডিকেল ডিভাইস খাতে মধ্য-মেয়াদে টেলিমেডিসিন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন একটি মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি, নীতিমালা হালনাগাদ, স্থানীয় উদ্ভাবনকে উৎসাহ প্রদান, পুরনো যন্ত্রপাতি পরিত্যাগ এবং বৈদেশিক যৌথ বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

গ. নিরাপদ খাদ্য খাতে সংক্ষিপ্ত-মেয়াদে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (Food Safety Authority) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থানান্তর, ২০১৩ সালের খাদ্য আইন হালনাগাদ, খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনে ট্রেসেবিলিটি চালু, স্থানীয় পর্যায়ে অফিসার নিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক মানদন্ড নিশ্চিতকরণ।

ঘ. চিকিৎসক-ফার্মাসিউটিক্যাল সম্পর্ক নীতি: World Medical Association – (WMA) এর ৭১তম সাধারণ পরিষদ, কর্ডোবা, স্পেন, অক্টোবর ২০২০ সাধারণ পরিষদে চিকিৎসা জ্ঞান উন্নয়ন এবং রোগীদের সেবার মানোন্নয়নে চিকিৎসক ও ওষুধ শিল্পের মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়। একইসাথে, চিকিৎসকদের পেশাগত স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করার গুরুত্বও জোর দিয়ে উল্লেখ করা হয়।উদ্দেশ্য ছিল একটি ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা, যাতে চিকিৎসকগণ সবসময় তাদের রোগীর সর্বোত্তম স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে পারেন, কোনো ধরনের অনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কিছু প্রস্তাবনা গৃহীত হয়, যার মধ্যে ছিল:

- চিকিৎসক-ওষুধ শিল্পের সম্পর্কের স্বচ্ছতা ও নৈতিক মান বজায় রাখা
- স্বার্থের দ্বন্দ্ব এড়ানোর জন্য কঠোর নীতিমালা প্রণয়ন
- কনফারেন্স ও শিক্ষামূলক কর্মকান্ডে ওষুধ শিল্পের অংশগ্রহণ সীমিত করা
- রোগীর কল্যাণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে চিকিৎসা প্রদান নিশ্চিত করা

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা দেওয়া হচ্ছে, যাতে করে মধ্য-মেয়াদে একটি নৈতিক ও ভারসাম্যপূর্ণ চিকিৎসক-ফার্মাসিউটিক্যাল সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। ১. ঔষধের নমুনা বা উপহার প্রদান করে কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে।২. মেডিকেল কনফারেন্স আয়োজনের পূর্বে অবশ্যই বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (BMEAC) অনুমোদিত CPD ক্রেডিট পয়েন্ট গ্রহণের জন্য আবেদন করতে হবে এবং মেডিক্যাল কনফারেন্সের সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব ট্যাক্স অফিসে জমা দিতে হবে এবং এর একটি কপি বিএমইএসি-তে জমা দিতে হবে। ।৩. ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো অনুমোদিত কনফারেন্সে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে পারবে, তবে কেবলমাত্র প্রদর্শনী এলাকায় পণ্যের উপস্থাপনার জন্য তাদের প্রতিনিধির শারীরিক উপস্থিতি অনুমোদিত থাকবে। কোনো ধরনের খাবার, উপহারের ব্যাগ বা অন্য কোনো উপহার সামগ্রী সরবরাহ ও ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধূলা, র‍্যাফল ড্র ইত্যাদি করতে পারবে না। ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো এ ধরনের আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে পারবে না ৪. ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো শুধুমাত্র ডাক্তারদের ই-মেইল বা ডাকযোগের মাধ্যমে তাদের পণ্য সম্পর্কিত তথ্য পাঠাতে পারবে না।প্রতিনিধিরা সরাসরি সাক্ষাতের মাধ্যমে দৈনন্দিন প্রোডাক্ট প্রমোশন করতে পারবে না। ৫. চিকিৎসকের চেম্বার বা হাসপাতাল প্রাঙ্গণে কোনো ধরনের ঔষধের/পণ্য প্রচার কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে, কারণ এসব কর্মকান্ডে চিকিৎসকের মনোযোগ বিঘ্নিত হয় এবং রোগীরা সঠিকভাবে চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হন।৬. চিকিৎসকদের যেকোনো পেশাগত সংগঠন, যেমন—চিকিৎসক সমিতি, পেশাগত সংস্থা বা বিশেষজ্ঞ সমাজ (Professional Associations or Societies)–এ কোনো ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে থাকতে পারবে না।৭. নতুন ওষুধ বা নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য থাকলে তা প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক না করে কেন্দ্রীয়ভাবে নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক সভার মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে।

২১ .অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের প্রাপ্যতা ও সুশাসন :

সকল নাগরিকের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের সর্বজনীন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। এই ওষুধ ক্ষেত্র বিশেষে বিনামূল্যে বা ভর্তুকি মূল্যে সরবরাহ করতে হবে। এজন্য সরকারি ওষুধ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলোকে আধুনিকায়ন ও কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে পুনর্গঠিত করতে হবে।বেসরকারি খাত থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্মত ওষুধ সংগ্রহে কৌশলগত ক্রয়ব্যবস্থা জোরদার করতে

হবে।অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে প্রতিটি সরকারি হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে ফার্মেসি ২৪ ঘণ্টা চালু রাখতে হবে।এই ফার্মেসিগুলো জাতীয় ফার্মেসি নেটওয়ার্ক-এর আওতায় পরিচালিত হবে।

অ্যান্টি-ক্যান্সার, অ্যান্টি-ডায়াবেটিক, অ্যান্টি-হাইপারটেনসিভ ও Essential Medicine List (অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা–(ভুক্ত অ্যান্টিবায়োটিকের ওপর ভ্যাট এবং প্রযোজ্য অন্যান্য শুল্ক ও কর শূন্য হবে।অন্যদিকে, ভিটামিন, মিনারেলস, ব্রেস্ট মিল্ক সাবস্টিটিউট ও প্রোবায়োটিকসহ স্বাস্থ্য-সম্পূরক ও উচ্চমূল্যের ওষুধের ওপর ভ্যাট ও শুল্ক বৃদ্ধি করতে হবে।এর মাধ্যমে একদিকে জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধের প্রাপ্যতা বাড়বে, অন্যদিকে তুলনামূলক কম-প্রয়োজনীয় ও বিলাসমূলক পণ্যে কর বাড়িয়ে রাজস্ব আয় জোরদার করা যাবে।

২. **এপিআই, ভ্যাকসিন এবং মেডিকেল ডিভাইস উৎপাদনে সুশাসন:** জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের বিবেচনায় মানসম্মত এপিআই, ভ্যাকসিন এবং মেডিকেল ডিভাইস উৎপাদনে দেশীয় স্বনির্ভরতা অর্জন করতে হবে।বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং আমদানি নির্ভরতা কমাতে এই খাতে গবেষণা ও উৎপাদন সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। প্রয়োজনে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের যৌথ বিনিয়োগে উৎসাহ দিতে হবে। এজন্য পর্যাপ্ত প্রণোদনা, স্বল্পসুদের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ, ট্যাক্স ও ভ্যাট ছাড়সহ প্রয়োজনীয় নীতিগত সুবিধা প্রদান করতে হবে।

২৩. বিদেশে চিকিৎসা নির্ভরতা হ্রাস এবং মেডিকেল ট্যুরিজম উন্নয়ন:

প্রতিবছর বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং বিদেশগামী রোগীর সংখ্যা হ্রাসের লক্ষ্যে একটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।ক্যান্সার চিকিৎসা, অঙ্গ প্রতিস্থাপন সার্জারি, হৃদরোগ, জটিল কিডনি রোগ,বন্ধ্যাত্ব ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত রোগনির্ণয়ের জন্য আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন উৎকর্ষকেন্দ্র (Centers of Excellence) প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেওয়া হবে, যাতে দেশেই উচ্চমানের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা যায়।এই উদ্যোগের জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ শক্তিশালী করা হবে এবং উচ্চপ্রযুক্তি নির্ভর বিশেষায়িত হাসপাতালে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে।দক্ষ জনবল উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি (যেমন: JCI, ISO) অর্জন এবং সেবার মানোন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় স্বাস্থ্যসেবায় জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পাবে।একইসঙ্গে, মেডিকেল ট্যুরিজম সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি আঞ্চলিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিকল্পিত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

কোন চিকিৎসক মেডিক্যাল বোর্ডের সিদ্ধান্ত ব্যাতীত কোন রোগী বিদেশে রেফার করতে পারবেন না।একটি দালাল চক্র রোগীদের বিদেশে প্রেরণ করে। রোগীরা আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।সকল রোগীকে বিদেশ যাবার পূর্বে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অন লাইন ফরম পূরণ করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে তাতে কোন রোগের জন্য যাচ্ছেন তার বিস্তারিত উ্ল্লেখ থাকবে কোন চিকিৎসক এর বিদেশের কোন হাসপাতালের এর সাথে রোগী আদান প্রদানের সম্পর্ক থাকতে পারবে না। প্রায়ই দেখায় এতে আর্থিক লেনদেন জড়িত থাকে। এটা শাস্তযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল এই বিষয়টির ওপর সময় সময় নজরদারি করবে।

২৪ .স্বাস্থ্যখাতে ক্রয় ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সুশাসন :

স্বাস্থ্য খাতে টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিত করতে করতে হবে।স্বাস্থ্য খাতের জন্য জিডিপির অন্তত ৫ %অর্থ বরাদ্দ এবং এডিপির ১৫% বরাদ্দ বাধ্যতামূলক করতে হবে। এতে স্বাস্থ্যখাতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, স্থিতিশীল অর্থায়ন এবং রাজনৈতিক অঙ্গীকারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবে।

সিন ট্যাক্সের মাধ্যমে ও স্বাস্থ্য সেবার জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং স্বাস্থ্য হানিকর বাজারজাত খাদ্য, পানীয় ও তামাক নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ক্রয় ও সংগ্রহ কাজে স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা বিধান এবং মেরামত, সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য প্রয়োজনানুগ অর্থের সংস্থান করতে হবে।

ই-জিপি চালু, স্বাধীন নিরীক্ষা, বাস্তবসম্মত বাজেট ব্যবস্থাপনা, পারফরম্যান্সভিত্তিক প্রণোদনা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর চাহিদা পূর্বাভাস চালু করতে

২৫. **দুর্নীতি প্রতিরোধ টাস্কফোর্স:** স্বাধীন দুর্নীতি তদন্ত দল গঠন, হুইসেলব্লোয়ার সুরক্ষা, রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখার বিধান কার্যকর করতে হবে।

সুপারিশসমূহ:

(সময়সীমা: স্বল্প-মেয়াদী [১ বছরের মধ্যে], মধ্য-মেয়াদী [৫ বছরের মধ্যে], দীর্ঘ-মেয়াদী [৫ বছরের পরে চলমান])

১. **সংবিধান সংশোধন :** [স্বল্প-মেয়াদী]

সংবিধান সংশোধন পূর্বক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য একটি পৃথক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা আইন প্রণয়ন করতে হবে, যা নাগরিকদের অধিকার ও রাষ্ট্রের কর্তব্য নির্ধারণ করবে, স্বাস্থ্যখাতে দীর্ঘমেয়াদে ন্যায্যতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিনামূল্যে প্রদান করবে।

২. **আইনের সংস্কার:** [স্বল্প,মধ্য-দীর্ঘ-মেয়াদী]

সকল সংশ্লিষ্ট পুরাতন আইন পর্যালোচনা ও যুগোপযোগী করা, এবং নতুন আইন প্রণয়ন জরুরি। এতে রোগী সুরক্ষা, আর্থিক বরাদ্দ ও ধারাবাহিকতা , জবাবদিহিতা ও জরুরি প্রস্তুতি নিশ্চিত হবে। প্রস্তাবিত নতুন আইনসমূহ হল: বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন আইন; বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস আইন; জনস্বাস্থ্য অবকাঠামো আইন; বাংলাদেশ ফুড, ড্রাগ ও মেডিকেল ডিভাইস আইন; ঔষধের মূল্য নির্ধারণ ও প্রবেশাধিকার আইন; স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী ও রোগী নিরাপত্তা আইন; এ্যালায়েড হেলথ প্রফেশনাল কাউন্সিল আইন; হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক এক্রেডিটেশন আইন; স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন; নারী স্বাস্থ্য আইন; ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ আইন; শিশু বিকাশ কেন্দ্র আইন; ও বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল আইন। এছাড়াও নিম্নলিখিত আইনসমূহের সংশোধন প্রয়োজন: *বাংলাদেশ মেডিক্যাল* অ্যান্ড *ডেন্টাল কাউন্সিল* আইন, মেডিকেল শিক্ষা এক্রেডিটেশন আইন, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন, বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল আইন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন, পৌর ও সিটি কপোরেশন আইন ইত্যাদি।

৩. **বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন গঠন :** [স্বল্প,মধ্য-দীর্ঘ-মেয়াদী]

সকল নীতিতে স্বাস্থ্য (Health in All Policies – HiAP) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি স্বাধীন ও স্থায়ী "বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন (BHC)" প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। এই কমিশন সরকার প্রধানের নিকট সরাসরি জবাবদিহি করবে এবং প্রতি বৎসর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সংসদে পাঠাবে।এই কমিশন নিম্নোক্ত বিভাগসমূহ এ বিষয়ক তদারক ও গঠনমূলক দিকনির্দেশনা প্রদান করবে: ১. চিকিৎসা শিক্ষা বিভাগ - স্নাতক ও স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা, নার্সিং ও প্যারামেডিক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন; ২. জনস্বাস্থ্য বিভাগ - জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়ন, রোগ প্রতিরোধ; ৩. ক্লিনিক্যাল বিভাগ – স্বাস্থ্যসেবার ও রোগীর নিরাপত্তা তদারকি; ৪. BICE (Bangladesh Institute for Health and Care Excellence) – ক্লিনিকাল গাইডলাইন ও প্রটোকল উন্নয়ন, পাবলিক হেলথ গাইডলাইন উন্নয়ন; ৫. BHCI (Bangladesh Health Care Improvement) – সেবার মানদণ্ড, রোগীর নিরাপত্তা ও প্রটোকল অনুযায়ী সেবা প্রদান বিষয়ক নিয়মতান্ত্রিক তদারকি; ৬. রেগুলেটরি ওভারসাইট বিভাগ – BMDC, BMRC, BMEAC, ইত্যাদির ক্ষমতা বৃদ্ধি ও নেটওয়ার্ক গঠন; ৭. ল্যাবরেটরি ও ডায়াগনস্টিক বিভাগ – মান নিয়ন্ত্রণ, স্বীকৃতি, ও National Diagnostic Network (NDN) তদারকি; ৮. নিরাপদ খাদ্য, ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম বিভাগ – ফার্মেসি নেটওয়ার্ক, আইভিডি-মেডিকেল ডিভাইস ও খাদ্য তদারকি; ৯. এনজিও (NGO) ও প্রাইভেট হাসপাতাল

সমন্বয় বিভাগ – বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাতের মান তদারকি ও সমন্বয়; ১০. CASH (Centre for Advanced Specialized Healthcare) – বিশেষায়িত সেবা কেন্দ্র: রোগীদের বিদেশমুখিতা রোধ ও দেশে আত্মনির্ভরশীল চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন (ক্যান্সার, কিডনি, লিভার ও অন্যান্য অঙ্গ প্রতিস্থাপন, হৃদযন্ত্রের শল্যচিকিৎসা, বন্ধ্যত্ব, ও দুর্লভ রোগ ইত্যাদি); ১১. Allied Health Professionals বিভাগ – টেকনোলজিস্ট, থেরাপিস্ট, কাউন্সেলর প্রমুখ পেশার মান উন্নয়ন; ১২. প্রথাগত ও বিকল্প চিকিৎসা বিভাগ – আয়ুর্বেদ, ইউনানি, হোমিওপ্যাথি ইত্যাদি; ১৩. সেক্টোরাল হেলথ কোঅর্ডিনেশন বিভাগ - স্থানীয় সরকার, প্রতিরক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্বরাষ্ট্র, রেলপথসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রায়শই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়হীনভাবে কাজ করে। এটি তথ্যভিত্তিক নীতিনির্ধারণ, সম্পদ বণ্টন এবং জরুরি সাড়া প্রদানে সহায়ক হবে। ১৪. স্বাস্থ্য প্রযুক্তি মূল্যায়ন (Health Technology Assessment) বিভাগ – ব্যয় সাশ্রয়িতা, অর্থনৈতিক প্রভাব, বাজেট ও ক্রয় ব্যবস্থাপনা; ১৫. স্বাস্থ্য নিরীক্ষা ও দুর্নীতি বিরোধী বিভাগ – স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে কার্যকর তদারকি; ১৬. স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিভাগ - সেবাগ্রহীতার অভিযোগ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে একটি আধুনিক ডিজিটাল অভিযোগ নিষ্পত্তি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা; BMDC, BNMC, Bangladesh Pharmacy Council ইত্যাদির আইনগত ক্ষমতা ও কাঠামোকে আরও কার্যকর করা; চিকিৎসা প্রদানকারীদের নিরাপত্তা ও পেশাগত সুরক্ষা; মেডিকেল প্রফেশনাল ইন্স্যুরেন্স; পেশাগত অবহেলা বিষয়ে সুরক্ষা; স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি; এবং ১৭. আইন বিভাগ - সকল সংশ্লিষ্ট পুরাতন আইন পর্যালোচনা ও যুগোপযোগী করা, এবং নতুন আইনের সুপারিশ করা।

৪. **বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস (BHS) গঠন :** [স্বল্প,মধ্য-মেয়াদী]

ক) পেশাদারীত্ব, দক্ষতা ও জবাবদিহিমূলক সেবার মান নিশ্চিত করতে বিদ্যমান স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ক্যাডারকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে প্রশাসনিকভাবে স্বায়ত্তশাসিত ও পেশাভিত্তিক একটি নতুন সিভিল সার্ভিস - বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস (BHS) গঠন করতে হবে।বি এইচ এস এর অধীনে বিভাগীয় পর্যায়ে ১১ টি আঞ্চলিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ থাকবে;এর মধ্যে থাকবে ঢাকা মেট্রোপলিটন,চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম। বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস এর জন্য একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় গঠন করা হবে, যার নেতৃত্বে থাকবেন একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক, যিনি মুখ্য সচিব (Chief of BHS) পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবেন। তাঁর অধীনে ক্লিনিকাল সেবা, জনস্বাস্থ্য, ও চিকিৎসা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা—এই তিনটি প্রধান খাত পরিচালনার জন্য তিনজন উপপ্রধান, বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস (ডেপুটি চিফ অব হেলথ-DCH) নিযুক্ত হবেন, যাঁরা প্রত্যেকে জ্যেষ্ঠ সচিব পদমর্যাদার হবেন। প্রতিটি খাতের অধীনে একজন করে মহাপরিচালক (DG) পদ সৃষ্টি করা হবে, যাঁরা সচিব-সমমানের পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং কার্যক্রম পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট ডেপুটি চীফ অব হেলথ এর অধীনে কাজ করবেন।কর্মরত জনবলের জন্য একটি স্বতন্ত্র চাকরি বিধি ও পৃথক বেতন কাঠামো প্রণয়ন করতে হবে এবং যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন ভাতা পাবেন যাতে পেশাদারীত্ব, দক্ষতা ও জবাবদিহিমূলক সেবার মান নিশ্চিত হয়। বিদ্যমান বিসিএস ক্যাডারভুক্তদের জন্য নতুন বিএইচএস ক্যাডারে বেছে নেওয়া বা বিকল্প অপশন এর সুযোগ রাখা হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন মহাপরিচালকত্ব (যেমন DGHS, DG মেডিকেল এডুকেশন, পরিবার পরিকল্পনা, নার্সিং, টোব্যাকো কন্ট্রোল, হেলথ ইকোনমিক্স, NIPORT, TEMO ও NEMEW) একত্র করে একটি একক সংস্থা — **বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস (BHS)** গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে আলাদা সেক্রেটারিয়েট থাকবে না; বরং একটি কেন্দ্রীয় BHS সেক্রেটারিয়েট থাকবে, যেখান থেকে প্রশাসনিক কাজ পরিচালিত হবে। DG পর্যায় থেকে সব ফাইল সরাসরি BHS-এর Deputy Chief ও Chief-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি হবে। এই কাঠামো স্বাস্থ্যখাতে দক্ষতা, সমন্বয় ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে [স্বল্প-মেয়াদী]

খ) বাংলাদেশ হেলথ সাভিস গঠনের জন্য স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, নার্সিং সেবা ও নগর পৌর স্বাস্থ্য সেবার অবকাঠামোর একত্রিকরন ও পুন:গঠন করতে হবে।[স্বল্প-মেয়াদী]

গ) বিকেন্দ্রীকরণ: স্বাস্থ্যসেবাকে বিকেন্দ্রীকরণ করে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ প্রশাসনিক আর্থিক স্বাধীনতা দিতে হবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাস্থ্যের অবস্থা, স্বাস্থ্য সমস্যার অবস্থা ও রোগতাত্ত্বিক প্রয়োজনের আলোকে উপজেলা-ওয়ারি বাজেট ও পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করতে হবে। বিভাগীয় পর্যায়ে কার্যক্রম স্বশাসিত আঞ্চলিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের অধীনে পরিচালিত হবে, যা নিয়ন্ত্রণ করবে বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস।জনবল নিয়োগ, বদলি নিয়ন্ত্রন ও ক্রয়-সংগ্রহ-আথিক ব্যবস্থাপনার জন্য দায়-দায়িত্বের প্রয়োগযোগ্য বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।[মধ্য মেয়াদী]

৫. **স্বতন্ত্র পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) গঠন :** [স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী]

ক) নিয়মিত নিয়োগ প্রক্রিয়া ও স্বচ্ছতা আনয়ন করার লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) গঠন করতে হবে। [স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী]

খ) গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্বাচিত পদের ক্ষেত্রে (যেমন বি এইচ এস প্রধান ও উপপ্রধান,মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ মহাপরিচালক, মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ, BMDC ও BMRC চেয়ারম্যান ইত্যাদি) যোগ্যতা, স্বচ্ছতা ও রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রেখে নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও নিয়োগের সুপারিশ করার জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের সার্চ কমিটি গঠন করা হবে। গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে যোগ্যতা নিয়োগপ্রাপ্তদের সম্পর্কে জাতীয় সংসদকে অবহিত করবে। এই উদ্যোগ জনস্বাস্থ্য ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

৬. **পেশাগত নিরপেক্ষতা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা:** [স্বল্প-মধ্য-মেয়াদী]

স্বাস্থ্যখাতের অস্থিতিশীলতা মোকাবেলায় পেশাগত নিরপেক্ষতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা (১৯৭৯) অনুযায়ী রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। জনগণের ট্যাক্সের অর্থে (সরকারি অর্থে) পরিচালিত প্রতিষ্ঠান যেমন সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা এবং সরাসরি দলীয় রাজনীতি সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের নির্বাহী পদে ‘না’ রাখার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

৭. **প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় সুশাসন:** [স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী]

ক) প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সর্বজনীন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে সরকারকে এই সেবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে (বা ক্ষেত্রবিশেষে ভর্তুকিমূল্যে) প্রদান করতে হবে, যাতে কোনো নাগরিক আর্থিক প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত না হন। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার কাঠামো শক্তিশালী করতে গ্রামাঞ্চলে ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহকে একত্রিত করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে রূপান্তর করতে হবে এবং শহরাঞ্চলে ওয়ার্ডভিত্তিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ লক্ষ্যে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারি খাত ও বেসরকারি খাতের সহায়তা নিতে হবে। প্রাথমিক সেবা চিকিৎসকের নেটওয়ার্ক গঠন করে শূন্যপদে প্রাথমিক স্বাস্থ্য চিকিৎসক/ জিপি/ পারিবারিক চিকিৎসক (Family Physician) -দের যুক্ত করা হবে, যা ইউনিয়ন থেকে উপজেলা পর্যন্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার প্রথম স্তরকে শক্তিশালী করবে। ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় জনবল, রোগনির্ণয় ব্যবস্থা, ঔষধ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জমাদির প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। প্রশিক্ষণের জন্য জেনেরিক কারিকুলাম অনুযায়ী BCPS, BCGP ও মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফ্যামিলি মেডিসিন কোর্স বা জিপি (GP) কোর্স প্রবর্তন করতে হবে। সরকারের অনুমোদন নিয়ে বাংলাদেশ কলেজ অব জেনারেল প্র্যাকটিশনার্স (BCGP) স্থাপিত হবে। রেফারেল ব্যবস্থাকে কাঠামোবদ্ধ, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বাধ্যতামূলক ও কার্যকর করতে হবে। এই বাধ্যবাধকতা জরুরি চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। [স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী]

খ) বিদ্যালয়ে, স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানেও জনগনের মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক অবহিতিকরণ ও সৃজনশীল কার্যক্রম বাস্তবায়ণ করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

৮. **অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের প্রাপ্যতায় সুশাসন :** [স্বল্প মেয়াদী]

ক) সকল নাগরিকের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের সর্বজনীন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। এই ঔষধ ক্ষেত্র বিশেষে বিনামূল্যে (যথা প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পর্যায়ে এবং অতি দরিদ্রের ক্ষেত্রে) বা ভর্তুকি মূল্যে সরবরাহ করতে হবে। এজন্য সরকারি ঔষধ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলোকে আধুনিকায়ন ও কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে পুনর্গঠিত করতে হবে।বেসরকারি খাত থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্মত ঔষধ সংগ্রহে কৌশলগত ক্রয়ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে প্রতিটি সরকারি হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে ফার্মেসি ২৪ ঘণ্টা চালু রাখতে হবে। এই ফার্মেসিগুলো জাতীয় ফার্মেসি নেটওয়ার্ক-এর আওতায় পরিচালিত হবে। [স্বল্প মেয়াদী]

খ) অ্যান্টি-ক্যান্সার, অ্যান্টি-ডায়াবেটিক, অ্যান্টি-হাইপারটেনসিভ ও অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের তালিকাভুক্ত অ্যান্টিবাইয়োটিকের ওপর ভ্যাট এবং প্রযোজ্য অন্যান্য শুল্ক ও কর শূন্য হবে।অন্যদিকে, ভিটামিন, মিনারেলস, ব্রেস্ট মিল্ক সাবস্টিটিউট ও প্রোবায়োটিকসহ স্বাস্থ্য-সম্পূরক ও উচ্চমূল্যের ঔষধের ওপর ভ্যাট ও শুল্ক বৃদ্ধি করতে হবে।এর মাধ্যমে একদিকে জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধের প্রাপ্যতা বাড়বে, অন্যদিকে তুলনামূলক কম-প্রয়োজনীয় ও বিলাসমূলক পণ্যে কর বাড়িয়ে রাজস্ব আয় জোরদার করা যাবে। [স্বল্প মেয়াদী]

৯. **সামাজিক স্বাস্থ্যবিমা চালু করা :** [মধ্য-মেয়াদী]

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে সম্পূর্ণ কর-ভিত্তিক অর্থায়নের আওতায় আনতে হবে, যাতে এটি শর্তসাপেক্ষে নাগরিকের জন্য বিনামূল্যে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে নিশ্চিত করা যায়।এর অতিরিক্ত হিসেবে, গুরুতর অসুস্থতা ও ব্যয়বহুল চিকিৎসা ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে জাতীয় পর্যায়ে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক একটি সামাজিক স্বাস্থ্যবিমা (SHI) চালু করতে হবে।এই বিমা কাঠামোতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে বিপর্যয়কর ব্যয়ের প্রধান কারণ—যেমন ক্যান্সার, হৃদরোগ, কিডনি ডায়ালাইসিস ও মারাত্মক দুর্ঘটনা—অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে চিকিৎসাব্যয়-সংক্রান্ত আর্থিক সুরক্ষা কার্যকরভাবে নিশ্চিত করতে হবে।সামাজিক স্বাস্থ্যবিমা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করতে হবে। সরকার একটি স্বাস্থ্য বীমা কর্তৃপক্ষ গঠন করবে সার্বজনীন স্বাস্থ্য বীমার জন্য। [মধ্য-মেয়াদী]

১০. **হাসপাতাল ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবায় সুশাসন :** [মধ্য-মেয়াদী]

ক. উপজেলা পর্যায়ে সেকেন্ডারি স্বাস্থ্যসেবা জোরদার করে জনগণের সেবা গ্রহণ সহজলভ্য করতে হবে। জেলা হাসপাতালগুলোতে বিশেষায়িত (টারশিয়ারি স্তরের) চিকিৎসাসেবা চালু করতে হবে, যাতে সেবার বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত হয়, মেডিকেল কলেজ ও জাতীয় ইনস্টিটিউটগুলোর ওপর রোগীর চাপ কমানো যায়, এবং ভৌগোলিক কারণে কেউ বিশেষায়িত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না হয়।সরকারি প্রয়োজনে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিসহ সকল স্তরের সেবাপ্রদানকারী কর্মচারীদের বিধি অনুযায়ী বদলি করা যাবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কার্যক্রম সবকিছু স্বশাসিত জেলা ও উপজেলা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ অধীনে পরিচালিত হবে, যা নিয়ন্ত্রণ করবে বিভাগীয় পর্যায়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস। [মধ্য-মেয়াদী]

খ. প্রতিটি বিভাগে অন্তত একটি পূর্ণাঙ্গ, সর্বাধুনিক সুবিধাসম্পন্ন ও বিশ্ব মানের টারশিয়ারি সেবা হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে—যা জটিল ও বিশেষায়িত চিকিৎসার জন্য একটি আঞ্চলিক রেফারেল কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে।যা নতুনভাবে গড়ে তোলা যেতে পারে, অথবা বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধাপে ধাপে উন্নীত করে করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে

প্রয়োজনে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ ও বিদেশি যৌথ বিনিয়োগ সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। বার্ধক্যজনিত স্বাস্থ্যসেবা-কে অগ্রাধিকার দিতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

গ সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোর সেবা প্রদানের সময় সকাল ৮:৩০ টা থেকে রাত ৮:৩০ টা পর্যন্ত বর্ধিত করা।

ঘ. একটি রোগের চিকিৎসার জন্য একজন চিকিৎসককেকেই দেখাবে একাধিক চিকিৎসক বা বিশেষজ্ঞকে নয় কারণ তা সার্ভিস এর ডুপ্লিকেশন হয়। একজন রোগী রোগী ও ডাক্তার উভয়রেই সময় ক্ষেপন হয় ও চিকিৎসকদের মধ্যে অস্থিকর পরিবেশ তৈরী হয়। ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতি হয়। এটা সরকারি ও বেসরকারী সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। যে কোন সরকারি আধা সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসক কর্মরত আছেন সে হাসপাতাল থেকে কোন রোগী ঐ চিকিৎসকের প্রাইভেট চেম্বারে যেতে পারবে না।হাসপাতালের কোন কর্মচারী রোগী প্রেরণ করলে তা শাস্তি যোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে। চিকিৎসকের ওপর অতিরিক্ত চাপ না দেওয়া এবং প্রতিটি রোগীর জন্য মানসম্মত সময় ও যত্ন নিশ্চিত করার জন্য একজন চিকিৎসক সর্বোচ্চ দৈনিক ৫০ জন রোগী দেখতে পারবেন। প্রতি রোগীর জন্য অন্তত ১০ মিনিটের পরামর্শ সময় নিশ্চিত করতে হবে,এজন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সেবা প্রদানকারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং সাপ্তাহিকভাবে প্রেসক্রিপশন নমুনা যাচাই পদ্ধতি চালু করা হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

ঙ. অতি দরিদ্র বা যারা দেশের মোট জনসংখ্যার ২০%, তারা সব হাসপাতালে বিনামূল্যে সব সেবা পাবে।[মধ্য-মেয়াদী]

চ. দেশের সব হাসপাতালের রক্ত সঞ্চালন, ল্যাবরেটরী ও ফার্মেসী ২৪/৭ খোলা থাকবে। [স্বল্প মেয়াদী]

ছ. যে ব্যক্তি স্বীকৃত MBBS বা BDS ডিগ্রি প্রাপ্ত নন, তিনি যদি চিকিৎসা অনুশীলন করেন, তবে তা আইনত বেআইনি কার্যক্রম হিসেবে গণ্য হবে। MBBS বা BDS ডিগ্রি ব্যতীত কেউ নিজেকে 'চিকিৎসক' পরিচয়ে রোগী দেখতে পারবেন না। BMDC এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে। [স্বল্প মেয়াদী]

জ. সব হাসপাতালে নিরাপদ ও কার্যকর ওষুধ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে **ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্ট** পদ সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্যে, প্রতিটি সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রে **ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্ট পদের সুযোগ ও পদোন্নতির সুনির্দিষ্ট কাঠামো** তৈরি করতে হবে। এতে ওষুধের সঠিক ব্যবহার, রুগীর প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন, ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশনের ঝুঁকি কমানো এবং মাল্টিডিসিপ্লিনারি চিকিৎসা সেবায় ফার্মাসিস্টদের ভূমিকা সুসংহত হবে। এই পদ সৃষ্টি করলে চিকিৎসা সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে এবং রোগীর নিরাপত্তা আরও নিশ্চিত হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

ঝ. কোনো বিদেশি চিকিৎসক যদি BMDC-র অনুমতি ব্যতিরেকে বাংলাদেশে চিকিৎসা অনুশীলন করেন, তবে তা অননুমোদিত ও বেআইনি কার্যক্রম হিসেবে গণ্য হবে। BMDC কারও ডিগ্রির স্বীকৃতি ও পেশাগত যোগ্যতা যাচাই না করা পর্যন্ত কাউকে চিকিৎসা প্রদানের অনুমতি দিবে না। [স্বল্প মেয়াদী]

ঞ. হাসপাতালে মানোন্নয়নের জন্য কার্যকরী মান উন্নয়ন পর্ষদ ও কন্টিনিউয়াস এডুকেশন পদ্ধতির ব্যবস্থা থাকতে হবে।[স্বল্প মেয়াদী]

১১. **জরুরি স্বাস্থ্যসেবা নেটওয়ার্ক গঠন:** [স্বল্প মেয়াদী]

জরুরি চিকিৎসাকে একটি বিশেষায়িত ও অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবা হিসেবে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় একে একটি স্বীকৃত চিকিৎসা বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি হাসপাতালের জরুরি বিভাগসমূহ পর্যায়ক্রমে এই বিশেষজ্ঞদের নেতৃত্বে পরিচালিত হতে হবে, যাতে জরুরি চিকিৎসাসেবার পরিসর ও মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

১২. **স্বাস্থ্য পরিষেবা সহায়ক নেটওয়ার্ক গঠন:** [স্বল্প-মেয়াদী]

স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলোর প্রাপ্যতা, মান ও পরিব্যাপ্তি নিশ্চিত করতে **জাতীয় ফার্মেসি নেটওয়ার্ক, জাতীয় ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি নেটওয়ার্ক ,জাতীয় রক্ত সঞ্চালন নেটওয়ার্ক** এবং **জাতীয় অ্যাম্বুলেন্স নেটওয়ার্ক** গঠন করতে হবে। এই পরিষেবাগুলো নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী স্ব স্ব ক্ষেত্রে একটি একীভূত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সারাদেশে সংযুক্ত থাকবে এবং পরিচালিত হবে, যাতে জনগণ সহজে, দুত ও নির্ভরযোগ্যভাবে এই পরিষেবাগুলো পেতে পারেন।

১৩. **স্বাস্থ্য সুরক্ষা:** [স্বল্প-মেয়াদী]

সেবাগ্রহীতার অভিযোগ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে একটি আধুনিক ডিজিটাল অভিযোগ নিষ্পত্তি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হবে। BMDC, BNMC, Bangladesh Pharmacy Council, Allied Health Professional Council -ইত্যাদির আইনগত ক্ষমতা ও কাঠামোকে আরও কার্যকর করা হবে ।

চিকিৎসা প্রদানকারীদের নিরাপত্তা ও পেশাগত সুরক্ষা (স্বাস্থ্য সুরক্ষা নীতির অংশ)। **১.** মেডিকেল প্রফেশনাল ইন্স্যুরেন্স: চিকিৎসক, নার্স, টেকনোলজিস্ট ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য মেডিকেল প্রফেশনাল ইন্স্যুরেন্স চালু করা হবে**,** যাতে কর্মজীবনে আইনি ঝুঁকি বা অপ্রীতিকর ঘটনার ক্ষেত্রে তাদের আর্থিক ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত হয়। ২. পেশাগত অবহেলা (Professional Negligence) বিষয়ে সুরক্ষা: BMDC, BNMC, Bangladesh Pharmacy Council, Allied Health Professional Council -ইত্যাদির পূর্বানুমতি ছাড়া কোনো চিকিৎসক,নার্স, টেকনোলজিস্ট ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের গ্রেফতার করা যাবে না। শুধুমাত্র অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য হবে, তবে তা নব্বই দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে ।

স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা: বাংলাদেশ পুলিশের অধীনে একটি নির্দিষ্ট ইউনিট থাকবে যেখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সংরক্ষিত কিছু পুলিশ থাকবেন (যাদের মেডিকেল পুলিশ বলা যেতে পারে) যারা জরুরী পরিস্থিতিতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। হাসপাতাল ও ক্লিনিকে অনাকাঙ্ক্ষিত হামলা, হুমকি ও সহিংসতা প্রতিরোধে এই ইউনিট কাজ করবে।

১৪ . **চিকিৎসা শিক্ষায় সুশাসন :** [স্বল্প ও মধ্য-মেয়াদী]

চিকিৎসা শিক্ষার মানোন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত, নীতিনির্ভর এবং কাঠামোগত সংস্কার অপরিহার্য।নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন:

জনস্বাস্থ্য চাহিদা, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, প্রতিষ্ঠান সক্ষমতা এবং World Federation for Medical Education (WFME)-এর গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে দেশের সকল মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম নিয়মিত মূল্যায়ন করতে হবে।[স্বল্প মেয়াদী]

মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন, প্রতিষ্ঠান সংখ্যা ও আসন সংখ্যা পুনর্বিন্যাস করতে হবে।মানহীন সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বন্ধ করতে হবে। তবে ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতি এড়াতে তাদের অন্যান্য স্বীকৃত মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরের (transfer) ব্যবস্থা করতে হবে।[স্বল্প মেয়াদী]

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথ উদ্যোগে (joint venture) বাংলাদেশে মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে WFME-এর মানদণ্ড অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি লিজকৃত বা সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত জমিতে স্থাপনের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে জমির মালিকানা (কবলা) গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না।[স্বল্প মেয়াদী]

পাঁচ দিনের একাডেমিক সপ্তাহ চালু করে শিক্ষার কাঠামো উন্নত করতে হবে, যাতে ছাত্রদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষকদের ওপর কাজের চাপ কমে।ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের জন্য ভর্তি প্রক্রিয়ায় অপ্রয়োজনীয়

বাধা অপসারণ করে ‘ব্রেইন ড্রেইন’ রোধ এবং প্রবাসী বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের দেশে ফিরে আসার সুযোগ তৈরি করতে হবে।[স্বল্প মেয়াদী]

FCPS ও MD/MS কোর্সসমূহে পাঠ্যক্রমে সমন্বয় (curricular alignment) আনতে হবে এবং দেশ-বিদেশে পারস্পরিক স্বীকৃতি (reciprocal recognition) নিশ্চিত করে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষার আন্তর্জাতিক মান বৃদ্ধি করতে হবে। [স্বল্প মেয়াদী]

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে Competency-Based Medical Education (CBME) এবং Community-Oriented Medical Education (COME) কার্যকরভাবে চালু করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান, দক্ষতা ও পেশাগত আচরণে পূর্ণ সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। [মধ্য-মেয়াদী]

১৫. **চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুশাসন :** [স্বল্প ও মধ্য-মেয়াদী]

ক. বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি (BMU), অন্যান্য মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস (**বিসিপিএস**), প্রাথমিক পর্যায়ে পর্যায়ে পুরানো আটটি সরকারি মেডিকেল কলেজ এবং পরবর্তীতে সকল মেডিকেল কলেজ, বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহের জন্য Bangladesh Health Commission (BHC)-এর Medical Education Wing-এর অধীনে পৃথক ও স্বশাসিত শাসন কাঠামো গঠন করা হবে। বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি আইনের সংস্কার করে কার্যকর পরিচালন কাঠামো নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ প্রক্রিয়া (বিজ্ঞাপনে চাহিদাকৃত নির্ধারিত যোগ্যতা) করবে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন (BHC)-এর পোস্টগ্র্যাজুয়েট মেডিকেল উইং (গঠন হওয়ার আগ পর্যন্ত UGC (University Grants Commission) দ্বারা হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

খ. বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি ও অন্যান্য মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়-সংযুক্ত হাসপাতালসমূহ (University Hospitals) সরাসরি প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে নিজস্ব বোর্ড অব গভর্ন্যান্স-এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে, যাতে নীতিনির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত হয়। [মধ্য-মেয়াদী]

গ. ভবিষ্যতে একক ও সমন্বিত কাঠামোর ভিত্তিতে একটি স্বশাসিত মেডিকেল ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক, যা দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার সামগ্রিক ও সমন্বিত উন্নয়ন ও গবেষণাকে সুসংহতভাবে এগিয়ে নিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। [মধ্য-মেয়াদী]

ঘ. বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস (বিসিপিএস) কে পরিগণ্য (Deemed) বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব করা হচ্ছে।বিসিপিএস-এ কাউন্সিল সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রতিটি বিশেষজ্ঞ শাখার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে, যাতে নীতিনির্ধারণে পেশাগত অন্তর্ভুক্তি ও বহুমাত্রিকতা বজায় থাকে। এই কাঠামোর আওতায় বিসিপিএস -এর প্রতিটি ফ্যাকাল্টিকে সাব কলেজ রূপান্তরিত করে (যেমন: মেডিসিন, সার্জারি, গাইনী, পেডিয়াট্রিক্স, ক্লিনিক্যাল অনকোলজি (রেডিওথেরাপির নতুন নাম হিসেবে) ইত্যাদি হিসেবে গঠন করা, যেগুলোর একাডেমিক স্বায়ত্তশাসনসহ প্রশ্ন ব্যাংক, পাঠ্যক্রম উন্নয়ন ইউনিট ও রিসার্চ কোঅর্ডিনেশন সেল পরিচালনা করবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

ঙ. NICVD, NITOR, NIKDU, ICMH, NIMH, NICRH, NIDCH, NIPSOM, IEDCR, IPH, IPHN ইত্যাদি সহ জাতীয় বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহকে Bangladesh Health Service (BHS)-এর অধীনে স্বশাসিতভাবে পরিচালিত হবে এবং প্রধানদের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদায় নিয়োগ দেয়া হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

চ. স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলি এনজিও ব্যুরো ব্যতীত সরাসরি স্থানীয় ও বিদেশি তহবিল গ্রহণ করতে পারবে এবং তা গবেষণা ও সেবা প্রদানে সঠিকভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের নিয়মিত অডিট কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। [মধ্য-মেয়াদী]

ছ. টারশিয়ারি ও কোয়ার্টনারি সেবার শাসন কাঠামো: সকল টারশিয়ারি ও কোয়ার্টনারি হাসপাতালসমূহে ইলেকট্রনিক মেডিকেল রেকর্ড চালু করে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় গতি, নির্ভুলতা ও ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

জ. সেবা প্রদানকারী হাসপাতাল ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণ প্রদানকারী হাসপাতালকে পৃথকভাবে পরিচালনা করতে হবে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং অন্যান্য শিক্ষা-প্রশিক্ষণ হাসপাতালগুলোর কাঠামোগত সংস্কার করতে হবে, যাতে তাদের প্রধান কার্যক্রম শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের উপর কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে চিকিৎসা শিক্ষা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে উৎকর্ষতা অর্জনের পথ প্রশস্ত হবে এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থায় জ্ঞানভিত্তিক অগ্রগতি নিশ্চিত করা যাবে। প্রেসক্রিপশন যাচাই, রোগী পরামর্শ সময় নির্ধারণ এবং সেবার গুণমান নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।জনসংখ্যাভিত্তিক ডেটা অনুসারে হাসপাতাল নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণে নিরীক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

ঝ. সরকারি মেডিকেল কলেজসমূহে অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার অধ্যক্ষের নেতৃত্বে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হবে, যা কলেজ ব্যবস্থাপনা,কলেজের কোর্স কারিকুলাম, তার বাস্তবায়ন ও শিক্ষার মান নিশ্চিত করবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

ঞ. প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ আইন সংস্কার: স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সরকারি তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করতে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ আইনের আওতায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে মনোনীত অধাপক পদমর্যাদার একজন মেডিকেল কলেজ শিক্ষককে কো-চেয়ারপারসন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।। [স্বল্প-মেয়াদী]

১৬. **জনবল সংস্কার ও সুশাসন :** [মধ্য-মেয়াদী]

যেসব বিষয়ে জনবল সংকট প্রকট (যেমন: মেডিকোলিগাল, অন্যান্য ক্লিনিক্যাল ও বেসিক সাবজেক্ট), সেখানে আগ্রহ সৃষ্টি ও জনবল ধরে রাখতে বিশেষ ভাতা এবং উপযুক্ত আর্থিক ও অন্যান্য প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে।

সকল বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র পূর্ণকালীন শিক্ষক ক্যাটেগরি চালু করতে হবে।এই ক্যাটেগরির জন্য নন-প্র্যাকটিসিং ভাতা ও অতিরিক্ত প্রণোদনা নির্ধারণ করতে হবে, যাতে শিক্ষকরা শিক্ষা ও গবেষণায় পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারেন। এর ফলে এই খাতে দীর্ঘমেয়াদে পেশাগত উৎকর্ষতা নিশ্চিত করা যাবে।

স্বাস্থ্য অবকাঠামোর বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি করতে হবে। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে বেতন ভাতাদি দিতে হবে। পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা , দুর্গম এলাকায় সেবা ও প্রশিক্ষণ, এবং নির্ধারিত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী সেবা প্রদান কে বিবেচনা করা হবে ; অন্যথায় এর ব্যত্যয় ঘটলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

দুর্গম এলাকায় সেবা প্রদানের জন্য সেবা প্রদানকারীদের বিশেষ ভাতা এবং বসবাসের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস' কাঠামো এবং অন্যান্য সেবা ও পরিষেবা সংক্রান্ত সুপারিশের আলোকে সারাদেশে স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় জনবলের ধরন ও পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বিদ্যমান শূন্যপদগুলো প্রয়োজনে ব্যক্তিখাতের সেবাপ্রদানকারীদের চুক্তির মাধ্যমে অবিলম্বে পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে নতুন পদ সৃষ্টি ও জনবল নিয়োগের উদ্যোগ নিতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

১৭. **বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালীকরণ ও সুশাসন : [স্বল্প ও** মধ্য মেয়াদী]

ক. চিকিৎসা এমন একটি সামাজিক প্রতিশ্রুতি, যা সমাজের প্রয়োজন মেটাতে উদ্ভাবনী ও টেকসই উপায়ে পরিচালিত হয়, আর্থিক লাভের চেয়েও সামাজিক চুক্তি যেখানে মুখ্য। বাংলাদেশে একটি কার্যকর ও টেকসই স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে, সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ, মান ও দক্ষতা বাড়াতে

সামাজিক ব্যবসার মডেল প্রয়োগের জন্য সঠিক নীতিমালা ও অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এতে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে, স্বাস্থ্যসেবা জনমুখী ও সহজলভ্য হবে এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা আরও কার্যকর ও টেকসই হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

খ. বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক কেন্দ্র ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইসেন্সিং ও প্রশাসনিক কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য একটি "একক সেবা কেন্দ্র" চালু করতে হবে। করছাড়, প্রণোদনা ও সহজতর নীতিগত সহায়তার মাধ্যমে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

গ. মাননির্ভর গ্রেডিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং এজন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সেবার স্বীকৃতিতে অ্যাক্রিডিটেশন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে ,যেখানে নিবিড় পরিচর্যা ইউনিট (ICU) ব্যবহারের মান,হাসপাতালে সংক্রমণের হার ও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবস্থাপনার ওপর নজরদারি থাকবে এবং প্রতিটি ৫০ শয্যার হাসপাতালে একজন সিনিয়র চিকিৎসকের নেতৃত্বে ব্যবস্থাপনা বোর্ড গঠনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সেবার মান ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এ সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের তদারকি ও সেবার পরিমাণ, মান ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং অপ্রয়োজনীয় সেবা ও প্রেসক্রিপশন মান নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সাথে মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের (প্রস্তাবিত) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিকস)। [স্বল্প-মেয়াদী]

ঘ. বেসরকারি হাসপাতাল সম্প্রসারণ: রোগীদের বিদেশমুখিতা রোধ ও দেশে আত্মনির্ভরশীল চিকিৎসা ব্যবস্থার সম্পর্কে প্রশিক্ষিত (কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট ও অন্যান্য অঙ্গ প্রতিস্থাপন, ক্যান্সার, কার্ডিয়াক সার্জারি, বন্ধ্যত্ব, ও দুর্লভ রোগ চিকিৎসা ইত্যাদির উন্নয়ন, চিকিৎসায় করছাড়, আমদানিতে সুবিধা ও অর্থনৈতিক প্রণোদনা দিতে হবে। প্রয়োজনে সরকার বেসরকারি খাতের সাথে অংশীদারিত্ব (PPP) ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন, ঝুঁকি বণ্টন ও সেবার মান উন্নয়ন করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

১৮. **স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য বেতন বোর্ড গঠন: [স্বল্প-মেয়াদী]**

বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশনের অধীনে ইন্টার্ন চিকিৎসক,স্নাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রীদের ভাতা,বেসরকারি চিকিৎসক, নার্স, সব ধরনের স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য একটি সুসংগঠিত এবং যুগোপযোগী বেতন কাঠামো প্রণয়ন করতে হবে। এই কাঠামো প্রণয়ন করলে, কর্মীদের আর্থিক স্থায়িত্ব এবং চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।এটি স্বাস্থ্য সেবা কর্মীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী উৎসাহ এবং কাজের পরিবেশের উন্নতি করতে সহায়তা করবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

১৯. **কাগজবিহীন (Paperless) ডিজিটাল স্বাস্থ্যব্যবস্থায় সুশাসন:** [মধ্য-মেয়াদী]

বাংলাদেশে একটি সম্পূর্ণ কাগজবিহীন স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্যখাতের সব সেবা ও ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রূপান্তর করতে হবে। প্রতিটি নাগরিকের জন্য ইউনিক স্বাস্থ্য আইডি ও স্মার্ট স্বাস্থ্য কার্ড চালু করতে হবে। সেবার ধারাবাহিকতা ও তথ্য সংরক্ষণের জন্য ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ড সিস্টেম চালু করা জরুরি। সরবরাহ ও মজুত ব্যবস্থাপনার জন্য আধুনিক ডিজিটাল লজিস্টিক সিস্টেম এবং প্রক্রিয়াগত স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ডিজিটাল প্রোকিউরমেন্ট ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। জাতীয় ফার্মেসি নেটওয়ার্ক-কে ডিজিটাল ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। এই সমন্বিত ডিজিটাল ব্যবস্থা দেশীয় প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের নেতৃত্বে স্থানীয়ভাবে তৈরি ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

২০. **সেইফ ফুড, ড্রাগ, ও আইভিডি-মেডিকেল ডিভাইস প্রশাসন গঠন:** [স্বল্প ও মধ্য-মেয়াদী]

একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে তিনটি শাখা থাকবে: ঔষধ-টিকা-প্রসাধনী, আই ভি ডি-মেডিকেল ডিভাইস, ও নিরাপদ খাদ্য। [স্বল্প-মেয়াদী]

ক. ঔষধ-টিকা-প্রসাধনী খাতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।এর মধ্যে রয়েছে প্রতি দুই বছর অন্তর অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের তালিকা পর্যালোচনা, অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (API)-এর মান নিয়ন্ত্রণ

নিশ্চিতকরণ, স্থানীয় রোগীদের উপর ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বাধ্যতামূলক করা, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত নিরপেক্ষ নিরীক্ষা কমিটি গঠন এবং বৈদেশিক যৌথ বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদান। [মধ্য-মেয়াদী]

খ. মেডিকেল ডিভাইস খাতে মধ্য-মেয়াদে টেলিমেডিসিন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন একটি মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি, নীতিমালা হালনাগাদ, স্থানীয় উদ্ভাবনকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে উৎসাহ প্রদান, পুরনো যন্ত্রপাতি পরিত্যাগ এবং বৈদেশিক যৌথ বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

গ. খাদ্য নিরাপত্তা খাতে সংক্ষিপ্ত-মেয়াদে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (Food Safety Authority) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থানান্তর, ২০১৩ সালের খাদ্য আইন হালনাগাদ, খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনে ট্রেসেবিলিটি চালু, স্থানীয় পর্যায়ে অফিসার নিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড নিশ্চিতকরণ। [স্বল্প-মেয়াদী]

ঘ. চিকিৎসক-ফার্মাসিউটিক্যাল সম্পর্কিত নীতি: [মধ্য-মেয়াদী]

World Medical Association – (WMA) এর প্রস্তাবনার আলোকে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা দেওয়া হচ্ছে, যাতে করে মধ্য-মেয়াদে একটি নৈতিক ও ভারসাম্যপূর্ণ চিকিৎসক-ফার্মাসিউটিক্যাল সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়:

১. ঔষধের নমুনা বা উপহার প্রদান করে কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে; ২. মেডিকেল কনফারেন্স আয়োজনের পূর্বে অবশ্যই বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (BMEAC) অনুমোদিত CPD ক্রেডিট পয়েন্ট গ্রহণের জন্য আবেদন করতে হবে **এবং** মেডিক্যাল কনফারেন্সের সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব ট্যাক্স অফিসে জমা দিতে হবে এবং এর একটি কপি বিএমইএসি-তে জমা দিতে হবে; ৩. কনফারেন্সে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির অংশগ্রহণ: ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো অনুমোদিত কনফারেন্সে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে পারবে, তবে কেবলমাত্র প্রদর্শনী এলাকায় পণ্যের উপস্থাপনার জন্য তাদের প্রতিনিধির শারীরিক উপস্থিতি অনুমোদিত থাকবে। কোনো ধরনের খাবার, উপহারের ব্যাগ বা অন্য কোনো উপহার সামগ্রী সরবরাহ ও **ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির** পক্ষ থেকে **সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধূলা,** রাফেল **ড্র** ইত্যাদি করতে পারবে না; ৪. ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো শুধুমাত্র ডাক্তারদের ই-মেইল বা ডাকযোগের মাধ্যমে তাদের পণ্য সম্পর্কিত তথ্য পাঠাতে পারবে।প্রতিনিধিরা সরাসরি সাক্ষাতের মাধ্যমে দৈনন্দিন প্রোডাক্ট প্রমোশন করতে পারবে না; ৫. চিকিৎসকের চেম্বার বা হাসপাতাল প্রাঙ্গণে কোনো ধরনের ঔষধের/পণ্য প্রচার কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে, কারণ এসব কর্মকাণ্ডে চিকিৎসকের মনোযোগ বিঘ্নিত হয় এবং রোগীরা সঠিকভাবে চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হন; ৬. চিকিৎসকদের যেকোনো পেশাগত সংগঠন, যেমন—চিকিৎসক সমিতি, পেশাগত সংস্থা বা বিশেষজ্ঞ সমাজ (Professional Associations or Societies)**–এ** কোনো ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে থাকতে পারবে না**; ও** ৭. নতুন ওষুধ বা নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য থাকলে তা প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক না করে কেন্দ্রীয়ভাবে নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক সভার মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

২১. **ঔষধ ও প্রযুক্তি সুশাসন :** [মধ্য-মেয়াদী]

জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের বিবেচনায় মানসম্মত এপিআই, ভ্যাকসিন এবং মেডিকেল ডিভাইস উৎপাদনে দেশীয় স্বনির্ভরতা অর্জন করতে হবে।বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং আমদানি নির্ভরতা কমাতে এই খাতে গবেষণা ও উৎপাদন সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। প্রয়োজনে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের যৌথ বিনিয়োগে উৎসাহ দিতে হবে। এজন্য পর্যাপ্ত প্রণোদনা, স্বল্পসুদের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ, ট্যাক্স ও ভ্যাট ছাড়সহ প্রয়োজনীয় নীতিগত সুবিধা প্রদান করতে হবে। এজন্য আইন প্রয়োগ করতে হবে।[মধ্য-মেয়াদী]

২২. **বিদেশে চিকিৎসা নির্ভরতা হ্রাস এবং মেডিকেল ট্যুরিজম উন্নয়ন:** [মধ্য-মেয়াদী]

ক. প্রতিবছর বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং বিদেশগামী রোগীর সংখ্যা হ্রাসের লক্ষ্যে একটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।ক্যান্সার চিকিৎসা, অঙ্গ প্রতিস্থাপন সার্জারি, হৃদরোগ, জটিল কিডনি রোগ,বন্ধ্যাত্ব ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত রোগনির্ণয়ের জন্য আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন উৎকর্ষকেন্দ্র (Centers of Excellence) প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেওয়া হবে, যাতে দেশেই উচ্চমানের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা যায়। এই উদ্যোগের জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP)-কে উৎসাহ দিতে হবে এবং উচ্চপ্রযুক্তি নির্ভর বিশেষায়িত হাসপাতালে বিনিয়োগ সহযোগিতা করতে হবে।দক্ষ জনবল উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি (যেমন: JCI, ISO) অর্জন এবং সেবার মানোন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় স্বাস্থ্যসেবায় জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পাবে। [মধ্য-মেয়াদী]

খ.একইসঙ্গে, মেডিকেল ট্যুরিজম সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি আঞ্চলিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিকল্পিত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।এ জন্য রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য দেশের পুরাতন ল্যাবরেটরীগুলির দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

গ. কোন চিকিৎসক মেডিক্যাল বোর্ডের সিদ্ধান্ত ব্যাতীত কোন রোগী বিদেশে রেফার করতে পারবেন না।একটি দালাল চক্র রোগীদের বিদেশে প্রেরণ করে। রোগীরা আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।সকল রোগীকে বিদেশ যাবার পূর্বে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অন লাইন ফরম পূরণ করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে তাতে কোন রোগের জন্য যাচ্ছেন তার বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে কোন চিকিৎসক এর বিদেশের কোন হাসপাতালের এর সাথে রোগী আদান প্রদানের সম্পর্ক থাকতে পারবে না। প্রায়ই দেখায় এতে আর্থিক লেনদেন জড়িত থাকে। এটা শাস্তযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল এই বিষয়টির ওপর সময় সময় নজরদারি করবে।[মধ্য-মেয়াদী]

২৩. **প্রবাসী বাংলাদেশি স্বাস্থ্যসেবা পেশাজীবীদের সম্পৃক্ততায় বিশেষ নীতিমালা :** [মধ্য-মেয়াদী]

বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি চিকিৎসক, নার্স, প্রযুক্তিবিদ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা পেশাজীবীদের দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ ও উন্নয়নের জন্য তাদের মূল্যবান দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরে আসার জন্য আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হবে।এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য একটি বিশেষ নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে, যা প্রত্যাবর্তনকারী পেশাজীবীদের প্রয়োজনীয় সুবিধা ও সহায়তা প্রদান করবে।

২৪. **ক্রয় ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার:** [মধ্য-মেয়াদী]

ই-জিপি চালু, স্বাধীন নিরীক্ষা, স্বাস্থ্য সমস্যার আলোকে স্থানীয়ভাবে বাস্তবসম্মত বাজেট ব্যবস্থাপনা, পারফরম্যান্সভিত্তিক প্রণোদনা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর চাহিদা পূর্বাভাস চালু করতে হবে এবং সে অনুযায়ী ক্রয় সংগ্রহ কাজ সম্পাদিত হতে হবে। বাজেত প্রাক্কলনে উন্নয়ন, রাজস্ব ও পরিচালনা ভিত্তিক বাজেট এক সাথেই প্রতিফলিত হতে হবে। স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা, বাজেট, কমর্সূচীর পর্যালোচনা করতে হবে।[মধ্য-মেয়াদী]

২৫. **দুর্নীতি প্রতিরোধ :** [স্বল্প-মেয়াদী]

ক. প্রতিটি মহাপরিচালকের দপ্তরে অবস্থিত স্বাধীন ইন্টারনাল অডিট ইউনিট অধিকতর শক্তিশালী এবং কার্যকর করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

খ. কোন চিকিৎসক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হাসপাতল সেবা, ঔষধ, রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষার পরামর্শ দিবেন না।কোন ঔষধ কোম্পানীর প্যাডে ঔষধের নিদান (প্রেসক্রিপশন) লিখবেন না। [স্বল্প-মেয়াদী]

২৬. ক) সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও বেশ কিছু দীর্ঘস্থায়ী জটিল ব্যাধির অতি দ্রুত হার বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলির রেজিস্ট্রি তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা জরুরি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এই রেজিস্ট্রি, সঠিক পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে, এসকল ব্যাধির চিকিৎসা ও প্রতিরোধ পরিকল্পনায় প্রচুর ভূমিকা রাখতে পারে।

খ) উপরোক্ত সুপারিশের ধারাবাহিকতায়, অগ্রাধিকারভিত্তিতে, অত্যন্ত ব্যয়বহুল মরণব্যাধি ক্যান্সারকে প্রথমে নির্বাচন করে একটি পরিকল্পনা সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করার সুপারিশ করা হচ্ছে। এর আওতায়, জেলা ও উর্ধ্বতন সকল সরকারি হাসপাতাল এবং ১০০ শয্যার অধিক বেসরকারি হাসপাতালে প্রাথমিক ক্যান্সার শনাক্তকরণ কেন্দ্র স্থাপন এবং ক্যান্সার রেজিস্ট্রি চালু,নিয়মিত স্ক্রিনিং কর্মসূচি চালু, ক্যান্সার শনাক্তকরণ ও চিকিৎসার জন্য হিস্টোপ্যাথোলজিস্ট, ক্লিনিক্যাল অনকোলজিস্ট, গাইনি অনকোলজিস্ট, মেডিক্যাল অনকোলজিস্ট, নার্স, টেকনোলজিস্টসহ প্রয়োজনীয় জনবল গড়ে তুলতে হবে এবং ক্যান্সার ট্রাস্ট ফান্ড সৃষ্টি করতে হবে। এর মাধ্যমে ক্যান্সার দ্রুত শনাক্ত, চিকিৎসা এবং মৃত্যুহার কমানো সম্ভব হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

২৭. **স্বাস্থ্য গবেষণা**য় **সুশাসন:** [মধ্য-মেয়াদী]

দেশের স্বাস্থ্য গবেষণার নৈতিক মান উন্নয়ন ও প্রমিতকরণ, গবেষণা সংক্রান্ত নীতিমালা ও গাইড লাইন প্রণয়ন, গবেষণা অনুদান ব্যবস্থাপনা, যথাযথ আইনের অধীনে, BMRC-র অবকাঠামোগত ও আর্থিক-প্রশাসনিক সামথ্য বৃদ্ধির সুপারিশ করা হলো। জাতীয় স্বাস্থ্য গবেষণায় বরাদ্দ বাজেট প্রাথমিকভাবে মোট স্বাস্থ্য বাজেটের অন্তত ১% পর্যন্ত উন্নীত করতে হবে। ধাপে ধাপে বৃদ্ধি করে অন্তত ২% বা তার বেশি করা প্রয়োজন, যাতে প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নীতিনির্ধারণ, এবং প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবনকে শক্তিশালী করা যায়। [মধ্য-মেয়াদী]

২৮. পরিবেশগত এবং পেশাগত স্বাস্থ্য নিশ্চিতে আইন : [মধ্য-মেয়াদী]

পরিবেশগত এবং পেশাগত স্বাস্থ্যকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে, এজন্য আইন তৈরি করতে হবে ।

২৯. নারী স্বাস্থ্য ও সুস্থতা নিশ্চিতে আইন : [মধ্য-মেয়াদী]

মা, শিশু, কৈশোরকালীন ও বিশেষ প্রয়োজনীয় জনগণের জন্য উপযুক্ত ও সম্মানজনক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে, এবং প্রয়োজনভিত্তিক সেবা-প্রদান ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। নারীর স্বাস্থ্য ও সুস্থতা নিশ্চিত করতে **জাতীয় নারীস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট** প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। জাপানে উদ্ভাবিত মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য (MCH) হ্যান্ডবুক মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য জোরদার, ধারাবাহিক পরিচর্যা নিশ্চিতকরণ, পরিবারকে ক্ষমতায়ন এবং স্বাস্থ্যশিক্ষার ব্যবধান দূরীকরণে বিশ্বব্যাপী একটি শক্তিশালী ও কার্যকর উদ্যোগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি সকল পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে এবং দুর্যোগ-নিরোধক, নারী, শিশু, কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক বান্ধব স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত করতে হবে।

৩০. নবজাতকের, শিশ, কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্য বিকাশ এবং মঙ্গল আইন: [মধ্য-মেয়াদী]

একটি নিরবিচ্ছন্ন ডিজিটাল তথ্য সম্প্রচার ব্যবস্থার মাধ্যমে, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রগুলির সার্বজনীন নজরদারি এবং সময়োচিত ও যথাযথভাবে মাধ্যমিক ও তৃতীয় পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে রেফার করার মাধ্যমে নবজাতক, শিশু, কিশোর -কিশোরীর স্বাস্থ্য, বিকাশ এবং মঙ্গল সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করা । [মধ্য-মেয়াদী]

৩১. রূপান্তর প্রক্রিয়া:

রূপান্তর প্রক্রিয়াটি সম্পন্নে প্রায় ২ বছর লাগবে এবং একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন প্রয়োজন।স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন এ পরিকল্পনায় কার্যকর সহযোগিতা দিতে পারে।

পরিচ্ছেদ ৫

স্বাস্থ্য জনবল ব্যবস্থাপনা

প্রতিটি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নির্মাণে স্বাস্থ্য জনবল একটি অপরিহার্য স্তম্ভ। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বেশ কিছু সাফল্য অর্জন করেছে, কিন্তু একই সঙ্গে, এমনকি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলেও জনগণের সংখ্যা অনুপাতে স্বাস্থ্যকর্মীদের ঘনত্ব এ দেশে সবচেয়ে কম। বিভিন্ন অধিদপ্তর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশে সর্বমোট ১,৬৬,৮৩৪ জন স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োজিত রয়েছেন। এক্ষেত্রে অনুমোদিত পদ রয়েছে ২৪৪,৭১১ টি; অর্থাৎ অনুমোদিত পদের মধ্যে ৩২ শতাংশ (৭৭,৮৭৭) এখনো শূন্য হয়ে আছে (ছক ৫.১)।

ছক ৫.১: বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীনে বিভাগ অনুযায়ী স্বাস্থ্যজনশক্তির শূন্যপদ সংখ্যা (২০২১ সাল অনুযায়ী)

বিভাগের নাম	মোট অনুমোদিত পদ সংখ্যা	মোট পুরণকৃত পদ সংখ্যা	শূন্য পদ সংখ্যা		এ্যালাইড জনশক্তি, কোড-২২৬ এবং ৩২১		মেডিকেল ডাক্তার, কোড- ২২১ এবং টিসিএম, কোড- ২২৩		নার্সিং ও মিডওয়াইফারি এসোসিয়েটস, কোড ৩২২		নার্সিং ও মিডওয়াইফারি প্রফেশনাল, কোড ২২২		অন্যান্য স্বাস্থ্য সহযোগী পেশাদার, কোড-৩২৫		পেশাদার পরিষেবা ব্যবস্থাপক, কোড ১৩৪, এবং সার্পোট স্টাফ	
			শূন্য পদ সংখ্যা	শূন্য পদ %	শূন্য পদ সংখ্যা	শূন্য পদ %	শূন্য পদ সংখ্যা	শূন্য পদ %	শূন্য পদ সংখ্যা	শূন্য পদ %	শূন্য পদ সংখ্যা	শূন্য পদ %	শূন্য পদ সংখ্যা	শূন্য পদ %	শূন্য পদ সংখ্যা	শূন্য পদ %
বরিশাল	১৬,৯৪২	১১,৩৩৬	৫,৬০৫	৩৩%	৭৮৫	৫৪%	১,২৩৪	৫৯%	৯৯	৭০%	৫৭৫	১৯%	১,৪৩৭	২৩%	১,৪৭৫	৩৬%
চট্টগ্রাম	৩৯,২০২	২৫,৫১৭	১৩,৬৮৫	৩৫%	১,৪১১	৪৫%	১,৪৯১	৩৩%	১৬৮	৫৯%	২,৭৭০	৪২%	৪,০৩২	২৭%	৩,৮১৩	৪০%
ঢাকা	৮১,১৯৬	৫৫,২২৬	২৫,৯৭১	৩২%	২,৩৮৭	৩৮%	৪,২৫২	৩৪%	৪০৭	৬১%	৩,৯৪১	২২%	৪,০১৫	২৬%	১০,৯৬৯	৩৮%
খুলনা	২৪,৬৭২	১৬,৫৭৬	৮,০৯৬	৩৩%	৯১৩	৪৫%	১,৫৯৯	৫২%	১১৪	৬০%	৭৮৮	১৮%	২,২৬৯	২৫%	২,৪১৩	৩৯%
ময়মনসিংহ	১৫,৯৭৫	১১,৭৪৯	৪,২২৬	২৬%	৪৭৮	৩৬%	৮১০	৪১%	৮৯	৭৭%	৪৬৯	১৮%	১,২৮৮	২০%	১,০৯২	৩১%
রাজশাহী	২৮,৮৯৭	২১,২৩৮	৭,৬৫৯	২৭%	৪৯৫	২০%	১,৩৯৫	৪২%	১১৭	৪৩%	৬৯৫	১২%	২,৩১৮	২৪%	২,৬৩৯	৩৬%
রংপুর	২৩,২৯১	১৬,৪৮৩	৬,৮০৮	২৯%	৮১৮	৪৩%	১,৩৭২	৫০%	১০৫	৬৭%	৮১৫	১৯%	২,১১২	২৪%	১,৫৮৬	২৯%
সিলেট	১৪,৫৩৬	৮,৭০৯	৫,৮২৭	৪০%	৬৬০	৫৮%	৭৭৫	৪৬%	৯২	৮৫%	১,৪৬৫	৫৩%	১,৩৫৩	২৬%	১,৪৮২	৪২%
মোট	**২৪৪,৭১১**	**১৬৬,৮৩৪**	**৭৭,৮৭৭**	**৩২%**	**৭,৯৪৭**	**৪০%**	**১২,৯২৮**	**৪০%**	**১,১৯১**	**৬২%**	**১১,৫১৮**	**২৫%**	**১৮,৮২৪**	**২৫%**	**২৫,৪৬৯**	**৩৭%**

Note: TCM (টিসিএম), Traditional & complementary medicine professionals; Allied (**এ্যালাইড**) HRH includes Other Health Professional, Code-226 & Medical & pharmaceutical technicians, Code- 321; Other health associates professionals (**অন্যান্য স্বাস্থ্য সহযোগী পেশাদার**) including Community health workers, covers mostly PHC services

ছক ৫.২: বাংলাদেশে স্বাস্থ্যকর্মীদের বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণ

বিভাগ	মোট স্বাস্থ্য জনশক্তি	যোগ্য এবং স্বীকৃত		অযোগ্য/স্বীকৃত		অযোগ্য/অস্বীকৃত	
		সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
বরিশাল	৩৯,১৪১	২০,৬২৫	৫৩%	৭০৩	২%	১৭,৮১৩	৪৬%
চট্টগ্রাম	১০৫,১১৯	৮২,৭৩৬	৭৯%	৪৬৯	০%	২১,৯১৪	২১%
ঢাকা	৩৬৬,৬৮৬	২৫৬,৯৯৭	৭০%	৩,২৮১	১%	১০৬,৪০৮	২৯%
খুলনা	৭৯,১০৩	৪৯,১০২	৬২%	১,৪০৬	২%	২৮,৫৯৪	৩৬%
ময়মনসিংহ	২৬,৮৩৬	১০,৭৮১	৪০%	১,৮৭৫	৭%	১৪,১৮০	৫৩%
রাজশাহী	৫৪,৩৭৬	২৮,৩৬০	৫২%	৪৬৯	১%	২৫,৫৪৭	৪৭%
রংপুর	৮৪,০২৫	৬২,৫৭৯	৭৪%	১,২৮৯	২%	২০,১৫৭	২৪%
সিলেট	২৯,৮৮৩	২০,২৭৪	৬৮%	৪৬৯	২%	৯,১৪১	৩১%
মোট	**৭৮৫,১৬৯**	**৫৩১,৪৫৪**	**৬৮%**	**৯,৯৬১**	**১%**	**২৪৩,৭৫৪**	**৩১%**

Source: Assessment of Healthcare Providers in Bangladesh 2021

ছক ৫.৩: বিভাগভিত্তিক স্বাস্থ্যকর্মীর ঘনত্ব (প্রতি ১০,০০০ জনসংখ্যার জন্য)

বিভাগ	যোগ্য এবং স্বীকৃত	অযোগ্য এবং স্বীকৃত	অযোগ্য এবং অস্বীকৃত	মোট
বরিশাল	***১৮.৮৫***	***০.৬৪***	***১৬.২৮***	***৩৫.৭৭***
গ্রাম	১৫.৮৮	০.৬৭	১৫.১	৩১.৬৫
শহর	৯৯.০৭	০	৪৮.০৩	১৪৭.১
চট্টগ্রাম	***৩৬.৭২***	***০.২১***	***৯.৭৩***	***৪৬.৬৬***
গ্রাম	১২.৩	০.২৩	৬.৭৩	১৯.২৬
শহর	৮৬.৭৯	০.১৬	১৫.৮৭	১০২.৮২
ঢাকা	***৯০.০১***	***১.১৫***	***৩৭.২৭***	***১২৮.৪৩***
গ্রাম	১৭.২৯	০.৩৩	৯.৪৬	২৭.০৮
শহর	১৩৯.০২	১.৪৫	৫২.৪৭	১৯২.৯৪
খুলনা	***৩১.৫৬***	***০.৯***	***১৮.৩৮***	***৫০.৮৪***
গ্রাম	২০.১৮	১.০৭	১৮.৭৪	৩৯.৯৯
শহর	৫১.০৩	০.৬১	১৭.৭৬	৬৯.৪
ময়মনসিংহ	***১৫.৫৬***	***২.৭১***	***২০.৪৬***	***৩৮.৭৩***
গ্রাম	২০.০৩	৪.০১	২৬.৬	৫০.৬৪
শহর	৯.১	০.৮৩	১১.৫৮	২১.৫১
রাজশাহী	***৮***	***০.১৩***	***৭.২১***	***১৫.৩৪***
গ্রাম	৮.৫৫	০.০৮	৬.০৯	১৪.৭২
শহর	৫.৯	০.৩২	১১.৪৮	১৭.৭
রংপুর	***২৮.০৭***	***০.৫৮***	***৯.০৪***	***৩৭.৬৯***
গ্রাম	১২.১৪	০.৪৫	১০.৩৩	২২.৯২
শহর	৫০.০৮	০.৭৫	৭.২৬	৫৮.০৯
সিলেট	***১১.২৯***	***০.২৬***	***৫.০৯***	***১৬.৬৪***
গ্রাম	৫.৩৩	০	৫.৫১	১০.৮৪
শহর	২৬.৭৭	০.৯৪	৩.৯৯	৩১.৭

Ref: Assessment of All Healthcare Providers in BD, by WHO and UKaid

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইউকে এইডের ২০২১ সালের একটি সার্ভে থেকে হিসাব করলে দেখা যায় যে দেশে ৭৮৫,১৬৯ জন স্বাস্থ্যকর্মী চিহ্নিত করা যায় মধ্যে ৫৩১,৪৫৪ অর্থাৎ ৬৮ শতাংশ শিক্ষিত এবং স্বীকৃত, ৯৯৬১ (১%) - এর কোনো শিক্ষা নেই অথচ স্বীকৃত এবং ২৪৩,৭৫৪ (৩১ শতাংশ) শিক্ষাগত যোগ্যতাবিহীন এবং তাদের কোন স্বীকৃতি নেই।

স্বাস্থ্য জনবলের আঞ্চলিক বিভাজনে ঢাকা বিভাগে প্রচুর স্বাস্থ্য কর্মী রয়েছেন যা সমগ্র জাতীয় জনবলের ৪৭ শতাংশ। অর্থাৎ,বাংলাদেশের আনুমানিক ৩০ শতাংশ জনগণের সেবা দিয়ে থাকেন ৪৭ শতাংশ (৩৬৬,৬৮৬) স্বাস্থ্যকর্মী; বাকি ৭০ শতাংশের সেবা করেন ৫৩ শতাংশ স্বাস্থ্যকর্মী। উপরোক্ত রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় যে, সিলেট বিভাগে জনসংখ্যার অনুপাতে সবচেয়ে কম স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন। এছাড়া নগরে অঞ্চলে অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন প্রায় সব বিভাগে। গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য কর্মীর ঘাটতি রয়েছে যেখানে দেশের প্রায় ৬২ শতাংশ মানুষ এখনো গ্রাম অঞ্চলে বাস করেন। স্বাস্থ্যকর্মীর এই অসম বিভাজন দেশের দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় একটি ঋনাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল এবং দুর্গম অঞ্চলে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়োগ অবস্থান নিশ্চিত করা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়েছে।

চাকরিকালীন সময়ে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য সুপরিকল্পিত কোন ব্যবস্থা নেই করা হয়নি। বিগত বছরগুলিতে বিভিন্ন অপারেশন প্লানের আওতায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কিছু প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু সেগুলি যথাযথ প্রয়োজনভিত্তিক ছিল না এবং এবং চতুর্থ এইচপিএনএসপি-র মধ্যমেয়াদী রিভিউ-এ সেগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

ছক ৫.৪: সরকারি খাতের স্বাস্থ্য জনশক্তি-এর ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তা (প্রাক্কলিত)

স্বাস্থ্য জনশক্তির শ্রেণীবিভাগ	**স্বাস্থ্য জনশক্তি**		
	২০২১ সাল	**২০২৫ সাল**	**২০৩০ সাল**
মেডিকেল ডাক্তার, কোড- ২২১ এবং টিসিএম, কোড- ২২৩	৩১,৯৯৩	৪১,৭৮৬	৫৯,৯৩১
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি প্রফেশনাল, কোড ২২২	৪৬,৮৩৮	৬১,১৭৬	৮৭,৭৪০
এ্যালাইড এইচআরএইচ, কোড-২২৬ এবং ৩২১	১৯,৭৪৩	১২,৭৫৬	৯,৮৭৬
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি এসোসিয়েটস, কোড ৩২২	১,৯৩৬	২,৫২৯	৩,৬২৭
অন্যান্য স্বাস্থ্য সহযোগী পেশাদার, কোড-৩২৫	৭৫,৯৬১	৯০,১৯৪	১০৭,৭৯৯
পেশাদার পরিষেবা ব্যবস্থাপক, কোড ১৩৪, এবং সার্পোট স্টাফ	৬৮,২৪০	৮৯,১২৯	১২৭,৮৩২
মোট:	**২৪৪,৭১১**	**২৯৭,৫৭০**	**৩৯৬,৮০৫**

Note: All technologists and other technical staff are included in the Allied HRH group. The requirement of such staff may be reduced as a result of the Technological Factor and will be applicable if technological advancement or automation develops.

বিভিন্ন স্বাস্থ্য জনবল ক্যাটেগরির অনুপাত (যেমন চিকিৎসক-নার্স অনুপাত) হিসাব করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে চিকিৎসক বনাম নার্স অনুপাত অনুমোদিত পদ অনুযায়ী ১.৫ এবং পুরনকৃত পদ অনুযায়ী ১.৯। এদের ক্ষেত্রে সেবার বিভিন্ন পর্যায়ে দক্ষতার যথাযথ মিশ্রণের প্রচুর অভাব রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর অনুপাত হওয়া উচিত ১:৩ ও ১:৫। ২০২১ সালে হিসাবকৃত ১৮ কোটি জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসকের সংখ্যা হবে ১,০৩,৫০০, সেই হিসেবে নার্সের সংখ্যা হবে ৩, ১০,৫০০ এবং মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও অন্যান্য দক্ষ জনবলের সংখ্যা হবে ৫, ১৭৫০০। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রকাশিত বাংলাদেশ স্বাস্থ্য জনবল জাতীয় প্রোফাইল ২০২১ অনুযায়ী চিকিৎসকের সংখ্যা ৮৬, ৬৭৫ (অর্থাৎ ১৬. ৫ শতাংশ কম), নার্স-মিডওয়াইফরি ও সহযোগী সংখ্যা ৫৬,৭৩৪ (অর্থাৎ ৮২ শতাংশ কম) এবং মেডিকেল

টেকনোলজিস্ট ও অন্যান্য দক্ষ জনবল সংখ্যা ২৩০,২১৯ (অর্থাৎ ৫৫.৫ শতাংশ কম) । বাংলাদেশে সরকারি খাতের প্রায় সব ক্যাটিগরীর জনবল ঘাটতি রয়েছে।

ছক ৫.৫: অনুপযুক্ত দক্ষতা মিশ্রণের উদাহরণ

যুগল পেশাজীবী	অনুপাত
সার্জন বনাম হাসপাতাল পরিষেবা	১.২২
অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট বনাম হাসপাতাল পরিষেবা	০.৪৫
অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট বনাম সার্জন	০.৩৭
ল্যাব টেকনিশিয়ান বনাম হাসপাতাল পরিষেবা	০.১৭
প্যাথলজিস্ট/বায়োকেমিস্ট/অন্যান্য বনাম হাসপাতাল পরিষেবা	০.৭৭
ল্যাব টেকনিশিয়ান বনাম প্যাথলজিস্ট/বায়োকেমিস্ট/অন্যান্য	০.২২

সেবার পর্যায় ও দায়িত্ব -স্তর ভেদে জনবল চিহ্নিতকরণ ও তার সংখ্যা নির্ধারণ বাংলাদেশের জন্য একটি জটিল বিষয়। একমাত্র অবস্থানভিত্তিক এক ধরনের প্রাথমিক, সেকেন্ডারি ও উচ্চতর সেবার বিভাজন ছাড়া সত্যিকারের সুপরিকল্পিত স্তরভিত্তিক গাইড লাইন এখনো দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিদ্যমান নেই, ফলে বিভিন্ন পর্যায়ে সেবাদানকারী স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা সঠিকভাবে চিহ্নিত করা কঠিন।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষ স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের অভাব এই দেশে প্রকট। জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দক্ষ জনবল প্রায় অনুপস্থিত। উর্ধ্বতন পর্যায়েও এ ধরনের জনবলের প্রচুর ঘাটতি রয়েছে।

স্থানীয় পর্যায়ে কমিউনিটির যথাযথ অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের অভাব রয়েছে। উপজেলা এবং কমিউনিটিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কমিটি সাধারণত তৈরি করা হয়, কিন্তু সিংহভাগ ক্ষেত্রে এইসব কমিটিগুলোকে কোন দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায় না এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য সেবাদানকারীদের মধ্যে কোনো জবাবদিহিতা তৈরি হয় না।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংস্থাগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। বাংলাদেশে অনেক মন্ত্রণালয় এবং সংস্থায় বহু স্বাস্থ্যকর্মী কাজ করেন । যেমন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ছাড়াও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, সিটি কর্পোরেশন এবং আরো অনেক প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থায় স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন । কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেই কোন ক্যারিয়ার বা চাকুরী পরিকল্পনা নেই এবং সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত ও পেশাগত উন্নয়নের কোন পদ্ধতি নেই । বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সংস্থার এসব স্বাস্থ্যকর্মী মধ্যে কোন সমন্বয়ের সুযোগ তৈরি হয়নি । এ সবই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যথাযথ উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশে বেসরকারি খাতের সেবাদান কার্যক্রম অতি দুত বিকশিত হয়েছে, বিশেষত সেকেন্ডারি ও উচ্চতর পর্যায় । প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যায় তাদের ভূমিকা অত্যন্ত কম। বেসরকারি খাতের জনবল সংক্রান্ত বর্তমান অবস্থা এবং সংকট মূল্যায়ন করা অত্যন্ত কঠিন, কারণ এক্ষেত্রে কোনো সমন্বিত প্রকাশিত তথ্যসূত্রের অভাব। সরকারি থেকে বেসরকারি খাতে স্বাস্থ্যব্যবস্থার অতি দুত স্থানান্তর অনেক চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করেছে যার মধ্যে স্বাস্থ্য জনবল একটি প্রধানতম চ্যালেঞ্জ। সিংহভাগ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের জনবল সরকারি অর্থ শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন। অথচ বেসরকারি খাতে অতি উচ্চ আর্থিক প্রণোদনের ফলে, দ্বৈত প্র্যাকটিসের সুযোগে, এই সকল বিশেষজ্ঞের সেবা বেসরকারি খাতেই বেশি পাওয়া যায়। আইনগত নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশাসনিক শিথিলতার কারণে বেসরকারি খাতের সেবা কার্যক্রম পুরোপুরি নৈতিক ও সমন্বিত করা সম্ভব হয়নি। বেসরকারি খাতে চিকিৎসা শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের পরিকল্পনাও একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে। বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্যসেবার জন্য ব্যক্তিগত অর্থব্যয়ের এটি একটি প্রধান কারণ।

স্বাস্থ্য জনবল ব্যবস্থাপনা - সুপারিশসমূহ

৫.১ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রচুর সংখ্যক খালি পদে জনবল নিয়োগের জন্য আশু পদক্ষেপ গ্রহণের জোরালো সুপারিশ করা হচ্ছে।

৫.২ 'নেতৃত্ব, সুশাসন ও কর্মসংস্কৃতি' পরিচ্ছেদের প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন'-এর স্বাস্থ্য প্রযুক্তি ও জনবল মূল্যায়ন ও নিরূপণ সংক্রান্ত শাখার মাধ্যমে সারাদেশের জন্য প্রয়োজনভিত্তিক ও সমন্বিত একটি দীর্ঘমেয়াদী ক্যাটেগরি বিভাজিত জনবল পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। হেলথ লেবার মার্কেট বিশ্লেষণ (লেবার মার্কেট অ্যানালিসিস বা এইচ এল এম এ)-এর মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় প্রয়োজনকে এতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৫.৩ বিএইচএস নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক রিক্রুটমেন্ট পরিকল্পনা করবে।

৫.৪ বিএইচসি-র জনবল পরিকল্পনা ও বি এইচ এস -এর রিক্রুটমেন্ট প্রস্তাব, উভয় ক্ষেত্রে সংস্থা দুটি দেশের ডেমোগ্রাফিক, টোপোলজিক্যাল, রোগতত্ত্ব, সেবা ব্যবহারের মাত্রা, এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তন বিবেচনায় রাখবে এবং এগুলির ভিত্তিতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির (পেশা ও স্তর) সংখ্যা ও অনুপাত, দক্ষতার যথাযথ মিশ্রণ, এবং গুণগত মানের বিষয়গুলির প্রতি মনোযোগ প্রদান করবে।

৫.৫ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অধিদপ্তর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অনেক জনবলের দায়িত্বে অধিক্রমন (overlapping), দ্বৈততা ও অস্পষ্টতা পরিহার করে প্রত্যেককে প্রস্তাবিত তিনটি অধিদপ্তর (অনুচ্ছেদ ২.৬)- এর একটিতে নির্দিষ্ট দায়িত্ব সহ পদায়ন করার সুপারিশ করা হচ্ছে।

৫.৬ ৫.৫-এ উল্লেখিত অধিদপ্তরগুলি হচ্ছে 'জনস্বাস্থ্য' অধিদপ্তর, খ. 'ক্লিনিক্যাল সেবা' অধিদপ্তর, ও গ. 'মেডিকেল ও সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষা অধিদপ্তর'। স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরসহ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে অন্যান্য অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানে যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রমোশন ও প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত রয়েছেন তাদের চাকরি প্রস্তাবিত জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরে ন্যস্ত করার প্রস্তাব করা হলো। যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদায়নে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিতে পারে তার সমাধানে পরামর্শদানে একটি টাসকফোস গঠন করতে হবে।

৫.৭ স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবেলা করার জন্য বিভিন্ন অধিদপ্তরের অধীনে প্রয়োজনীয় নতুন ক্যাটেগরির জনবল সৃষ্টির তালিকা তৈরি করা প্রয়োজন এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাদের নিয়োগ প্রদান করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

৫.৮ বর্তমান সুপারিশমালার 'স্বাস্থ্যসেবা দান' অধ্যায়ে বর্ণিত সুপারিশের সঙ্গে সংগতি রেখে বর্তমানের সকল অধিদপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পে স্বাস্থ্য প্রমোশন, ব্যাধি প্রতিরোধ ও প্রাথমিক ক্লিনিক্যাল সেবা প্রদানকারী স্বাস্থ্যকর্মীদের 'বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিসেস'-এর অংশ হিসেবে নবপ্রতিষ্ঠিত জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সঙ্গে সংযুক্ত করার সুপারিশ করা হলো। এক্ষেত্রে বর্তমান চুক্তির অধীনে চাকরিরত কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী নতুন ব্যবস্থায় যেতে সম্মত না হলে তাকে পূর্বতন ব্যবস্থার অধীনে থাকার অপশন দেয়া যেতে পারে; তবে এক্ষেত্রে তার দায়িত্ব-কর্তব্যের যুক্তিসম্মত বিন্যাস হতে হবে।

৫.৯ স্বাস্থ্যসেবাদানে উপরোক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত টিমের নেতৃত্বে থাকবেন একজন 'প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ান' বা পিসিপি। শুরুতে পর্যাপ্ত জনবলের অভাবে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও পর্যাপ্ত অভিজ্ঞ একজন স্বীকৃত মেডিকেল অফিসার নিয়োগ দেয়া হবে; তবে যত দ্রুত সম্ভব দুই বছর মেয়াদী ফ্যামিলি হেলথ বিষয়ে একাডেমিক ডিগ্রিপ্রাপ্ত একজন চিকিৎসককে এই দায়িত্ব প্রদান করা হবে। এই ব্যবস্থায় ইউনিয়ন ও নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে শুরু করে সকল প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেতৃত্ব দানকারী পিসিপি ছাড়াও প্রয়োজনীয় সংখ্যক পিসিপি নিয়োগ দিতে হবে।

৫.১০ প্রান্তিক পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা অধিদপ্তর, পরিবার কল্যাণ অধিদপ্তর ও বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে কর্মরত এইচ এ, পি এইচ এ, সি এইচ সি পি এবং সমমানের যোগ্যতা ও দক্ষতাসহ কর্মীবৃন্দকে কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার (CHW) নামক একটি ক্যাটেগরিতে নিয়ে আনা ও বি এইচ এস -এর অধীনে তাদের নিয়োজিত করার সুপারিশ করা হলো।

৫.১১ ৫.১০ অনুচ্ছেদে একীভূত CHW-দেরকে ক্যাটাগরি-ভিত্তিক প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা নিজেদের পূর্বতন যোগ্যতা ও দক্ষতার সংগে সংগে স্বাস্থ্যসেবা দান অধ্যায়ে অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার মৌলিক বিষয়গুলিতে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ হতে পারে।

৫.১২ উপজেলা হাসপাতালসহ দেশের সকল হাসপাতালের বর্তমান অবকাঠামোর একটি নির্দিষ্ট অংশ (যেমনঃ বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা সেবার জন্য ব্যবহৃত অংশ) পি এইচ সি সংক্রান্ত সেবাদানের জন্য নির্দিষ্ট করার সুপারিশ করা হলো।

৫.১৩ স্বাস্থ্যসেবাদান অধ্যায়ের সুপারিশ অনুযায়ী দেশের সকল উপজেলা হাসপাতালে মৌলিক বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইন্টারনাল মেডিসিন, জেনারেল সার্জারি, গাইনেকোলজি-অবসটাট্রিকস, পেডিয়াট্রিকস ও এনেসথেসিওলজি-তে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের জনবল নিয়োগকে অগ্রাধিকার দেয়ার পরামর্শ দেয়া হলো।

৫.১৪ উপজেলা হাসপাতাল থেকে শুরু করে উচ্চতর প্রতিটি পর্যায়ের হাসপাতালে, যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের নেতৃত্বে, প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল ও সহায়ক জনবল সমন্বয়ে একটি মেডিকোলিগ্যাল টিম-এর উপস্থিতি নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যকীয় হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

৫.১৫ বর্তমান সুপারিশমালা অনুযায়ী, সংস্কারকৃত ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন স্বাস্থ্যব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে, বর্তমানকালে অতি প্রয়োজনীয় হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত কিছু নতুন ডিসিপ্লিন -এর জনবলকে স্বাস্থ্যকর্মী পুলের অংশ করে তুলতে হবে।

৫.১৬ স্বাস্থ্যকর্মীদের উদ্যম ও কর্মস্পৃহা বৃদ্ধির জন্য বিবিধ গবেষণালব্ধ নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলির বাস্তবায়নে মনোযোগ দেয়ার সুপারিশ করা হলো: ক. কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের সাপেক্ষে উচ্চতর ডিগ্রিবিহীন মেডিকেল অফিসারদের জন্য সিনিয়র, প্রিন্সিপাল ও চীফ অফিসার – এর পদে প্রোমোশন-সুযোগ সৃষ্টি করা; খ. অন্যান্য ক্যাটেগরির স্বাস্থ্যকর্মী (যেমন গ্রাজুয়েট ও ডিপ্লোমা নার্স, গ্রাজুয়েট টেকনোলজিস্ট এবং ডিপ্লোমা টেকনিশিয়ান)-দের পদ যৌক্তিকীকরণ ও তাদের জন্য যথাযথ প্রমোশনাল সিঁড়ির সৃষ্টি; গ. নবগঠিত বি এইচ এস -এর অধীনে সকল স্বাস্থ্যকর্মীর আর্থিক প্রণোদনার যৌক্তিক বৃদ্ধি এবং বাড়ি ভাড়া কর্তনের পরিমাণ পুনর্বিবেচনা সহ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য ক্যাম্পাসের ভিতরে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন বাসস্থানের ব্যবস্থা করা; ঘ. পশ্চাদপদ ও দুর্গম এলাকায় সেবাদানকারীদের জন্য আকর্ষণীয় আর্থিক প্যাকেজের প্রণোদনা এবং একটি স্বচ্ছ ও অবশ্য পলনীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ করে দেয়া এবং বিভিন্ন পর্যায়ে যথাযথ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ও প্রচারের মাধ্যমে উত্তম হিসেবে নির্বাচিত স্বাস্থ্যকর্মীদের যথাযথ সামাজিক স্বীকৃতি প্রদান।

৫.১৭ প্রতিটি অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প যেন অধীনস্থ স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে গ্রুপ বা সাব-গ্রুপ ভিত্তিতে যথাযথ ও আধুনিক কারিকুলাম-এর সাহায্যে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং সেবাদান প্রক্রিয়ায় উক্ত প্রশিক্ষণের প্রভাব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করতে হবে।

৫.১৮ প্রতিটি স্বাস্থ্যকর্মীর ক্ষেত্রে বর্তমানে পরিচালিত বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর-ভিত্তিক যা শুধুমাত্র উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মতামত নির্ভর) কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ডিজাইনকৃত ৩৬০ ডিগ্রী পদ্ধতি (যেখানে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও সেবাগ্রহণকারীসহ সংশ্লিষ্ট সহকর্মী, নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণকারী ইত্যাদি অংশীজনের মতামতের প্রতিফলন থাকবে) চালু করার সুপারিশ প্রদান করা হলো।

৫.১৯ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ‘স্বাস্থ্যসেবা গ্রহিতা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সুরক্ষা আইনের’ আওতায়, ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রে, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি-বেসরকারি যে কোনো সেক্টরে নিয়োগকর্তা কিংবা অন্য যে কোন গ্রুপ বা ব্যক্তি কর্তৃক অবকাঠামো, পরিবেশজনিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং দৈহিক-মানসিক নিপীড়ন বা অপব্যবহারের প্রতিবিধান এই আইনের অংশ হতে হবে।

৫.২০ পাবলিক সেক্টরে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আউটসোর্সিং পদ্ধতির জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া, যথাসম্ভব দ্রুত বন্ধ করে নিয়মিত নিয়োগের প্রক্রিয়া চালু করতে হবে।

৫.২১ নেতৃত্ব, সুশাসন ও কর্মসংস্কৃতি অধ্যায়ে উল্লেখিত সকল ক্যাটেগরির স্বাস্থ্যকর্মীকে যথাযোগ্য যথাযোগ্য কাউন্সিল বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিবন্ধিত হতে হবে ও ক্ষেত্রবিশেষে নিবন্ধন নবায়ন করতে হবে।

৫.২২ সকল ক্যাটেগরীর স্বাস্থ্যকর্মীকে (নেতৃত্ব ও সুশাসন অধ্যায়ের অনুচ্ছেদে) উল্লেখিত নিবন্ধন প্রক্রিয়া একটি সমন্বিত এইচ আর আই এস-এর সঙ্গে যুক্ত থাকবে এবং প্রতিটি স্বাস্থ্যকর্মীর জন্য যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহ নিজের অ্যাকাউন্ট আপডেট করার সুযোগ থাকবে।

৫.২৩ কিছু কিছু জটিল মাল্টিডিসিপ্লিনারি প্রযুক্তি নির্ভর বিষয় (যেমন Biomedical Equipment Maintenace, ICT)-এর ক্ষেত্রে, জনবলের একান্ত অপ্রতুলতার কারণে, ২.২৩ অনুচ্ছেদের উল্লিখিত বিষয়টি শিথিল করে, যথাযথ নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে, বর্ধিত ওয়ারেন্টি, সমন্বিত সংরক্ষণ চুক্তি ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

পরিচ্ছেদ ৬

স্বাস্থ্য জনবলের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

যে কোন স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য স্বাস্থ্য জনবল একটি অপরিহার্য উপাদান। যথাযথ স্বাস্থ্য জনবল পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ক্যাটেগিরির যথেষ্ট সংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা যে কোনো স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সফলতার জন্য অপরিহার্য। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিদর্শিত হলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের মধ্যেও জনসংখ্যার অনুপাতে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য জনশক্তির সংখ্যা সবচেয়ে কম। পরিমাণের সঙ্গে জনবলের মানের কথা চিন্তা করলে এই সমস্যাটি আরো প্রকট হয়ে ওঠে। স্বভাবতই দেশের স্বাস্থ্য সমস্যাগুলোর আলোচনা করতে হলে স্বাস্থ্য জনবলের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ইস্যুগুলি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেয়। প্রথম চ্যালেঞ্জই হচ্ছে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক-প্রশিক্ষক ও গবেষকের ঘাটতি। অন্য চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে দক্ষ এবং ন্যায্যভাবে শিক্ষক-প্রশিক্ষক নিয়োগ, এই জনশক্তিকে সঠিক স্থানে রাখা রাখতে পারা, দক্ষতার যথাযথ মিশ্রণ, সামর্থ্য ও কর্মদক্ষতার মূল্যায়ন, জবাবদিহিতা, সমন্বয়, দক্ষতা, এবং নীতি নির্ধারণের সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি সুপরিকল্পিত তথ্য ব্যবস্থাপনা।

শিক্ষক-প্রশিক্ষক-গবেষক ইস্যু ছাড়াও ভৌত অবকাঠামো এবং অন্যান্য সহায়ক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রচুর সংখ্যক চ্যালেঞ্জ রয়েছে এক্ষেত্রে। গত বছরে দেশে একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে। সেই সঙ্গে দেশের জনগণ এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিটি আশা করছি যে টেকসই লক্ষ্যমাত্রার লক্ষ্য ৩ (উত্তম স্বাস্থ্য ও সুস্থতা) অর্জনে সরকার আরো দ্রুত সফল হবে। তবে ২০৩০ সালের পূর্বে যে সামান্য কয়েকটি বছর রয়েছে তার মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অর্জন (যা এসডিজি ৩ অর্জনের আবশ্যিক অঙ্গ), বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায়, কঠিন হয়ে পড়বে। স্বাস্থ্যব্যবস্থার সংস্কারে অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে এই বাস্তবতা, বিশেষ বিশেষ চ্যালেঞ্জ ও গৃহীত পদক্ষেপগুলিকে সমন্বিতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্য জনবল সৃষ্টির সামর্থ্য : বাংলাদেশে ৩০ টি সরকারি (৩২১২ আসন সংখ্যা), ৬৪ টি বেসরকারি (৫৯৫০ আসন সংখ্যা), একটি আর্মড ফোর্সেস (১২৫ আসন সংখ্যা) এবং ৫টি আর্মি মেডিকেল কলেজ (২৫০ আসন সংখ্যা) রয়েছে। ডেন্টাল কলেজের ক্ষেত্রে ৫টি সরকারি এবং ২৪ টি বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ রয়েছে যেখানে যথাক্রমে ৫৩২ ও ১৩৫৫ আসন সংখ্যা রয়েছে। বিএমডিসি-র তথ্য অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ উভয় ক্ষেত্রে ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ সেশন থেকে ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যানুপাত বেশি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট শাখাগুলির তথ্য অনুযায়ী, নারী চিকিৎসকদের সংখ্যাও বেশি।

বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা পর্যালোচনায় দেখা যায়, পাবলিক হেলথ-এর ১২টি প্রোগ্রামসহ এমফিল, এম এস, এম ডি ও এম পি এইচ এবং স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা, এফ সি পি এস ও এম সি পি এস ডিগ্রিসহ, ১৯৬৫ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত, বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ২৮,২২৪ জন বিশেষজ্ঞ হয়েছেন। তাদের মধ্যে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ (হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা, অসংক্রামক ব্যাধি, কমিউনিটি মেডিসিন, ফরেনসিক মেডিসিন, রোগতত্ত্ববিদ্যা, রিপ্রোডাক্টিভ ও চাইল্ড হেলথ, এনভারমেন্টাল এবং অকুপেশনাল হেলথ, হেলথ প্রমোশন ও হেলথ এডুকেশন ইত্যাদি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ) মাত্র ৩৫৬৩ জন।

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শতকরা মাত্র ২৩ শতাংশ প্রতিষ্ঠান পাবলিক সেক্টরে রয়েছে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় সেগুলিতে খরচ যৎসামান্য। বিগত বছরগুলিতে প্রাইভেট সেক্টরে স্বাস্থ্যকর্মী সৃষ্টির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে অতি দ্রুত। ফলে, প্রায় সকল ধরনের ডিগ্রি ও কোর্সের জন্য প্রাইভেট সেক্টরের তুলনায় আসন সংখ্যার অনুপাত অনেক গুণ বেশি।

২০২১ সালে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সংখ্যা সম্পর্কিত একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে যেখানে দেশের স্বাস্থ্য জনবলের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মী সৃষ্টির তুলনা করে করা হয়েছে। এর সঙ্গে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য জনবল সংক্রান্ত তথ্যসংক্ষেপ মিলিয়ে দেখা যায় যে, ২০৩০ সালের মধ্যে প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ করতে হলে চিকিৎসকের সংখ্যা ১.৮ গুণ বৃদ্ধি করতে হবে। এই অনুপাত কিছুটা রক্ষণধর্মী কারণ বিদ্যমান জনবল পরিকল্পনার ভিত্তিতে সেটি করা হয়েছে এবং সেটি কিছুটা কম হতে পারে। এই হিসাব অনুসারে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কর্মীদের সংখ্যা ১.৫ গুণ ও নার্সিং-সহযোগী কর্মীদের সংখ্যা ৩ গুণ বৃদ্ধি করতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে সহায়ক স্বাস্থ্যকর্মীদের সংখ্যা (যারা মূলত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পর্যায়ে কর্মরত তাদের সংখ্যা) প্রায় ছয় গুণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এদেশে। বাংলাদেশ স্বাস্থ্য জনবলের কর্মক্ষেত্রের পর্যায় খুব সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত নয়।

Table ৬.৩ : Availability of different categories of HWFs' educational institutions (undergraduate) and number of seat in Bangladesh (degree wise), ২০১৯

Sl No	Description	Number of Institution			Number of Seat				Stock HWF
		Govt	Non-Govt.	Total	Govt.	Non-Govt.	Total	% of Total	
A	***Medical Doctors (code-221)***								
1	Medical College (MBBS)	38	75	113	4,243	6,531	10,774		76,867
2	Dental College/Unit (BDS)	9	26	35	532	1,405	1,937	**18**	9,608
	Subtotal for A	**47**	**101**	**148**	**4,775**	**7,936**	**12,711**		**86,475**
B	***Nursing & Midwifery Professionals (code-222)***								
1	B Sc.	18	59	77	1,435	2,700	4,135		4,064
2	Post-B Sc./Public Health Nursing	6	44	50	650	1,690	2,340		
3	Diploma	43	165	208	2,580	7,980	10,560	**27**	50,539
4	Specialized Diploma	1	5	6	20	100	120		
5	Diploma in Midwifery	38	17	55	975	590	1,565		2,131
	Subtotal for B	**106**	**290**	**396**	**5,660**	**13,060**	**18,720**		**56,734**
C	***Traditional and Complementary Medicine Professionals (code-223)***								
1	**Homeopathic Medicine and Surgery**								
	(a) Bachelor	1	1	2	50	100	150		1,605
	(b) Diploma	-	61	61	-	3,050	3,050		31,090
2	**Unani Medicine and Surgery**								
	(a) Bachelor	1	2	3	25	100	125	**7**	456
	(b) Diploma	1	15	16	50	750	800		2,662
3	**Ayurvedic Medicine and Surgery**								
	(a) Bachelor	1	-	1	25	-	25		388
	(b) Diploma	-	9	9	-	450	450		1,071
	Subtotal for C	**4**	**88**	**92**	**150**	**4,450**	**4,600**		**37,272**
D	***Other Health Professionals (code-226)***								
1	**Pharmacists**								
	Bachelor (B Pharm)	12	28	40	550	3,220	3,770		14,673
	Diploma	11	41	52	481	1,855	2,336		14,454
2	Physiotherapy (Diploma from IHT)	8	30	38	400	920	1,320		2,376
3	Operation Theatre Assistance (Diploma from IHT)	1	4	5	25	180	205	**11**	165
4	Intensive Care Assistance (Diploma from IHT)	1	4	5	25	180	205		60
5	Prosthetics and Orthotics (Diploma from IHT)	-	1	1	-	10	10		23
6	Cardiology (Diploma from IHT)	-	1	1	-	5	5		4
	Subtotal for D	**33**	**109**	**142**	**1,481**	**6,370**	**7,851**		**31,755**
E	***Medical and Pharmaceutical Technicians (code-321)***								
1	Laboratory (Diploma from IHT)	13	97	110	665	4,127	4,792		12,744
2	Radiotherapy (Diploma from IHT)	7	6	14	140	500	640		576
3	Radiography (Diploma from IHT)	10	25	35	505	795	1,300	**10**	3,435
4	Certified pharmacist								105,700
	Subtotal for E	**30**	**128**	**159**	**1,310**	**5,422**	**6,732**		**122,455**
F	***Nursing & Midwifery Associates Professionals (code-322)***								
1	Family Welfare Visitor (FWV)	12	-	12	1,000	-	1,000		7,202
2	Community Based Skilled Birth Attendants (CSBA)	48	4	52	960	80	1,040	**5**	9,183
3	Community Paramedic	-	23	23	1,270	-	1,270		1,533
	Subtotal for F	**60**	**27**	**87**	**3,230**	**80**	**3,310**		**17,918**
G	***Other Health Associates Professionals (code-325)***								
1	Diploma in Medical Faculty (DMF) from Medical Assistant Training School (MATS)**	9	200	209	818	12,824	13,642		14,081
2	Dentistry (Diploma from IHT)	8	66	74	405	2,123	2,528	**23**	4,118
3	Sanitary Inspector Training	-	1	1	-	100	100		2,620
	Subtotal for G	**17**	**267**	**284**	**1,223**	**15,047**	**16,270**		**20,819**
Grand Total		**297**	**1,010**	**1,308**	**17,829**	**52,365**	**70,194**	**100**	**373,428**
% of Total		**23**	**77**	**100**	**25**	**75**	**100**		

Source : HRH data sheet ২০১৯, MOHFW [৭]

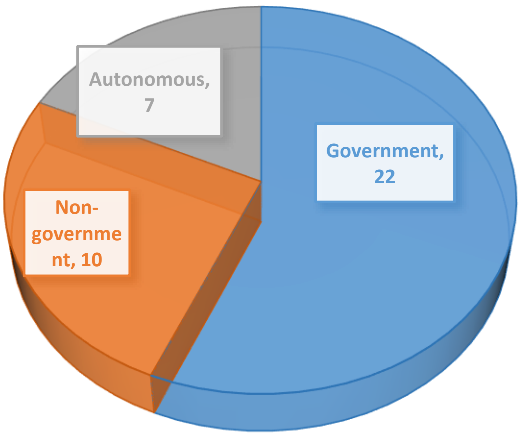

Figure-1 : Postgraduate Medical Institute in Bangladesh

In higher studies, mainly BSMMU and BCPS conduct registration, evaluation & certification activities. Presently 39 medical institutions (Figure-1) in the country offer PG degree/diploma in various disciplines of Medical sciences.

এদেশের প্রয়োজন এই হারে স্বাস্থ্য জনবল সৃষ্টির মাধ্যমে মেটানো সম্ভব নয়। বর্তমান আসন সংখ্যা অনুযায়ী চিকিৎসক-এর সঙ্গে নার্স-মিডওয়াইফ-এর সৃষ্টির অনুপাত ১:১.৫, অথচ স্বাস্থ্যকর্মীর স্টক-এর ভিত্তিতে সেই অনুপাত ১:০৭, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত অনুপাতের অনেক কম। লক্ষ্যণীয় যে, স্বাস্থ্য প্রশাসক, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং বায়োস্ট্যাটিস্টিশিয়ান-এর মত স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের সংখ্যা অনেক হওয়া উচিত, অথচ খুব কম সংখ্যক প্রতিষ্ঠানে এই পেশাজীবীদের সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং বিশ্লেষণে তাদের বিবেচনা করা হচ্ছে না।

শিক্ষক-প্রশিক্ষক-গবেষক-এর এর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন সম্পর্কে সংখ্যা নির্ণয়ের চ্যালেঞ্জ: দেশে শিক্ষক-প্রশিক্ষক-গবেষকের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের প্রয়োজনভিত্তিক সংখ্যা নির্ণয়ের সমন্বিত কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। বিভিন্ন নীতিমালা ও দাপ্তরিক আদেশের মাধ্যমে বিভিন্ন শাখায়, কিছুটা অপরিকল্পিতভাবে, শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাতের একটি সাধারণ ধারণার ভিত্তিতে শিক্ষক-প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে এবং সেটিও বহু বছর একই অনুপাতে রয়ে গেছে।

যথাযথ দক্ষতার মিশ্রণ সহ জনবল সৃষ্টি: এই সংক্রান্ত দক্ষতার যথাযথ মিশ্রণ সংক্রান্ত কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই, সাধারণভাবে স্বাস্থ্য জনবলের সৃষ্টি পরিকল্পনা করা হয়।

গবেষণা, উন্নয়ন ও উদ্ভাবন বিষয়ে গুরুত্বের অভাবঃ বর্তমানকালে স্বাস্থ্য জনশক্তি সৃষ্টিতে গবেষণা, উন্নয়ন ও উদ্ভাবন (innovation), সংক্ষেপে RDI, একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উন্নততর জ্ঞান, দক্ষতা এবং উদ্ভাবক তৈরীর ক্ষেত্রে, এবং সেই সঙ্গে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভ্যাস তৈরির জন্য এ বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত, উচ্চতর জনশক্তি সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই উপাদানগুলি অপরিহার্য। অথচ, বাংলাদেশে এগুলি অত্যন্ত অবহেলিত। এই উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার পর পরই 'বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল' বা বিএমআরসি সৃষ্টি করা হয়েছিল; কিন্তু যথাযথ আইনগত ভিত্তি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও পর্যাপ্ত জনবল - এর অভাবে প্রতিষ্ঠানটি সেভাবে অগ্রসর হতে পারিনি, ফলে প্রতিষ্ঠানটি দেশে একটি গবেষণা সংস্কৃতি সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে।

স্বাস্থ্য জনবল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় ও পরিচালনায় সুদক্ষ পেশাজীবীদের অন্তর্ভুক্তির অভাব: স্বাস্থ্য জনবল সৃষ্টির ক্ষেত্রে ও প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় দক্ষ পেশাজীবীদের অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত আবশ্যক। বাংলাদেশ এ বিষয়ে এ পর্যন্ত নেতৃত্বদানকারীদের অনেকেরই এই বিশেষ বিষয়গুলিতে তেমন কোন শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ছিল না।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন শাখায় সমন্বয় এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা ও সমন্বয়: স্বাস্থ্য জনবল সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা ও উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সঙ্গে পরিকল্পনাগত এবং বাস্তবায়নগত সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের অভাব রয়েছে।

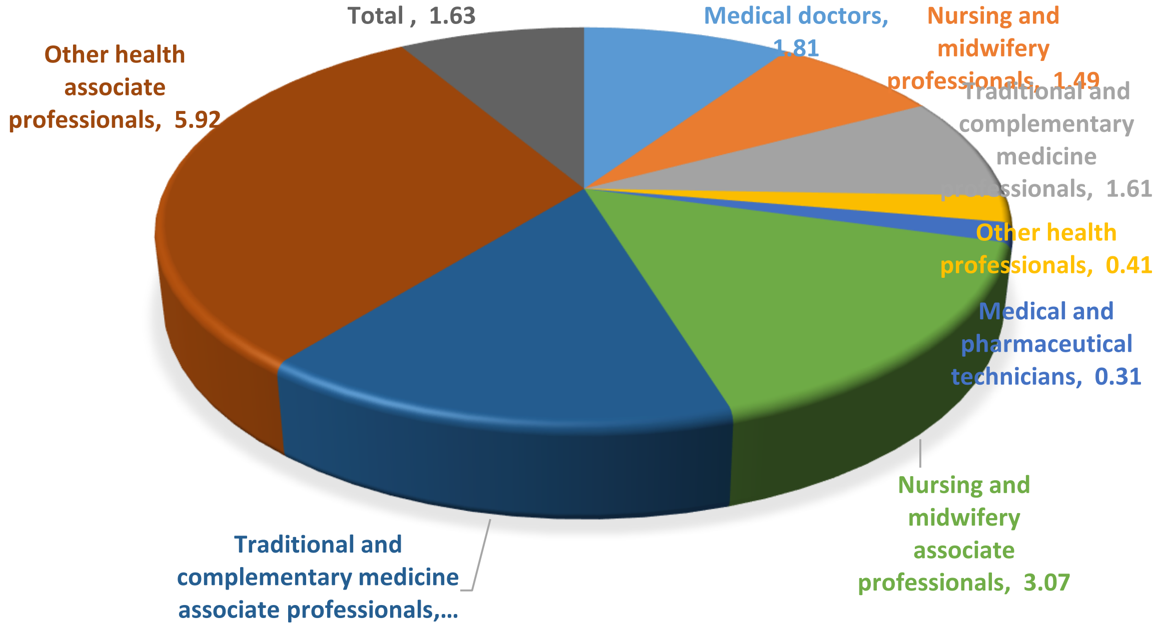

Figure 2: HRH to be increased from stock 2019 to the requirement 2030 (by times)

এক্রেডিটেশনজনিত সীমাবদ্ধতা: বাংলাদেশের শিক্ষা (বিশেষত উচ্চতর শিক্ষা)-র বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতির জন্য এক্রেডিটেশন একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়, কিন্তু সেটির বিষয়ে পূবে কোন সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। সাম্প্রতিককালে একটি কাউন্সিল করা হয়েছে, কিন্তু এটিও শুধুমাত্র এমবিবিএস প্রোগ্রামের জন্য এবং এখন পর্যন্ত সেভাবে সক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়নি।

বিগত বছরগুলিতে শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণের সমস্যা: সারা বিশ্বেই সাম্প্রতিক বছরগলিতে স্বাস্থ্য জনবলের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এক্ষেত্রে একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। সে তুলনায় বাংলাদেশে শিক্ষা-প্রশিক্ষণের কারিকুলাম-সিলেবাস এবং পদ্ধতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন এখনো সীমিত রয়ে গেছে।

প্রতিষ্ঠানগুলির ভৌত অবকাঠামো এবং অন্যান্য সহায়ক সম্পদের সীমাবদ্ধতা: এমনকি প্রথম দিকের প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ছাত্র-ছাত্রী আসন সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি করা হলেও অবকাঠামো, সহায়ক সম্পদ এবং জনবলের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো উন্নয়ন করা হয়নি। নতুনগুলোর ক্ষেত্রেও প্রচুর সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে।

কারিকুলাম বহির্ভূত সৃষ্টিশীল কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা: শিক্ষা-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে শুধুমাত্র কারিকুলার কার্যক্রম যে ছাত্রদের মান বৃদ্ধি করে তা নয়, কারিকুলাম বহির্ভূত যেসব সৃষ্টিশীল কার্যক্রম রয়েছে সেগুলিও অত্যন্ত প্রয়োজন; অথচ সেগুলোর সুযোগ-সুবিধা খুবই সীমাবদ্ধ।

ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তার অভাব: বর্তমান আমাদের দেশের একটি বড় সমস্যা হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের যথেষ্ট নিরাপত্তা নেই।

বেসরকারি খাতের প্রাধান্যজনিত চ্যালেঞ্জ: বিভিন্ন রকম রাজনৈতিক পদক্ষেপ ও নীতির কারণে, সরকারি খাতের তুলনায় বেসরকারি খাতে অনেক বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে, অথচ সেগুলোর শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মান সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন রয়ে গেছে। এ বিষয়টিও বাংলাদেশের জন্য প্রধান একটি চ্যালেঞ্জ। যখন অনেক অর্থ ব্যয় করে কোন ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা লাভ করে তখন চিকিৎসক হওয়ার পরে সেটি ফেরত আনা পরিবারের ও অভিভাবকের জন্য একটি বিশেষ আগ্রহের কারণ হয়ে ওঠে।

স্বাস্থ্য জনবল-এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ – সুপারিশসমূহ

৬.১ বর্তমান সুপারিশমালার ‘নেতৃত্ব, সুশাসন ও কর্মসংস্কৃতি’ অধ্যায়ের উল্লেখিত সুপারিশ অনুযায়ী সৃষ্ট ‘বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস’-এর আওতায় ‘মেডিকেল শিক্ষা অধিদপ্তরের’ অধীনে পূর্ণকালীন নিবেদিত শিক্ষকদের জন্য একটি বিশেষ ক্যাটেগরির পেশাগত স্ট্রিম চালু করার সুপারিশ করা হলো। এর অন্তর্ভুক্ত শিক্ষক এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য গবেষণা ও স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে আবশ্যিকভাবে একটি নন-প্র্যাকটিসিং ব্যবস্থার অধীনে দায়িত্ব পালনে সম্মত হতে হবে এবং এর প্রতিদানে আর্থিক ও অন্যান্য বিশেষ প্রণোদনা (যেমন প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউশনে প্র্যাকটিস)-এর ব্যবস্থা থাকবে।

৬.২ গ্র্যাজুয়েট ও তদূর্ধ্ব স্বাস্থ্য জনবল সৃষ্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভবিষ্যতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৩.১ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত পদ্ধতি বাধ্যতামূলক হবে, তবে বর্তমানে কর্মরত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বিষয়টি অপশনাল থাকবে; ফলে পূর্ণকালীন পদ্ধতিতে যোগ দিতে অনিচ্ছুক শিক্ষকগণ প্রাইভেট প্র্যাকটিসের সুযোগসহ বর্তমান চুক্তির অধীনে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

৬.৩ আদর্শগতভাবে, গ্র্যাজুয়েট ও তদূর্ধ্ব শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাকারী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে, একটি সমন্বিত জাতীয় নীতিমালার ভিত্তিতে, স্থানীয় পর্যায়ে গভর্নিং বডির অধীনে, যথাসম্ভব অধিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের প্রস্তাব করা হচ্ছে যার মধ্যে অবদলিযোগ্য জনবল নিয়োগ-এর ক্ষমতাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তবে বাস্তবায়নের সুবিধা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে, সুনির্বাচিত জাতীয় পর্যায়ের কিছু ইনস্টিটিউটে, প্রাথমিকভাবে, এই পদ্ধতি চালুর সুপারিশ করা হলো।

৬.৪ দেশের বিভিন্ন স্থানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ্য শিক্ষক-প্রশিক্ষক আকর্ষণের লক্ষ্যে, একটি সুপরিকল্পিত গাইডলাইনের ভিত্তিতে, স্বতন্ত্র আর্থিক প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬.৫ মেডিকেল শিক্ষায় প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে প্রতিটি বিভাগে মেডিকেল শিক্ষা অধিদপ্তর-এর কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ করা হচ্ছে।

৬.৬ সকল পোস্টগ্র্যাজুয়েট মেডিকেল ডিগ্রির পরিচালনা ঢাকায় কেন্দ্রীভূত না রেখে, গ্যাজুয়েট মেডিকেল শিক্ষার অনুসরণে, পোস্টগ্র্যাজুয়েট মেডিকেল ডিগ্রীসমূহ দেশের অন্যান্য মেডিকেল ইউনিভার্সিটির অধীনেও পরিচালনা করার সুপারিশ করা হচ্ছে।

৬.৭ আর্থিক-প্রশাসনিক ও সম্ভাব্য অন্যান্য সকল প্রণোদনার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট সব ধরনের গবেষণা-উন্নয়ন-উদ্ভাবনকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা এবং স্বাস্থ্য বাজেটে এই উদ্দেশ্যে যথাযথ বরাদ্দ রাখার সুপারিশ করা হলো।

৬.৮ দেশের স্বাস্থ্য গবেষণার নৈতিক মান উন্নয়ন ও প্রমিতকরণ, গবেষণা সংক্রান্ত নীতিমালা ও গাইড লাইন প্রণয়ন, গবেষণা অনুদান ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কর্মকান্ড ছাড়াও এই ক্ষেত্রে ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গবেষণায় প্রত্যক্ষ অবদান রাখার জন্য, যথাযথ আইনের অধীনে, বিএমআরসি-র অবকাঠামোগত ও আর্থিক-প্রশাসনিক সামথ্য বৃদ্ধির সুপারিশ করা হলো। এই প্রস্তাবনার সূত্র ধরে, বিএমআরসি-র অধীনে বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন সেলুলার-মলিকিউলার ল্যাবরেটরি দ্রুত চালু করার পরামর্শ দেয়া হলো।

৬.৯ বর্তমান সুপারিশমালার ‘নেতৃত্ব, সুশাসন ও কর্মসংস্কৃতি’ অধ্যায়ে উল্লোখিত আইনগত ও অন্যান্য সংস্কারের মাধ্যমে মেডিকেল শিক্ষা ও গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা (যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, বিএমডিসি, বিসিপিএস, বিএমআরসি, সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর ইত্যাদির বিধি-বিধান ও নীতিমালা পুনর্মূল্যায়ন ও আধুনিকায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৬.১০ মেডিকেল শিক্ষা-প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নতুন কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে, যথাযোগ্য বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রয়োজন নির্ধারণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে, উচ্চ পর্যায়ের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হবে।

৬.১১ বর্তমান পর্যায়ে নারীস্বাস্থ্য বিষয়ক সার্বিক পরিকল্পনা, বিশেষ রোগ-ব্যাধি বিষয়ক গবেষণা এবং প্রতিরোধ ও চিকিৎসা গাইডলাইন সৃষ্টি ইত্যাদি কার্যক্রমের আশু প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে কমিশন নারীস্বাস্থ্য বিষয়ক একটি জাতীয় ইনস্টিটিউট স্থাপনের সুপারিশ প্রদান করছে।

৬.১২ সরকারি-বেসরকারি উভয় সেক্টরে স্বাস্থ্যকর্মীদের উচ্চতর শিক্ষা-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে জনবল নিয়োগ, পদায়ন, প্রমোশন, বদলি, ডেপুটেশন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে পরিচালনাগত জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন এবং এ উদ্দেশ্যে BHC-র নির্দিষ্ট শাখায় মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

৫.১৩ স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য পরিচালিত শিক্ষা-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে বর্তমান শুন্য পদগুলি অতিসত্বর পূরণের জন্য জোরালো সুপারিশ করা হচ্ছে।

৬.১৪ প্রতিটি স্বাস্থ্যকর্মী শিক্ষা-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে যথাসম্ভব দ্রুত, প্রমিত, নিয়মমাফিক, শিক্ষক-প্রশিক্ষক-ছাত্র অনুপাত অর্জনে একটি বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণের প্রস্তাব করা হচ্ছে।

৬.১৫ শিক্ষার্থীরা যেন তাত্ত্বিক ধারণাগুলোকে বাস্তব ক্লিনিক্যাল প্রয়োগের সাথে সংযুক্ত করতে পারে, সেজন্য প্রচলিত বিচ্ছিন্ন/খন্ডিত কারিকুলামের পরিবর্তে সমন্বিত ও মডিউলভিত্তিক (integrated & modular) কারিকুলাম চালুর প্রস্তাব করা হচ্ছে।

৬.১৬ গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল শিক্ষায় নিম্নোক্ত পরিবর্তনগুলিকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হিসেবে সুপারিশ করা হচ্ছে:

ক. তথ্য-প্রমান-ভিত্তিক (evidence-based) সমন্বিত ও গবেষণামুখী লার্নিং মডিউলের মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন: খ. যত দ্রুত সম্ভব (আদর্শগতভাবে প্রথম বর্ষ থেকেই) ক্লিনিকাল সমস্যাসমূহের সঙ্গে পরিচিতির উদ্যোগ; ও গ. সমস্যা সমাধান এবং রোগীর সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার দক্ষতা সৃষ্টি এবং ক্লিনিকাল দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মডিউলার প্রশিক্ষণ।

৬.১৭ সমস্যাভিত্তিক লার্নিং (Problem-based Learning বা PBL), ক্ষুদ্র গ্রুপ লার্নিং (Small Group Learning বা SGL) এবং ট্রিট ক্লাস রুম (Treat Class Room) মডেলে গুরুত্ব দিয়ে বর্তমান গ্যাজুয়েট মেডিকেল শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের সুপারিশ করা হচ্ছে।

৬.১৮ ওয়ার্ড-কেন্দ্রিকতার পরিবর্তে, মুখ্যত আউটডোরকেন্দ্রিক গ্যাজুয়েট মেডিকেল শিক্ষা চালু দ্বারা, প্রকৃত বাস্তবতা-ভিত্তিক রোগী ও সমাজকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা অর্জনে ছাত্র-ছাত্রীকে সক্ষম করে তোলার জন্য শিক্ষা-প্রশিক্ষণ পদ্ধতি পরিবর্তনের সুপারিশ করা হলো।

৬.১৯ চিকিৎসকদের মধ্যে মানবিক ও হলিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির লক্ষ্যে মেডিকেল শিক্ষার কারিকুলামে নৈতিকতা, পেশাদারিত্ব ও পারস্পরিক যোগাযোগ ক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হচ্ছে।

৬.২০ শুধুমাত্র মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে ক্লিনিকাল যুক্তি, তথ্যভিত্তিক চিন্তা ও হাতেকলমে দক্ষতা যাচাইয়ে গুরুত্ব দিতে হবে; এজন্য মূল্যায়ন পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস এবং ন্যায়সংগত ও পক্ষপাতহীন মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে প্রচলিত সাবজেক্টিভ পদ্ধতির বিপরীতে অবজেকটিভ মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব করা হচ্ছে।

৬.২১ বর্তমান যুগের বৈশ্বিক অগ্রযাত্রার সঙ্গে সংগতি রেখে, সংশ্লিষ্ট নতুন নতুন শাখায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিদ্যার পাঠ ও প্রশিক্ষণ বিস্তৃত করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনীয় অথচ অবহেলিত যেমনঃ বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল ফিজিক্স, হেলথ ইনফরমেটিকস এবং বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স বিষয়গুলিতে বিশেষ অগ্রধিকার দেয়ার সুপারিশ করা হচ্ছে।

৬.২২ যেসব বিষয়ে দক্ষ বিশেষজ্ঞের অভাবে রোগীরা বিদেশে চলে যাচ্ছেন (এবং এর ফলে প্রচুর বিদেশী মুদ্রা নষ্ট ও দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে) সেইসব গুলির মধ্যে কিছু চিহ্নিত বিষয়ে (যেমনঃ অনকোলজির বিবিধ শাখা-উপশাখা ও ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারি) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করতে হবে।

৬.২৩ বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত অবহেলিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দক্ষ চিকিৎসক, টেকনোলজিস্ট ও সহায়ক জনবল সৃষ্টির জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৬.২৪ ইন্টার্নী চিকিৎসক ও পোস্টগ্যাজুয়েট ট্রেইনীদের আর্থিক প্রণোদনা যৌক্তিক পরিমাণে বৃদ্ধি করতে হবে।

৬.২৫ রোগতাত্তিক বিশ্লেষণে নির্বাচিত কিছু বিশেষ বিশেষ অসুখ কিম্বা অবস্থা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জনবলের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়া হলো।

৬.২৬ বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলিতে টিউশন ফি-কে যৌক্তিক মাত্রায় রাখার বিষয়ে আরো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পরিচ্ছেদ ৭

অত্যাবশ্যকীয়/ অপরিহার্য ঔষধপত্র, চিকিৎসা প্রযুক্তি ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ

১. বর্তমান পরিস্থিতি

বাংলাদেশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মডেল এসেনশিয়াল মেডিসিনস লিস্ট (EML) অনুসরণ করে এবং দেশের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও জনস্বাস্থ্যের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ২৮৫টি ওষুধ অন্তর্ভুক্ত করে একটি জাতীয় EML বজায় রাখে। ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর (DGDA) সময়োপযোগী প্রয়োজন অনুযায়ী এই তালিকাটি নিয়মিত হালনাগাদ করার দায়িত্বে রয়েছে।

দেশের ওষুধ শিল্প বর্তমানে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ, যা স্থানীয় চাহিদার ৯৮% পূরণ করে এবং জাতীয় জিডিপিতে ১.৮% অবদান রাখে। এই খাতটি তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী, মানসম্মত ওষুধ উৎপাদনের জন্য পরিচিত এবং বিশ্বের ১০০টিরও বেশি দেশে ওষুধ রপ্তানি করে। তবে, সক্রিয় ফার্মাসিউটিক্যাল উপাদান (API)-এর ক্ষেত্রে এই খাত এখনো চীন ও ভারতের উপর ৮৫% এর বেশি নির্ভরশীল, যা একটি উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা।

যেখানে শহরাঞ্চলে প্রায় ১ লাখ ফার্মেসির একটি শক্তিশালী সরবরাহ ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে গ্রামীণ অঞ্চলে সরবরাহ ব্যবস্থার অকার্যকারিতা, অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা এবং উচ্চ ব্যয়ের কারণে প্রবেশাধিকার সীমিত। সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় ওষুধের ঘাটতি একটি সাধারণ সমস্যা, যা রোগীদের বেসরকারি ফার্মেসির উপর নির্ভর করতে বাধ্য করে এবং এতে তাদের আর্থিক চাপ আরও বেড়ে যায় (WHO, ২০২১)।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবায় একটি বৈশিষ্ট্য হলো উচ্চ "আউট অফ পকেট" (OOP) ব্যয়, যার বড় অংশই ওষুধ ক্রয়ে ব্যয় হয়। মুদ্রাস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার মান হ্রাস এবং API দামের ঊর্ধ্বগতির কারণে ওষুধের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সাধারণ মানুষের জন্য ওষুধের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করছে। সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোর ৩০%–৪০% এ প্রয়োজনীয় ওষুধ অনিয়মিতভাবে পাওয়া যায়। এর ফলে দেশের মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের ৭৩% জনগণকে নিজ পকেট থেকে দিতে হয়, যা গ্রামীণ ও নিম্নআয়ের মানুষের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এ ছাড়া, অপ্রাতিষ্ঠানিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, যেমন লাইসেন্সবিহীন ওষুধ বিক্রেতা, অনিয়ন্ত্রিত ওষুধ ব্যবহারকে উৎসাহিত করে, যা রোগীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ায় (রহমান ও আহমেদ, ২০২২)।

দেশীয় ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প ইতোমধ্যে উচ্চ-মূল্যযুক্ত খাত যেমন বায়োসিমিলার, ভ্যাকসিন এবং অনকোলজি ওষুধ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। কোভিড-১৯ মহামারির সময় এ খাত ভ্যাকসিন ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা উৎপাদনে দক্ষতা প্রমাণ করেছে। তবে, এখনো দুর্বল ফার্মাকোভিজিল্যান্স, অপর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো, গবেষণা ও উন্নয়নে সীমিত বিনিয়োগ এবং দেশীয় API উৎপাদনের ঘাটতি রয়ে গেছে।

প্রয়োজনীয় ওষুধের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হলে সরবরাহ ব্যবস্থার বৈষম্য দূরীকরণ, ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং মান নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা অত্যাবশ্যক। এই উদ্যোগগুলো সার্বজনীন, টেকসই ও ন্যায়ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

Essential Drugs Company Limited (EDCL) একটি সরকারি মালিকানাধীন ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, যা সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করে। প্রচলিত আইন ও বিধিমালার আওতায়, সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ EDCL থেকে সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে ওষুধ সংগ্রহ করতে পারে, যা সরবরাহ শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়ক।

DGDA দুইটি শ্রেণির অধীনে ওষুধের মূল্য অনুমোদন করে:

- **নিয়ন্ত্রিত শ্রেণি:**
  ১১৭টি প্রয়োজনীয় ও বহুল ব্যবহৃত ওষুধ এই শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত। DGDA-এর মূল্য নির্ধারণ কমিটি এই ওষুধগুলোর সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (MRP) নির্ধারণ করে।

- **অনিয়ন্ত্রিত শ্রেণি:**
  অধিকাংশ অন্যান্য ওষুধের মূল্য কোম্পানিগুলো নিজেরা নির্ধারণ করে এবং অনুমোদনের জন্য DGDA-তে প্রস্তাব করে।

২. ওষুধের মূল্য নির্ধারণ

ওষুধের মূল্য নির্ধারণে তিনটি প্রধান পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়:

- **খরচ-ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ:**
  উৎপাদন, বিতরণ ও বিপণনের খরচের সাথে একটি লাভের মার্জিন যোগ করে মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এটি খরচ পুনরুদ্ধারে সহায়ক।

- **মূল্য-ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ:**
  রোগীর জন্য চিকিৎসার ফলাফল এবং ওষুধের উপযোগিতা অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এটি উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে, তবে বেশি মূল্য ও সীমিত প্রবেশাধিকার তৈরি করতে পারে।

- **বাজার-ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ:**
  প্রতিযোগিতা, চাহিদা এবং বাজার পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এটি সাশ্রয়ী দাম নির্ধারণে সহায়ক হলেও, অস্থির মূল্য প্রতিযোগিতা তৈরি করতে পারে।

৩. ভূমিকা

- ঔষধের মূল্য নির্ধারণের একটি কার্যকর কৌশল প্রণয়নের জন্য দেশের সুনির্দিষ্ট চাহিদা, চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগগুলো সম্পর্কে গভীর ও সামগ্রিক তথ্য প্রয়োজন। একদিকে এই কৌশলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য অত্যাবশ্যকীয় ঔষধসমূহের সহজ প্রাপ্যতা ও সাশ্রয়ী মূল্যের নিশ্চয়তা; অপরদিকে ঔষধ উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে হবে এবং ঔষধ শিল্পের আর্থিক স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

- ঔষধ শিল্পের নিয়ন্ত্রক কাঠামো একই সাথে অভিভাবক সুলভ ও শিল্পকে সক্ষম করে তোলার ভূমিকা পালন করে। এই কাঠামোসমূহ ওষুধের নিরাপত্তা ও গুণগত মান নিশ্চিত করার পাশাপাশি, ন্যায্য প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করে, এমন একটি বাজার গড়ে তোলে যা অন্যায্য মূল্য নির্ধারণ রোধ করে। জনস্বাস্থ্য সেবাকে অগ্রাধিকার দেয়ার ক্ষেত্রে এই দ্বৈত ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যেমন, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং অসংক্রামক রোগের ক্রমবর্ধমান বোঝা মোকাবিলা, যাতে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধসমূহ যাদের সর্বাধিক প্রয়োজন তাদের কাছে পৌঁছানো যায়।

- বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং ঔষধ শিল্পের ক্রমবর্ধমান হারের বিবেচনায় হাইব্রিড মূল্য নির্ধারণ কৌশল একটি যৌক্তিক ও কৌশলগত সমাধান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অত্যাবশ্যকীয় ঔষুধের জন্য ব্যয়-ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ করে জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসাসমূহ দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সাশ্রয়ী রাখার নিশ্চয়তা প্রদান করা সম্ভব। একইসঙ্গে, অত্যাবশ্যকীয় নয় এমন ঔষুধের জন্য বাজার-ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ একটি গতিশীল প্রতিযোগিতামূলক বাজার তৈরি করে, যা রোগী ও উৎপাদনকারী উভয়ের জন্য উপকার বয়ে আনে। আর উদ্ভাবনী চিকিৎসার জন্য উৎপাদনের মূল্যের আলোকে মূল্য নির্ধারণ গবেষণা ও উন্নয়নের বিষয় হতে পারে — যা থেকে শিল্পের স্থিতিশীলতা ও দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা যায়।

- বাংলাদেশে চিকিৎসার যন্ত্রপাতি নিবন্ধনের দায়িত্ব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিচালিত ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের (ডিজিডিএ) উপর ন্যস্ত। ডিজিডিএ দেশের চিকিৎসা যন্ত্রপাতির আমদানি, উৎপাদন, বিতরণ ও বিক্রয় কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে এবং গুণগত মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বারোপ করে। চিকিৎসা সম্পর্কিত যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিতে ডিজিডিএ’র তদারকি ও নিবন্ধন পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- ২০২৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর প্রণীত 'বাংলাদেশ ওষুধ ও প্রসাধনী আইন, ২০২৩' চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও ঔষধ সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণ বিধি-বিধানের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এই আইন উৎপাদন, আমদানি, বিতরণ ও বিক্রয় সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যা মান ও নিরাপত্তা রক্ষায় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তবে বেসরকারি খাতে নিয়ন্ত্রকারী বিধি-বিধানের যথাযথ প্রয়োগ না হওয়া, চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাদির গুণমান ও মূল্য নির্ধারণে বড় ধরনের পার্থক্য, এবং স্টেন্ট, ইমপ্লান্টসহ জীবনরক্ষাকারী যন্ত্রের বিপণনে অনৈতিক কার্যক্রম, ও নিবন্ধন প্রক্রিয়া এবং লাইসেন্সিং নিয়েও অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

- বাংলাদেশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মডেল তালিকা অনুসরণ করে এবং **২৮৫**টি ওষুধ অন্তর্ভুক্ত করে একটি জাতীয় অপরিহার্য ওষুধ তালিকা (EML) করে, যা জনস্বাস্থ্য ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণে সহায়তা করে। ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (DGDA) ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা মেটাতে এই তালিকাটি নিয়মিত হালনাগাদ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত।

- বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে, যা অভ্যন্তরীণ চাহিদার ৯৮% উৎপাদন করে এবং জাতীয় জিডিপির ১.৮% অবদান রাখে। এ খাতটি তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী মূল্যের মানসম্পন্ন ওষুধ সরবরাহের জন্য স্বীকৃত এবং ১০০টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করে। তবে সক্রিয় ফার্মাসিউটিক্যাল উপাদান (API)-এর ক্ষেত্রে চীনা ও ভারতীয় আমদানির ওপর উচ্চ নির্ভরশীলতা (৮৫%-এর বেশি) একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্বলতা হিসেবে রয়ে গেছে।

- দেশে ১,০০,০০০-এর বেশি ফার্মেসির একটি শক্তিশালী নগর বিতরণ নেটওয়ার্ক থাকলেও, গ্রামীণ অঞ্চলে সরবরাহ শৃঙ্খলের অদক্ষতা, অপর্যাপ্ত অবকাঠামো ও উচ্চ ব্যয়ের কারণে ঔষধের প্রাপ্যতা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলিতে অপরিহার্য ওষুধের ঘাটতি প্রায়শই দেখা যায়, ফলে রোগীরা ব্যক্তিগত ফার্মেসির ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হন, যা তাদের জন্য অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি করে (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ২০২১)।

- বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবায় উচ্চ মাত্রার ব্যক্তিগত ব্যয় (OOP) অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। মূল্যস্ফীতি, মুদ্রার অবমূল্যায়ন এবং সক্রিয় ফার্মাসিউটিক্যাল উপাদানের (API) উচ্চ ব্যয়ের কারণে ঔষধের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, যা জনগণের সাধ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলির ৩০% থেকে ৪০% পর্যন্ত অপরিহার্য ওষুধের অনিয়মিত সরবরাহ ও ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে। ফলস্বরূপ, ব্যক্তিগত ব্যয় (OOP), যা স্বাস্থ্যসেবায় মোট ব্যয়ের ৭৩% প্রতিনিধিত্ব করে, নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার মানুষের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অননুমোদিত ঔষধ বিক্রেতাসহ অনানুষ্ঠানিক স্বাস্থ্যসেবা খাত অনিয়ন্ত্রিত ঔষধ ব্যবহারের প্রবণতা বাড়িয়ে রোগীদের জন্য ঝুঁকি সৃষ্টি করছে (রহমান ও আহমেদ, ২০২২)।

- দেশের ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প বায়োসিমিলার, টিকা এবং অনকোলজি ওষুধের মতো উচ্চমূল্যবান ক্ষেত্রে উন্নতি করেছে। কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে দেশীয় সক্ষমতার মাধ্যমে টিকা ও অপরিহার্য চিকিৎসা সামগ্রী উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। তবে এখনো দুর্বল ফার্মাকোভিজিল্যান্স, অপর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো, গবেষণা ও উন্নয়নে (R&D) সীমিত বিনিয়োগ এবং দেশীয় API উৎপাদনের ঘাটতির মতো চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান।

- অপরিহার্য ঔষধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে বিতরণ ব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা, মূল্য স্থিতিশীলতা এবং গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। টেকসই ও সমতা ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে এসব উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান **এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড** (EDCL) সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলিতে অপরিহার্য ওষুধ সরবরাহ করে। প্রচলিত আইন ও বিধিমালার আওতায়, সরকারি স্বাস্থ্য সংস্থাগুলি **EDCL-এর মাধ্যমে সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে ওষুধ সংগ্রহ করতে পারে,** যা অপরিহার্য ওষুধের সরবরাহ শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

DGDA সমস্ত পণ্যের দাম দুইটি ক্যাটাগরিতে অনুমোদন করে:

- **নিয়ন্ত্রিত ক্যাটাগরি (Controlled Category):**

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বা সাধারণভাবে ব্যবহৃত **১১৭**টি অপরিহার্য ওষুধকে নিয়ন্ত্রিত ক্যাটাগরিতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। DGDA এর **মূল্য নির্ধারণ কমিটি (Price Fixation Committee)** এর মাধ্যমে এই ওষুধগুলোর দাম নির্ধারণ করে, যা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (Maximum Retail Price - MRP) নামে পরিচিত। এই **১১৭**টি ওষুধ একত্রে **"নিয়ন্ত্রিত ক্যাটাগরি পণ্য"** হিসেবে বিবেচিত হয়।

- **অনিয়ন্ত্রিত ক্যাটাগরি** (Decontrolled Category):

বেশিরভাগ অন্যান্য ওষুধের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ওষুধ কোম্পানিগুলো স্বাধীনভাবে মূল্য নির্ধারণ করে এবং DGDA-এর অনুমোদন গ্রহণ করে।

I. ওষুধের মূল্য নির্ধারণ (Pricing of Medicines)

ওষুধের মূল্য নির্ধারণের কৌশলগুলোর মধ্যে রয়েছে **খরচভিত্তিক (Cost-Based), মূল্যভিত্তিক (Value-Based), এবং বাজারভিত্তিক (Market-Based) পদ্ধতি:**

১. **খরচভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ (Cost-Based Pricing):**
   - উৎপাদন, বিতরণ এবং বিপণন খরচের সাথে একটি লাভের মার্জিন যোগ করে দাম নির্ধারণ করা হয়।
   - এটি খরচ পুনরুদ্ধার (Cost Recovery) নিশ্চিত করে।

২. **মূল্যভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ** (Value-Based Pricing):
   - ওষুধের কার্যকারিতা ও রোগীর চিকিৎসা ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে দাম নির্ধারণ করা হয়।
   - এটি উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে, তবে ওষুধের উচ্চমূল্য নির্ধারণের কারণে প্রাপ্যতা সীমিত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

৩. **বাজারভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ (Market-Based Pricing):**
   - প্রতিযোগিতা, চাহিদা এবং বাজারে অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে মূল্য নির্ধারণ করা হয়।
   - এটি ওষুধের সাশ্রয়ী মূল্যে প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে পারে, তবে অস্থিতিশীল মূল্য প্রতিযোগিতার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

বাংলাদেশের জন্য সর্বোত্তম কৌশল নির্ধারণ: যুক্তিসঙ্গত কারণ

- বাংলাদেশের জন্য উপযুক্ত ওষুধের মূল্য নির্ধারণ কৌশল নির্বাচন করতে হলে একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন, যা দেশের অনন্য চ্যালেঞ্জ ও সুযোগগুলোর সমাধান করবে। অর্থনৈতিক অবস্থা ভিন্ন হওয়ায় এমন মূল্য নির্ধারণ মডেল প্রয়োজন যা নিম্ন-আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য ওষুধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করবে এবং একই সাথে ফার্মাসিউটিক্যাল উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করবে।
- যদিও নিয়ন্ত্রক কাঠামো (Regulatory Framework) ক্রমবিকাশশীল, তবুও এটি অবশ্যই **ন্যায়সঙ্গত প্রতিযোগিতা নিশ্চিত** করতে হবে এবং বিশেষত **অপরিহার্য ওষুধের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ প্রতিরোধ** করতে হবে। **সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং অসংক্রামক রোগের ক্রমবর্ধমান চাপ মোকাবিলার জন্য** সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী ওষুধ নিশ্চিত করা জরুরি।
- **একটি সংকরমূলক (Hybrid) মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি** সর্বোত্তম হতে পারে, যেখানে:
   - **অপরিহার্য ওষুধের জন্য খরচভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ (Cost-Based Pricing),**
   - **উদ্ভাবনী বা উচ্চ কার্যকারিতা সম্পন্ন চিকিৎসার জন্য মূল্যভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ (Value-Based Pricing),** এবং

- **অপ্রয়োজনীয় বা ওভার-দ্য-কাউন্টার (OTC) ওষুধের প্রতিযোগিতা বজায় রাখতে বাজারভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ (Market-Based Pricing)** ব্যবহার করা যেতে পারে।
- এই কৌশলটি রোগীদের জন্য **সাশ্রয়ী মূল্যে ওষুধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করবে, উৎপাদকদের জন্য টেকসই উন্নয়ন বজায় রাখবে** এবং **বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য লক্ষ্যসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।**

- **বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা** দূষণ সমস্যা **(Impurity Issue)** এবং নিম্ন কার্যকারিতা **(Less Potency)** সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জগুলোর কার্যকর সমাধানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪. **ওষুধ ও চিকিৎসা প্রযুক্তি সংস্কারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

প্রাথমিক লক্ষ্য:

সমস্ত মানুষের জন্য **অপরিহার্য, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী ওষুধ ও চিকিৎসা প্রযুক্তির নিরবচ্ছিন্ন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।**

নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ:

- **সরবরাহ ব্যবস্থাপনা ও সরবরাহ শৃঙ্খল (Supply Chain) শক্তিশালী করা;**
- **মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও ভর্তুকির মাধ্যমে ওষুধ ও চিকিৎসা প্রযুক্তির সাশ্রয়ী মূল্যে প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা;**
- **ওষুধ ও চিকিৎসা প্রযুক্তির গুণমান, নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করা;**
- **প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে নীতিমালা ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো শক্তিশালী করা;**
- **সম্প্রদায়ের মধ্যে ওষুধ ও প্রযুক্তির সচেতনতা বৃদ্ধি এবং যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।**

৫. **ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ**

- **ওষুধ, রোগ নির্ণয়ের সরঞ্জাম এবং গৃহভিত্তিক চিকিৎসা কিট, যন্ত্রপাতি ও ডিভাইসের উচ্চমূল্য**
- **বিদেশি API-র উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা:** বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প **৮৫% সক্রিয় ফার্মাসিউটিক্যাল উপাদান (API) আমদানির ওপর নির্ভরশীল,** যা মূলত চীন ও ভারত থেকে আসে **(DGDA, ২০২২)**।
- **সরবরাহ শৃঙ্খলের ব্যাহত অবস্থা: COVID-১৯ মহামারি** ও **ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা** বিশ্বব্যাপী সরবরাহ ব্যবস্থাকে ব্যাহত করেছে, যার ফলে ব্যয় বৃদ্ধি এবং ওষুধের ঘাটতি দেখা দিয়েছে **(Rahman & Ahmed, ২০২২)**।
- **অর্থনৈতিক অস্থিরতা: মুদ্রার অবমূল্যায়ন:** গত দুই বছরে **টাকার মান প্রায় ৫০% কমে গেছে,** ফলে উৎপাদন খরচ বেড়েছে **(Alam, ২০২২)**।
- **জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি:** গ্যাসের দাম **১০০%** এবং বিদ্যুতের দাম **৪৫%** বেড়েছে **(World Bank, ২০২০)**।
- **মুদ্রাস্ফীতি:** ধারাবাহিকভাবে **১০% মুদ্রাস্ফীতি** ওষুধের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে এবং স্বাস্থ্যসেবায় অসমতা বৃদ্ধি করেছে **(WHO, ২০২১)**।
- **নীতিগত ও বিধিবিধানগত সীমাবদ্ধতা: মূল্য সমন্বয়ের অনিয়মিততা ও দুর্বল নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো:** মূল্য পুনর্নির্ধারণের অনিয়মিততা ও **নিয়ন্ত্রক সংস্থার অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ** গুণমান নিয়ন্ত্রণে সমস্যা সৃষ্টি করছে **(DGDA, ২০২২)**।
- **স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা:**
- **অসম বণ্টন:** ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম **গ্রাম ও সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলে অপ্রতুলভাবে বিতরণ করা হয় (WHO, ২০২১)**।
- **সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা: ভুল তথ্য** ও **স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাবের** কারণে ওষুধ ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার বাধাগ্রস্ত হয় **(Rahman & Ahmed, ২০২২)**।
- **আর্থ-সামাজিক কারণে বাধা:**

- **নিম্ন-আয়ের জনগোষ্ঠী** খাদ্য, বাসস্থান এবং জীবনরক্ষাকারী ওষুধ ও প্রযুক্তির মধ্যে **একটি বেছে নিতে বাধ্য হয়।**
- **ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিসের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগের চিকিৎসা ব্যয় বহন করা কঠিন।**

- **স্বাস্থ্যসেবার সামাজিক নির্ধারক (Social Determinants of Health - SDOH):** আয়, শিক্ষা, পেশা, ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি **ওষুধ ও চিকিৎসা প্রযুক্তির প্রাপ্যতার ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।**
- **উদাহরণ: গ্রামীণ জনগোষ্ঠী** প্রায়শই **ফার্মেসির অভাব, রোগ নির্ণয়ের সীমিত সুযোগ, খারাপ পরিবহন ব্যবস্থা ও নিম্ন স্বাস্থ্যসচেতনতার কারণে স্বাস্থ্যসেবায় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়।**
- **প্রশিক্ষিত ফার্মাসিস্ট ও রোগ নির্ণয় বিশেষজ্ঞের (ডায়াগনস্টিশিয়ান) অভাব** রয়েছে, যা **স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ বা সার্টিফিকেট কোর্সের মাধ্যমে পূরণ করা যেতে পারে।**
- **বয়স বৃদ্ধির ফলে চলাচলের সমস্যা ও আর্থিক সংকট বৃদ্ধির কারণে বয়স্কদের জন্য চিকিৎসা সুবিধা সীমিত।**
- **"A, B, C, D ক্যাটাগরি ভিত্তিক ফার্মাসিস্ট" তৈরি করতে স্বীকৃত প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা জরুরি।**
- **গুণমান নিশ্চিতকরণের চ্যালেঞ্জসমূহ**
  - **দুর্বল ওষুধ নজরদারি ব্যবস্থা (Pharmacovigilance):**
    - কার্যকর **ফার্মাকোভিজিলেন্স ব্যবস্থা না থাকায়** নকল ও নিম্নমানের ওষুধ চিহ্নিত করা কঠিন **(WHO, ২০২১)।**
    - **অবিশ্বস্ত ও অনির্ভরযোগ্য রোগ নির্ণয় পরিষেবা।**
    - **পুরনো এবং নিম্নমানের চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম** ব্যবহারের ফলে সঠিক রোগ নির্ণয় ব্যাহত হয়।

৬. **কৌশলগত সুপারিশমালা**

প্রয়োজনীয় ওষুধ ও প্রযুক্তির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক সংস্কার পদক্ষেপ স্বল্পমেয়াদী সুপারিশসমূহ:

১) মূল্য ও কর নিয়ন্ত্রণ:

- **মূল্য নির্ধারণ ও বাজারমূল্যের পর্যালোচনা** করা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা।
- **কর হ্রাস বা প্রণোদনা প্রদান** করে ওষুধ ও চিকিৎসা প্রযুক্তিকে আরও সাশ্রয়ী করা।
- **প্রাথমিক চিকিৎসার গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ, সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতির মূল্য কমানো,** যেমন ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিসের ওষুধ, কিছু প্রথম সারির অ্যান্টিবায়োটিক এবং পুনরায় ব্যবহৃত গৃহস্থালি চিকিৎসা সরঞ্জাম।
- **ভিটামিন, মিনারেল, প্রোবায়োটিক, বুকের দুধের বিকল্প ইত্যাদির ওপর ভ্যাট/কর বৃদ্ধি** করে সরকারি রাজস্ব ঘাটতি সমন্বয় করা।
- **প্যাকেজিং সহজীকরণ এবং মেডিকেল প্রতিনিধিদের ব্যয় কমিয়ে মূল্য হ্রাস নিশ্চিত করা।**

২) বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা:

- **ঔষধ শিল্প ও জাতীয় ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সাথে সংযুক্ত হয়ে মূল্য নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন করা (**৬ মাস থেকে ১ বছরের মধ্যে)।
- **প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং গ্লুকোমিটার, ব্লাড প্রেসার মেশিন, থার্মোমিটার, স্টেথোস্কোপের মতো পুনরায় ব্যবহারযোগ্য গৃহস্থালি সরঞ্জামের সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।**

৩) EDCL- এর বিরুদ্ধে অভিযোগের যাচাই:

- উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির মাধ্যমে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত।

৪) খরচ-ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ:

- প্রয়োজনীয় ওষুধ তালিকার (EDL) ওষুধের মূল্য নির্ধারণের জন্য খরচ-ভিত্তিক মডেল প্রয়োগ।

৫) প্রেসক্রিপশনভিত্তিক ওষুধ বিতরণ:

- BMDC নিবন্ধিত চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ সরবরাহ করা যাবে না।
- প্রতিটি ফার্মেসিতে ওভার দ্য কাউন্টার (OTC) ওষুধের তালিকা টানিয়ে রাখা বাধ্যতামূলক।

৬) ওষুধের গুণমান নিশ্চিতকরণ:

- প্রতিটি বিভাগীয় সদর দপ্তরে আধুনিক ওষুধ পরীক্ষাগার স্থাপন।
- কঠিন দুর্গম এলাকায় মোবাইল ল্যাব স্থাপন।

৭) বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় ওষুধ ও যন্ত্রপাতির তালিকা হালনাগাদ করা:

- ২০১৬ সালে হালনাগাদ হওয়া প্রয়োজনীয় ওষুধ তালিকা অবিলম্বে হালনাগাদ করা (WHO ২৩তম সংস্করণ, ২০২৩ অনুযায়ী)।
- EDCL-কে প্রধান সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাপক সংস্কার ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৮) জাতীয় প্রয়োজনীয় ওষুধ ও প্রযুক্তি কমিটি গঠন:

- নিয়মিত ওষুধ তালিকা পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় নতুন ওষুধ সংযোজন।
- বাংলাদেশের রোগের প্রকোপ অনুযায়ী ওষুধ অগ্রাধিকার প্রদান।
- মানসম্পন্ন চিকিৎসা সরঞ্জামের তালিকা প্রণয়ন।
- জরুরি স্বাস্থ্য সংকটে দ্রুত ওষুধ সংযোজন ব্যবস্থা গঠন।
- "জন ঔষধি" প্রকল্পের মতো সাশ্রয়ী মূল্যের জেনেরিক ওষুধ বিক্রয় ব্যবস্থা চালু করা।

৭. মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশসমূহ:

১. EDCL শক্তিশালীকরণ ও বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা:
    - ২-৫ বছরের মধ্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি।
    - ৫-১০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পকে সম্পূর্ণভাবে জাতীয় চাহিদা পূরণে সক্ষম করে তোলা।
    - গবেষণা ও প্রযুক্তি স্থানান্তরের জন্য আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা (উদাহরণ: FDA, EMed Agency)।

২. স্থানীয় ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির মাধ্যমে কৌশলগত ক্রয় ব্যবস্থা:
    - EDCL উৎপাদনে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত স্থানীয় কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে সরবরাহ নিশ্চিত করা।
    - নির্বাচিত কোম্পানিগুলোর সাথে দীর্ঘমেয়াদী ক্রয় চুক্তি করা।
    - সকল ক্রয়কৃত ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে শক্তিশালী বিধি-নিষেধ কার্যকর করা।

৩. **প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণের জন্য একটি জাতীয় ফার্মেসি নেটওয়ার্ক (NPN) গঠন:**

- **সরকারি হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে ভালোভাবে পরিচালিত ফার্মেসি স্থাপন।**
- **প্রশিক্ষিত ফার্মাসিস্ট দ্বারা ওষুধ সরবরাহ ও ওষুধ সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান নিশ্চিত করা।**
- **সরকারি হাসপাতালগুলোতে ২৪/৭ ফার্মেসি চালু করা।**

৪. **ই-প্রেসক্রিপশন ব্যবস্থা চালু করা:**

- **সকল সরকারি চিকিৎসকদের ই-প্রেসক্রিপশন ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা।**
- **প্রাইভেট ডাক্তারদের ই-প্রেসক্রিপশন ব্যবহারে উৎসাহিত করা।**
- **ডুপ্লিকেশন ও অপব্যবহার রোধে ওষুধ বিতরণ একটি ডিজিটালভাবে সংযুক্ত রোগী শনাক্তকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া উচিত, যা জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, স্মার্ট কার্ড বা জন্ম নিবন্ধন ব্যবহারের মাধ্যমে করা যেতে পারে।**

এই পদ্ধতি নিশ্চিত করবে যে রোগীরা সঠিক ওষুধ গ্রহণ করছে, অতিরিক্ত ওষুধ প্রদান ও অপব্যবহার রোধ করা সম্ভব হবে এবং নীতিনির্ধারকরা ওষুধ ব্যবহারের প্রবণতা বিশ্লেষণ ও সরবরাহ শৃঙ্খলা উন্নত করতে পারবেন।

একটি গঠনমূলক জাতীয় ফার্মেসি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা, ই-প্রেসক্রিপশন প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার এবং ডিজিটাল রোগী শনাক্তকরণ ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে বাংলাদেশ সর্বজনীনভাবে প্রয়োজনীয় ওষুধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে পারবে, রোগীর নিরাপত্তা বৃদ্ধি করবে এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে।

৮. নিয়ন্ত্রক কাঠামো উন্নতকরণ

মূল্য নির্ধারণ এবং পর্যায়ক্রমিক মূল্য পর্যালোচনা:

• সরকারকে সব ধরনের ওষুধ, ডায়াগনস্টিক এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও ডিভাইসের জন্য একটি মূল্য নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠন করা উচিত।

• শক্তিশালী সরকারী নিয়ন্ত্রণ এবং ভর্তুকি নিশ্চিত করতে পারে যে, **প্রয়োজনীয় ওষুধ সাশ্রয়ী থাকে,** পাশাপাশি **উদ্ভাবন এবং বাজার প্রতিযোগিতা** উৎসাহিত হয়।

উৎপাদন এবং সরবরাহ শৃঙ্খলার স্থিতিস্থাপকতা শক্তিশালীকরণ:

বাংলাদেশ **ঘরোয়া নীতি সংস্করণ** এবং **বিশ্বের সেরা চর্চা** একত্রিত করে একটি আরও সাশ্রয়ী, কার্যকর এবং প্রযুক্তিভিত্তিক ওষুধ সরবরাহ শৃঙ্খলা তৈরি করতে পারে।

• একটি **কেন্দ্রীভূত ক্রয় ব্যবস্থা** নিশ্চিত করতে পারে **খরচের কার্যকারিতা** এবং ওষুধের একটি ধারাবাহিক সরবরাহ যা অন্তত **৬৬% EDL** চাহিদা পূরণ করবে, **বাল্ক ক্রয় ক্ষমতা** ব্যবহার করে;

• **স্থানীয় API উৎপাদন:** বিদেশী সরবরাহকারীদের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে স্থানীয় **API** উৎপাদনকে উৎসাহিত করা উচিত, এবং এর জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবনা কাজ করতে পারে, যখন **ব্যক্তিগত খাতের সাথে সহযোগিতা/অনুপ্রাণিত করা হয়:**

- **বিনিয়োগের জন্য প্রণোদনা:** এটি সাময়িক **কর ছাড়, অনুদান** এবং **ভর্তুকি** অন্তর্ভুক্ত করতে পারে যা **API** উৎপাদন অবকাঠামোতে ব্যক্তিগত খাতের বিনিয়োগ উৎসাহিত করবে;
- **প্রযুক্তি স্থানান্তরের জন্য কৌশলগত অংশীদারিত্ব:** স্থানীয় ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলিকে আন্তর্জাতিক **API** নির্মাতাদের সাথে অংশীদারিত্ব, যৌথ উদ্যোগ এবং প্রযুক্তি স্থানান্তর চুক্তির মাধ্যমে সহযোগিতা করার জন্য উৎসাহিত করা উচিত। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ তার সক্ষমতা তৈরি করতে পারবে যাতে **উচ্চ-মানের API** দেশীয়ভাবে উৎপাদন করা যায়। **WHO** এর **প্রযুক্তিগত সহায়তা** ব্যবহার করুন এবং **আন্তর্জাতিক PPPs** আকর্ষণ করুন ওষুধের প্রাপ্যতা বাড়ানোর জন্য;

- **API উৎপাদনের জন্য সুরক্ষাবাদী নীতি প্রয়োগ:** স্থানীয় API নির্মাতাদের বৃদ্ধির জন্য, সরকারকে এমন সুরক্ষাবাদী নীতি গ্রহণ করা উচিত যা সেই API এর আমদানি সীমাবদ্ধ করবে, যার জন্য দেশীয় সক্ষমতা বিদ্যমান বা উন্নয়নশীল। একটি **ধাপে ধাপে আমদানি শুল্ক ব্যবস্থা** প্রবর্তন করা উচিত, যেখানে একটি নির্দিষ্ট API আমদানির উপর শুল্ক কমানো হবে দেশীয় উৎপাদন সক্ষমতার অনুপাত অনুসারে। স্থানীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে আমদানি শুল্ক অনুপাতে বৃদ্ধি করা উচিত যাতে আরও দেশীয় API উৎপাদন উৎসাহিত হয়। এছাড়া, **নিয়ন্ত্রক তত্ত্বাবধান** বাড়ানো উচিত যাতে **মান এবং সামঞ্জস্যতা** নিশ্চিত হয় এবং বাজার বৈচিত্র্য এবং প্রতিযোগিতা উৎসাহিত করতে **API পোর্টফোলিও** সীমাবদ্ধ করা উচিত প্রতিটি নির্মাতার জন্য এবং **মূল্য-ভিত্তিক খরচ মডেল** প্রয়োগ করা উচিত।

৯. **সাশ্রয়িতা নিশ্চিতকরণ**

বাংলাদেশে জেনেরিক ওষুধের প্রবর্তন:

• ভারত সরকার **ডাক্তারদের (**সরকারি এবং কিছু ক্ষেত্রে **বেসরকারী ডাক্তারদের)** জন্য **জেনেরিক নাম** লিখে প্রেসক্রিপশন দেওয়ার নিয়ম প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছে। এটি একটি **পারডক্সিক** পরিবর্তন ঘটিয়েছে, যেখানে **ক্ষমতা** স্থানান্তরিত হয়েছে **ডাক্তারের টেবিল** থেকে **ফার্মেসির কাউন্টার** এ। পরে **সস্তা দাম** ছাপানোর জন্য আলোচনা করা হয়েছিল। **২০১৪** সাল থেকে, ভারত সরকার এই প্রোগ্রামটি সম্প্রসারণ করেছে এবং বর্তমানে প্রায় **১৫,০০০** জেনেরিক ফার্মেসি রয়েছে, এবং **২৩০০** ওষুধ ও **৩০০** সার্জিক্যাল আইটেম উপলব্ধ। অনেক **বেসরকারী এবং সরকারি হাসপাতাল** তাদের ক্যাম্পাসে এই ফার্মেসিগুলি পরিচালনা করছে। **ভারতীয় মেডিক্যাল কাউন্সিল** একটি নিয়ম করেছে যে, **ডাক্তাররা ব্র্যান্ড নাম লিখতে পারবেন তবে অবশ্যই জেনেরিক নামও লিখতে হবে**।

• **সবচেয়ে দামি** প্রেসক্রিপশন করা ওষুধের **কমপক্ষে ২০% ডাক্তারদের জেনেরিক নাম** লিখতে হবে।

- **খরচ কার্যকর জেনেরিক ওষুধ:** সরকারী হস্তক্ষেপ প্রয়োগ করে **জেনেরিক ওষুধ ব্যবহারের প্রচার** এবং **সরকারি ভর্তুকি প্রদত্ত ফার্মেসির বিস্তার,** শুরুতেই কমপক্ষে **সবচেয়ে দামি ২০% ওষুধ;**
- **গবেষণা ও উন্নয়ন খরচ কমানো: জেনেরিক নির্মাতারা** নতুন ওষুধ বিকাশ এবং বাজারজাত করার জন্য প্রচুর খরচ এড়িয়ে চলেন, বরং মূল পেটেন্ট শেষ হওয়ার পর উৎপাদনের উপর মনোযোগ দেন;
- **বাজার প্রতিযোগিতা:** একাধিক নির্মাতা একই জেনেরিক ওষুধ উৎপাদন করলে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়, যা দাম কমায়;
- **বিপণন খরচ কমানো:** ব্র্যান্ডেড ওষুধের তুলনায় বিপণন খরচ কম থাকে, যা সাধারণত প্রচুর প্রচারমূলক খরচ সংযুক্ত থাকে;
- **নতুন ফর্মুলারির উদ্ভাবনে উৎসাহিত করতে কর অবকাশ** প্রদান করা।

১০. **ওষুধের যুক্তিসংগত ব্যবহার প্রচার**

• **কমিউনিটি সচেতনতা প্রচারাভিযান:** জনগণকে সঠিক ওষুধ ব্যবহারের এবং অপব্যবহারের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন করতে Mass Media এবং কমিউনিটি ভিত্তিক উদ্যোগের মাধ্যমে প্রচার চালানো;

• **প্রদানকারী প্রশিক্ষণ:** স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের প্রমাণভিত্তিক প্রেসক্রিপশন অনুশীলনে প্রশিক্ষণ দেওয়া;

• **পলিফার্মেসি, অপ্রয়োজনীয় ডায়াগনস্টিক পরীক্ষা এবং অপ্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রিপশন নিয়ন্ত্রণ:** ক্লিনিকাল অডিটের মাধ্যমে প্রেসক্রিপশনগুলো নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা।

১১. **ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা**

• **গ্রামীণ বিতরণ ব্যবস্থা:** গ্রামীণ এলাকায় অবহেলিত অঞ্চলে ওষুধ পৌঁছানোর জন্য আঞ্চলিক ঔষধ গুদাম এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগ স্থাপন করা।

• **লক্ষ্যভিত্তিক ভর্তুকি: অসহায় জনগণকে** সহায়তা করার জন্য আর্থিক সহায়তা বা ভাউচার প্রদান করা।

১২. **ভুয়া ওষুধের বিরুদ্ধে লড়াই এবং মান নিশ্চিতকরণ**

১৩. **ভুয়া ওষুধের বিরুদ্ধে লড়াই:** ভুয়া এবং নিম্নমানের ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ব্লকচেইন বা অন্যান্য ট্রেসেবিলিটি প্রযুক্তি প্রয়োগ করা।

• **ফার্মাকোভিজিল্যান্স:** খারাপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ এবং সমাধানের জন্য ব্যবস্থা গঠন করা। ওষুধের সঠিক লেবেলিং এবং প্যাকেজিং নিশ্চিত করা, বিশেষত অ্যান্টিবায়োটিকের জন্য স্বতন্ত্র প্যাকেজিং (লাল রঙ) ব্যবহার করা, যা সীমিত ব্যবহারের জন্য নির্দেশ করে।

১৪. **নিয়ন্ত্রক তত্ত্বাবধান**

• নিরাপত্তা মানদণ্ড মেনে চলা নিশ্চিত করার জন্য উৎপাদন সুবিধা এবং বিতরণ চ্যানেলগুলোর নিয়মিত পরিদর্শন করা।

• **ক্ষমতা বৃদ্ধি:** নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের জন্য প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করা, যাতে সময়মতো পরিদর্শন এবং কার্যকরী লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা যায়।

১৫. **প্রবেশযোগ্যতা উন্নতকরণ**

আমাদের আউটডোর ফার্মেসি সেবা সকাল ৮টা থেকে ২টা পর্যন্ত চালু থাকে, যা নিয়মিত অফিস সময়ের সাথে মিলে যায়, ফলে দৈনিক মজুরি নির্ভর নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য এই সেবা পেতে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। প্রবেশযোগ্যতা উন্নত করতে, আমরা সেবা সময় বাড়িয়ে রাত ৮টা পর্যন্ত বা ২টা থেকে ১০টা পর্যন্ত দ্বিতীয় শিফট চালু করতে পারি। যদি ফার্মাসিস্টদের সংখ্যা পর্যাপ্ত না থাকে তবে তাদের অতিরিক্ত সময়ের জন্য বেতন প্রদান করা হবে।

১৬. **স্বাস্থ্যসেবায় প্রযুক্তির ভূমিকা**

প্রযুক্তি বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার ফাঁক পূরণে একটি রূপান্তরকারী শক্তি হিসেবে উদিত হয়েছে। ডিজিটাল হেলথ প্ল্যাটফর্ম, টেলিমেডিসিন সেবা, এবং মোবাইল হেলথ (mHealth) অ্যাপ্লিকেশনগুলি অধিকতরভাবে গ্রামীণ জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য ব্যবহার হচ্ছে, যা তাদের গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা পরামর্শ এবং স্বাস্থ্য তথ্য প্রদান করছে। উদাহরণস্বরূপ, টেলিমেডিসিন উদ্যোগগুলি গ্রামীণ এলাকায় রোগীদেরকে দীর্ঘ দূরত্বে ভ্রমণ ছাড়াই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়ার সুযোগ প্রদান করেছে, ফলে খরচ কমানো এবং স্বাস্থ্যগত ফলাফল উন্নত করা সম্ভব হয়েছে।

১৭. **বর্তমান পরিস্থিতি**

বাংলাদেশ তার স্বাস্থ্য খাত ডিজিটালাইজ করতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, যা বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের উন্নতি ঘটাচ্ছে। বর্তমানে ব্যবহৃত প্রধান ডিজিটাল টুলসগুলো হলো:

• **অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম:** সরকারি স্বাস্থ্য সম্পদ ট্র্যাক করতে ব্যবহৃত, যাতে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করা যায়;

• **সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট পোর্টাল (SCMP):** কার্যকরী সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে, যা প্রয়োজনীয় ওষুধ ও স্বাস্থ্য সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করে;

• **ডিস্ট্রিক্ট হেলথ ইনফরমেশন সফটওয়্যার ২ (DHIS২):** ডেটা সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা, বিশ্লেষণ এবং প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়;

• **ই-টিবি ম্যানেজার:** টিউবারকুলোসিস (টিবি) রোগের রেকর্ড এবং রিপোর্টিংয়ের জন্য একটি বিশেষায়িত টুল, যা টিবি নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির জন্য সঠিক ডেটা নিশ্চিত করে;

• **ওপেন এমআরএস:** একটি ওপেন-সোর্স স্বাস্থ্য রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, যা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে রোগী ডেটা ব্যবস্থাপনা সহজতর করে।

এই সিস্টেমগুলো জাতীয় স্বাস্থ্য অবকাঠামোর সাথে সংযুক্ত, যা অপারেশনাল দক্ষতা এবং ডেটা ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উন্নতি ঘটাচ্ছে। তবে, একটি পূর্ণ ডিজিটালাইজড এবং আন্তঃসংযোগযোগ্য স্বাস্থ্য পরিবেশ তৈরি করতে চ্যালেঞ্জগুলি অব্যাহত রয়েছে।

১৮. **স্বাস্থ্য খাত ডিজিটালাইজেশনে চ্যালেঞ্জ**

যদিও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, বাংলাদেশ স্বাস্থ্য খাত ডিজিটালাইজেশনে কয়েকটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে:

• **ইন্টারঅপারেবিলিটির অভাব:** বর্তমান ডিজিটাল সিস্টেমগুলো আলাদা আলাদা কাজ করছে, যার ফলে ডেটা খণ্ডিত হচ্ছে এবং সামগ্রিক বিশ্লেষণে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে;

• **সীমিত অবকাঠামো:** বিশেষত গ্রামীণ অঞ্চলে অপর্যাপ্ত ইন্টারনেট সংযোগ এবং ডিজিটাল অবকাঠামো, যা এই সিস্টেমগুলোর অ্যাক্সেসকে সীমাবদ্ধ করে;

• **ক্ষমতার ঘাটতি:** স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে ডিজিটাল টুলস এবং সিস্টেমগুলি কার্যকরভাবে ব্যবহার করার জন্য পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব;

• **ডেটা সুরক্ষা এবং গোপনীয়তা বিষয়ক উদ্বেগ:** সংবেদনশীল স্বাস্থ্য ডেটার গোপনীয়তা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করা একটি চ্যালেঞ্জ;

• **আর্থিক সীমাবদ্ধতা:** সিস্টেমের রক্ষণাবেক্ষণ, আপগ্রেড এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সীমিত বাজেট বরাদ্দ;

• **পরিবর্তনের প্রতি প্রতিরোধ:** স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের মধ্যে ডিজিটাল সিস্টেম গ্রহণে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ এবং মোটিভেশনের অভাব।

১৯. প্রযুক্তির মাধ্যমে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের উন্নতি

• সাপ্লাই চেইন প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির সংযোজন মেডিকেল সরবরাহের ক্রয়, বিতরণ এবং মনিটরিংয়ে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিয়েছে।

• একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলো **ইলেকট্রনিক লজিস্টিকস ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (eLMIS)** বাস্তবায়ন, যা স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তর (DGHS) দ্বারা প্রবর্তিত। এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটি মেডিকেল সামগ্রীর স্টক স্তর, ইনভেন্টরি লেনদেন এবং ব্যবহারের নিদর্শনগুলি রিয়েল-টাইম ট্র্যাক করার সুযোগ প্রদান করে।

• এছাড়াও, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (MOHFW) **সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট পোর্টাল (SCMP)** তৈরি করেছে, একটি ওয়েব-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম, যা বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের জন্য প্রবেশযোগ্য, যেমন ক্রয়কারী সংস্থা, হাসপাতাল এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

২০. রিয়েল-টাইম ইনভেন্টরি ট্র্যাকিং উন্নত করা

• **ডিজিটাল ক্রয় ব্যবস্থা প্রবর্তন:** সব মেডিকেল সরবরাহ এবং সরঞ্জামের জন্য e-GP (ইলেকট্রনিক গভার্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট) বাধ্যতামূলক করা, যাতে রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং এবং স্বচ্ছ বিডিং প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা যায় এবং রাজনৈতিক প্রভাব দূর করা যায়। বিশেষ করে HSD (স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ) এর জন্য এটি প্রয়োজনীয়, যেখানে e-GP ব্যবহার কিছুটা পিছিয়ে আছে। রিয়েল-টাইম ইনভেন্টরি ট্র্যাকিং সিস্টেম গ্রহণ করা সঙ্কট প্রতিরোধ করতে পারে এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ ও মেডিকেল সরবরাহের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে পারে। ইন্টারনেট অব থিংস (IoT) ডিভাইসের সংমিশ্রণ স্টক স্তরের অবিচ্ছিন্ন মনিটরিং করতে সক্ষম করে, যা সময়মতো স্টক পুনঃস্থাপন এবং স্টক আউটের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক। এই পদ্ধতিটি তাপমাত্রা সংবেদনশীল সরবরাহের অখণ্ডতা বজায় রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, উন্নত কোল্ড চেইন স্টোরেজ সুবিধা ব্যবহারের মাধ্যমে।

• **প্রয়োজনভিত্তিক ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগ:** মেডিকেল সরঞ্জামের ক্রয়ের জন্য একটি কঠোর মূল্যায়ন প্রোটোকল তৈরি করা (এতে সরঞ্জামের প্রিসেট স্পেসিফিকেশন এবং হাসপাতালের চাহিদার হিসাব অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যেমন হাসপাতালের সাইজ এবং ব্যবহার হার) যাতে হাসপাতালের প্রকৃত চাহিদার সাথে সঙ্গতি বজায় রাখা যায় এবং অপ্রয়োজনীয় ক্রয় প্রতিরোধ করা যায়।

• **ক্রয় অস্বাভাবিকতার জন্য কঠোর শাস্তি প্রবর্তন:** ক্রয় জালিয়াতি এবং অনৈতিক প্রক্রিয়া (যেমন লবিং) এর সঙ্গে জড়িতদের জন্য আইনি পরিণতি কার্যকর করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

২১. অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি

• **স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি তৈরি:** প্রকল্প পরিচালক (PDs) এবং অর্থনৈতিক কর্মকর্তাদের সরকারী আর্থিক নিয়মাবলী সম্পর্কে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা, যাতে ভুল ক্রয়ের ঝুঁকি কমানো যায়। ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে সেক্টর প্রোগ্রাম থেকে স্থানান্তরের জন্য সম্ভাব্য PDs এর একটি প্রশিক্ষিত প্যানেল প্রস্তুত করা।

• **অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিকেন্দ্রীকরণ:** স্থানীয় হাসপাতাল প্রশাসকদের বেশি আর্থিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া, যাতে কেন্দ্রীভূত অনুমোদনের উপর নির্ভরতা কমে এবং ক্রয় এবং মেরামত প্রক্রিয়া দ্রুত হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শ করে সংশোধিত আর্থিক কর্তৃত্বের ডেলিগেশন প্রবর্তন করা।

• **পারফরম্যান্স-ভিত্তিক প্রণোদনা প্রতিষ্ঠা:** নেতৃত্বের ধরে রাখার এবং পদোন্নতির সাথে আর্থিক শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন দক্ষতার সম্পর্ক স্থাপন করা। প্রণোদনাগুলি নগদবিহীনও হতে পারে (যেমন স্বাস্থ্য মন্ত্রীর পুরস্কার)।

২২. সরবরাহ চেইন এবং লজিস্টিকস ব্যবস্থাপনা উন্নত করা

• **একটি কেন্দ্রীভূত ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়ন:** DGHS এর জন্য (যেমন DGFP তে ব্যবহার করা হয়) গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহের জন্য রিয়েল-টাইম ইনভেন্টরি ট্র্যাকিং প্রবর্তন করা।

• **AI-ভিত্তিক চাহিদা পূর্বাভাস প্রবর্তন:** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ডেটা বিশ্লেষণ ব্যবহার করে নির্দিষ্ট জেলা গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনভিত্তিক চাহিদা পূর্বাভাস তৈরি করা (যেমন জনসংখ্যার আকার, রোগের ধরন এবং সুবিধার ব্যবহার ইত্যাদি)।

• **পরিবার পরিকল্পনা ক্রয়ে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি:** কনট্রাসেপটিভ এবং সম্পর্কিত সামগ্রীর সময়মতো ক্রয় এবং বিতরণ নিশ্চিত করতে একটি ব্যাপক এবং স্বাধীন মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যাতে হঠাৎ স্টক আউট এড়ানো যায়।

২৩. ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অবকাঠামোতে বিনিয়োগ

প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পূর্ণ সুবিধা নিতে, এটি অপরিহার্য যে স্বাস্থ্যসেবা পেশাদার এবং সরবরাহ চেইন কর্মীদের জন্য ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ করা হয়। ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং সরবরাহ চেইন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নতুন প্রযুক্তিগুলির কার্যকর ব্যবহারের জন্য সহায়ক হতে পারে। এছাড়াও, ইন্টারনেট সংযোগ এবং অবকাঠামো উন্নত করা, বিশেষ করে গ্রামীণ এবং অবহেলিত এলাকায়, ডিজিটাল সরঞ্জামগুলির ব্যাপক গ্রহণে সহায়তা করবে।

২৪. ডেটা সুরক্ষা এবং গোপনীয়তা নিশ্চিত করা

• ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার বাড়ানোর সঙ্গে, রোগী এবং সরবরাহ চেইন ডেটা সুরক্ষিত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শক্তিশালী ডেটা সুরক্ষা নীতি প্রতিষ্ঠা করা এবং নিরাপদ সিস্টেম প্রয়োগ করা গোপনীয়তা বজায় রাখতে এবং স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে বিশ্বাস তৈরি করতে সাহায্য করবে।

• এই কৌশলগুলির প্রতি মনোযোগ দিয়ে, বাংলাদেশ তার স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ চেইন ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে পারে, প্রয়োজনীয় ওষুধে ন্যায়সঙ্গত প্রবেশাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য ফলাফল উন্নত করতে পারে।

২৫. চ্যালেঞ্জ এবং সুপারিশ

এই প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পরেও, সীমিত ডিজিটাল সাক্ষরতা, অপর্যাপ্ত ইন্টারনেট সংযোগ এবং ডেটা গোপনীয়তা সম্পর্কিত উদ্বেগের মতো চ্যালেঞ্জগুলি স্বাস্থ্য প্রযুক্তির ব্যাপক গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করছে।

২৬. নীতি এবং শাসন:

একটি ব্যাপক জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য কৌশল তৈরি করুন, যা ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

• **সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব:** প্রযুক্তি কোম্পানি, উন্নয়ন সহযোগী এবং এনজিওগুলির সঙ্গে অংশীদারিত্ব তৈরি করুন, উদ্ভাবন এবং সম্পদ সংগঠনের জন্য।

• **পাইলট এবং স্কেল-আপ:** নির্বাচিত জেলাগুলিতে উদ্ভাবনী ডিজিটাল সমাধানগুলি পরীক্ষা করুন, প্রভাব মূল্যায়ন করুন এবং সফল মডেলগুলি দেশের অন্যান্য স্থানে প্রসারিত করুন।

• **মনিটরিং এবং মূল্যায়ন:** ডিজিটাল স্বাস্থ্য হস্তক্ষেপগুলির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে এবং নীতি সমন্বয়ের জন্য একটি শক্তিশালী মনিটরিং এবং মূল্যায়ন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করুন।

. আবশ্যিক ঔষধপত্র, প্রযুক্তি ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদির প্রাপ্যতা ও লভ্যতা - সুপারিশসমূহ

১) বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে, ডিজিডিএ-কে এখন থেকে চিকিৎসা যন্ত্রপাতির নিবন্ধন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করতে হবে এবং শুধুমাত্র বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন (BHC) কর্তৃক মূল্য নির্ধারণের পরেই নিবন্ধন প্রদান করবে।

২) (১) ঔষধ ও চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিপণ্যের খরচ ও বাজারমূল্য পর্যালোচনার মাধ্যমে মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) একইসাথে, সাশ্রয়ী মূল্যে এইসব পণ্য নিশ্চিত করতে কর হ্রাস অথবা উৎপাদকদের জন্য নগদ প্রণোদনা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩) ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, নির্দিষ্ট কিছু অ্যান্টিবায়োটিক এবং ব্যবহৃত ঘরোয়া যন্ত্রপাতি ও একবার ব্যাবহার উপযোগী / ডিসপোজেবল পণ্যের মতো মৌলিক চিকিৎসা সামগ্রীর উপর আরোপিত ভ্যাট/কর উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসা প্রয়োজন। এইসব পণ্যে রোগীরা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগত ব্যয় করেন, যা হ্রাস করতে হবে।

৪) (১) ভিটামিন, খনিজ, প্রোবায়োটিক, বুকের দুধের বিকল্প এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যক নয় এমন পণ্যের উপর কর/ভ্যাট বৃদ্ধি করে প্রয়োজনীয় ঔষধে কর হ্রাসের ফলে যে আর্থিক ক্ষতি হবে তা ভারসাম্যপূর্ণভাবে পূরণ করা যেতে পারে, (২) ঔষধের দাম কমানোর অংশ হিসেবে প্যাকেজিং প্রক্রিয়া সরলীকরণ এবং ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির বিপণন ব্যয় কমাতে হবে।

৫) (১) চিকিৎসকদের সঙ্গে ঔষধ কোম্পানির সম্পর্কের ক্ষেত্রে (যেমন: কোম্পানির প্রতিনিধিদের (রিপ্রেজেন্টেটিভ) মাধ্যমে তথ্য প্রদান, উপহার, স্পন্সরশিপ, সেমিনার ইত্যাদি) নৈতিকতা নিশ্চিত করতে কঠোর নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা প্রবর্তন করা জরুরি, (২) একটি এমন কাঠামো গড়ে তুলতে হবে, যেখানে রোগীর সর্বোত্তম স্বার্থে চিকিৎসকদের স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা ও পেশাগত সততা বজায় রাখা আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক হবে।

৬) ডায়াবেটিস মাপক, রক্তচাপ মাপক, থার্মোমিটার, স্টেথোস্কোপসহ ঘরোয়া ব্যবহারের প্রয়োজনীয় পুনঃব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতির মূল্য নির্ধারণ কৌশল বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করে একটি যৌথ উদ্যোগ গড়ে তুলতে হবে। এতে করে সবার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির প্রাপ্যতা ও নাগালযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

৭) বাংলাদেশ সরকারের অধীনে একটি উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞ টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে, যা দেশের ফার্মাসিউটিক্যাল খাতের একটি প্রমাণভিত্তিক মূল্যায়ন পরিচালনা করবে। এই মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্ত থাকবে: এপিআই (API) উৎপাদন ও আমদানি, উৎপাদন সক্ষমতা, গুণগত মান, নিয়ন্ত্রক তদারকি, সরবরাহ চেইনের দক্ষতা এবং বিপণন কার্যক্রম। এই টাস্কফোর্সের মূল কাজ হবে:

(৭.১) খাতভিত্তিক মূল্যায়ন: বাংলাদেশের ঔষধ উৎপাদন সক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামোর মূল্যায়ন, ত্রুটি, অদক্ষতা, অপচয় ও চৌর্যবৃত্তির উৎস চিহ্নিত করা;

(৭.২) ইডিসিএল ফরেনসিক অডিট: ইডিসিএল (EDCL)-এর দুর্নীতি, ব্যবস্থাপনা অদক্ষতা ও অভিযোগগুলোর তদন্ত করে সুশাসন সংস্কার, কাঠামোগত পুনর্গঠন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ প্রদান।

৮) বেসরকারি ঔষধ শিল্পে কথিত অনৈতিক অনুশীলন—যেমন: ট্রান্সফার-প্রাইসিং কৌশল, আগ্রাসী বিপণন কৌশল এবং অতিরিক্ত প্রেসক্রিপশনের জন্য প্ররোচনা—যেগুলি ঔষধের ব্যয় বৃদ্ধি করে, তা রোধে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করা প্রয়োজন, যা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এই প্রতিবেদনে শোষণমূলক অনুশীলন রোধ, মূল্য নির্ধারণে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং রোগীর কল্যাণ সুরক্ষায় অগ্রাধিকার এবং প্রমাণভিত্তিক নীতিগত ও নিয়ন্ত্রণমূখী সংস্কারের সুপারিশ থাকবে।

৯) (১) বাংলাদেশের অত্যাবশকীয় ঔষধের তালিকা—যা সর্বশেষ ২০১৬ সালে হালনাগাদ হয়েছিল, সেটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২৩তম সংস্করণ (২০২৩) অনুযায়ী হালনাগাদ করা প্রয়োজন, এবং সেটিকে দেশের বর্তমান রোগসংক্রান্ত চালচিত্র (প্রোফাইল) ও জনস্বাস্থ্যের অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে, (২) এই সংশোধন প্রক্রিয়া বাংলাদেশ হেলথ কমিশনের অধীনে গঠিত বহুমুখী বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা পরিচালিত হবে, যেখানে ক্লিনিক্যাল, ফার্মাকোলজিক্যাল এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করবেন, (৩) অংশীজনদের সঙ্গে নিয়ে একটি স্বচ্ছ পরামর্শ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তালিকাভুক্ত ঔষধগুলো যথাযথ, সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী হয়।

১০) নতুন বা উদীয়মান স্বাস্থ্য সংকট (যেমন: মহামারী, সংক্রামক রোগ, অথবা নতুনভাবে শনাক্তকৃত জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা) মোকাবিলায় দ্রুত প্রতিক্রিয়া প্রদানের একটি কার্যকর প্রক্রিয়া তৈরি করতে হবে, যাতে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও যন্ত্রপাতি দ্রুত তালিকাভুক্ত করা সম্ভব হয়।

১১) ইডিসিএল (Essential Drugs Company Limited)-কে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, দক্ষ এবং আরো বৃহৎ আকারে একটি জাতীয় ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য একটি ধারাবাহিক, টেকসই, নীতিনির্ভর কৌশল বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ইডিসিএল যাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পর্যায়ের সকল ঔষধ উৎপাদন করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবেঃ

(১১. ১) স্বল্পমেয়াদী (১–২ বছর): নির্বাচিত কিছু অত্যাবশকীয় ঔষধ সম্পূর্ণরূপে দেশীয়ভাবে উৎপাদন নিশ্চিত করতে উৎপাদন কেন্দ্র আধুনিকায়ন, গুণগত মানের উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা অর্জনে মূলধন বিনিয়োগ করতে হবে।

(১১.২) মধ্যমেয়াদী (৩–৫ বছর): ইডিসিএলের উৎপাদন সক্ষমতা সম্প্রসারণ করে, হালনাগাদকৃত অত্যাবশকীয় ঔষধের তালিকাভুক্ত বেশিরভাগ ওষুধ—বিশেষত বায়োলজিক ও বায়োসিমিলার, উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং দক্ষ মানবসম্পদ, সরবরাহ চেইনের উন্নয়ন এবং দেশীয় কাঁচামাল সংগ্রহে প্রণোদনা প্রদানকে গুরুত্ব দিতে হবে।

(১১.৩) দীর্ঘমেয়াদী (১০ বছরের মধ্যে): সম্পূর্ণ অত্যাবশকীয় ঔষধ তালিকার ঔষধসমূহ বৃহৎ পরিসরে দেশীয়ভাবে উৎপাদন করে স্থানীয় উৎপাদক ও আমদানির উপর নির্ভরতা নির্মূল করতে হবে। এজন্য গবেষণা ও উন্নয়নে টেকসই বিনিয়োগ অপরিহার্য।

(১২) (১) স্থানীয় ঔষধ প্রস্তুতকারকদের সাথে কৌশলগত সম্পর্ক গড়ে তুলে প্রয়োজনীয় ঔষধের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য একটি শক্তিশালী নীতিগত কাঠামো গঠন করতে হবে, (২) ইডিসিএল-এর উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে সরকারকে ব্যয়ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে এবং স্থানীয় প্রস্তুতকারকদের সাথে দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত ক্রয়চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে, যাতে পূর্বানুমেয় চাহিদা অনুযায়ী অনতিবিলম্বে, ঔষধ উৎপাদনের দক্ষতা তৈরি হয় এবং ব্যাপক উৎপাদনের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হয়।

(১৩) (১) প্রয়োজনীয় ঔষুধের জন্য, Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) এর দেশীয় উৎপাদন দ্রুত সম্প্রসারণে একটি সমন্বিত, সময়-সীমাবদ্ধ কাঠামো প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে, (২) এপিআই প্রস্তুতকারকদের জন্য সরকার-সমর্থিত ও প্রদত্ত অর্থায়ন সুবিধা চালু করতে হবে, যার মাধ্যমে এপিআই প্রস্তুতকারকরা স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পাবে, (৩) দেশীয়ভাবে উৎপাদিত এপিআই ব্যবহার করলে প্রয়োজনীয় ওষুধের উপর ভ্যাট রিফান্ড প্রণোদনা প্রদান করতে হবে, (৪) যেখানে দেশীয় উৎপাদন সক্ষমতা আছে বা গড়ে তোলা হচ্ছে, সেখানে আমদানিকৃত এপিআই-তে শুল্ক আরোপ করতে হবে এবং নির্দিষ্টে এপিআই -এর পূর্ণ দেশীয় চাহিদা পূরণ নিশ্চিত হলে, সেসবের উপর আমদানি নিষেধাজ্ঞা জারি করে স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করতে হবে, (৫) প্রতিযোগিতামূলক বাজার নিশ্চিত করতে, প্রতিটি প্রস্তুতকারকের এপিআই পোর্টফোলিও ১০ থেকে ১৫টির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, যাতে একচেটিয়া ব্যবসা রোধ হয় এবং সরবরাহ বৈচিত্র্য বজায় থাকে। এই সমন্বিত নীতি দেশীয় উচ্চমানের এপিআই উৎপাদনে বিনিয়োগ উৎসাহিত করবে, বৈশ্বিক সরবরাহ বিঘ্ন থেকে রক্ষা করবে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে নির্ভরযোগ্য ঔষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করবে।

১৪) (১) সারা দেশে একটি সরকারি ফার্মেসি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে, যাতে প্রত্যেক সরকারি হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র (জিপি ক্লিনিক) একটি সম্পূর্ণ মজুদকৃত এবং পেশাদারভাবে পরিচালিত ফার্মেসিরূপে সেবা দিতে পারে, (২) লাইসেন্সধারী ফার্মাসিস্টদের দ্বারা পরিচালিত এই ফার্মেসিগুলো ঔষধ বিতরণ, ঔষধ সম্পর্কিত পরামর্শ এবং যুক্তিসংগত প্রেসক্রিপশন প্রয়োগ নিশ্চিত করবে।

১৫) সকল সরকারি হাসপাতালে ২৪ ঘণ্টা খোলা ইন-হাউস ফার্মেসি চালু করতে হবে, যাতে ভর্তি ও বহির্বিভাগের রোগীরা সার্বক্ষণিক প্রয়োজনীয় ওষুধ পেতে পারেন। এই নীতির আওতায়, সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান থেকে বিতরণকৃত সকল প্রয়োজনীয় ঔষধ রোগীকে স্বল্প বা বিনামূল্যে প্রদান করতে হবে, যা দরিদ্রদের সেবা গ্রহণে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূর করবে এবং দেশের স্বাস্থ্যসেবায় সমতা নিশ্চিত করবে। [মধ্য-দীর্ঘমেয়াদী]

১৬) (১) বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পে নতুন ঔষধ, নতুন উদ্ভাবিত মলিকুল এবং বায়োসিমিলার উদ্ভাবনে গবেষণা ও উন্নয়নে উৎসাহ প্রদানার্থে আর্থিক প্রণোদনা বিবেচনা করতে হবে, (২) এই প্রস্তাবনার আওতায়, যারা দেশে গবেষণায় বিনিয়োগ করছেন—যেমন: ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল নিবন্ধন, পেটেন্ট আবেদন বা বায়োসিমিলার উন্নয়ন—তাদের জন্য নতুন পণ্যের আয়ের উপর কর্পোরেট কর ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, (৩) এই সুবিধা পেতে ডিজিডিএ-তে (DGDA) স্বচ্ছ পর্যায়ক্রমিক উন্নয়নভিত্তিক প্রতিবেদন প্রদান বাধ্যতামূলক হবে, যাতে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। এই নীতিনির্ভর প্রণোদনা কাঠামো উদ্ভাবন আর্থিক

প্রতিবন্ধকতা কমাবে, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে এবং দেশীয়ভাবে প্রাসঙ্গিক চিকিৎসা উদ্ভাবন দ্রুততর করবে—ফলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকবে এবং উন্নত চিকিৎসা সহজলভ্য হবে।

১৭) আই ভি সেলাইন এর মতো পণ্যগুলোর উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে ডেংগু, ডায়রিয়া বা যেকোনো মহামারী ও দুর্যোগ পরিস্থিতিতে এসব ওষুধের ঘাটতি না হয়। [স্বল্প-মধ্যমেয়াদী]

১৮) (১) বিএমডিসিকে একটি নিয়ম প্রণয়ন করতে হবে, যাতে চিকিৎসকরা ব্র্যান্ড নাম লিখলেও অবশ্যই জেনেরিক নামও লিখবেন, (২) চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশনে অন্তত ২০% ব্যয়বহুল ওষুধ জেনেরিক নামে লিখতে বাধ্য করতে হবে, (৩) সকল প্রয়োজনীয় ওষুধের প্রেসক্রিপশনে জেনেরিক ও ব্র্যান্ড উভয় নামই অন্তর্ভুক্ত করা বাধ্যতামূলক হবে, যাতে স্বচ্ছতা বাড়ে, রোগীরা সহজে বুঝতে পারেন এবং সরকারি ও বেসরকারি ফার্মেসিতে সঠিক ওষুধ বিতরণ নিশ্চিত হয়।

১৯) (১) বিএমডিসি রেজিস্ট্রার্ড চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশন ছাড়া কোনো ঔষধ বিতরণ করা যাবে না, শুধুমাত্র 'ওভার-দ্য-কাউন্টার (OTC)' ঔষধ ছাড়া, (২) যার তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করে প্রত্যেক ফার্মেসিতে প্রকাশ্যে প্রদর্শন করতে হবে। [স্বল্পমেয়াদি]

২০) (১) ইডিসিএল কর্তৃক বর্তমানে বিদ্যমান ঔষধের গুণাগুন পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারগুলোর (ল্যাবগুলোর) সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রতিটি বিভাগীয় শহরে নতুন ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে, (২) চলমান ভ্রাম্যমাণ ‘মিনি ল্যাব’ ভ্যান স্থাপন করতে হবে, যাতে দূরবর্তী এলাকাগুলোতে ঔষধের মান পরীক্ষা করা যায়। এই ল্যাবগুলোতে ঔষধের মান ও ভেজাল শনাক্তের ব্যবস্থা থাকতে হবে। [স্বল্প-মধ্যমেয়াদী]

২১) সাশ্রয়ী ঔষধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত রাখতে, দেশীয় উৎপাদন সক্ষমতা জোরদার করার লক্ষ্য নিয়ে অস্থায়ী আন্তর্জাতিক সহযোগিতা চুক্তি করা এবং TRIPS সুবিধা অব্যাহত রাখার জন্য নতুন উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে আন্তর্জাতিকভাবে আলোচনা করতে হবে।

২২) সরকার ও ব্যক্তিগত অংশীদারিত্বের (পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ মডেলের) মাধ্যমে, গবেষণা, উন্নয়ন ও উদ্ভাবন (RDI); প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব (যেমন: FDA বা EMed এজেন্সি) বাড়াতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে হবে, যাতে উচ্চমানের ও সাশ্রয়ী ঔষধ দেশেই উৎপাদন করা যায়। [মধ্য-দীর্ঘমেয়াদি]

২৩) সকল ঔষধ প্রস্তুতিতে Good Manufacturing Practices (GMP) পদ্ধতি অনুসরণ নিশ্চিত করতে একটি দক্ষ এবং শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কাঠামো গঠন করতে হবে। [স্বল্প-মধ্যমেয়াদী]

২৪) জাতীয় ই-প্রেসক্রিপশন পোর্টাল চালু করতে হবে, যা সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে সংযুক্ত ও সমন্বিত থাকবে এবং যা প্রেসক্রিপশনের কার্যকারিতা, ঔষধের অবস্থিতি ও স্থিতি অনুসরণ (ট্র্যাকিং) এবং জবাবদিহিতা বাড়াবে। [মধ্যম-দীর্ঘমেয়াদি[

২৫) ঔষধের পুন: বিতরণ এবং অপব্যবহার রোধে, জাতীয় পরিচয়পত্র, স্মার্ট কার্ড বা জন্ম নিবন্ধনের মাধ্যমে সংযুক্ত ডিজিটাল রোগী শনাক্তকরণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যার মাধ্যমে ঔষধের বিতরণ নিয়ন্ত্রিত ও অনুসরণযোগ্য (ট্র্যাকযোগ্য) হবে। [মধ্যম-দীর্ঘমেয়াদি]

২৬) দেশের ভিতরে নীতিগত সংস্কার এবং আন্তর্জাতিক উৎকৃষ্টতা অনুশীলনের সমন্বয়ের মাধ্যমে উৎপাদন ও সরবরাহ চেইনের স্থিতিশীলতা জোরদার করতে হবে, যাতে একটি সাশ্রয়ী, দক্ষ ও প্রযুক্তিনির্ভর ঔষধ সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।

২৭) সাশ্রয়ী মূল্যের জেনেরিক ঔষধ: সরকারের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে জেনেরিক ওষুধ ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করতে হবে—প্রাথমিকভাবে সবচেয়ে ব্যয়বহুল ওষুধের অন্তত ২০% ক্ষেত্রে। একই জেনেরিক ওষুধ উৎপাদনে একাধিক প্রস্তুতকারকের অংশগ্রহণের ফলে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে, যা মূল্য হ্রাসে সহায়ক হবে।

২৮) (১) ঔষধের যুক্তিসংগত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে—এর জন্য রোগীদের শিক্ষার উদ্যোগ, কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা কার্যক্রম, চিকিৎসক ও প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ, পলিফার্মেসি (একাধিক ওষুধের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ, অপ্রয়োজনীয় ডায়াগনস্টিক পরীক্ষা এবং অপ্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে, (২) ক্লিনিক্যাল অডিটের মাধ্যমে প্রেসক্রিপশনের কঠোর নজরদারি চালু করতে হবে।

২৯) ঔষধের বণ্টন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে সমতা সংক্রান্ত ঘাটতি দূর করতে হবে। এর অংশ হিসেবে, আঞ্চলিক ইডিসিএল এবং ঔষধের গুদাম স্থাপন এবং অবহেলিত অঞ্চলে ঔষধের সরবরাহের জন্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩০) (১) ঔষধ ও টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য উপজেলা পর্যন্ত ফার্মাকোভিজিল্যান্স ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে, (২) পাশাপাশি, নকল ও নিম্নমানের ঔষধ প্রতিরোধে ব্লকচেইন বা অন্যান্য ট্রেসেবিলিটি প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

৩১) (১) নিয়ন্ত্রণমূলক তদারকি (Regulatory Oversight) জোরদার করতে হবে, যাতে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও সরবরাহ চ্যানেলগুলোর নিরাপত্তা মানদণ্ডে নিয়মিত মিল রয়েছে কি না তা নিশ্চিত করা যায়, (২) নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের অবকাঠামোতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে সময়মতো পরিদর্শন ও কার্যকর লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা যায়, (৩) ডিজিডিএ কর্তৃক ঔষধ, সরঞ্জামাদি, যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি ও কৃতিস্বত্ব (পেটেন্ট) এর নিবন্ধন এক মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

৩১) (১) ডিজিটাল প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা কার্যকর করার মাধ্যমে রিয়েল-টাইম ইনভেন্টরি ট্র্যাকিং জোরদার করতে হবে, (২) চাহিদাভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণ কৌশল বাস্তবায়ন, কেনাকাটার অনিয়মের জন্য কঠোর শাস্তি নির্ধারণ এবং সব ধরণের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে, (৩) সরবরাহ চেইন ও লজিস্টিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করতে হবে এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর চাহিদা পূর্বাভাস (AI-Driven Demand Forecasting) ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৩২) (১) ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের পাশাপাশি তথ্য নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে রোগী ও সরবরাহ চেইনের তথ্য সুরক্ষিত থাকে, (২) শক্তিশালী তথ্য সুরক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন ও নিরাপদ প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, যাতে সব অংশীদারদের মধ্যে আস্থা তৈরি হয়।

৩৩) অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ, টিকা ও চিকিৎসা সামগ্রীর টেকসই প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে বহুমুখী কৌশল গ্রহণ করতে হবে, যেমন:

৩৩.১) TRIPS সমাপ্তকালীন সময়সীমা নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ;

৩৩.২) বাধ্যতামূলক লাইসেন্সিং পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ

৩৩.৩) TRIPS সুবিধার আওতায় নিম্নমূল্যের বাজার থেকে জেনেরিক ওষুধের সমান্তরাল আমদানি উৎসাহিত করা;

৩৩.৪) দেশীয় ঔষধ গবেষণা ও উদ্ভাবনে (R&D) বিনিয়োগ বৃদ্ধি;

৩৩.৫) ক্রয় ও বিতরণ কৌশলের উন্নয়ন (প্রয়োজনের নীরিখে বিতরণ);

৩৩.৬) প্রয়োজনীয় অর্থায়ন এবং অর্থায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ;

৩৩.৭) টিকা চুক্তির স্বচ্ছতা ও যথার্থতা নিশ্চিতকরণ;

৩৩.৮) জাতীয় বাজেটভিত্তিক টিকা নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রণয়ন;

৩৩.৯) জাতীয় ঔষধ ও টিকা নীতিমালা প্রণয়ন;

৩৩.১০) স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ বিবেচনায় দীর্ঘমেয়াদি কৌশল প্রণয়ন, যা দেশের ফার্মাসিউটিক্যাল খাতকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেবে;

৩৩.১১) দেশের ভিতর মেশিন, যন্ত্রাদি, যন্ত্রের অংশ, কাঁচামাল, কেমিক্যাল, জারক, টিকা উদ্ভাবন ও তৈরী, দূর-চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা (টেলিমেডিসিন ও টেলিসার্জারি), তথ্য সংগ্রহ ও প্রেরণের সফটওয়্যার তৈরি ইত্যাদি, যা অতি উচ্চ মূল্যের সেবার মূল্য হ্রাস করতে সাহায্য করবে ও ব্যবস্থাপনাকে সমুন্নত করবে এসব প্রচেষ্টায় ও উদ্ভাবনীতে সরকারকে আর্থিক প্রণোদনা দিতে হবে।

৩৪) ডেন্টাল ইমপ্লান্ট, হাঁটুর জয়েন্ট ও হিপ জয়েন্ট প্রতিস্থাপন, কার্ডিয়াক ও অন্যান্য স্টেন্ট এবং কিডনি ডায়ালাইসিসের ব্যয় হ্রাসে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন (BHC) নিম্নলিখিত বিষয়গুলো তদারকি করবে:

৩৪.১) DGDA কর্তৃক বাংলাদেশ ঔষধ ও প্রসাধনী আইন, ২০২৩ অনুসারে জারিকৃত নির্দেশিকাসমূহ বেসরকারি খাত যথাযথভাবে অনুসরণ করছে কিনা;

৩৪.২) প্রযুক্তিনির্ভর চিকিৎসা যন্ত্রপাতি মূল্যসাশ্রয়ী ও সবার নাগালের মধ্যে রাখা নিশ্চিতে সরকারি-বেসরকারি খাতের কার্যকর অংশীদারিত্ব;

৩৪.৩) প্রতিটি প্রস্তুতকারী/নির্মাতা ও আমদানিকারকের DGDA থেকে দেশীয় নিবন্ধন গ্রহণ; (এই নিবন্ধনগুলো হতে হবে নিয়ন্ত্রন কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ, যা বাজারজাতকরণ ও বিক্রয়ের অনুমতি হিসেবে কাজ করবে);

৩৪.৪) বৈধ লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিনিধি তথা "বাংলাদেশ লাইসেন্স হোল্ডার"-এর মাধ্যমে অনুমোদন/ স্বীকৃতি প্রাপ্ত কি না;

৩৪.৫) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করতে হবে, যা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ড্রাগ কন্ট্রোল কমিটির প্রযুক্তিগত উপকমিটি হিসেবে কাজ করবে।

- **প্রযুক্তির মাধ্যমে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের উন্নতি**

  • সাপ্লাই চেইন প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির সংযোজন মেডিকেল সরবরাহের ক্রয়, বিতরণ এবং মনিটরিংয়ে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিয়েছে।

  • একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলো **ইলেকট্রনিক লজিস্টিকস ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম** (eLMIS) বাস্তবায়ন, যা স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তর (DGHS) দ্বারা প্রবর্তিত। এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটি মেডিকেল সামগ্রীর স্টক স্তর, ইনভেন্টরি লেনদেন এবং ব্যবহারের নিদর্শনগুলি রিয়েল-টাইম ট্র্যাক করার সুযোগ প্রদান করে।

  • এছাড়াও, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (MOHFW) **সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট পোর্টাল** (SCMP) তৈরি করেছে, একটি ওয়েব-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম, যা বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের জন্য প্রবেশযোগ্য, যেমন ক্রয়কারী সংস্থা, হাসপাতাল এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

- **রিয়েল-টাইম ইনভেন্টরি ট্র্যাকিং উন্নত করা**

  • ডিজিটাল ক্রয় ব্যবস্থা প্রবর্তন: সব মেডিকেল সরবরাহ এবং সরঞ্জামের জন্য e-GP (ইলেকট্রনিক গভার্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট) বাধ্যতামূলক করা, যাতে রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং এবং স্বচ্ছ বিডিং প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা যায় এবং রাজনৈতিক প্রভাব দূর করা যায়। বিশেষ করে HSD (স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ) এর জন্য এটি প্রয়োজনীয়, যেখানে e-GP ব্যবহার কিছুটা পিছিয়ে আছে। রিয়েল-টাইম ইনভেন্টরি ট্র্যাকিং সিস্টেম গ্রহণ করা সঙ্কট প্রতিরোধ করতে পারে এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ ও মেডিকেল সরবরাহের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে পারে। ইন্টারনেট অব থিংস (IoT) ডিভাইসের সংমিশ্রণ স্টক স্তরের অবিচ্ছিন্ন মনিটরিং করতে সক্ষম করে, যা সময়মতো স্টক পুনঃস্থাপন এবং স্টক আউটের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক। এই পদ্ধতিটি তাপমাত্রা সংবেদনশীল সরবরাহের অখণ্ডতা বজায় রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, উন্নত কোল্ড চেইন স্টোরেজ সুবিধা ব্যবহারের মাধ্যমে।

  • প্রয়োজনভিত্তিক ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগ: মেডিকেল সরঞ্জামের ক্রয়ের জন্য একটি কঠোর মূল্যায়ন প্রোটোকল তৈরি করা (এতে সরঞ্জামের প্রিসেট স্পেসিফিকেশন এবং হাসপাতালের চাহিদার হিসাব অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যেমন হাসপাতালের সাইজ এবং ব্যবহার হার) যাতে হাসপাতালের প্রকৃত চাহিদার সাথে সঙ্গতি বজায় রাখা যায় এবং অপ্রয়োজনীয় ক্রয় প্রতিরোধ করা যায়।

  • ক্রয় অস্বাভাবিকতার জন্য কঠোর শাস্তি প্রবর্তন: ক্রয় জালিয়াতি এবং অনৈতিক প্রক্রিয়া (যেমন লবিং) এর সঙ্গে জড়িতদের জন্য আইনি পরিণতি কার্যকর করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

পরিচ্ছেদ ৮

স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার একটি উপাদান হিসেবে স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থার বিবর্তন

একটি আদর্শ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সেই সকল কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করবে যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো স্বাস্থ্যকে উন্নীত করা, পুনঃস্থাপন করা বা বজায় রাখা। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা হলো এমন একটি সমন্বিত কাঠামো যা সম্পদ, সংগঠন, অর্থায়ন এবং ব্যবস্থাপনার সমন্বয়ে গঠিত, যার চূড়ান্ত লক্ষ্য জনসাধারণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা [১]। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) একটি শক্তিশালী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ছয়টি মূল উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছে: স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, স্বাস্থ্য জনবল, স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় ওষুধের প্রাপ্যতা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অর্থায়ন এবং নেতৃত্ব ও সুশাসন (চিত্র ১)। স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা এই ছয়টি উপাদানের একটি [২]।

সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য হল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতিটি উপাদানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি। এটি স্বাস্থ্য নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সুশাসন ও বিধিবিধান, স্বাস্থ্য গবেষণা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, সেবা প্রদান এবং অর্থায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা স্বাস্থ্য নীতি, ব্যবস্থাপনা এবং ক্লিনিকাল সেবার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে, স্বাস্থ্য পরিস্থিতি, স্বাস্থ্য নির্ধারক এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সূচকসমূহ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, মানীকরণ, কোডিং এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে।

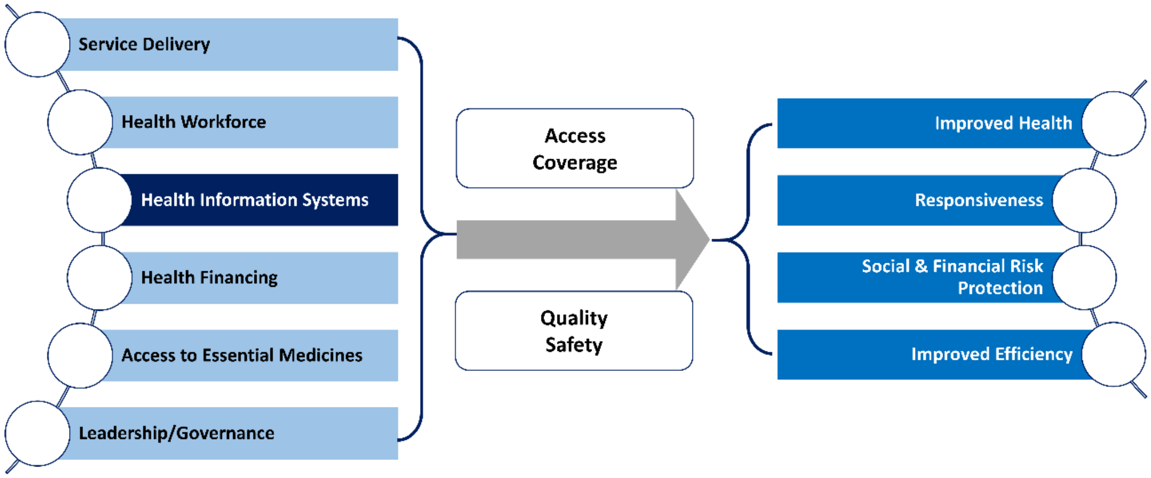

চিত্র ১. স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ছয়টি নির্মাণ স্তম্ভ এবং সেগুলির বৈশিষ্ট্য

স্বাস্থ্য পরিকল্পনাকারী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের জন্য প্রয়োজন বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময় তথ্য, যাতে তারা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে কার্যকরভাবে পরিচালিত করতে পারেন। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে স্বাস্থ্য নির্ধারক উপাদানসমূহ যেমন সামাজিক-অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, আচরণগত ও জিনগত কারণসমূহের পাশাপাশি সেই প্রেক্ষাপট বা পরিবেশ যেখানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কার্যকর হচ্ছে, সে সম্পর্কেও বোঝাপড়া। তাদের আরও প্রয়োজন হয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে চালিত করা উপাদান ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা—যেমন নীতিমালা, অবকাঠামো, সুবিধাসমূহ, খরচ, মানব ও আর্থিক সম্পদ এবং স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করাও

গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে গুরুত্ব পায় স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা, প্রবেশযোগ্যতা, গুণগত মান ও ব্যবহার, পাশাপাশি আর্থিক ঝুঁকির সুরক্ষা এবং ব্যবহারকারীদের চাহিদার প্রতি সাড়া দেওয়ার সক্ষমতা। স্বাস্থ্য ফলাফল, যেমন মৃত্যু হার, অসুস্থতার হার, রোগের প্রাদুর্ভাব, অক্ষমতা এবং সামগ্রিক সুস্থতা, এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়নে অপরিহার্য। স্বাস্থ্য বৈষম্য মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্য নির্ধারক, সেবার আওতা এবং স্বাস্থ্য ফলাফল বিশ্লেষণ করা, যেখানে লিঙ্গ, সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থান, জাতিগোষ্ঠী এবং ভৌগলিক অবস্থানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাজন উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একটি শক্তিশালী স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা এ ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে, যা প্রাসঙ্গিক অংশীজনদের যুক্ত করে এবং ব্যবহারকারীদের নির্ভরযোগ্য, গ্রহণযোগ্য ও তুলনামূলক তথ্য সরবরাহ করে, যা বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী উপস্থাপিত হয় [২]।

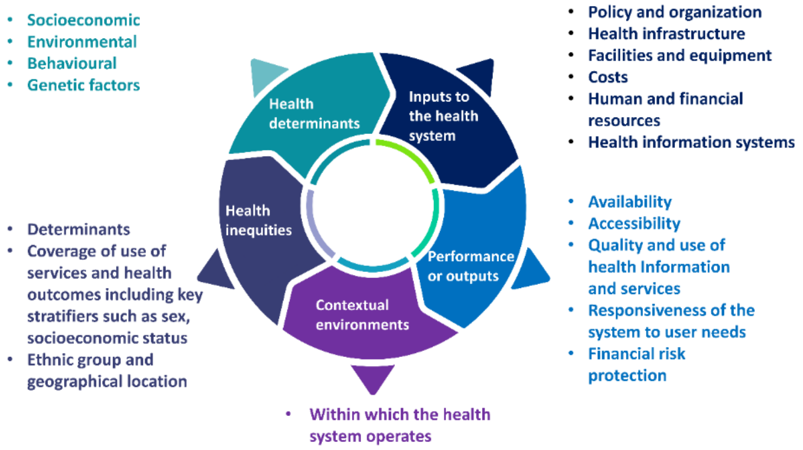

চিত্র ২: জাতীয় স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা থেকে প্রত্যাশিত, পরিকল্পনাকারী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় তথ্যের ধরনসমূহ

একটি দেশের স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থায় দুই ধরনের প্রধান তথ্য উৎস রয়েছে—নিয়মিত (Routine) উৎস এবং বহিঃস্থ (External) উৎস, যেমন জরিপ ও সার্ভেল্যান্স (Surveillance) (তালিকা ১)। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্য প্রশাসনে নানাবিধ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, যা সেবার গুণগত মান এবং ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে [২]।

তালিকা ১: স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থার গঠনে অন্তর্ভুক্ত তথ্যের ধরন এবং তার সংশ্লিষ্ট উৎস

রুটিন/বহিরাগত উৎস	তথ্যের প্রকৃতি	উদাহরণ
রুটিন উৎস	**ব্যক্তিগত স্তরের তথ্য**	রোগীর প্রোফাইল স্বাস্থ্যসেবা রেকর্ড প্রশাসনিক রেকর্ড
রুটিন এবং বহিরাগত উৎস	**স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্তরের তথ্য**	স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্তরের রেকর্ড (সরকারি ও বেসরকারি) প্রশাসনিক উৎস
বহিরাগত উৎস	**জনসংখ্যা স্তরের তথ্য**	গৃহস্থালি জরিপ

	জনস্বাস্থ্য নজরদারি	স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নজরদারি SARI-নজরদারি (Severe Acute Respiratory Infection Surveillance)

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থার গঠনমূলক তথ্যের প্রাপ্যতা

নিচের অনুচ্ছেদগুলিতে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এমন বিদ্যমান তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে-

নিয়মিত উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য

বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা একটি বহু-স্তরবিশিষ্ট কাঠামো, যার উদ্দেশ্য জনগণের কাছে প্রতিরোধমূলক ও চিকিৎসামূলক— উভয় ধরনের স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া (চিত্র ৩)। **স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (DGHS)** মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং কমিউনিটি ক্লিনিকের মতো বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধান করে থাকে, যেগুলো প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও তৃতীয় স্তরের সেবা প্রদান করে। অন্যদিকে, **পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর (DGFP)** মাতৃ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWC), পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পরিচালনা করে, যেগুলো প্রজনন, মাতৃ, নবজাতক, শিশু ও কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্যসেবা (RMNCAH) প্রদান করে থাকে। উভয় অধিদপ্তরই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরি করে, যার মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতে আরও ভালো সমন্বয়, সম্পদের সঠিক বরাদ্দ এবং প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করা হয়।

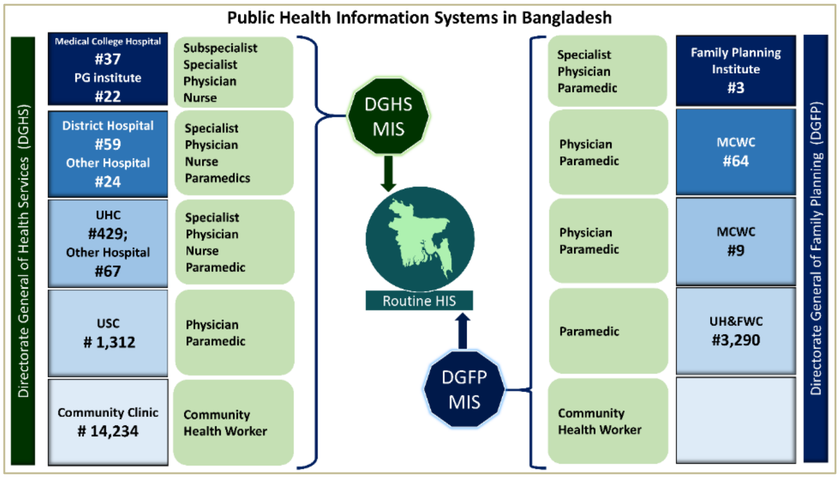

চিত্র ৩. **Public Health Information System of Bangladesh**

নিয়মিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত পর্যায়ের তথ্য এবং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রভিত্তিক তথ্য

বাংলাদেশের নিয়মিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিভিন্ন ডিজিটাল ও কাগজভিত্তিক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ব্যক্তিগত পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করে, যা স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং জনস্বাস্থ্যের অবস্থা পর্যবেক্ষণে সহায়তা করে। ইলেকট্রনিক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (eMIS) এবং District Health Information Software২ (DHIS২)- এর মতো সিস্টেমগুলো রোগীর জনসংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য, সেবার ব্যবহার, টিকাদান, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, এবং রোগ নজরদারির তথ্য সংগ্রহ করে [৩]। এই সিস্টেমগুলো স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের রোগীর চিকিৎসা ইতিহাস ট্র্যাক করতে, সেবা প্রদানে উন্নতি আনতে এবং সময়মতো প্রতিবেদন প্রদান নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। তবে, তথ্য সমন্বয়, নির্ভুলতা এবং প্রবেশযোগ্যতার মতো কিছু চ্যালেঞ্জ এখনো রয়ে গেছে, যা রুটিন স্বাস্থ্য

তথ্য ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য ডিজিটালাইজেশন এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে অব্যাহত বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তাকে নির্দেশ করে। চিত্র ৪-এ বাংলাদেশে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের (DGHS) ব্যবস্থাপনা তথ্য ব্যবস্থায় ব্যবহৃত প্রধান সফটওয়্যারগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে, যার মধ্যে DHIS২ সবচেয়ে বৃহৎ উপাদান।

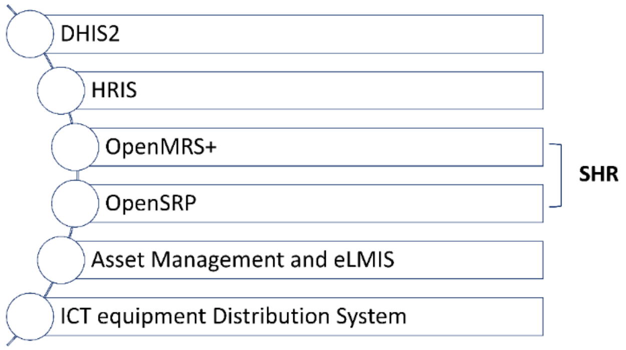

চিত্র ৪: বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনা তথ্য ব্যবস্থায় ব্যবহৃত মূল সফটওয়্যারসমূহ

এইচআরআইএস (HRIS): কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ তথ্য ব্যবস্থা (HRIS) বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের (MOHFW) একটি উদ্যোগ]৪]। এটি একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যা স্বাস্থ্য খাতে জনবলের তথ্য দক্ষতার সঙ্গে ব্যবস্থাপনার জন্য তৈরি। এই প্ল্যাটফর্মে কর্মীদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং কর্মদক্ষতা সংক্রান্ত বিশদ তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে, যা জনবল বণ্টন ও পরিকল্পনাকে ন্যায্য ও কার্যকর করতে সহায়তা করে।

OpenMRS: বাংলাদেশের সরকারী স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে খোলা উৎসভিত্তিক ইলেকট্রনিক মেডিকেল রেকর্ড সিস্টেম **OpenMRS** বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এটি দেশীয় প্রয়োজনে **OpenMRS+** রূপে কাস্টমাইজ করা হয়েছে, যেখানে **OpenELIS** (একটি ল্যাবরেটরি তথ্য ব্যবস্থা ও অতিরিক্ত মডিউলসমূহ (যেমন ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা, ইনপেশেন্ট, আউটপেশেন্ট, জরুরি সেবা, বিলিং, ও ফার্মেসি ব্যবস্থাপনা) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর ফলে সরকারী হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ব্যবস্থা উন্নত হয়। OpenMRS+ নির্দিষ্ট স্থান এবং কেন্দ্রীয় সেটআপ, উভয় ক্ষেত্রে দুর্বল ইন্টারনেট সংযোগযুক্ত এলাকায়ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করে।

OpenSRP: Open Smart Register Platform (OpenSRP) একটি ওপেন সোর্স ডিজিটাল স্বাস্থ্য তথ্যব্যবস্থা যা বাংলাদেশে **স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (DGHS)** কর্তৃক কমিউনিটি পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এটি ফ্রন্টলাইন স্বাস্থ্যকর্মীদের সহায়তা করে, রোগী ট্র্যাকিং, টিকাদান ব্যবস্থাপনা এবং মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ যা সংগে সংগে রোগীর স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ করে।

অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ও eLMIS: ইলেকট্রনিক অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (eAMS) এবং **ইলেকট্রনিক লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (eLMIS)**—এ দুটি প্ল্যাটফর্ম DGHS পরিচালিত, যা স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে ডিজিটালভাবে কাজ করে [৫,৬]। eAMS চিকিৎসা ও মেডিকেল-নন মেডিকেল অ্যাসেট ট্র্যাক করা, দক্ষ রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং বাতিল প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা ইত্যাদির ওপর বিশেষ মনোযোগ দেয়।

অপরপক্ষে, **eLMIS** জাতীয়, স্থানীয় এবং সেবা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে লজিস্টিক তথ্য মনিটর দ্বারা ঔষধ এবং অন্যান্য উপকরণের প্রাপ্যতা সম্পর্কে রিয়েল টাইম অন্তরদৃষ্টি দেয় এবং এর দ্বারা ক্রয় ও বিতরণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে।

আইসিটি সরঞ্জাম বণ্টন ব্যবস্থা: DGHS-এর আইসিটি সরঞ্জাম বণ্টন ব্যবস্থা একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, যা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে আইসিটি সরঞ্জাম সরবরাহ ও ট্র্যাকিং সহজ করে [৭]। DGHS-এর MIS ইউনিট-এর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এই সিস্টেম ব্যবহারকারীদের লগইন করে সরঞ্জাম চাওয়া ও তাদের অনুরোধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ দেয়। এটি সম্পদ বণ্টনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

DHIS২: District Health Information Software, version ২ বা (DHIS২): তথ্য সংগ্রহ, বৈধতা নিরূপণ, ব্যাখ্যা এবং উপস্থাপনার জন্য একটি রুটিন তথ্য উৎস হিসেবে কাজ করে সামগ্রিক পরিসংখ্যানগত তথ্য দান করে। এর মাধ্যমে তা স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সূচকগুলি নির্ণয় করতে পারে ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমগুলিকে সমন্বিত করে করতে পারে। ফলে এটি সেবাকেন্দ্রভিত্তিক তথ্যব্যবস্থাপনা ও দৃশ্যায়নের সুযোগ করে দেয়। স্বাস্থ্যসেবা ব্যবহারের তথ্য সংগ্রহ এবং সেবাকেন্দ্র পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য ২০০৯ সালে এটি বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা তথ্য ব্যবস্থায় যুক্ত হয়। তথ্যগুলো জাতীয় স্তর, প্রশাসনিক কাঠামো, সময়কাল, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং বিভিন্ন ডেটাসেট অনুযায়ী শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। বাংলাদেশে রুটিন স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা:

১. **ব্যবহারকারী ও সেবাকেন্দ্র:** ২০২৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ৩৭,০০০ এর বেশি ব্যবহারকারী রয়েছেন এবং হাসপাতাল ও ক্লিনিকসহ প্রায় ১৪,০০০ স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
তথ্যের ধরন: বর্তমানে ১১টি সার্ভার সক্রিয় রয়েছে। নিচে সার্ভারগুলোর তালিকা দেওয়া হলো:

- **DHIS২ কেন্দ্রীয় ডেটাবেইস:** উপজেলা ভিত্তিক সেবা প্রতিষ্ঠান এবং তদূর্ধ্ব প্রশাসনিক পর্যায়ে থেকে এই সার্ভার স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ এবং তার ব্যবস্থাপনা করে। এর দ্বারা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কর্মক্ষমতা মনিটরিং এবং কেন্দ্রীয় ব্যাখ্যার সামর্থ্য প্রদান করে ।
- **DHIS২ পেশেন্ট ট্র্যাকার:** ব্যক্তিগত রোগী তথ্য অনুসরণের জন্য ।
- **DHIS২ ইউনিয়ন ও নিচের স্তর:** ইউনিয়ন পর্যায়ের সেবাকেন্দ্র ও কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মীদের তথ্য ।
- **জাতীয় VPDs এবং AEFI-DHIS২-DGHS):** টিকায় প্রতিরোধযোগ্য রোগ ও টিকাজনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া (Adverse Events Following Immunization, AEFI) নজরদারি ।
- **জাতীয় জরায়ু ও স্তন ক্যান্সার নজরদারি সিস্টেম:** প্রাথমিক শনাক্তকরণ ও নীতিনির্ধারণে সহায়ক ।
- **জাতীয় কোভিড-১৯ নজরদারি সিস্টেম:** কোভিড সংক্রমণ পর্যবেক্ষণ ও প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা ।
- **DHIS২ FDMN (জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক** রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য তথ্য) ।
- **মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশুর টিকাদান ই:ট্র্যাকার-** মাতৃ ও শিশুর স্বাস্থ্য কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ।
- **EPI ক্যাম্পেইন ব্যবস্থাপনা সিস্টেম:** টিকাদান কার্যক্রম পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ ।
- **MR ক্যাম্পেইন ২০২০ সার্ভার:**
- জাতীয়ভিত্তিক হাম ও রুবেলা ক্যাম্পেইন তথ্য ব্যবস্থাপনায় এই সারভার ব্যবহৃত হয়েছিল যার ফলে দক্ষ রিপোর্টিং সম্ভব হয়েছে।
- **জাতীয় COVID-১৯ প্রশিক্ষণ সার্ভার:** স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য কোভিড নজরদারি সিস্টেমের সিমুলেশন।

DGHS-এর MIS দ্বারা সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী DHIS২ সিস্টেমে উপলব্ধ তথ্যের ধরন চিত্র ৪-এ দেখা যায়।

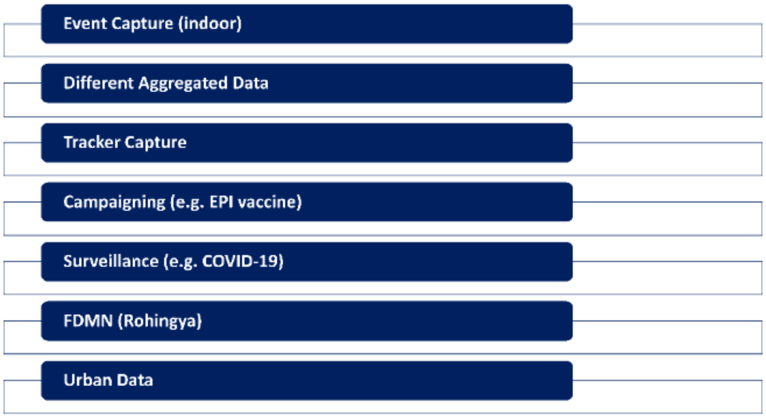

চিত্র ৫ : DHIS২ ভিত্তিক রুটিন স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা

সিস্টেমটি **ইভেন্ট ক্যাপচার ডেটাসেট** (এ ধরনের ৯টি ডেটাসেট অন্তর্ভুক্তএবং (**সমষ্টিগত ডেটাসেট** (মোট ১৪০টি ডেটাসেটের সমন্বয়ে গঠিতপরিচালনা করে। (. বাংলাদেশে, রুটিন ডেটাসেটগুলো নিয়মিতভাবে রোগী, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী এবং লজিস্টিক সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে, যা স্বাস্থ্যসেবা পর্যবেক্ষণ, সম্পদ পরিকল্পনা এবং কার্যকর সেবা প্রদানে সহায়তা করে।

বর্তমানে, **DHIS২ কেন্দ্রীয় সিস্টেমে** ৯৬টি সক্রিয় **সমষ্টিগত ডেটাসেট** চিহ্নিত হয়েছে, পাশাপাশি কিছু নিষ্ক্রিয় ডেটাসেটও রয়েছে (২।

সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য সার্ভারগুলিতে প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ।

বিভিন্ন সার্ভারে পৃথক ডেটাসেটগুলোর তালিকা তালিকা ৩-এ দেওয়া হয়েছে।

সিভিল রেজিস্ট্রেশন এবং ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস (CRVS): বাংলাদেশে সিভিল রেজিস্ট্রেশন এবং ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস (CRVS) সিস্টেম একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো যা জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ এবং মৃত্যুর কারণের মতো প্রধান জীবনের ঘটনা রেকর্ড করার জন্য ব্যবহৃত হয় [৯]। এর মধ্যে দত্তক গ্রহণ, অভিবাসন, এবং নিবন্ধন পরিসংখ্যানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা পূর্ণাঙ্গ জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ধারণা প্রদান করে। CRVS সিস্টেমটি DHIS২-এ একীভূত করা হয়েছে, যা মৃত্যু কারণের মতো স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার জন্য একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করে। এই সংযোগ তথ্যের প্রবাহ সহজতর করে এবং স্বাস্থ্য পরিকল্পনা ও নীতি উন্নয়নের জন্য প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সহায়ক করে।

ইলেকট্রনিক ব্যবস্থাপনা তথ্য সিস্টেম (eMIS–DGFP): বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের (DGFP) eMIS (ইলেকট্রনিক ব্যবস্থাপনা তথ্য সিস্টেম) একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, যার উদ্দেশ্য পরিবার পরিকল্পনা সেবার কার্যকারিতা এবং স্বচ্ছতা উন্নত করা। এটি বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ, পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্টিং সহজতর করে, যা সম্পদ বণ্টন এবং সেবা প্রদানকে আরও কার্যকর করে। সিস্টেমটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের রিয়েল-টাইম অ্যাক্সেস প্রদান করে, যা তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। চিত্র ৪ DGFP-এর eMIS-এর কার্যকারিতা প্রদর্শন করছে। কমিউনিটি পর্যায়ে ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট দ্বারা এবং সেবা কেন্দ্র পর্যায়ে ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ভিজিটর এবং সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার দ্বারাতথ্য সংগ্রহ করা হয়।

তালিকা ৩: DHIS২-এ পৃথক স্তরের ডেটাসেটগুলোর তালিকা

ক্রমিক নং	ডেটাসেটের নাম	সার্ভারের নাম
১	হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ (ইনডোর) রোগী	DHIS২ রোগী ট্র্যাকার
২	কালাজ্বর	DHIS২ রোগী ট্র্যাকার
৩	মৃত্যুর কারণের চিকিৎসা সনদ (এমসিসিওডি)	DHIS২ কেন্দ্রীয় ডেটাবেস
৪	কুকুরের কামড়	জাতীয় ভ্যাকসিন-প্রতিরোধযোগ্য রোগ (VPDs) ও টিকাজনিত প্রতিক্রিয়া (AEFI) নজরদারি প্রতিবেদন ব্যবস্থা
৫	এইচআইভি নিয়ে বেঁচে থাকা মানুষ	DHIS২ রোগী ট্র্যাকার
৬	মাতৃস্বাস্থ্য ট্র্যাকার	DHIS২ সিস্টেম (ইউনিয়ন স্তর ও নিচে – স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ও কমিউনিটি ফিল্ড কর্মী)
৭	শিশুস্বাস্থ্য ট্র্যাকার	DHIS২ সিস্টেম (ইউনিয়ন স্তর ও এর নিচে - স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহ ও কমিউনিটি মাঠকর্মীরা)
৮	এনআইডি সহ ব্যক্তিগত রোগী ট্র্যাকার	জাতীয় জরায়ু মুখ ও স্তন ক্যান্সার নজরদারি ব্যবস্থা
৯	ব্যক্তিগত রোগীর পজিটিভ ও নেগেটিভ পরীক্ষার ট্র্যাকার	জাতীয় কোভিড-১৯ নজরদারি ব্যবস্থা

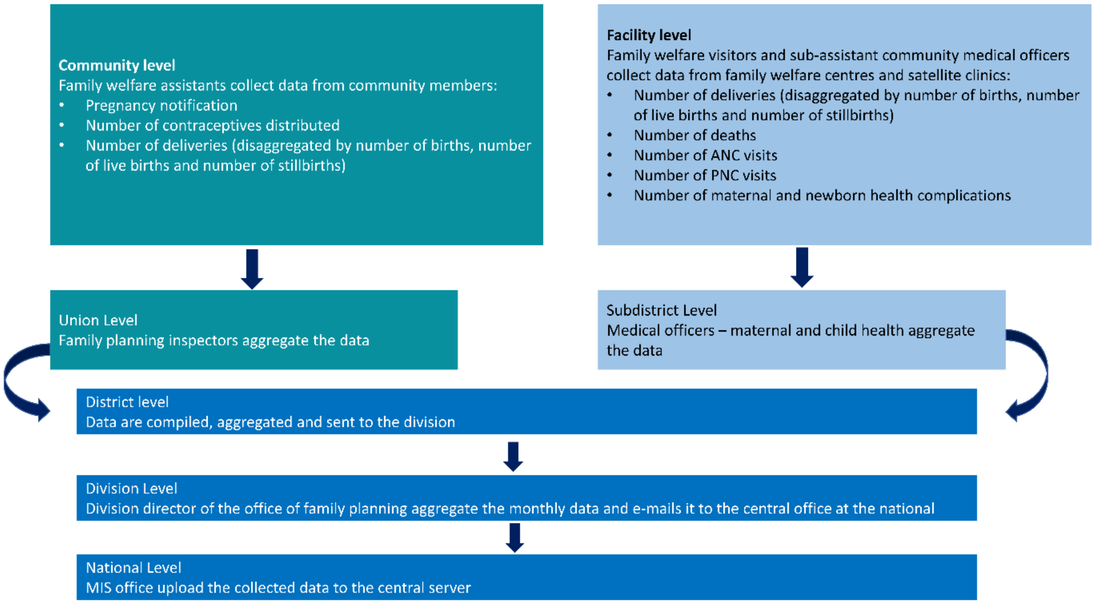

চিত্র ৬: (eMIS) DGFP-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে রুটিন স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা

তালিকা ৪: eMIS-এর বর্তমান ব্যবহারকারীর সংখ্যা]১০]।

প্রকৃতি	বিস্তারিত	**মান**
ব্যবহারকারী	পরিবার কল্যাণ সহকারী (এফডাব্লিউএ)	৬১৯২
	পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক (এফপিআই)	১৫২৩
স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (ইউএইচ অ্যান্ড এফডাব্লিউসি)	**১০০০+**
	পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক এবং উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (এফডাব্লিউভি ও স্যাকমো)	**১২৮৫**
তথ্য	নিবন্ধিত ব্যক্তি	১৬.৪ মিলিয়ন
	নিবন্ধিত দম্পতি	**২.৬ মিলিয়ন**

রুটিন-বহিঃস্থ তথ্যসূত্র

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কেন্দ্র বিষয়ক জরিপ: বাংলাদেশ বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের জরিপ পরিচালনা করে, যার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন এলাকায় স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা, প্রস্তুতি এবং মান মূল্যায়ন করা হয়। এই জরিপগুলি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে এবং সেবা প্রদানে, অবকাঠামো এবং সম্পদ বণ্টনে উন্নতি করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে।

সবচেয়ে প্রচলিত জরিপগুলোর মধ্যে একটি হলো **বাংলাদেশ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র জরিপ (BHFS)**, যা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ পপুলেশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (NIPORT) দ্বারা ইউএসএআইডি এবং icddr,b-এর সহায়তায় সময়ে সময়ে পরিচালিত হয় [১১]। BHFS জরিপটি অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবা সেবার প্রাপ্যতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে, যেমন মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পুষ্টি এবং অবহিত রোগ যেমন ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের ব্যবস্থাপনা। এটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলির প্রস্তুতিও মূল্যায়ন করে, যেমন অবকাঠামো, সরঞ্জাম, কর্মী, এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ ও সরঞ্জামের প্রাপ্যতা।

এই জরিপটি সেবার প্রস্তুতি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করে, যেমন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলির মাতৃ ও নবজাতক যত্ন, টিকাদান সেবা এবং যক্ষ্মার চিকিৎসা প্রদান করার ক্ষমতা। এটি সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ল্যাবরেটরি সেবার প্রাপ্যতাও পরীক্ষা করে। এই তথ্যগুলো স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে ঘাটতি চিহ্নিত করতে এবং উন্নতির জন্য ক্ষেত্রগুলো নির্ধারণ করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

BHFS-এর পাশাপাশি, অন্যান্য সেবা কেন্দ্রভিত্তিক মূল্যায়নগুলি বিশেষ স্বাস্থ্য কর্মসূচী বা অঞ্চলগুলিতে মনোযোগ দেয়। বিশেষ মূল্যায়নগুলি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলির জরুরি পরিস্থিতি বা মহামারী পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি মূল্যায়ন করে। এসব জরিপে রোগী সন্তুষ্টি, কর্মী প্রশিক্ষণ এবং স্বাস্থ্য তথ্য সিস্টেমের একীভূতকরণের উপরও তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে।

জনসংখ্যা স্তরের তথ্য: বাংলাদেশ প্রতি দশ বছরে বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস-এর নেতৃত্বে জনগণনা (সেনসাস) পরিচালনা করে [১২]। এ ছাড়াও বাংলাদেশ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরিবারভিত্তিক জরিপ পরিচালনা করে, যা জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্যতা এবং জনসংখ্যাতাত্ত্বিক প্রবণতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে। এই জরিপগুলি জনসংখ্যার স্বাস্থ্য অবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান ধারণা প্রদান করে, যা নীতিনির্ধারক এবং গবেষকদের স্বাস্থ্য সঙ্কট মোকাবেলা করতে এবং স্বাস্থ্য ফলাফল উন্নত করতে সহায়তা করে।

এমন একটি জরিপ হলো বাংলাদেশ জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য জরিপ (BDHS) [১৩], যা সময় সময় পরিচালিত হয়। BDHS জরিপটি বন্ধ্যাত্ব, পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং সংক্রামক রোগ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। এটি মৃত্যুহার সম্পর্কিত তথ্যও প্রদান করে, যেমন নবজাতক, শিশু এবং পাঁচ বছরের নিচে মৃত্যুহার, পাশাপাশি টিকাদান কভারেজ এবং স্তন্যপান চর্চার তথ্য। জরিপটি পরিবারভিত্তিক তথ্য, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার এবং বায়োমার্কার মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত করে, যা স্বাস্থ্য সূচকের একটি বিস্তৃত দৃশ্য প্রদান করে। এই জরিপগুলি মার্কিন সরকারের ইউএসএআইডি নিষেধাজ্ঞার কারণে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিছু মূল কভারেজ সূচক আপডেট করার জন্য **এসেনসিয়াল সার্ভিস ডেলিভারি (UESD)**-ও পরিচালনা করা হয়।

মাল্টিপল ইনডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে (MICS) [১৪], যা ইউনিসেফ দ্বারা পরিচালিত, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং পুষ্টির উপর ফোকাস করে। এটি শিশু মৃত্যুহার, অপুষ্টি, টিকাদান, এবং পরিষ্কার পানি ও স্যানিটেশন প্রাপ্যতা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। MICS বিশেষত বৈশ্বিক স্বাস্থ্য লক্ষ্যগুলোর দিকে অগ্রগতি ট্র্যাক করতে সহায়ক, যেমন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs)।

অন্যান্য বিশেষায়িত জরিপের মধ্যে **বাংলাদেশ শহরে স্বাস্থ্য জরিপ (BUHS)** রয়েছে, যা শহরাঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিস্থিতি এবং সেবা প্রদান মূল্যায়ন করে, এবং **বাংলাদেশ পুষ্টি জরিপ**, যা খাদ্যাভ্যাস, পুষ্টির অবস্থা এবং খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে ফোকাস করে। রোগ বিশেষ জরিপগুলি, যেমন যক্ষ্মা প্রাদুর্ভাব জরিপ এবং HIV/AIDS মূল্যায়ন, নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য সঙ্কট মোকাবেলা করার জন্য লক্ষ্যভিত্তিক তথ্য প্রদান করে [১৫]।

এছাড়াও, **বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যু ও স্বাস্থ্যসেবা জরিপ (BMMS)** একটি জাতীয় প্রতিনিধিত্বকারী জরিপ, যা **জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT)** এর অধীনে পরিচালিত হয়। এই জরিপটি পরিবারের এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের বৈশিষ্ট্য, মাতৃমৃত্যু অনুপাত (MMR), মাতৃমৃত্যুর কারণ, প্রসবকালীন যত্ন, মাতৃস্বাস্থ্য সমস্যা ও চিকিৎসার সন্ধান প্রক্রিয়া, প্রজনন ক্ষমতা, পরিবার পরিকল্পনা, এবং শিশু মৃত্যুহার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। BMMS পরিবারভিত্তিক সাক্ষাৎকার এবং মৌখিক আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে মৃত্যুর কারণ নির্ধারণ করে, যা দেশে মাতৃস্বাস্থ্য সম্পর্কিত একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

এই পরিবারভিত্তিক জরিপগুলি একত্রে অনেক মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করে, যার মধ্যে রয়েছে সামাজিক-অর্থনৈতিক উপাদান, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবহার, রোগের প্রাদুর্ভাব এবং স্বাস্থ্য ফলাফল। তারা স্বাস্থ্য অসমতা চিহ্নিত করতে, অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে এবং সম্পদ বণ্টন পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব জরিপের তথ্য একত্রিত করে, বাংলাদেশ প্রমাণভিত্তিক নীতি ও হস্তক্ষেপ তৈরি করতে সক্ষম হতে পারে, যা জনস্বাস্থ্য উন্নত করতে এবং ন্যায্য স্বাস্থ্য ফলাফল অর্জন করতে সহায়তা করবে।

জনস্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ / সার্ভেল্যান্স

বাংলাদেশ বিভিন্ন স্বাস্থ্য এবং জনসংখ্যা পর্যবেক্ষণ সাইট স্থাপন করেছে, যা দেশব্যাপী বিভিন্ন জনগণের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য প্রবণতা এবং জনসংখ্যাগত পরিবর্তনগুলি পর্যবেক্ষণ করতে সাহায্য করে। এই সাইটগুলি মৃত্যুহার, প্রজনন হার, অভিবাসন এবং স্বাস্থ্যসেবা ব্যবহারের তথ্য সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা প্রমাণভিত্তিক নীতি উন্নয়ন এবং সম্পদ বণ্টনে সাহায্য করে।

স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (SVRS), যা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো দ্বারা পরিচালিত, এটি জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির তথ্য সংগ্রহ করে যেমন জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, অভিবাসন এবং প্রতিবন্ধিতা [১৬]। এটি মৃত্যুহারের বার্ষিক আনুমানিক হিসাব, জীবনকাল, এবং মৃত্যুর কারণ প্রদান করে, যা জনসংখ্যা এবং স্বাস্থ্য পরিকল্পনায় সাহায্য করে।

মাতলাব স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা পর্যবেক্ষণ সিস্টেম, যা ১৯৬৬ সাল থেকে চাঁদপুরে কার্যক্রম পরিচালনা করছে, এটি অন্যতম পুরনো এবং সর্বাধিক বিস্তৃত সিস্টেম। এটি ২৪০,০০০ ব্যক্তির একটি গ্রামীণ জনগণ পর্যবেক্ষণ করে, যারা ৫৭,০০০ পরিবারে বসবাস করে, প্রতি তিন মাস পর পর স্বাস্থ্য এবং জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্য আপডেট করা হয় [১৭]।

বালিয়াকান্দি জনসংখ্যা পর্যবেক্ষণ সিস্টেম, যা ২০১৭ সালে শুরু হয়, এটি রাজবাড়ির ২২৫,৯১২ জন গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্য এবং জনসংখ্যা পর্যবেক্ষণ করে, যা প্রতি দুই মাস পর পর পরিবারের সফর করা হয় [১৭]।

চকরিয়া স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা পর্যবেক্ষণ সিস্টেম, যা ২০০৪ সালে কক্সবাজারে স্থাপিত হয়, এটি ৮৭,০০০ ব্যক্তির স্বাস্থ্য এবং জনসংখ্যা তথ্য আপডেট করে, যারা গ্রামীণ এবং উপকূলীয় এলাকার বাসিন্দা, এবং প্রতি তিন মাস পর পর সফর করা হয় [১৭]।

মির্জাপুর জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ সিস্টেম টাঙ্গাইলের ৩০০,৮১৬ শহুরে বাসিন্দার তথ্য সংগ্রহ করে, যা ২০০৭ সাল থেকে প্রতি ৪ মাস পর পর পরিবারে সফর করে সংগ্রহ করা হয়। ঢাকা শহরে, **নগর স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা পর্যবেক্ষণ সিস্টেম** ১,২২,০০০ মানুষের তথ্য সংগ্রহ করে, যার মধ্যে বস্তির বাসিন্দাও অন্তর্ভুক্ত, এবং প্রতি তিন মাস পর পর তথ্য আপডেট করা হয় [১৮]।

শ্বাসতন্ত্র সংক্রমণ (Severe Acute Respiratory Infections - SARI) পর্যবেক্ষণসহ অন্যান্য ছোট আকারের পর্যবেক্ষণ সাইট রয়েছে, যা রোগের প্রবণতা ট্র্যাক করে এবং মহামারী শনাক্ত করতে সাহায্য করে। এই সিস্টেমটি রোগীদের থেকে নমুনা সংগ্রহ করে ভাইরাল প্যাথোজেন চিহ্নিত করতে সহায়তা করে।

এছাড়া, **ইন্সটিটিউট অফ এপিডেমিওলজি, ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ (IEDCR)** বাংলাদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ প্রোগ্রাম পরিচালনা করে। এর মধ্যে রয়েছে **কমিউনিটি-বেসড সার্ভেইল্যান্স (CBS)**, যা ইনফ্লুয়েঞ্জা জাতীয় অসুস্থতা (ILI), তীব্র পানিযুক্ত ডায়রিয়া (AWD), তীব্র জন্ডিস সিনড্রোম (AJS), সন্দেহভাজন ডেঙ্গু জ্বর, এবং অন্যান্য অস্বাভাবিক স্বাস্থ্য ঘটনাগুলির প্রাথমিক সনাক্তকরণ এবং প্রতিক্রিয়া দেখার উপর ফোকাস করে। এছাড়া, IEDCR **ক্লাইমেট-ইনফর্মড ডিজিজ সার্ভেইল্যান্স অ্যান্ড আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম** পরিচালনা করে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে রোগের পর্যবেক্ষণ এবং প্রস্তুতি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করে।

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য তথ্য সিস্টেমের চ্যালেঞ্জসমূহ

রুটিন বহিঃস্থ তথ্যসূত্রের চ্যালেঞ্জ

DHIS২-এর চ্যালেঞ্জ ও দুর্বলতা: DHIS২-এর কিছু শক্তি থাকলেও, এটি কার্যকারিতার ক্ষেত্রে একাধিক সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হয়। একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো তথ্যের মান [৩]। যদিও DHIS২ বড় আকারের তথ্য সংগ্রহে সক্ষম, তবুও এই তথ্যের সঠিকতা, পূর্ণতা, এবং সময়োপযোগিতা নিশ্চিত করা একটি চলমান সমস্যা। অনেক ক্ষেত্রে, তথ্যের প্রবেশের ভুল, অসঙ্গত রিপোর্টিং ফরম্যাট, এবং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলির মধ্যে মানের অভাব তথ্যের নির্ভরযোগ্যতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। DHIS২ থেকে প্রাপ্ত কভারেজ অনুমান কখনও কখনও তথ্যের সঠিকতা এবং পূর্ণতার সীমাবদ্ধতার কারণে প্রকৃত সংখ্যা থেকে কম বা বেশি হতে পারে। এছাড়া, ব্যবহারকারীদের মধ্যে সীমিত প্রযুক্তিগত সক্ষমতা একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। অনেক স্বাস্থ্যকর্মী এবং তথ্য ব্যবস্থাপক যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাবে DHIS২ ব্যবহারে সমস্যা সম্মুখীন হন, যার ফলে সিস্টেমের কার্যকারিতা কমে যায় এবং প্রযুক্তিগত সমস্যা সমাধানে অক্ষমতা দেখা দেয় [১৯]।

আরেকটি সীমাবদ্ধতা হলো DHIS২ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য তথ্য সিস্টেমের মধ্যে আন্তঃসংযোগের অভাব। যদিও এই প্ল্যাটফর্মটি অভিযোজনযোগ্য হতে ডিজাইন করা হয়েছে, তবে এটি অন্য সিস্টেম বা ডাটাবেসের সঙ্গে একীভূত করা জটিল এবং সম্পদ-ভিত্তিক হতে পারে [২০]। এই কারণে বিভক্ত ডেটা সাইলোস সৃষ্টি হয়, যা বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্য তথ্যের একক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনকে চ্যালেঞ্জ করে। এছাড়া, DHIS২ সিস্টেমটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলির মধ্যে একক রোগীর তথ্য ট্র্যাক করতে সক্ষম নয়। DHIS২ মূলত প্রোগ্রামগত স্তরে তথ্য সংগ্রহের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যেমন সেবা প্রদান পরিসংখ্যান এবং স্বাস্থ্য সূচক, তবে এটি রোগীর চিকিৎসা চলমান রাখতে বিস্তারিত ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করতে সক্ষম নয়।

DHIS২-এর দ্বারা তৈরি তথ্যের অপব্যবহার একটি বড় সমস্যা [৩]। যদিও প্ল্যাটফর্মটি বিস্তৃত স্বাস্থ্য পরিসংখ্যান উৎপন্ন করতে সক্ষম, তথাপি সেগুলি প্রাযুক্তিক বা নীতি তৈরিতে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয় না। এজন্য একটি ব্যবহারকারী-বান্ধব ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন টুলসের অভাব এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকদের মধ্যে তথ্য বিশ্লেষণের সীমিত ক্ষমতা দায়ী। DHIS২-এর সঙ্গে সম্পর্কিত গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা বিষয়গুলি উপেক্ষা করা যায় না [২০]। যেহেতু এই প্ল্যাটফর্মটি সংবেদনশীল স্বাস্থ্য তথ্য পরিচালনা করে, সুতরাং তথ্য সুরক্ষা এবং গোপনীয়তা বিধিমালা মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি। তবে কিছু পরিবেশে, সুরক্ষা ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত এবং তথ্য সুরক্ষা প্রোটোকল সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে সিস্টেমটি তথ্য ফাঁস এবং অনুমোদনহীন প্রবেশের ঝুঁকির সম্মুখীন হয়।

eMIS-এর চ্যালেঞ্জ: eMIS-এর প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো ব্যবহারকারীদের মধ্যে প্রযুক্তিগত সক্ষমতার অভাব, বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ে, যেখানে স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার অভাবে সিস্টেম পরিচালনায় সমস্যার সম্মুখীন হন [২২]। এর ফলে প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার কম হয় এবং তথ্য প্রবেশে ভুল হয়। এছাড়া, eMIS-এর অবকাঠামো নির্ভরতা একটি সীমাবদ্ধতা। এটি নির্ভরশীল একটি ভালো ইন্টারনেট সংযোগ এবং যথেষ্ট হার্ডওয়্যারের ওপর [২২]। গ্রামীণ এবং দুর্গম এলাকাগুলিতে যেখানে এসব অবকাঠামো প্রায়শই নেই, সিস্টেমের কার্যকারিতা খুবই সীমিত থাকে। ডেটা একীভূতকরণ এবং আন্তঃসংযোগের সমস্যা এখনও বিদ্যমান। যদিও eMIS মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে, তবে এটি DHIS২-এর মতো অন্যান্য স্বাস্থ্য তথ্য সিস্টেমের সঙ্গে একীভূত করা জটিল এবং সম্পদসাপেক্ষ, যার ফলে ডেটা ব্যবহারে অদক্ষতা সৃষ্টি হয় [১০]।

eMIS-এর টেকসই ক্ষমতা একটি চিন্তার বিষয়, কারণ এর বাস্তবায়ন অনেকাংশে বাহ্যিক তহবিল এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। দীর্ঘমেয়াদী টেকসইতা নিশ্চিত করতে সক্ষমতা বৃদ্ধি, হার্ডওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ, এবং সফটওয়্যার আপডেটের জন্য ব্যাপক বিনিয়োগ প্রয়োজন, যা সম্পদ-সীমাবদ্ধ পরিবেশে চ্যালেঞ্জ হতে পারে। এছাড়া, eMIS দ্বারা উৎপন্ন তথ্যের অপব্যবহার একটি গুরুতর সমস্যা, কারণ এই তথ্যগুলি অনেক সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নীতি প্রণয়নে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয় না। সীমিত বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং ব্যবহারকারী-বান্ধব ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন টুলসের অভাব এ অপব্যবহারের কারণ হিসেবে কাজ করে।

b. নন-রুটিন বহিঃস্থ তথ্যসূত্রের চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে জরিপ এবং পর্যবেক্ষণের বাস্তবায়ন বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। একটি প্রধান সমস্যা হলো তথ্যের সঠিকতা, কারণ জরিপগুলি প্রায়ই স্মৃতির ওপর নির্ভর করে এবং দূরবর্তী বা দুর্গম এলাকায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে, যার ফলে রিপোর্টের অভাব বা তথ্য হারানো সম্ভব হয়। বিভিন্ন সংস্থা যেগুলি জরিপ পরিচালনা করে, তাদের মধ্যে মানসম্মত পদ্ধতির অভাব থাকতে পারে, যা অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করে এবং ফলাফলগুলির তুলনা বা একীভূত করা কঠিন করে তোলে। এছাড়াও, সীমিত প্রযুক্তিগত অবকাঠামো তথ্য সংগ্রহে প্রভাব ফেলে, কারণ এখনও অনেক জায়গায় ম্যানুয়াল পদ্ধতিগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যা কার্যকারিতা কমিয়ে দেয় এবং ত্রুটির ঝুঁকি বাড়ায়। সম্পদ সঙ্কট, যেমন অর্থায়ন সংকট এবং প্রশিক্ষিত জনশক্তির অভাব, জরিপের কার্যকারিতা আরও বাধাগ্রস্ত করে, জাতীয় স্তরের গবেষণার পরিধি এবং ফ্রিকোয়েন্সি সীমিত করে। অংশগ্রহণকারীদের সহযোগিতা এবং সচেতনতা ও একটি চ্যালেঞ্জ, কারণ জরিপের বিষয়ে ভুল ধারণা বা অবিশ্বাসের কারণে সঠিক উত্তর প্রদানে অনীহা দেখা দিতে পারে, বিশেষত সংবেদনশীল স্বাস্থ্য বা সামাজিক বিষয়গুলির ক্ষেত্রে। ভাষা এবং সাক্ষরতার প্রতিবন্ধকতা ভুল বোঝাবুঝি বা অসম্পূর্ণ উত্তর প্রদান করতে সহায়ক হতে পারে, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় যেখানে জরিপের উপকরণ যথাযথভাবে অনুবাদ বা স্থানীয় উপভাষায় অভিযোজিত হয়নি। তাছাড়া, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ, যেমন অনুমোদন প্রাপ্তিতে দেরি, ব্যুরোক্র্যাটিক অকার্যকারিতা, বা সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, প্রায়ই সঠিক বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করে। এছাড়াও, তথ্যের নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তার উদ্বেগ ক্রমাগত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, কারণ ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা এবং নৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করা জরিপ

গবেষণার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। শেষকথা, দীর্ঘ সময় ধরে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাওয়া ব্যবস্থাপনা এবং অর্থায়নের দিক থেকে একটি চ্যালেঞ্জ হতে পারে।

স্বাস্থ্য তথ্য সিস্টেম কর্মক্ষমতা সূচক (HISPIX) বাংলাদেশ অবস্থান

WHO একটি স্বাস্থ্য তথ্য সিস্টেম কর্মক্ষমতা সূচক (HISPIX) প্রস্তাব করছে, যা ২৭টি মানক সূচক ভিত্তিক একটি সারাংশ পরিমাপ যা তথ্যের গুণমান এবং স্বাস্থ্য তথ্য সিস্টেমের সামগ্রিক কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয় [২]। এই HISPIX সূচকে মোট ৩০টি স্কোর রয়েছে, যা পাবলিক ডোমেইনে উপলব্ধ তথ্য থেকে হিসাব করা হয় এবং এটি সময়ের সাথে এবং দেশগুলির মধ্যে উদ্দেশ্যপূর্ণতা এবং তুলনাযোগ্যতা উন্নত করতে সহায়তা করে। HISPIX সূচকের মধ্যে বাংলাদেশ ৩০টির মধ্যে ১৫টি স্কোর পেয়েছে (১০০-এর মধ্যে ৫০)। এই পদ্ধতির সুবিধা হলো, এটি দেশগুলো এবং উন্নয়ন অংশীদারদের স্বাস্থ্য তথ্য সিস্টেম শক্তিশালীকরণের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে উন্নতির জন্য মূল ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। ছক ৬- পরিশিষ্ট .....)

HISPIX বাংলাদেশের স্বাস্থ্য তথ্য সিস্টেমের মূল্যায়ন

HISPIX বিভিন্ন ডোমেইনের মধ্যে স্বাস্থ্য তথ্য সিস্টেমগুলি মূল্যায়ন করে। আমাদের মূল্যায়ন অনুযায়ী, বাংলাদেশ ৩০ এর মধ্যে মোট ১৫ স্কোর (অথবা ১০০ এর মধ্যে ৫০) পেয়েছে। এই ডোমেইনগুলির মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য জরিপ, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, জনগণনা, স্বাস্থ্য সুবিধা রিপোর্টিং, স্বাস্থ্য সিস্টেম রিসোর্স ট্র্যাকিং এবং তথ্য বিশ্লেষণ ও যাচাইকরণের সক্ষমতা। নীচে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য তথ্য সিস্টেমের কর্মক্ষমতার একটি সারাংশ দেওয়া হলো:

১. **স্বাস্থ্য জরিপ**: মাঝারি কর্মক্ষমতা, যেখানে শিশু ও মাতৃমৃত্যু, মূল স্বাস্থ্য হস্তক্ষেপের কভারেজ এবং ধূমপান/পুষ্টির অবস্থা সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তবে, কোনও বিস্তৃত ১০ বছরের ব্যয়সমূহ ভিত্তিক জরিপ পরিকল্পনা নেই (স্কোর: ৪/৫)।

২. **জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন**: মাঝারি জন্ম নিবন্ধন হলেও মৃত্যু নিবন্ধন এবং ICD-১০ ব্যবহার করে মৃত্যুর কারণ রিপোর্টিংয়ে কম পারফরম্যান্স (স্কোর: ১/৬)।

৩. **জনগণনা**: শক্তিশালী কর্মক্ষমতা, সাম্প্রতিক জনগণনা সম্পন্ন এবং জনসংখ্যার পূর্বাভাস পাওয়া গেছে (স্কোর: ২/২)।

৪. **স্বাস্থ্য সুবিধা রিপোর্টিং**: প্রতিষ্ঠানিক প্রসব, HIV প্রবণতা, এবং রোগ নোটিফিকেশনে দুর্বল পারফরম্যান্স। যথাযথ, ওয়েব-ভিত্তিক জেলা রিপোর্ট এবং তথ্যের গুণগত মান মূল্যায়ন সমস্যা রয়ে গেছে (স্কোর: ২/৭)।

৫. **স্বাস্থ্য সিস্টেম রিসোর্স ট্র্যাকিং**: উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি, যেখানে জাতীয় ডাটাবেসগুলি স্বাস্থ্য সুবিধা, কর্মী, এবং ট্রেসার ঔষধগুলি ট্র্যাক করছে, পাশাপাশি সাম্প্রতিক স্বাস্থ্য হিসাব কার্যক্রম (স্কোর: ৪/৪)।

৬. **তথ্য বিশ্লেষণ ও যাচাইকরণের সক্ষমতা**: নিম্ন পারফরম্যান্স, যেখানে তথ্য সংশ্লেষণ, সমন্বয় এবং স্বাস্থ্য পরিসংখ্যান যাচাইকরণের জন্য কিছু মেকানিজম রয়েছে। কিছু প্রচেষ্টা রোগের বোঝা গবেষণা এবং জাতীয় সূচক সেটে লক্ষ্য করা গেছে (স্কোর: ২/৬)।

বাংলাদেশের জন্য স্বাস্থ্য তথ্য সিস্টেম (HIS) সংস্কার সুপারিশসমূহ

বাংলাদেশের বিদ্যমান স্বাস্থ্য তথ্য সিস্টেম (HIS) বিভক্ত, দীর্ঘকালীনভাবে অপ্রতুল অর্থায়িত এবং বাহ্যিক প্রযুক্তি ও দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল। এই বিভাজন আমাদের সমান, কার্যকর এবং রোগী-কেন্দ্রিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সক্ষমতাকে দুর্বল করে। এটি স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং আমাদের জাতীয় নিরাপত্তাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

HIS সংস্কার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে আমরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক যত্ন এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্য কভারেজ (UHC)-এর লক্ষ্য অর্জন করতে পারি। একটি পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল রূপান্তরের তাড়াতাড়ি প্রয়োজন, যা তথ্য-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করবে, তথ্য ও ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করবে এবং প্রতিটি নাগরিকের জন্য সমান স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করবে, বিশেষত সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগণের জন্য। স্থানীয় সক্ষমতা এবং প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করে, আমরা একটি টেকসই এবং প্রতিক্রিয়া প্রদানকারী HIS গড়ে তুলতে পারি, যা আমাদের অনন্য জাতীয় প্রেক্ষাপট এবং স্বাস্থ্যসেবা চ্যালেঞ্জগুলোকে সঠিকভাবে সমাধান করবে।

আমরা ২০টি আন্তঃসংযুক্ত সুপারিশ উপস্থাপন করছি, যা চারটি মৌলিক স্তম্ভের মাধ্যমে গভীর-জাতীয় প্রাচীরগুলি সমাধান করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে:

১. নীতি, আইন এবং শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি

২. মূল ডিজিটাল অবকাঠামো

৩. তথ্য বুদ্ধিমত্তা

৪. ক্ষমতা এবং অন্তর্ভুক্তি

এই সুপারিশগুলি বাস্তবায়ন করলে বাংলাদেশের HIS যথেষ্ট পরিবর্তিত হবে, যা আরও একীভূত, দৃঢ় এবং প্রতিক্রিয়া প্রদানকারী হবে। এই রূপান্তর সরাসরি UHC অর্জন, ন্যায়বিচার বৃদ্ধি, রোগী অভিজ্ঞতা উন্নত এবং বাংলাদেশকে উদ্ভাবনী, সার্বভৌম ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবায় নেতৃস্থানীয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

স্তম্ভ ১: নীতি, আইন এবং শাসন ব্যবস্থা

১. **স্বাস্থ্য তথ্যকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক সম্পদ এবং জাতীয় নিরাপত্তা উদ্বেগ হিসেবে স্বীকৃতি দিন এবং জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করুন**

বাংলাদেশের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে স্বাস্থ্য তথ্য সিস্টেম (HIS) কে জাতীয় নিরাপত্তার একটি বিষয় এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক সম্পদ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। স্বাস্থ্য তথ্যের সেবা ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় নীতির সর্বোচ্চ স্তরে স্বাস্থ্য তথ্যের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা হবে, যা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য স্থাপন করবে: শক্তিশালী ডিজিটাল অবকাঠামো নির্মাণ, কার্যকর আন্তঃমন্ত্রনালয় সমন্বয় নিশ্চিত করা এবং যথাযথ কৌশলগত বিনিয়োগ সংগ্রহ করা। উন্নত এবং একীভূত HIS সমাধানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যা দেশীয় প্রকৌশলী এবং আইটি বিশেষজ্ঞরা তৈরি করবেন, যা সার্বভৌমত্ব, বিভাজন এবং বিস্তৃততার সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলো সুনির্দিষ্টভাবে সমাধান করবে। দেশে দক্ষতা এবং উদ্ভাবনে বিনিয়োগ করলে বাংলাদেশ একটি টেকসই এবং প্রতিক্রিয়াক্ষম HIS গড়ে তুলতে সক্ষম হবে, যা জাতীয় প্রেক্ষাপটের জন্য বিশেষভাবে তৈরি হবে এবং স্বাস্থ্য সিস্টেমের স্বায়ত্তশাসন এবং প্রস্তুতি শক্তিশালী করবে।

২. **স্বাস্থ্য তথ্য সিস্টেমের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ কৌশল তৈরি করুন, যা সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজেশন জন্য একটি সময়সীমাবদ্ধ রোডম্যাপ অন্তর্ভুক্ত করবে**

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সিস্টেমের সম্পূর্ণ ডিজিটাল রূপান্তরের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় কৌশল এবং শাসন কাঠামো তৈরি করুন, যা একটি পরিষ্কার, সময়সীমাবদ্ধ বাস্তবায়ন রোডম্যাপ দ্বারা সমর্থিত হবে।

জাতীয় স্বাস্থ্য তথ্য কৌশলটি স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, ব্যবস্থাপনা এবং মনিটরিং ডিজিটাইজ করার জন্য একটি জাতীয় ভিশন উপস্থাপন করবে, যা প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং তৃতীয় স্তরের সমস্ত স্তরের যত্ন এবং সকল ধরনের স্বাস্থ্য সুবিধা, যেমন সরকারি, বেসরকারি এবং এনজিও পরিচালিত সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করবে। এটি সামনের সারির সেবা ইন্টারফেসগুলি, যেমন ব্যবহারকারী-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য নিবন্ধন, পরামর্শ, পরীক্ষা এবং চিকিৎসা, এবং ব্যাকএন্ড তথ্য অবকাঠামো, যেমন নিরাপদ ডাটাবেস, একীভূত তথ্যবিদ্যা এবং শক্তিশালী তথ্য বিনিময় মেকানিজম সম্বন্ধে সমাধান প্রদান করবে।

একই সংগে তা একটি জাতীয় স্বাস্থ্য ডেটা শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হবে, যা তথ্য উৎপাদক, রক্ষক, ব্যবহারকারী এবং নিয়ন্ত্রকদের জন্য পরিষ্কার দায়িত্ব এবং জবাবদিহি ব্যবস্থা নির্ধারণ করবে। এটি স্বাস্থ্য তথ্যের নিরাপদ এবং নিরবচ্ছিন্ন শেয়ারিং সক্ষম করবে, স্বাস্থ্য তথ্যের স্বচ্ছ এবং নৈতিক ব্যবহারকে উৎসাহিত করবে এবং প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিশ্বাস তৈরি করবে। এটি জাতীয় তথ্য শাসন নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে এবং সিভিল রেজিস্ট্রেশন এবং ভায়টাল স্ট্যাটিস্টিক্স (CRVS) এবং স্যাম্পল ভায়টাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (SVRS) এর মতো সিস্টেমগুলির সাথে আন্ত:সংযোগ নিশ্চিত করার জন্য প্রোটোকল অন্তর্ভুক্ত করবে।

৩. স্বাস্থ্য তথ্য সুরক্ষা আইন প্রবর্তন করুন, যা গোপনীয়তা, সাইবার নিরাপত্তা এবং রোগীর অধিকার সুরক্ষিত করবে

স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, অ্যাক্সেস, ব্যবহার এবং শেয়ারিংয়ের জন্য একটি স্পষ্ট এবং কার্যকর আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি স্বাস্থ্যখাত তথ্য সুরক্ষা আইন প্রবর্তন করুন। এই আইনটি বিশ্বব্যাপী সেরা প্রথাগুলি অনুসরণ করবে—যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়নের জেনারেল ডেটা প্রটেকশন রেগুলেশন (GDPR), OECD-এর স্বাস্থ্য তথ্য শাসন সংক্রান্ত সুপারিশ, এবং WHO-এর তথ্য নীতিমালা—তবে এটি বাংলাদেশ-এর আইনগত, প্রযুক্তিগত এবং প্রতিষ্ঠানগত প্রেক্ষাপটে ভিত্তি স্থাপন করবে। আইনটি রোগীর সম্মতি, তথ্য অ্যাক্সেস অধিকার, তথ্য শেয়ারিং প্রটোকল, লঙ্ঘনের নোটিফিকেশন, প্রতিকার ব্যবস্থা এবং লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা প্রভৃতি পরিষ্কার বিধান অন্তর্ভুক্ত করবে। এটি ভবিষ্যতের প্রযুক্তি যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ব্লকচেইন, এবং উন্নত বিশ্লেষণ সমর্থন করার জন্য প্রস্তুত হবে, যা স্বাস্থ্য তথ্য ইকোসিস্টেমে দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা, দায়বদ্ধতা এবং জনগণের আস্থা নিশ্চিত করবে।

৪. স্বাস্থ্য তথ্য সিস্টেমের শাসন ব্যবস্থাপনার জন্য একটি জাতীয় স্বাস্থ্য তথ্য কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করুন

স্বাস্থ্য তথ্য সিস্টেমের শাসন ব্যবস্থাপনা এবং কৌশলগত তত্ত্বাবধানে একটি স্বাধীন নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ হিসেবে জাতীয় স্বাস্থ্য তথ্য কাউন্সিল (NHIC) প্রতিষ্ঠা করুন। NHIC-কে জাতীয় তথ্য মান তৈরি এবং কার্যকর করতে, স্বাস্থ্য আইটি সিস্টেমগুলোকে অনুমোদন দিতে, কমপ্লায়েন্স মনিটর করতে এবং স্বাস্থ্য এবং অস্বাস্থ্য খাতগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে বাধ্য করা উচিত যাতে সিস্টেমের মধ্যে সামগ্রিক সমন্বয় বজায় থাকে। এর নিয়ন্ত্রক সততা এবং কৌশলগত তত্ত্বাবধানের ভূমিকা সুরক্ষিত রাখতে, NHIC-কে বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কার্যক্রমগুলির থেকে স্বাধীন থাকতে হবে, শুধুমাত্র শাসন ব্যবস্থা, দায়বদ্ধতা এবং HIS ইকোসিস্টেমের মধ্যে সঙ্গতি নিশ্চিত করতে মনোযোগী থাকতে হবে।

স্তম্ভ ২: মূল ডিজিটাল অবকাঠামো এবং প্ল্যাটফর্ম

৫. "স্বাস্থ্য-সেতু (Shasthyo-Shetu)" নামে জাতীয় একীভূত HIS প্ল্যাটফর্ম চালু করুন

'স্বাস্থ্য-সেতু' গড়ে তুলুন, যা বাংলাদেশ-এর জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য সিস্টেমের মূল অবকাঠামো হবে, যেখানে সকল স্বাস্থ্য সুবিধা—সরকারি, বেসরকারি এবং এনজিও খাত, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং তৃতীয় স্তর, এবং রোগী, সেবা প্রদানকারী, সুবিধা এবং লজিস্টিকসের মতো তথ্য ডোমেইন—একটি একীভূত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত হবে।

স্থানীয় প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের (আইটি, হার্ডওয়্যার এবং সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার, সফটওয়্যার প্রোগ্রামার, ডেটা ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি) দ্বারা নির্মিত 'স্বাস্থ্য-সেতু' একটি মডুলার, ওপেন-সোর্স আর্কিটেকচারে ডিজাইন করা হবে, যা রিয়েল-টাইম ট্রানজেকশনাল ডেটা এবং দীর্ঘমেয়াদী ডেটা সংরক্ষণের সমর্থন করবে, যা সেবা চালু রাখার ধারাবাহিকতা এবং সিস্টেমের মধ্যে একীকরণ সক্ষম করবে। এটি জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য প্ল্যাটফর্মের পূর্ণ স্যুটের কেন্দ্রীয় হাব হিসেবে কাজ করবে, যার মধ্যে থাকবে 'স্বাস্থ্য-চাবি' রোগী শনাক্তকরণ এবং অধিকার ব্যবস্থাপনার জন্য, 'স্বাস্থ্য-বৃত্তান্ত' ইলেকট্রনিক স্বাস্থ্য রেকর্ড (EHR) এর জন্য, 'স্বাস্থ্য-চিত্র' ডায়াগনস্টিক ইমেজিংয়ের জন্য, 'স্বাস্থ্য-উপকরণ' স্বাস্থ্য লজিস্টিকস এবং ঔষধ ব্যবস্থাপনার জন্য, এবং 'স্বাস্থ্য-বিকাশ' নাগরিকদের ব্যক্তিগত ডিজিটাল স্বাস্থ্য রেকর্ডের ওয়ালেট এবং জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য ইকোসিস্টেমে প্রথম প্রবেশের পয়েন্ট হিসেবে।

'স্বাস্থ্য-সেতু', এই একীভূত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটি বর্তমান এবং ভবিষ্যতের ডিজিটাল সিস্টেমের সঙ্গে পূর্ণ আন্তঃপ্রচলন নিশ্চিত করবে এবং অন্তর্নির্মিত কার্যকারিতা যেমন স্বয়ংক্রিয় রিপোর্টিং, জিও-ট্যাগিং, GIS সংযোজন, এবং উন্নত বিশ্লেষণ সরবরাহ করবে। শক্তিশালী, অন্তর্নির্মিত ডেটা শাসন প্রটোকলগুলি প্ল্যাটফর্মটিকে নিরাপত্তা, গোপনীয়তা, এবং নিয়ন্ত্রক সম্মতি নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে। জাতীয় HIS ইকোসিস্টেমের অঙ্কুর হিসেবে 'স্বাস্থ্য-সেতু' ডেটা বিশ্লেষণ, সিস্টেম কর্মক্ষমতা মনিটরিং এবং প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবদান রাখবে।

৬. জাতীয় পরিচয়পত্র/ জন্ম নিবন্ধন (১৮ বছরের নিচে)-এর সাথে সংযুক্ত একটি 'ইউনিভার্সাল হেলথ আইডি' বাধ্যতামূলক করুন এবং "স্বাস্থ্য-চাবি (Shasthyo-Chabi)" কার্ড চালু করুন

প্রতিটি নাগরিককে একটি অনন্য স্বাস্থ্য আইডি প্রদান করুন, যা তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধনের (১৮ বছরের নিচে) সাথে ডিজিটালি সংযুক্ত থাকবে এবং একটি স্মার্ট স্বাস্থ্য কার্ড—'স্বাস্থ্য-চাবি' এর মাধ্যমে কার্যকর হবে। এই স্বাস্থ্য আইডি স্বাস্থ্য সেবায় অ্যাক্সেসের জন্য একটি সার্বজনীন শনাক্তকারী হিসেবে কাজ করবে এবং এটি ব্যক্তির সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য ইকোসিস্টেমে নিরাপদ, প্রমাণিত অ্যাক্সেস নিশ্চিত করবে। 'স্বাস্থ্য-সেতু' এর মাধ্যমে, 'স্বাস্থ্য-চাবি' কার্ডটি 'স্বাস্থ্য-বৃত্তান্ত' এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে, যাতে ব্যক্তিগত ইলেকট্রনিক স্বাস্থ্য রেকর্ড দেখতে পারে, 'স্বাস্থ্য-উপকরণ' ঔষধ অধিকার অ্যাক্সেস করতে পারে এবং 'স্বাস্থ্য-চিত্র' ডায়াগনস্টিক ইমেজিং উদ্ধার করতে পারে। এটি সেবার অধিকার এবং বীমা সুবিধাগুলিতে অ্যাক্সেসও সহজ করবে, যেমন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, সরকারি সুবিধা থেকে মৌলিক ঔষধ, এবং সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা স্কিমগুলির অধীনে সুরক্ষা যা চরম স্বাস্থ্য খরচ কমাতে সাহায্য করবে। 'স্বাস্থ্য-চাবি' এর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করবে যে, একীভূত সেবা সরবরাহ নিশ্চিত হচ্ছে, পুনরাবৃত্তি দূর হচ্ছে, সেবা ধারাবাহিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পরিচয় জালিয়াতি, সম্পদ অপচয়, এবং ব্যবস্থাগত দুর্নীতি থেকে সুরক্ষা পাওয়া যাচ্ছে।

৭. স্থায়ীভাবে "স্বাস্থ্য-বৃত্তান্ত (Shasthyo-Brittanto)" কে জাতীয় ইলেকট্রনিক স্বাস্থ্য রেকর্ড (EHR) সিস্টেম হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য করুন

'স্বাস্থ্য-বৃত্তান্ত' কে জাতীয় ইলেকট্রনিক স্বাস্থ্য রেকর্ড (EHR) সিস্টেম হিসেবে চালু করুন, যা 'স্বাস্থ্য-সেতু' প্ল্যাটফর্মের অধীনে দীর্ঘমেয়াদী, একাধিক সেবা প্রদানকারী, আন্তঃখাত এবং রোগী-কেন্দ্রিক তথ্য ব্যবস্থাপনা সক্ষম করবে।

'স্বাস্থ্য-বৃত্তান্ত' সাধারণ EMR থেকে ভিন্ন, যা শুধুমাত্র একক সুবিধায় সীমাবদ্ধ, এটি একজন ব্যক্তির স্বাস্থ্য ইতিহাসের একটি বিস্তৃত এবং একীভূত চিত্র সরবরাহ করবে যা পুরো সেবা ধারাবাহিকতায় থাকবে। এটি যত্নের পূর্ণ জীবনচক্রের নথিভুক্তি সমর্থন করবে, যেমন ক্লিনিকাল পরামর্শ, ডায়াগনস্টিক, ইনপেশেন্ট ট্রিটমেন্ট, রেফারেল, ফলো-আপ, এবং ঔষধ প্রদান। 'স্বাস্থ্য-চিত্র' এর মাধ্যমে তৈরি করা সমস্ত ডায়াগনস্টিক ইমেজিং ব্যক্তির EHR-এ এমবেড করা হবে, এবং 'স্বাস্থ্য-উপকরণ' এর মাধ্যমে সকল প্রেসক্রিপশন এবং ঔষধ লেনদেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের রেকর্ডে ক্যাপচার এবং সংযুক্ত হবে। 'স্বাস্থ্য-চাবি' এর মাধ্যমে ডিজিটালভাবে সংযুক্ত থাকা সিস্টেমটি রেকর্ডে নিরাপদ, প্রমাণিত অ্যাক্সেস নিশ্চিত করবে এবং যত্নের গুণগত মান উন্নত করতে ক্লিনিকাল সিদ্ধান্ত সমর্থন সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত করবে।

'স্বাস্থ্য-বৃত্তান্ত' এর গ্রহণযোগ্যতা তথ্যের বিভাজন এবং পুনরাবৃত্তি কমাবে, ক্লিনিকাল গুণমান শক্তিশালী করবে এবং রোগী-কেন্দ্রিক, সমন্বিত সেবা সরবরাহের জন্য ভিত্তি তৈরি করবে।

৮. জাতীয় ইমেজিং প্ল্যাটফর্ম চালু করুন, যা "স্বাস্থ্য-চিত্র (Shasthyo-Chitro)" নামে পরিচিত হবে

'স্বাস্থ্য-চিত্র' কে জাতীয় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বাস্তবায়ন করুন, যা ডায়াগনস্টিক ইমেজিং ধারণ, সংরক্ষণ এবং শেয়ারিংয়ের জন্য সম্পূর্ণরূপে 'স্বাস্থ্য-সেতু' অবকাঠামোর অধীনে একীভূত হবে। এটি একটি DICOM-সামঞ্জস্য পিকচার আর্কাইভিং এবং কমিউনিকেশন সিস্টেম (PACS) হিসেবে ডিজাইন করা হবে, অথবা একটি তুলনামূলক ওপেন-স্ট্যান্ডার্ড সমাধান, যা সুরক্ষিত ইমেজ এক্সচেঞ্জ সক্ষম করবে এবং AI-ভিত্তিক ডায়াগনস্টিক সমর্থন সরঞ্জামগুলির সাথে সংযোগ স্থাপন করবে।

৯. ঔষধ এবং স্বাস্থ্য লজিস্টিকস ব্যবস্থাপনার জন্য একটি জাতীয় প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করুন, যা "স্বাস্থ্য-উপকরণ (Shasthyo-Upokoron)

১০. জাতীয় তথ্য কেন্দ্রে সমস্ত স্বাস্থ্য তথ্য হোস্ট করুন এবং একটি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য তথ্য বিনিময় এবং ডেটা রিপোজিটরি তৈরি করুন

জাতীয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো—যেমন 'স্বাস্থ্য-সেতু', 'স্বাস্থ্য-চাবি', 'স্বাস্থ্য-বৃত্তান্ত', 'স্বাস্থ্য-চিত্র', এবং 'স্বাস্থ্য-উপকরণ'—এর মাধ্যমে উৎপন্ন সমস্ত স্বাস্থ্য তথ্য ICT বিভাগ অধীনে জাতীয় তথ্য কেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে, যা কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ, ডেটা সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। একটি শক্তিশালী স্বাস্থ্য তথ্য বিনিময় (HIE) স্তর এবং একটি জাতীয় স্বাস্থ্য ডেটা রিপোজিটরি তৈরি করতে হবে, যা সময়মতো ডেটা শেয়ারিং, সিস্টেমের আন্তঃসঙ্গতি এবং বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে নিরাপদ অ্যাক্সেস সক্ষম করবে। এই অবকাঠামোকে শক্তিশালী ডেটা সুরক্ষা প্রোটোকলের দ্বারা শাসিত হতে হবে এবং জাতীয় স্বাস্থ্য ডেটা শাসন কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, যাতে গোপনীয়তা, সম্মতি এবং সেক্টর-অংশীকারের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা যায়। HIE এবং রিপোজিটরি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা, কার্যক্ষমতা মনিটরিং এবং প্রমাণভিত্তিক নীতিনির্ধারণের জন্য ডিজিটাল পৃষ্ঠভূমি হিসেবে কাজ করবে।

১১. বৈশ্বিক আন্তঃসংযোগযোগ্যতা মানদণ্ডের অধীনে ডিজিটাল স্বাস্থ্য সিস্টেম এবং ভেন্ডরদের জন্য একটি জাতীয় সার্টিফিকেশন কাঠামো প্রবর্তন করুন

বাংলাদেশে যে সকল ডিজিটাল স্বাস্থ্য সিস্টেম স্থাপন করা হবে, সেগুলোকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আন্তঃসংযোগযোগ্যতা মানদণ্ড মেনে চলতে হবে, যেমন (কিন্তু সেগুলি সীমাবদ্ধ নয়) HL৭ FHIR স্বাস্থ্য তথ্য বিনিময়ের জন্য, ICD-১১ রোগ শ্রেণীবিভাগের জন্য, DICOM ডায়াগনস্টিক ইমেজিংয়ের জন্য, SNOMED CT ক্লিনিক্যাল টার্মিনোলজি, এবং LOINC ল্যাবরেটরি এবং ডায়াগনস্টিক কোডসের জন্য। জাতীয় প্রেক্ষাপটে এসব মানদণ্ডের যথাযথ এবং সঙ্গতিপূর্ণ প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য, সরকারকে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে স্থানীয় বাস্তবায়ন গাইড এবং ব্যবহার প্রোটোকল তৈরি করতে হবে। সরকারি নিয়ন্ত্রিত একটি সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়া সকল স্বাস্থ্য IT ভেন্ডর, সফটওয়্যার ডেভেলপার এবং সিস্টেম বাস্তবায়নকারীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। এই সার্টিফিকেশনটি সরকারি ক্রয় যোগ্যতার জন্য এবং 'স্বাস্থ্য-সেতু', 'স্বাস্থ্য-বৃত্তান্ত', 'স্বাস্থ্য-চিত্র', এবং 'স্বাস্থ্য-উপকরণ' সহ কেন্দ্রীয় জাতীয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলির সাথে ইন্টিগ্রেশনের জন্য বাধ্যতামূলক হতে হবে। এই সার্টিফিকেশন কাঠামো ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিবেশে আন্তঃসংযোগযোগ্যতা, ডেটার ধারাবাহিকতা এবং সিস্টেমের সঙ্গতি নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে, পাশাপাশি গুণমান, জবাবদিহি এবং ডিজিটাল স্বাস্থ্য বিনিয়োগের দীর্ঘমেয়াদী টেকসইতা রক্ষা করবে।

স্তম্ভ ৩: ডেটা অ্যানালিটিক্স, ডেটা ইনটেলিজেন্স এবং ডেটার ব্যবহার

১২. অগ্রাধিকার প্রাপ্ত অবস্থাগুলির জন্য 'জাতীয় রোগ রেজিস্ট্রি' প্রতিষ্ঠা করুন

বাংলাদেশকে জাতীয় রোগ রেজিস্ট্রি তৈরি করার প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত, প্রথমে ক্যান্সার থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে অন্যান্য উচ্চ অগ্রাধিকার পরিস্থিতি, যেমন ডায়াবেটিস, দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ, রিউমাটোলজিক্যাল রোগ, গর্ভাবস্থা ফিস্টুলা, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, বিরল রোগ এবং অস্বাভাবিক মৃত্যুর অন্তর্ভুক্ত করতে। এই নিবন্ধনগুলো 'স্বাস্থ্য-সেতু' প্ল্যাটফর্মে সম্পূর্ণভাবে ইন্টিগ্রেটেড এবং 'স্বাস্থ্য-চাবি' দিয়ে রোগী শনাক্তকরণ, 'স্বাস্থ্য-বৃত্তান্ত' দিয়ে ক্লিনিক্যাল রেকর্ড, 'স্বাস্থ্য-চিত্র' দিয়ে ইমেজিং ডেটা এবং 'স্বাস্থ্য-উপকরণ' দিয়ে চিকিৎসা এবং ওষুধ ট্র্যাকিং এর সাথে সংযুক্ত করা হবে। রিয়েল-টাইম অ্যানালিটিক্স ক্ষমতা সহ ডিজাইন করা, নিবন্ধনকৃত রোগের সংক্রমণ, চিকিৎসার ধরণ, ফলাফল এবং যত্নের ভৌগোলিক এবং জনগণভিত্তিক বৈষম্য নিরীক্ষণের জন্য কার্যকর হবে। এগুলো ক্লিনিক্যাল গবেষণা, স্বাস্থ্য কর্মী পরিকল্পনা এবং উচ্চ অঞ্চলে লক্ষ্যভিত্তিক জনস্বাস্থ্য হস্তক্ষেপের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে। এই নিবন্ধনগুলোর প্রতিষ্ঠা একটি তথ্যভিত্তিক, প্রতিক্রিয়াক্ষম স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে।

১৩. জাতীয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং মেশিন লার্নিং (ML) অন্তর্ভুক্ত করুন, যাতে প্রাকৃতিক, পূর্বাভাসমূলক, এবং সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ চালিত হয়

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং মেশিন লার্নিং (ML) ক্ষমতাগুলো জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিকাঠামো—'স্বাস্থ্য-সেতু', 'স্বাস্থ্য-বৃত্তান্ত', 'স্বাস্থ্য-চিত্র', এবং 'স্বাস্থ্য-উপকরণ'—এর মধ্যে সিস্টেম্যাটিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যাতে রিয়েল-টাইম অ্যানালিটিক্স, প্রারম্ভিক সতর্কতা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সারা স্বাস্থ্য সিস্টেমের সকল স্তরে কার্যকরী হয়। এই প্রযুক্তিগুলোকে প্রাদুর্ভাবের পূর্বাভাস, রোগ বোঝার পূর্বানুমান, সেবার ব্যবহার পূর্বাভাস এবং মজুদ ফুরিয়ে যাওয়ার এবং লজিস্টিক চাহিদা অনুমান করতে ব্যবহার করা উচিত, যার ফলে 'স্বাস্থ্য-উপকরণ' এর মাধ্যমে পরিকল্পনা এবং সম্পদ বরাদ্দ উন্নত হবে।

AI-চালিত ক্লিনিক্যাল সিদ্ধান্ত সহায়ক টুলগুলো 'স্বাস্থ্য-বৃত্তান্ত' এ সংযুক্ত করা উচিত, যাতে চিকিৎসা কার্যক্রম উন্নত হয়, ডায়াগনস্টিক ভুল কমে এবং ক্লিনিক্যাল অনুশীলন স্ট্যান্ডার্ডাইজড হয়। 'স্বাস্থ্য-চিত্র'-এ, AI-ভিত্তিক চিত্র বিশ্লেষণ বিশেষজ্ঞদের অপ্রতুলতা সহ পরিস্থিতিতে সময়মতো ডায়াগনস্টিক সহায়তা করবে। 'স্বাস্থ্য-সেতু' মাধ্যমে প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হলে, AI এবং ML প্রতিক্রিয়াশীল স্বাস্থ্যসেবার পরিবর্তে পূর্বাভাসমূলক স্বাস্থ্যসেবায় রূপান্তর করতে সক্ষম হবে—এবং বাংলাদেশকে একটি তথ্যভিত্তিক, অভিযোজনশীল এবং কার্যকরী স্বাস্থ্য সিস্টেমের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

১৪. জাতীয় স্বাস্থ্য তথ্য সিস্টেম থেকে কার্যকরী ধারণা উদ্ভাবনের জন্য একটি নিবেদিত স্বাস্থ্য ইনফরমেটিকস ইউনিট প্রতিষ্ঠা করুন

বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সেবার অধীনে একটি বিশেষ স্বাস্থ্য ইনফরমেটিকস ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা উচিত, যা 'স্বাস্থ্য-সেতু', 'স্বাস্থ্য-চাবি', 'স্বাস্থ্য-বৃত্তান্ত', 'স্বাস্থ্য-চিত্র' এবং 'স্বাস্থ্য-উপকরণ' থেকে একত্রিত স্বাস্থ্য ডেটা বিশ্লেষণ করে এবং কার্যকরী ধারণা তৈরি করে। এই ইউনিটটি জাতীয় এবং উপ-জাতীয় স্তরে রোগ পর্যবেক্ষণ, স্বাস্থ্য সেবা পরিকল্পনা, গুণমান মনিটরিং এবং রিয়েল-টাইম সিদ্ধান্ত গ্রহণে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবে।

ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে, স্বাস্থ্য ইনফরমেটিকস ইউনিট সময়মতো, প্রমাণভিত্তিক তথ্য প্রদান করবে, যা নীতি প্রণয়ন, সম্পদ বরাদ্দ এবং কার্যক্ষমতা উন্নতির জন্য সহায়ক হবে—এবং বাংলাদেশকে একটি আরও প্রতিক্রিয়া-ক্ষমতাসম্পন্ন, জবাবদিহি প্রতিষ্ঠিত এবং তথ্যভিত্তিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়তে সহায়তা করবে।

১৬. স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সচেতন জন বিতর্কে উৎসাহিত করতে একটি ওপেন-অ্যাক্সেস পাবলিক স্বাস্থ্য তথ্য পোর্টাল চালু করুন

একটি জাতীয় ওপেন-অ্যাক্সেস ডিজিটাল পোর্টাল তৈরি করা উচিত, যা 'স্বাস্থ্য-সেতু' এবং এর অন্তর্ভুক্ত প্ল্যাটফর্মগুলো—'স্বাস্থ্য-বৃত্তান্ত', 'স্বাস্থ্য-চাবি', 'স্বাস্থ্য-চিত্র', এবং 'স্বাস্থ্য-উপকরণ'—থেকে নিষ্ক্রিয়কৃত পাবলিক স্বাস্থ্য ডেটাসেট প্রকাশ করবে। এই পোর্টালটি গবেষক, সাংবাদিক, নীতিনির্ধারক এবং নাগরিকদের নিরাপদভাবে কিউরেটেড ডেটাসেট অ্যাক্সেসের সুযোগ দেবে, যা স্বাধীন বিশ্লেষণ, জনসমালোচনা এবং নাগরিক অংশগ্রহণকে সক্ষম করবে। অধিকাংশ ডেটা (অ্যানোনিমাইজড) সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে, তবে কিছু ডেটা সীমিত থাকবে।

পোর্টালটি স্ট্যান্ডার্ডাইজড মেটাডেটা, ডেটা ডকুমেন্টেশন প্রোটোকল এবং ডেটা নেভিগেশনের জন্য ব্যবহারকারী-বান্ধব টুলস অন্তর্ভুক্ত করবে। নজরদারি 'জাতীয় স্বাস্থ্য তথ্য কাউন্সিল' (NHIC) এর মাধ্যমে হতে হবে, যাতে ডেটার ব্যবহার নৈতিক, সমান এবং জাতীয় স্বাস্থ্য তথ্য সুরক্ষা আইন অনুযায়ী থাকে। ওপেন ডেটা অ্যাক্সেসকে প্রতিষ্ঠানিকরণ করে, বাংলাদেশ স্বচ্ছতা এবং প্রমাণভিত্তিক সংলাপের একটি সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারে।

স্তম্ভ ৪: সক্ষমতা, অন্তর্ভুক্তি এবং উদ্ভাবন

১৭. "স্বাস্থ্য-সাক্ষরতা (Shasthyo-Shakkhorota)" নামক জাতীয় ডিজিটাল সাক্ষরতা উদ্যোগ চালু করুন

স্বাস্থ্য-সাক্ষরতা একটি জাতীয় উদ্যোগ হিসেবে চালু করা উচিত, যাতে ডিজিটাল সাক্ষরতা বৃদ্ধি করা যায় এবং ডিজিটাল স্বাস্থ্য প্ল্যাটফর্মগুলির কার্যকর ব্যবহার জন্য সিস্টেম-ব্যাপী সক্ষমতা শক্তিশালী হয়। উদ্যোগটি মেডিকেল, নার্সিং এবং সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের প্রি-সার্ভিস শিক্ষা কার্যক্রমে ডিজিটাল দক্ষতা প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের সকল শ্রেণীর জন্য কাঠামোগত, ধারাবাহিক ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই প্রশিক্ষণগুলো ডিজিটাল স্বাস্থ্য প্ল্যাটফর্মগুলির সুনির্দিষ্ট ব্যবহার এবং সঠিক তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবহারে সহায়তা করবে।

একই সঙ্গে, জনগণের মধ্যে ডিজিটাল স্বাস্থ্য সরঞ্জামের প্রতি আস্থা গড়ে তোলার জন্য এবং রোগীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার জন্য কমিউনিটি-ভিত্তিক ডিজিটাল সাক্ষরতা ক্যাম্পেইন চালু করা উচিত। বিশেষ করে নারী স্বাস্থ্য কর্মীদের ক্ষমতায়ন এবং প্রান্তিক ও অবহেলিত জনগণের ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে সারা দেশে ডিজিটাল স্বাস্থ্য সেবা সাম্যভাবে প্রদান করা যায়।

শিশু ও কিশোরদের উন্নয়ন, সুস্থতা এবং সুরক্ষা:

- শিশু ও কিশোরদের সুস্থতা বৃদ্ধি এবং তাদের মানসিক, শারীরিক এবং যৌন নির্যাতন ও শোষণ থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সকল নাগরিকদের কাছে বৃহৎ আকারে এসএমএস পাঠানো।
- শিশু ও কিশোরদের কার্যকর উন্নয়ন সম্পর্কে জ্ঞান প্রচারের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা, যাতে এনিমেটেড ভিডিও এবং অন্যান্য কার্যকর যোগাযোগ উপকরণ ব্যবহার করে, বাড়িতে ভিত্তিক মূল্যায়ন সরঞ্জাম দিয়ে স্ক্রীনিং করা এবং বিশ্বাসযোগ্য সেবাগুলোর মানচিত্র তৈরি করে যত্ন গ্রহণের অভ্যাসগুলো সহজতর করা।

১৯. স্বাস্থ্য তথ্যবিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্য ডেটা সম্পর্কিত ইঞ্জিনিয়ারিংকে একটি আনুষ্ঠানিক শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং ডিজিটাল স্বাস্থ্য নেতৃত্ব ও বাস্তবায়নে ক্যারিয়ার পথ তৈরি করা

বাংলাদেশের সরকারি সেবা এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্য তথ্যবিজ্ঞানকে আনুষ্ঠানিকভাবে একাডেমিক এবং পেশাদার শাখা হিসেবে পরিচিত করানো উচিত। একটি দক্ষ কর্মশক্তি গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ এবং ডিগ্রি প্রোগ্রাম স্থাপন করা উচিত, যারা জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য ইকোসিস্টেমের নেতৃত্ব ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

এছাড়া, পাবলিক সেক্টরে HIS বাস্তবায়ন, ডেটা অ্যানালিটিকস এবং ডিজিটাল শাসন সম্পর্কিত ভূমিকার জন্য একটি নিবেদিত ক্যারিয়ার ট্র্যাক তৈরি করা উচিত। প্রশিক্ষিত পেশাদারদেরকে সকল প্রশাসনিক স্তরে, জাতীয় থেকে জেলা পর্যায় পর্যন্ত, সিস্টেম পরিচালনা, ডেটা ব্যবহার এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য সুসংগতভাবে নিয়োগ করতে হবে। স্বাস্থ্য তথ্যবিজ্ঞানকে এভাবে প্রতিষ্ঠিত করা জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য প্ল্যাটফর্মগুলো যেমন 'স্বাস্থ্য-সেতু', 'স্বাস্থ্য-বৃত্তান্ত', 'স্বাস্থ্য-চাবি', 'স্বাস্থ্য-চিত্র', এবং 'স্বাস্থ্য-উপকরণ' দেশব্যাপী বাস্তবায়ন, শাসন এবং সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় দীর্ঘমেয়াদী সক্ষমতা তৈরি করবে।

২০. জাতীয় HIS-এ বেসরকারি হাসপাতাল এবং ক্লিনিকগুলোকে পর্যায়ক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে লাইসেন্সিং চাহিদা হিসেবে বাধ্যতামূলক করা

একটি বিস্তৃত এবং আন্তঃপ্রযুক্তিগত ডিজিটাল স্বাস্থ্য ইকোসিস্টেম প্রতিষ্ঠা করতে, সকল বেসরকারি এবং এনজিও পরিচালিত স্বাস্থ্য সুবিধাগুলোকে জাতীয় HIS-এর সাথে সংযুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। এই সংযোগে 'স্বাস্থ্য-সেতু' এবং 'স্বাস্থ্য-বৃত্তান্ত' প্ল্যাটফর্ম গ্রহণ, প্রাসঙ্গিক রোগ নিবন্ধনগুলোতে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং জাতীয় ডেটাসেটগুলোর কাছে নিয়মিত রিপোর্টিং অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে, যার মধ্যে মাসিক সেবার পরিসংখ্যান থাকবে।

বাস্তবায়নটি বড় তৃতীয় স্তরের বেসরকারি হাসপাতালগুলোর মাধ্যমে শুরু হওয়া উচিত, এরপর দ্বিতীয় এবং প্রাথমিক সেবা সুবিধাগুলোর জন্য, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুতি এবং ভৌগলিক অবস্থান বিবেচনায় নিয়ে। এই রূপান্তরকে সহজ করতে সরকারকে টার্গেটেড প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং প্রণোদনা প্রদান করা উচিত। সম্মতি নিশ্চিত করতে হবে প্রতিষ্ঠানের/হাসপাতাল/ক্লিনিকের লাইসেন্সিংয়ের সাথে, যার নবায়ন সফল সংযুক্তি এবং ধারাবাহিক অননুমোদন থাকলে বাতিলকরণের শর্তে করা হবে।

অতিরিক্তভাবে, 'স্বাস্থ্য-সাক্ষরতা' এবং 'স্বাস্থ্য-বিকাশ'-এর মতো সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রচারাভিযানগুলো ডিজিটাল স্বাস্থ্য সংযুক্তির উপকারিতা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করতে ব্যবহার করা উচিত। সিস্টেমগুলোর মাধ্যমে সেবার গুণমান কিভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ধারাবাহিকতা নিশ্চিত হয় তা জানিয়ে নাগরিকদের মধ্যে চাহিদাভিত্তিক পদক্ষেপ গড়ে তোলা যাবে, যা বেসরকারি সুবিধাগুলোকে জাতীয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো গ্রহণে উৎসাহিত করবে। একটি ওপেন-অ্যাক্সেস ওয়েবসাইট এবং ড্যাশবোর্ড প্রতিষ্ঠা করা উচিত, যা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সংযুক্তির অবস্থা স্বচ্ছভাবে প্রদর্শন করবে, দায়বদ্ধতা প্রচার করবে এবং নাগরিকদেরকে স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে। যেসব প্রতিষ্ঠান সংযুক্তি করতে ব্যর্থ হবে, তারা রোগী সেবা সুবিধা এবং সামাজিক স্বাস্থ্য বীমার মতো সুবিধা দিতে অযোগ্য হবে, যা সম্মতির গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে তুলবে। এই সংযুক্তি বাধ্যতামূলক করে এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক চাহিদা সৃষ্টি করে, বাংলাদেশ ডেটার পূর্ণতা, সেবার ধারাবাহিকতা এবং স্বাস্থ্য সিস্টেম শাসন ক্ষেত্রে সরকারিএবং বেসরকারি উভয় খাতে উন্নতি করবে।

পরিচ্ছেদ ৯
স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়ন

সূচনা

২০২৪ সালের ১৮ নভেম্বর, বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্যখাতকে আরও জনমুখী, সহজলভ্য এবং সর্বজনীন করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশন গঠন করে। স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়ন (Health Financing) স্বাস্থ্য ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপুর্ণ অঙ্গ। তাই এই কমিশন স্বাস্থ্যখাতের অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট সংস্কারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করেছে।

এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়ন সংক্রান্ত বর্তমান পরিস্থিতি নানা তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে এই খাতের নানা নীতিগত অসামঞ্জস্য ও কাঠামোগত দুর্বলতা তুলে ধরা হয়েছে। যেমন, স্বাস্থ্যখাতে আমাদের বরাদ্দ অপ্রতুল, তহবিল একত্রীকরণ ও ঝুঁকি সমন্বয় (risk pooling) ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে অসংগঠিত, এবং স্বাস্থ্য সেবার কৌশলগত ক্রয়ের (strategic purchasing) সক্ষমতা অপর্যাপ্ত। তাই বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যয়ের একটা বড় অংশ জনগণকে এখনো নিজের পকেট থেকে বহন করতে হয় (১)।

এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, অধ্যায়টিতে কিছু সময়োপযোগী ও বাস্তবভিত্তিক সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই- স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়নের নীতি, কাঠামো ও ব্যবস্থাপনাকে এমনভাবে পুনর্গঠন করা, যাতে তা দক্ষতা (efficiency), ন্যায্যতা (equity) এবং জবাবদিহিতা (accountability) বৃদ্ধির মাধ্যমে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা (Universal Health Coverage) অর্জন করা যায়। প্রস্তাবিত সংস্কারগুলোতে পিছিয়ে থাকা ও উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর কথা বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। এই সংস্কারগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে জন্য একটি সহনশীল এবং টেকসই অর্থায়ন গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

স্বাস্থ্যখাতে এই সংস্কারের মূল লক্ষ্য হলো ২০৩৫ সালের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা (Universal Health Coverage) নিশ্চিত করা। অর্থাৎ, দেশের প্রতিটি মানুষ যেন তার প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথ স্বাস্থ্য সেবা, যথাসময়ে, যথাযথ মানে পায়, আর এ কারণে যেন কেউ অতিরিক্ত আর্থিক চাপে না পড়ে।

এই লক্ষ্য অর্জনে আমরা দুটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কারিগরি কাঠামো (technical framework) ব্যবহার করেছি:

- **সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা কিউব কাঠামো:** এই কাঠামোর তিনটি কৌশলগত দিক- কত জন মানুষ সেবার আওতায় আসছে, কী ধরনের সেবা তারা পাচ্ছে, এবং সে সেবা গ্রহনের জন্য কতটুকু আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করা হচ্ছে, অর্থাৎ ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয় কতটা হ্রাস পাচ্ছে। এই তিনটি মাত্রায় অগ্রগতি হলেই পর্যায়ক্রমে 'সর্বজনীনতা' অর্জিত হয়। (চিত্র ১ দেখুন) (২)
- **স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়নের কাঠামো**—এই কাঠামোরটি দেখায় কীভাবে রাজস্ব আহরণ ও অর্থ সংস্থান (revenue collection), তহবিল একত্রীকরণ ও ঝুঁকি সমন্বয় (resource and risk pooling) এবং স্বাস্থ্য সেবা ক্রয় (service purchasing) ব্যবস্থাকে উন্নত করে দক্ষতা (efficiency), ন্যায্যতা (equity), এবং জবাবদিহিতা (accountability) বাড়ানো যায়। এই উন্নয়নগুলোই শেষ পর্যন্ত নির্ধারণ করে স্বাস্থ্যসেবার পরিধি (coverage) কতটুকু বাড়বে, আর তার মান কতটা উন্নত হবে। (চিত্র ২ দেখুন) (৩)

এই কারিগরি কাঠামোগুলোর (technical framework) ওপর ভিত্তি করে, আমরা স্বাস্থ্যখাতের অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট সংস্কারের জন্য চারটি কৌশল নির্ধারণ করেছি -

১. সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার পরিধি বাড়াতে স্বাস্থ্যখাতে সরকারের বিনিয়োগ বৃদ্ধি-

সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার পরধি বাড়াতে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি অপরিহার্য। এ জন্য সরকারকেই প্রধান ভুমিকা পালন করতে হয়। সরকার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ ও অর্থ সংস্থানের পরিমান বৃদ্ধি করে স্বাস্থ্যখাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চিত করতে

পারে। এর মাধ্যমে আরও বেশি মানুষকে এবং আরও বেশি পরিসেবাকে স্বাস্থ্য সেবার আওতায় আনা যায়। একই সাথে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনে ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয় (out of pokcet expenditure) উল্লখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব।

২. ন্যায্যতা ও আর্থিক সুরক্ষার জন্য তহবিল একত্রীকরণ ও ঝুঁকি সমন্বয় ব্যবস্থা সংহত করা-

স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়নের খন্ডিত ব্যবস্থাগুলোকে সংহত করার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী তহবিল একত্রীকরণ ও ঝুঁকি সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। এতে আয়ভেদ বা ভৌগলিক ব্যবধান নির্বিশেষে সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরি করা যায়, এবং স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনে ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয় উল্লখযোগ্যভাবে **কমিয়ে** বিপর্যয়কর **চিকিৎসা** ব্যয় (catastrophic health expenditure)-এর ঝুঁকি কমানো যায়।

৩. স্বাস্থ্যসেবার কৌশলগত ক্রয় কার্যকরী করা এবং সেবার মান উন্নত করা-

স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় ক্রয় ব্যবস্থাপনা (passive purchasing) থেকে কৌশলগত ক্রয় ব্যবস্থাপনার (strategic purchasing) দিকে গেলে, জনসংখ্যার চাহিদা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সক্ষমতা (capacity) ও দক্ষতার (efficiency) সাথে সমন্বয় করে বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা যায়। এক্ষেত্রে ব্যয়-সাশ্রয়ী (cost effective) সেবা ও পরিসেবাগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া যায় এবং সম্পদের আরও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত যায়।

৪. অর্থায়ন পরিচালনায় স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা যাতে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অপচয় কমানো যায়

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সক্ষমতা (capacity) ও দক্ষতা (efficiency) বাড়াতে এবং অপচয় রোধ করতে একটি শক্তিশালী নজরদারি ও তদারকি কাঠামো (monitoring and supervision framework) জরুরি। পাশাপাশি, শাসনব্যবস্থায় উদ্ভাবনী ধারণার সমন্বয় ঘটিয়ে অনিয়ম, দুর্নীতি ও সম্পদের অপব্যবহার প্রতিরোধ করা সম্ভব। স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ অর্থের সঠিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করলে দীর্ঘমেয়াদে জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

***Figure ১:** সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার দিকে **অগ্রসর** হওয়ার তিনটি মূল মাত্রা; (বিশ্ব স্বাস্থ্য প্রতিবেদন ২০১০ থেকে গৃহীত)*

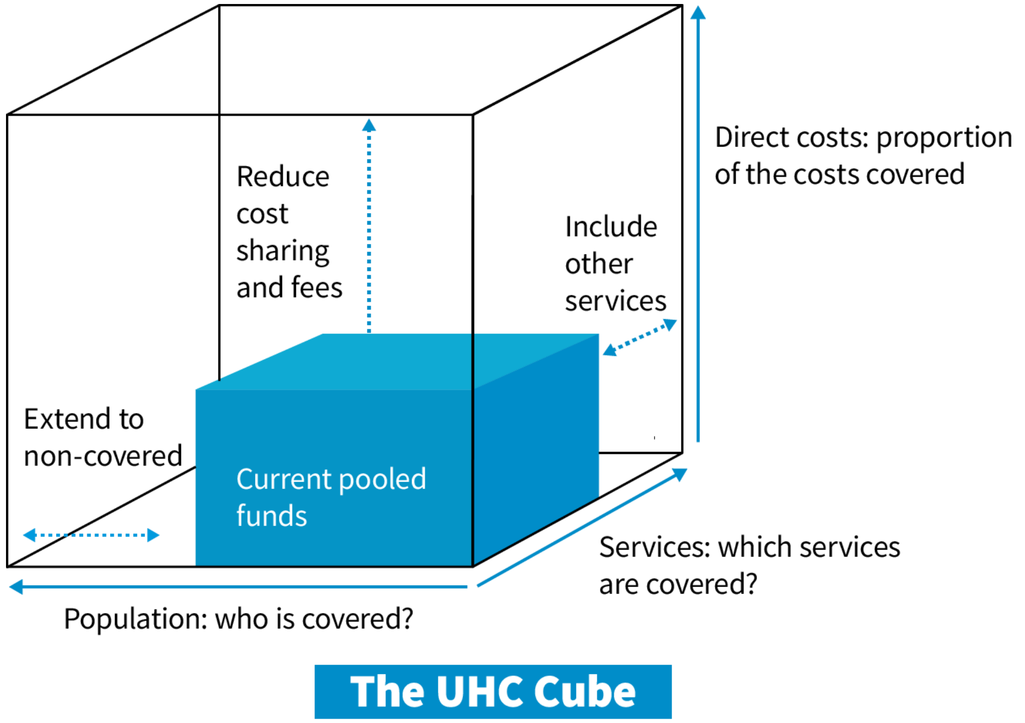

Figure ২: স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়নের প্রধান কার্যক্রমসমূহ এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জনের মধ্যবর্তী উদ্দেশ্যসমূহ (কুটজিন, ২০১৩ থেকে গৃহীত)

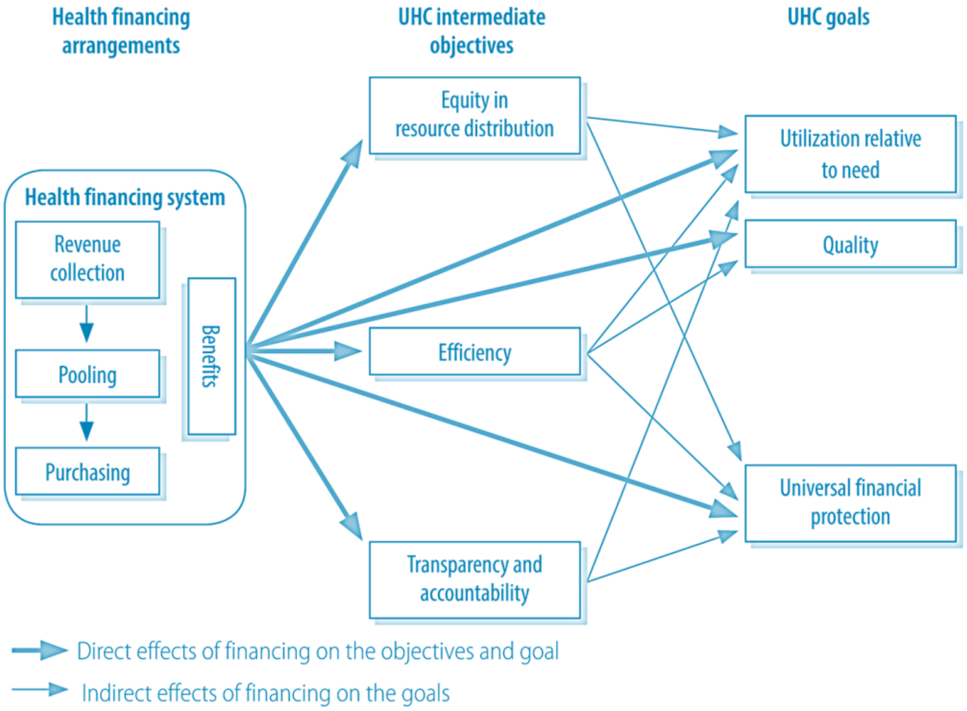

বর্তমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণ

জনসংখ্যা এবং জনমিতি

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ণ এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর, বাংলাদেশ অভূতপূর্ব জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। ১৯৭৪ সালে দেশের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৭১ মিলিয়ন। পাঁচ দশক পর, ২০২২ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়ে হয়েছে প্রায় ১৬৫ মিলিয়নের বেশি। এর ফলে, বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের অষ্টম জনবহুলতম দেশে পরিণত হয়েছে (চিত্র ৩ দেখুন) (৪)। এই সময়ের মধ্যে নগরায়নের হারও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৪ সালে দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৯ শতাংশ শহরে বাস করত। ১৯৮১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৫ শতাংশে। এরপর ১৯৯১ সালে ২০ শতাংশ এবং ২০০১ সালে ২৪ শতাংশে পৌঁছায়। যদিও ২০১১ সালে এই হার কিছুটা স্থিতিশীল ছিল (২৩ শতাংশ), ২০২২ সালে তা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে ৩২ শতাংশে পৌঁছায়।

বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যার গড় বার্ষিক বৃদ্ধি হার (average annual rate of increase) মাত্র ১.২ শতাংশ (চিত্র ৪ দেখুন) (৪)। বিপরীতে, শহরাঞ্চলে এই হার প্রায় ৪.৪ শতাংশ, যা গ্রামাঞ্চলের তুলনায় চার গুণেরও বেশি। ১৯৮১ সালে শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল সর্বোচ্চ, ১০.৭ শতাংশ। এরপর এই হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ২০১১ সালে দাঁড়ায় ১.৫ শতাংশে। তবে, ২০২২ সালে তা আবার বৃদ্ধি পেয়ে পৌঁছেছে ৪ শতাংশে, যা নগরায়নের একটি নতুন ঢেউকে নির্দেশ করে। অন্যদিকে, গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধি হার ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৮১ সালে এই হার ছিল ১.৮ শতাংশ, যা ২০২২ সালে নেমে এসেছে মাত্র ০.২ শতাংশে। এই সময়ের মধ্যে দেশের মোট জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধি হারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, ১৯৮১ সালে ২.৮ শতাংশ থেকে ২০২২ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১.২ শতাংশে।

Figure ৩: বাংলাদেশের জনসংখ্যার **পরিমান** (সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০২২)

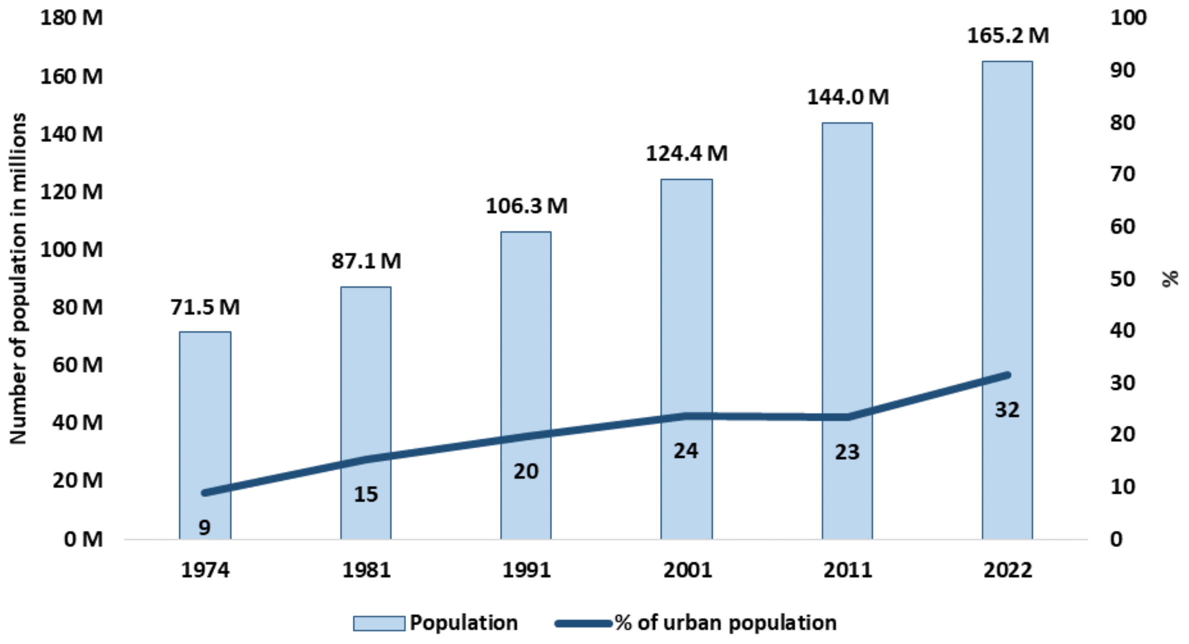

এই পরিবর্তনগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতাকে সামনে নিয়ে আসে, বাংলাদেশে মানুষ এখন ক্রমেই গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে যাচ্ছে। গ্রামীণ জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি প্রায় থমকে গেছে, আর শহরগুলো ক্রমান্বয়ে আরও বড় ও ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে উঠছে।

Figure 8 বাংলাদেশের জনসংখ্যার গড় বার্ষিক বৃদ্ধি হার (সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০২২)

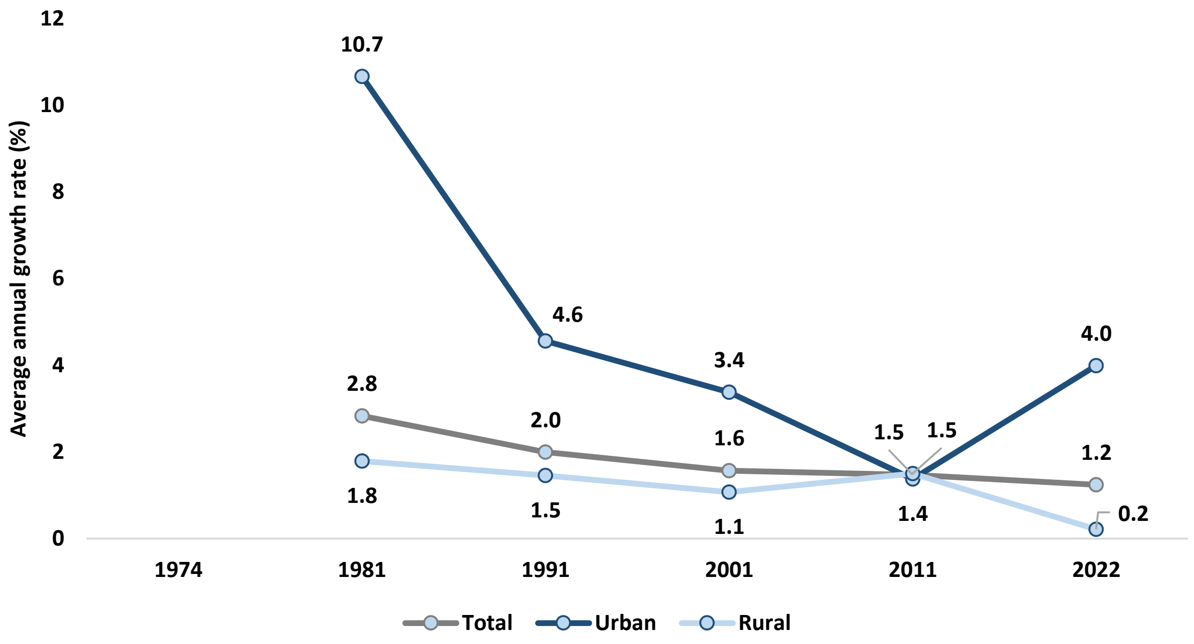

জনসংখ্যার ঘনত্ব বাংলাদেশের এক অনন্য বাস্তবতা, যা আমাদের বিশ্বের বুকে একটি স্বতন্ত্র পরিচিতি দিয়েছে। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করেন ১,২০০ জনেরও বেশি মানুষ (চিত্র ৫a) (৫, ৬)। এই বিপুল ঘনত্ব বাংলাদেশকে বিশ্বের জনঘনত্বতম দেশগুলোর একটিতে পরিণত করেছে। মালদ্বীপ ছাড়া, এই ঘনত্ব আমাদের প্রতিবেশী সব দেশের চেয়েই অনেক বেশি। দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই জনসংখ্যার ঘনত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে (চিত্র ৫b) (৭)। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০০০ সালে দেশের উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উপকূলীয় দক্ষিণাঞ্চলের অনেক জায়গায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৫০০ জনেরও কম মানুষ বাস করতেন। কিন্তু ২০২০ সাল নাগাদ, এর বেশিরভাগ এলাকাতেই এই সংখ্যা বেড়ে ১,২৫০ জনে দাঁড়িয়েছে।সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন ঘটেছে ঢাকা ও এর আশপাশের অঞ্চলে। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১,৭৫০ জনেরও বেশি মানুষের বসবাস, এবং এর এলাকাও বিগত দুই দশকে কয়েকগুণ বেড়েছে। এই মানচিত্রগুলো একটি সুস্পষ্ট বার্তা দেয়: বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব শুধু যে অত্যন্ত বেশি তাই নয়, এটি দেশজুড়ে দ্রুতগতিতে বেড়েই চলেছে।

এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে এখনই সময় দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে নতুনভাবে গড়ে তোলার। ঐতিহাসিকভাবে আমাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কাঠামো তৈরি হয়েছিল মূলত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন মাথায় রেখে (৮)। কিন্তু এখন বাস্তবতা বদলে গেছে। নগরায়নের দ্রুত বিস্তার তৈরি করেছে নতুন চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ—যেমন অতিরিক্ত জনবসতি, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের ঘাটতি, ভয়াবহ বায়ু দূষণ এবং অসংক্রামক রোগের ক্রমবর্ধমান বিস্তার ও চাপ। এই নতুন চ্যালেঞ্জগুলো কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে স্বাস্থ্য সেবার পরিকল্পনা, কাঠামো, ব্যবস্থাপনা এবং অর্থায়ন পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন আনা জরুরি। নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর করতে প্রয়োজন উদ্ভাবনী সব সমাধান। যেমন: সীমিত জায়গায় বহুতল স্বাস্থ্য অবকাঠামো নির্মাণ, বিদ্যমান অবকাঠামোর বহুমুখী ব্যবহার এবং টেলিমেডিসিনসহ বিভিন্ন ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবার প্রসার ঘটানো। এই ধরনের উদ্যোগগুলো একদিকে যেমন জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করবে, তেমনি অন্যদিকে পরিচালন দক্ষতা (management efficiency) বাড়াবে, সেবার পরিধি (health service coverrage) আরও বিস্তৃত করবে এবং সব নাগরিকের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার সুযোগ তৈরি করবে। এভাবেই বাংলাদেশ ভবিষ্যতের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, সক্ষম এবং টেকসই স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে।।

Figure ৫: *বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব **(২০২১ সাল)** (সূত্র: বিশ্বব্যাংক ২০২১ এবং গ্লোবাল হেলথের উদাহরণসমূহ)*

a: আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

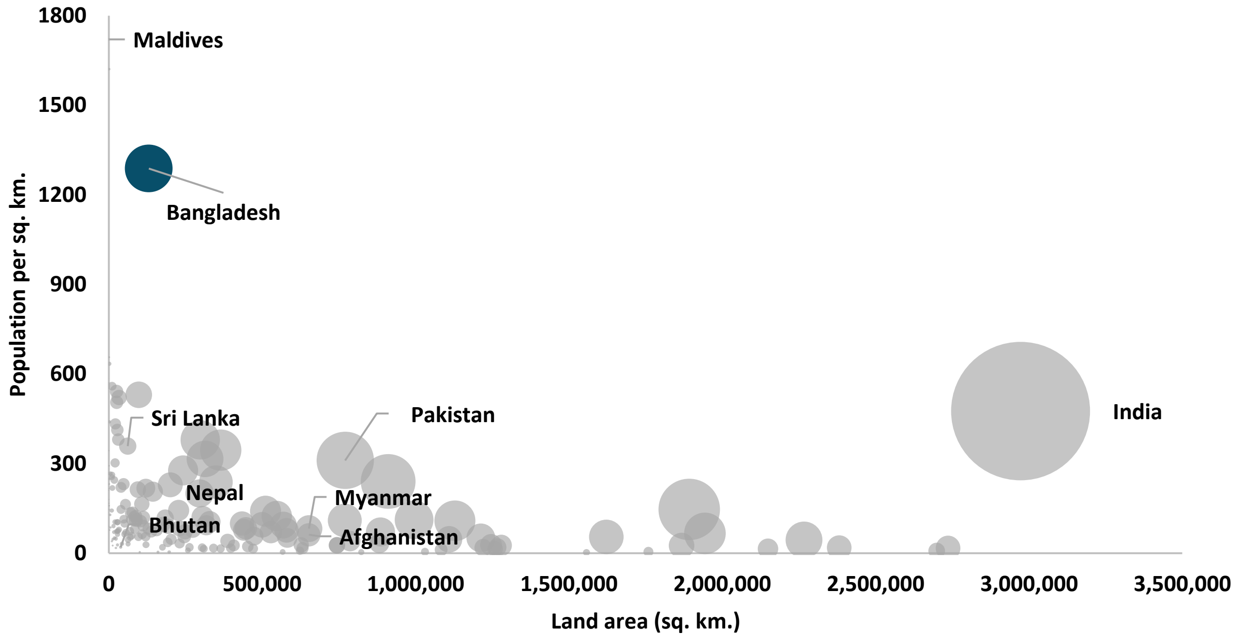

b: জাতীয় প্রেক্ষাপট

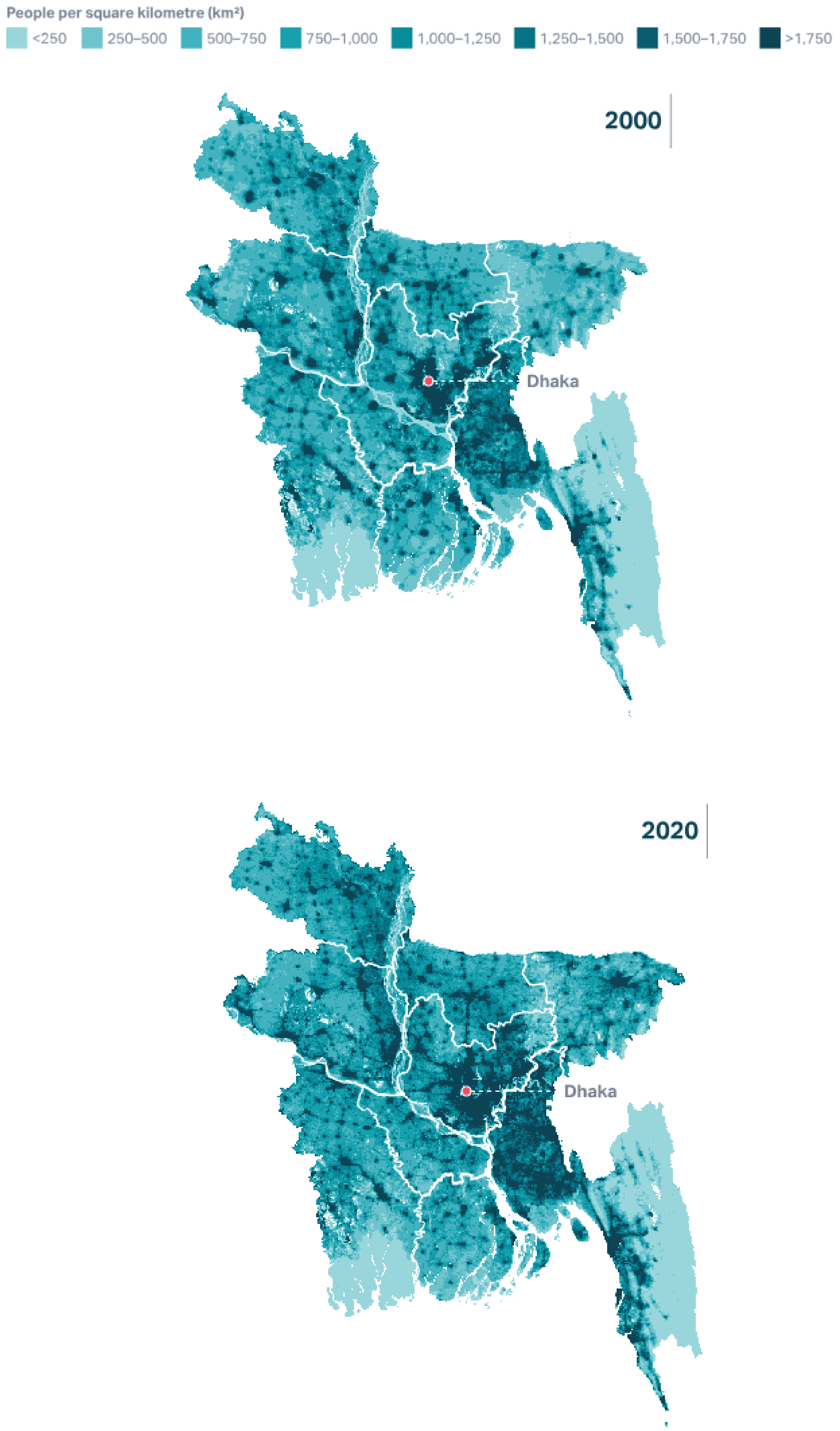
People per square kilometre (km²)
<250
250–500
500–750
750–1,000
1,000–1,250
1,250–1,500
1,500–1,750
>1,750
2000
Dhaka
2020
Dhaka

বয়স কাঠামো, প্রজনন হার এবং গড় আয়ু

বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা কাঠামো একটি যুবসমৃদ্ধ সমাজের প্রতিচিত্র তুলে ধরে, যা ২০২১ সালের জনসংখ্যা পিরামিডে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে (চিত্র ৬) (৯)। দেশের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও বেশি মানুষ ২০ বছরের নিচে। এর মধ্যে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু প্রায় ৯ শতাংশ, আর ৫–৯, ১০–১৪ ও ১৫–১৯ বছর বয়সী প্রতিটি গোষ্ঠীর অনুপাত প্রায় ১০ শতাংশ করে।

জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ কর্মক্ষম বয়সসীমার (২০–৬৪ বছর) মধ্যে অবস্থান করছে, যার মধ্যে ২০ থেকে ৩৯ বছর বয়সী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা সর্বাধিক। এটি বাংলাদেশের জন্য কর্মসংস্থান, উৎপাদনশীলতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এক বিশাল সম্ভাবনা তৈরি করেছে। তবে জনসংখ্যা পিরামিডের গঠন আরও একটি বিষয় স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। বাংলাদেশ যদিও এখনো তরুণ জনগোষ্ঠীর দেশ, তবুও ধীরে ধীরে এটি একটি বার্ধক্যমুখী সমাজে রূপান্তরের দিকে এগোচ্ছে।

Figure ৬: *বাংলাদেশের জনসংখ্যার বয়স ও লিঙ্গ ভিত্তিক কাঠামো* ***(২০২১ সাল)*** *(সূত্র: গ্লোবাল বার্ডেন অফ ডিজিজ ২০২১)*

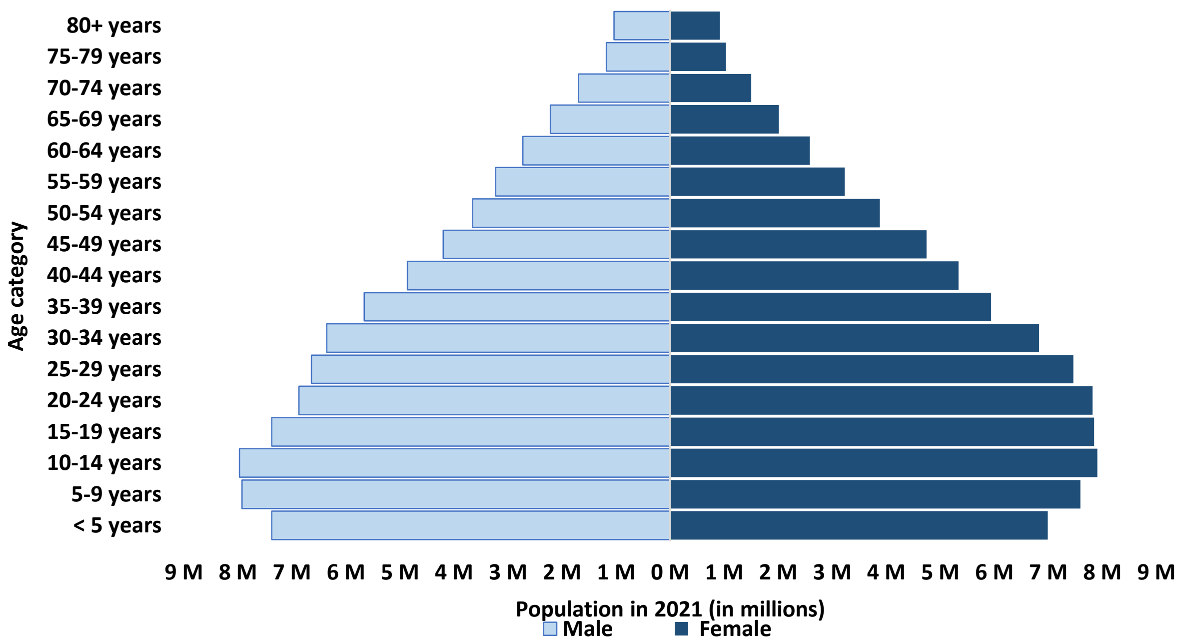

চিত্র ৭-এ ১৯৯০ সাল থেকে ২০৫০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যা কাঠামোর পরিবর্তনের একটি সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে (৯)। ২০২১ সালে দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৫৭ শতাংশ ছিল কর্মক্ষম (২০–৬৪ বছর)। অথচ ১৯৯০ সালে এটি ছিল মাত্র ৪১ শতাংশ। ধারণা করা হচ্ছে, এই কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী ২০৪০ সালের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬৪ শতাংশে পৌঁছাবে। অর্থাৎ, বাংলাদেশের সামনে এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ জনমিতিক সুযোগের জানালা (Demographic Window Of Opportunity) উন্মোচিত হয়েছে—যা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতা ও সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য গতি আনা সম্ভব।

অন্যদিকে, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের পরিমান ১৯৯০ সালে ছিল ১৭ শতাংশ, যা ২০২১ সালে কমে ৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এই ধারা বজায় থাকলে, ২০৫০ সালের মধ্যে এটি আরও হ্রাস পেয়ে ৪ শতাংশে পৌঁছাবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটি ঘটবে ২০৩০-এর দশকে, যখন দেশের প্রবীণ জনসংখ্যা (৬৫ বছর ও তার বেশি) প্রথমবারের মতো পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে। ২০৫০ সালের মধ্যে প্রবীণদের অনুপাত বেড়ে হবে ১৮ শতাংশ, যা সেই সময়ের ৫–১৯ বছর বয়সী তরুণদের তুলনায় (১৪ শতাংশ) বেশি হবে।

এই বিশ্লেষণ আমাদের সামনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা স্পষ্ট করে তুলে ধরে। একদিকে, দেশের বড় একটি তরুণ জনগোষ্ঠী আছে—যাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে পারলে, তারা হতে পারে জাতীয় উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি। অন্যদিকে, দ্রুত বাড়ছে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা—তাই এখনই প্রয়োজন একটি সুসংগঠিত বার্ধক্যসেবা ও শক্তিশালী সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে তোলার প্রস্তুতি নেওয়া।

Figure ৭: *বাংলাদেশে বিভিন্ন বয়স অনুযায়ী জনসংখ্যার পরিবর্তনের চিত্র (উৎস: গ্লোবাল বার্ডেন অফ ডিজিজ)*

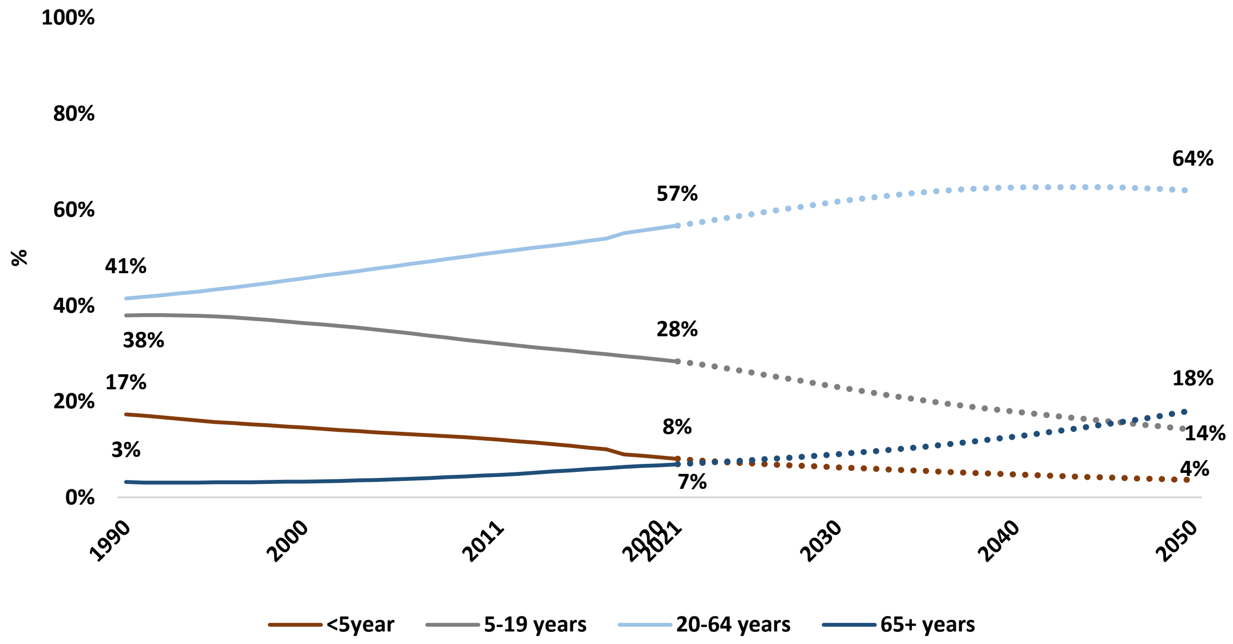

চিত্র ৮-এ দেখা যায়, ১৯৮২ সালে একজন নারীর গড় প্রজনন হার ছিল ৫-এরও বেশি। সেখান থেকে এটি ধারাবাহিকভাবে কমতে কমতে ২০২২ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ২.৩-এ (১০-১২)। সবচেয়ে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে ১৯৯০-এর দশকে। ১৯৯৩–৯৪ সালে নারীদের গড় প্রজনন হার ছিল ৩.৪, যা ২০০৪ সালে নেমে আসে ৩.০-এ এবং ২০১১ সালে আরও কমে দাঁড়ায় ২.৩-এ। এরপর গত এক দশকের বেশি সময় ধরে এই হার প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে এবং বর্তমানে তা প্রতিস্থাপন হারের (২.০) কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছে।

চিত্র ৯-এ দেখা যায়, ১৯৯০ সালে গড় আয়ু ছিল ৬০ বছর, পুরুষদের জন্য ৫৮ এবং নারীদের জন্য ৫৯ বছর (৯)। ২০২১ সালে গড় আয়ু বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭২ বছরে, পুরুষদের জন্য ৭১ এবং নারীদের জন্য ৭৩ বছর। এই ধারা বজায় থাকলে, ২০৫০ সালের মধ্যে গড় আয়ু আরও বেড়ে ৮০ বছর হতে পারে, নারীদের ক্ষেত্রে ৮২ বছর এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে ৭৯ বছর। এই দুটি পরিবর্তন— গড় প্রজনন হারের নিম্নগতি এবং গড় আয়ুর ঊর্ধ্বগতি—স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে বাংলাদেশ একটি গভীর জনমিতিক পরিবর্তনের (Demographic Transition) মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে।

এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে এখন স্বাস্থ্যনীতি ও অর্থায়ন কাঠামো জীবনচক্রভিত্তিক করা জরুরি হয়ে পড়েছে। জীবনের প্রতিটি ধাপ—শৈশব, কৈশোর, কর্মজীবন ও বার্ধক্য—বয়স, লিঙ্গ এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী উপযুক্ত ও সংবেদনশীল সেবা নিশ্চিত করতে হবে। জনসংখ্যার চাহিদা বদলে গেছে, আরও বদলাবে—এই বাস্তবতা মাথায় রেখে এখনই স্বাস্থ্যব্যবস্থা, অর্থায়ন এবং সেবাদানের পদ্ধতি নতুনভাবে সাজাতে হবে, যেন বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দুই প্রজন্মের চাহিদা পূরণ করা যায়।

Figure ৮: *বাংলাদেশের **নারীদের** গড় প্রজনন হার (TFR) (সূত্র: বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক হেলথ সার্ভে, মাল্টিপল ইনডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে এবং বাংলাদেশের স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম)*

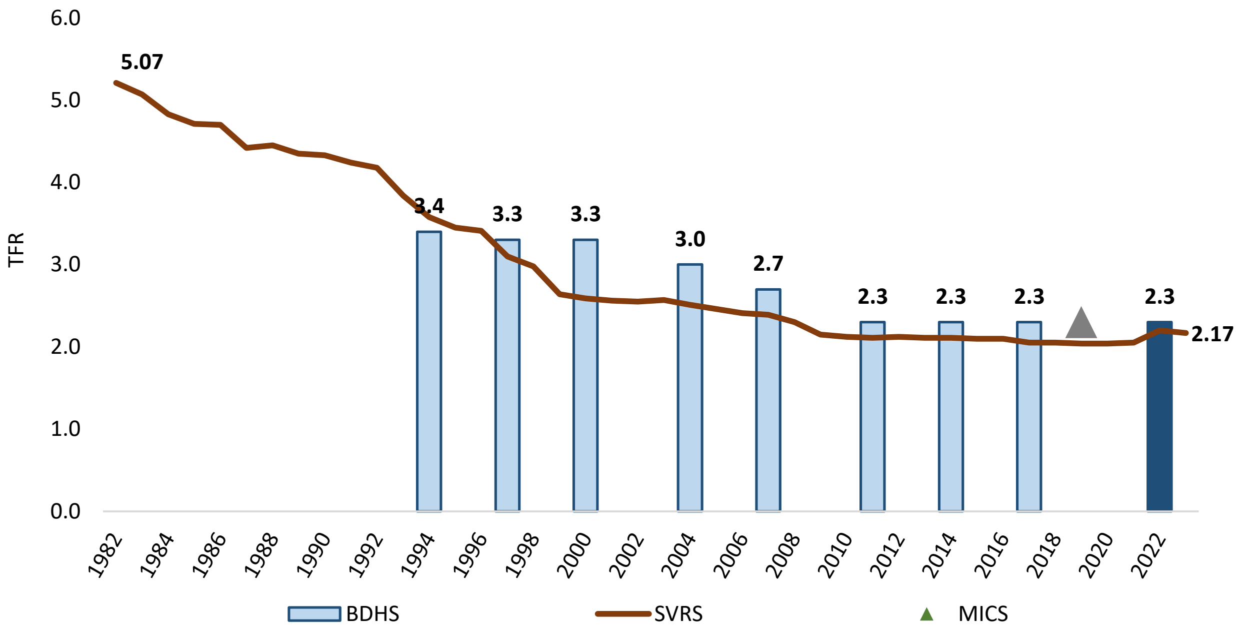

Figure ৯: বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু (সূত্র: গ্লোবাল বার্ডেন অফ ডিজিজ **২০২১**)

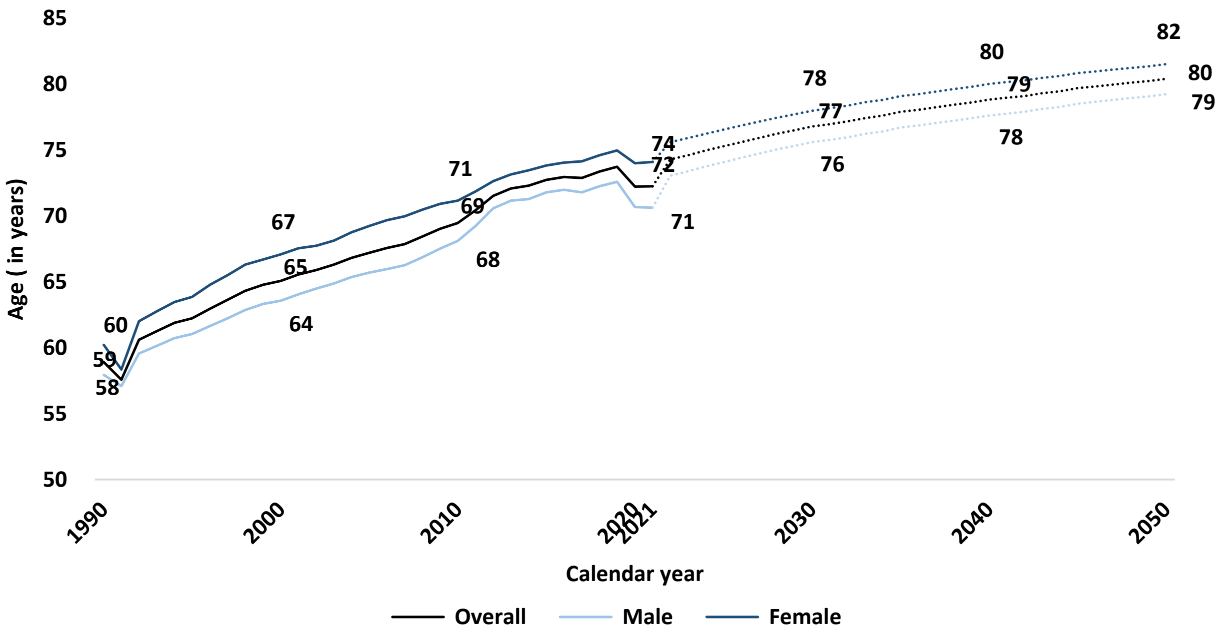

স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি

মৃত্যুহার ও রোগের প্রকোপ

চিত্র ১০ থেকে ১৩ পর্যন্ত তথ্য বিশ্লেষণে স্পষ্টভাবে দেখা যায়- বাংলাদেশে বয়স ভিত্তিক মৃত্যু এবং ডালি (DALY)-এর মোট পরিমান ও হার বিগত দশকে নাটকীয়ভাবে বদলে গেছে । এক সময় শিশু মৃত্যুই ছিল সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয়, কিন্তু এখন স্বাস্থ্যখাতের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্য যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। প্রথম বড় পরিবর্তন এসেছে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর মধ্যে। ১৯৯০ সালের তুলনায় ২০২১ সালে এই বয়সের শিশুদের মৃত্যুহার (চিত্র ১১) এবং ডালি (DALY) হার প্রায় ৮০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে (চিত্র ১৩) (৯) । এটি বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের এক বড় সাফল্য। তবে চিত্র ১২ থেকে বোঝা যায়, ২০২১ সালেও শিশুদের DALY-এর পরিমাণ ছিল অন্যান্য বয়স শ্রেণির তুলনায় বেশি (৯)। এর মানে, অনেক শিশু এখন বেঁচে থাকলেও তারা এমন সব রোগ বা প্রতিবন্ধকতা (disability) নিয়ে বেঁচে আছে যা তাদের ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

দ্বিতীয় বড় পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর (৬৫ বছর ও তদূর্ধ্ব) মধ্যে। চিত্র ১০ অনুযায়ী, দেশে মোট মৃত্যুর অর্ধেকের বেশি এই বয়সীদের মধ্যে ঘটে (৯)। চিত্র ১১ ও ১৩ বলছে, এই বয়সী জনগণের মৃত্যুহার এবং ডালি (DALY) হার এখন সবচেয়ে বেশি। বয়স্কদের মধ্যে মৃত্যুহার কিছুটা কমলেও দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা এবং কর্মক্ষমতা হারানোর কারণে জীবনের মান কমে যাচ্ছে— যা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি এবং সমন্বিত স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজন অনেক বেড়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে, কর্মক্ষম বয়সের জনগোষ্ঠী (২০–৬৪ বছর) এর চিত্র আরও জটিল। এই বয়সে মৃত্যুহার তুলনামূলকভাবে কম, কিন্তু চিত্র ১২ অনুযায়ী দেখা যায় যে এই শ্রেণির মানুষই দেশের মোট রোগভার বা ডালি (DALY)-এর সবচেয়ে বড় অংশ বহন করছে। অর্থাৎ, তারা বেঁচে থাকলেও অনেকেই অসুস্থতা, অক্ষমতা বা দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে দিয়ে জীবন কাটাচ্ছেন। ডালি (DALY) এর এই পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ হিসেবে রয়েছে অসংক্রামক রোগ, দুর্ঘটনা, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা; যার বেশিরভাগই প্রতিরোধযোগ্য হলেও বিদ্যমান স্বাস্থ্যব্যবস্থা তা প্রতিরোধ বা ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো, প্রায় সব বয়সেই পুরুষদের স্বাস্থ্যসূচক নারীদের তুলনায় খারাপ। চিত্র ১০ ও ১২ অনুযায়ী, পুরুষদের মৃত্যুহার ও ডালি (DALY) হার বেশিরভাগ বয়সেই নারীদের তুলনায় বেশি। এর পেছনে রয়েছে কাজসংক্রান্ত ঝুঁকি, ঝুঁকিপূর্ণ জীবনাচার, স্বাস্থ্যসেবা চাওয়ার অনাগ্রহ এবং সামাজিক কাঠামোগত বাধা।

এই বিশ্লেষণ স্পষ্টভাবে দেখায় যে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যব্যবস্থার মূল বোঝা এখন আর ‘শুধু প্রাণ বাঁচানো’ নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদে মানুষকে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখা। শিশু মৃত্যু কমেছে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা, বার্ধক্যজনিত সমস্যায় দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসার চাহিদা বাড়ছে। এখন সময় হয়েছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে নিয়ে নতুনভাবে ভাবার। এককালীন চিকিৎসা নয়, জীবনের প্রতিটি ধাপে প্রয়োজন নির্ভর একীভূত সেবা নিশ্চিত করাই হতে হবে আগামী দিনের অগ্রাধিকার।

রোগের দ্বৈত বোঝা

চিত্র ১৪ ও ১৫ বাংলাদেশের মৃত্যুর কারণ এবং রোগের কারণে মানুষের জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া সুস্থ বছর বা ডালি (DALYs) সম্পর্কে জরুরি তথ্য দেয়। এই তথ্যগুলো পরিষ্কারভাবে জানায় যে দীর্ঘস্থায়ী অসংক্রামক রোগ (NCDs) এখন দেশের প্রধান স্বাস্থ্য ঝুঁকি। তবে, সংক্রামক রোগ এবং মা ও শিশুর স্বাস্থ্য বিষয়ক জটিলতা এখনও স্বাস্থ্য পরিস্থিতিকে কিছুটা প্রভাবিত করছে।

Figure ১০: বাংলাদেশে বয়স ও লিঙ্গ ভিত্তিক মৃত্যুর পরিমান (সূত্র: গ্লোবাল বার্ডেন অফ ডিজিজ ২০২১)

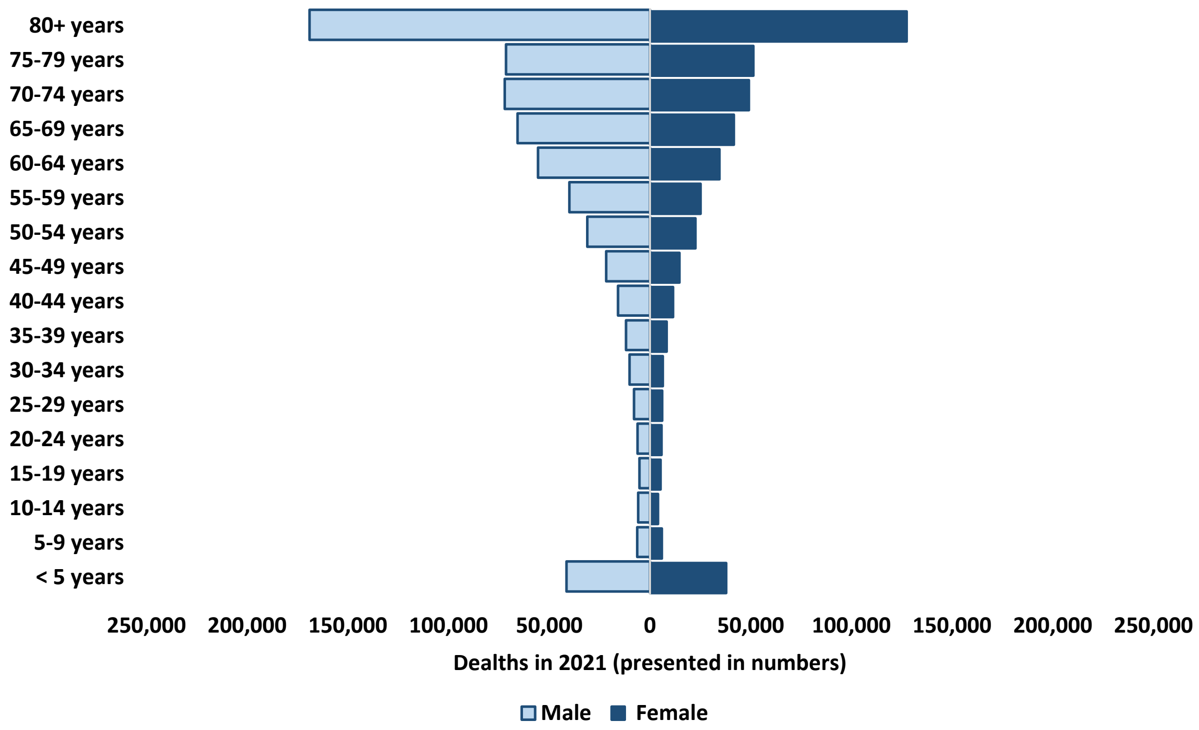

Figure ১১: বাংলাদেশে বয়সভিত্তিক মৃত্যুর হার (সূত্র: গ্লোবাল বার্ডেন অফ ডিজিজ)

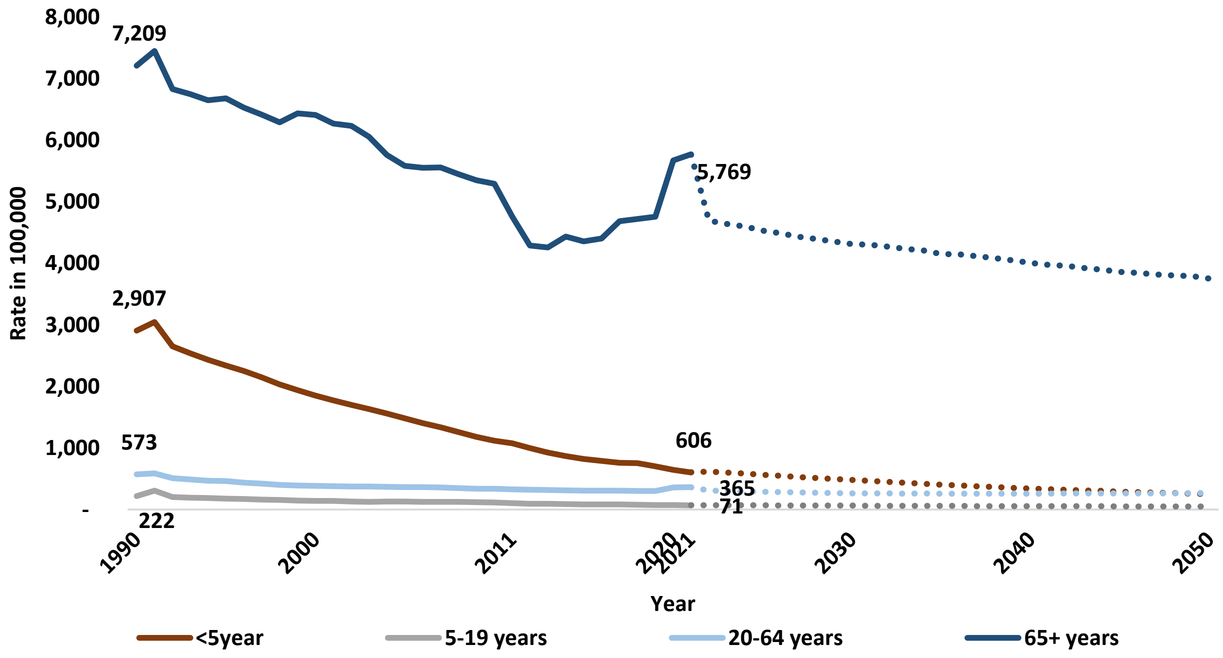

Figure ১২: ২০২১ সালে বাংলাদেশে বয়সগ্রুপ ও লিঙ্গভিত্তিক DALY (সূত্র: গ্লোবাল বার্ডেন অফ ডিজিজ)

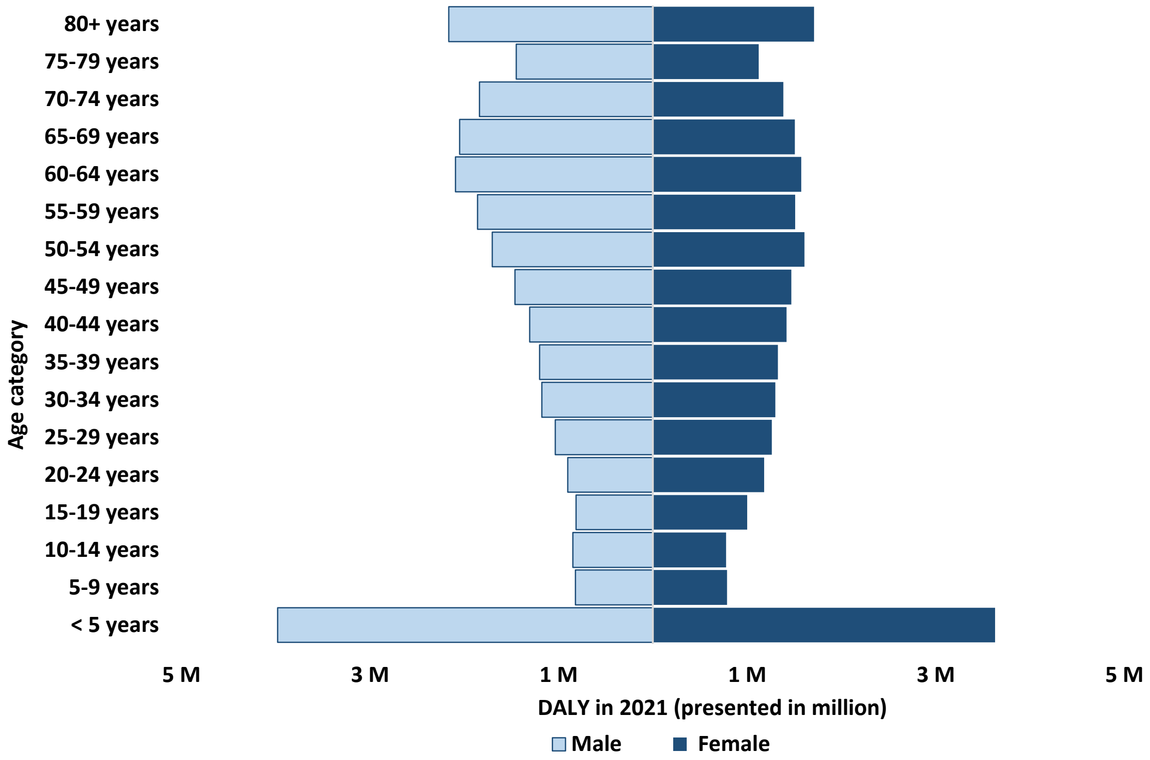

Figure ১৩: বাংলাদেশে বয়সভিত্তিক DALY হারের পরিবর্তনের ধারা (সূত্র: গ্লোবাল বার্ডেন অফ ডিজিজ)

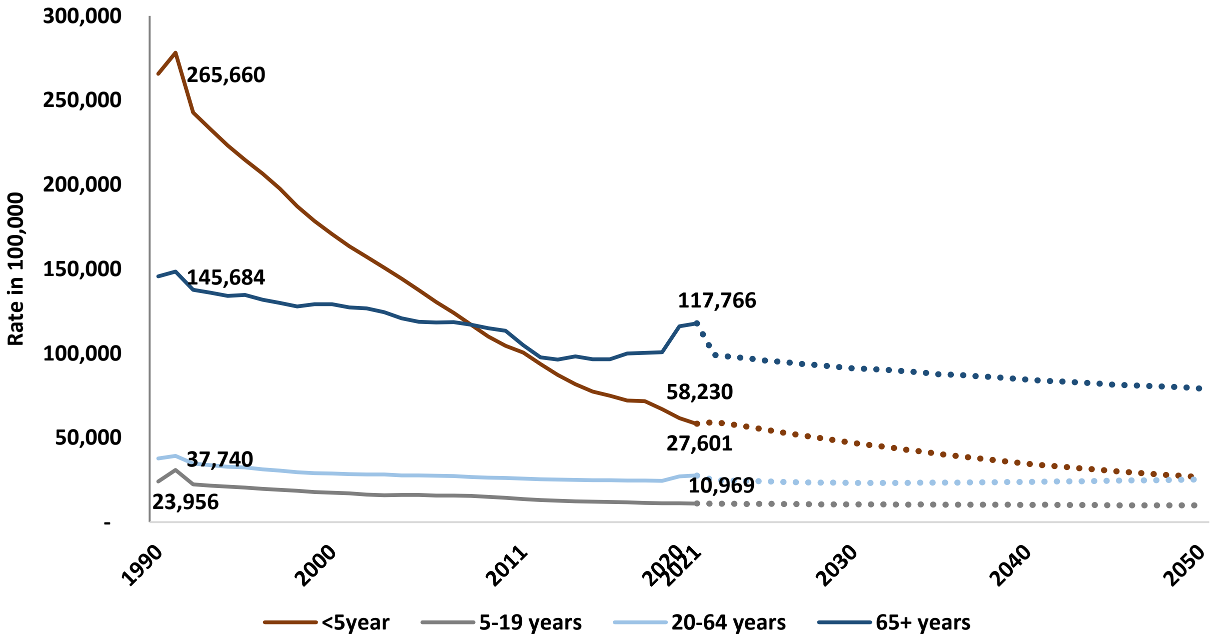

মৃত্যুর প্রধান কারণের তালিকায় হৃদরোগ সবচেয়ে এগিয়ে, মোট মৃত্যুর ৩৬ শতাংশের জন্য এটি দায়ী (চিত্র ১৪) (৯)। এরপরের তিনটি প্রধান কারন হলো- শ্বাসনালীর সংক্রমণ ও যক্ষ্মা (১৯%), দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসরোগ (৯%) এবং ক্যান্সার (৮%)। ডায়াবেটিস, কিডনির রোগ, পেটের রোগ এবং মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য বিষয়ক জটিলতাও এখনও মৃত্যুর গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে রয়ে গেছে। তবে, রোগের কারণে মানুষের জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া সুস্থ বছর বা ডালির (DALYs) হিসেবে চিত্রটি আরও বড় এবং ভাবনার বিষয় (চিত্র ১৫) (৯)। হৃদরোগ এখানেও প্রথমে (১৮%), কিন্তু মৃত্যুহারের তুলনায় এর গুরুত্ব কিছুটা কম, কারণ এটি সাধারণত বেশি বয়সে হয় এবং কর্মক্ষম জীবনের খুব কম বছর কেড়ে নেয়। অন্যদিকে, যেসব রোগ মৃত্যু এবং দীর্ঘমেয়াদী অক্ষমতা, দুটোই ঘটায়, যেমন মা ও নবজাতকের জটিলতা (১০%), মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা (৭%) এবং হাড় ও মাংসপেশীর রোগ (৭%), সেগুলোর অবদান ডালির (DALYs) হিসাবে অনেক বেশি। এছাড়াও, শ্বাসনালীর সংক্রমণ ও যক্ষ্মা ডালির (DALYs) ১৩ শতাংশের জন্য দায়ী, যা দেখায়, এই রোগগুলো শুধু প্রাণহানিই ঘটায় না, বরং দীর্ঘস্থায়ী দুর্বলতারও কারণ হয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলোঃ ডালির (DALYs) প্রভাব অনেক বেশি বিস্তৃত। যেখানে মৃত্যুহার মূলত কয়েকটি নির্দিষ্ট রোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সেখানে ডালির (DALYs) হার স্নায়ুর সমস্যা, দুর্ঘটনা, চোখ ও কানের রোগ ইত্যাদির মধ্যেও ছড়িয়ে আছে। এগুলো হয়তো মৃত্যু ঘটায় না, কিন্তু জীবনের মান অনেক কমিয়ে দেয়।

সব মিলিয়ে একটি স্পষ্ট বার্তা পাওয়া যায়। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শুধু মানুষকে বাঁচানোর দিকে নয়, বরং দীর্ঘকাল সুস্থ জীবন নিশ্চিত করার দিকেও মনোযোগ দিতে হবে। এর জন্য রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা, দ্রুত রোগ শনাক্তকরণ, পুনর্বাসন এবং দীর্ঘমেয়াদী যত্নে সরকারের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। বিশেষ করে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী ও প্রবীণদের জন্য এই সেবাগুলো নিশ্চিত করা জরুরি, যাতে তারা শুধু দীর্ঘজীবী না হন, সুস্থ জীবনও পান।

Figure ১৪: *২০২১ সালে বাংলাদেশে মৃত্যুর প্রধান কারণসমূহ (লেভেল ২) (সূত্র: গ্লোবাল বার্ডেন অফ ডিজিজ)*

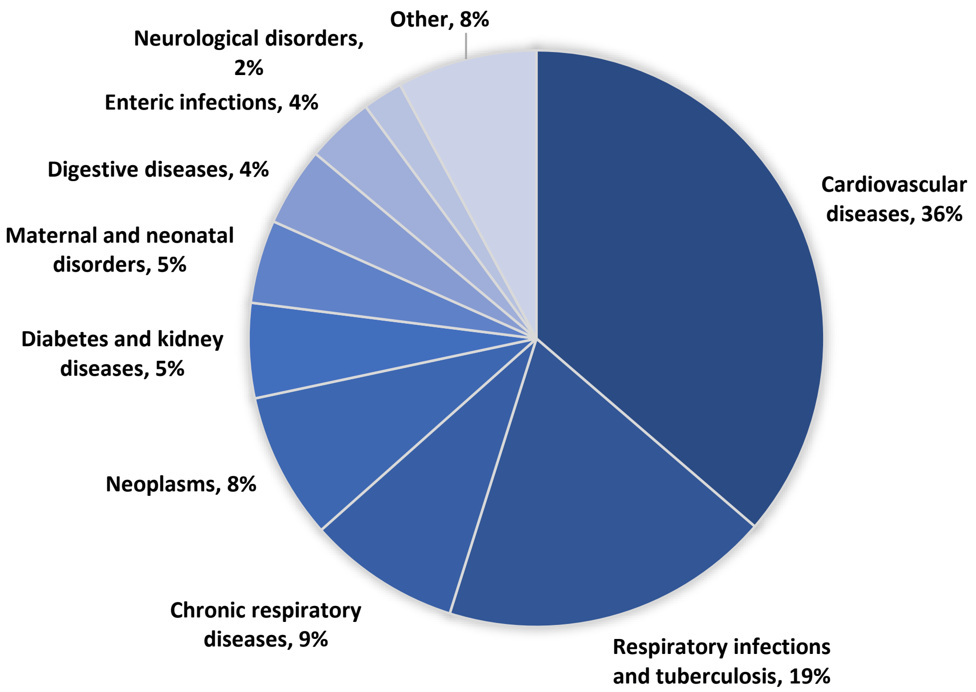

*Figure ১৫: ২০২১ সালে বাংলাদেশে **ডালি** (DALYs)-এর প্রধান কারণসমূহ (লেভেল ২) (সূত্র: গ্লোবাল বার্ডেন অফ ডিজিজ)*

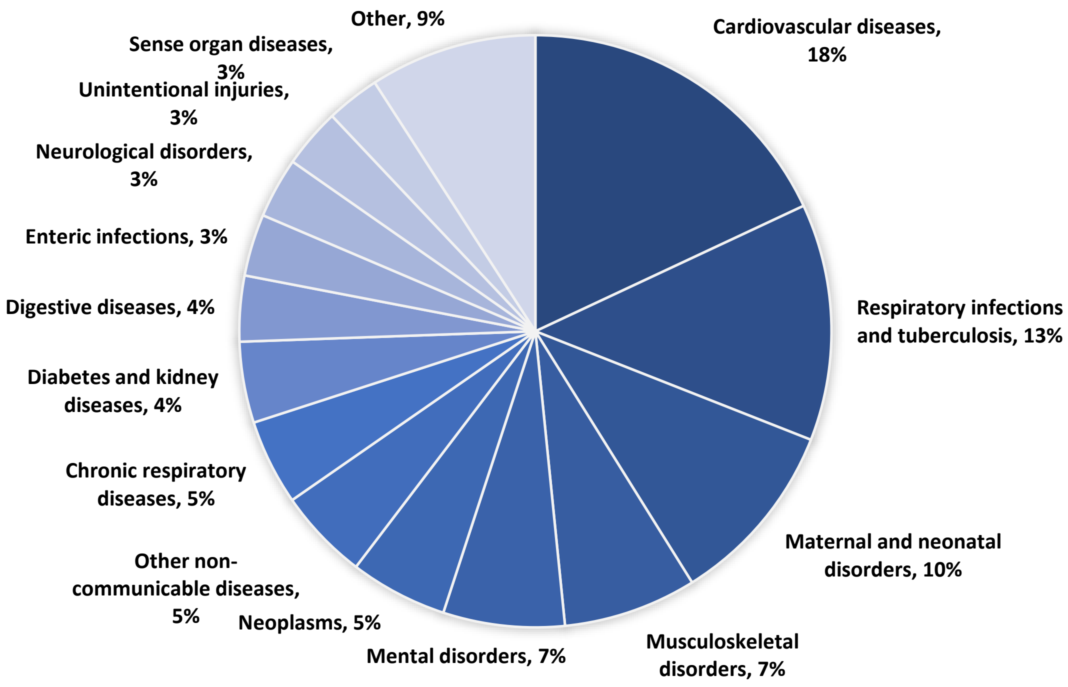

নারীর স্বাস্থ্য: বহুমাত্রিক সংকট

বাংলাদেশে নারীরা আজও জটিল এবং বহুস্তরের স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন। মাতৃমৃত্যু কমানোর ক্ষেত্রে দেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি করলেও, গর্ভাবস্থার জটিলতা, প্রসব পরবর্তী ফিস্টুলা, জরায়ু নিচে নেমে আসা এবং তীব্র রক্তশূন্যতা, বিশেষত গ্রামীণ ও সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলে, এখনও ব্যাপকভাবে বিদ্যমান (১৩)। নারীর স্বাস্থ্যের এমন অনেক দিক রয়েছে যা দীর্ঘকাল ধরে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অবহেলিত। সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার, এন্ডোমেট্রিওসিস এবং প্রজনন অঙ্গের দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণের মতো রোগ অসংখ্য নারীকে প্রভাবিত করলেও, এগুলো জাতীয় স্বাস্থ্য পরিকল্পনায় তেমন গুরুত্ব পায় না এবং বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রেও এদের অগ্রাধিকার কম দেখা যায় (১৪, ১৫)। নারীরা আরও বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যায় তুলনামূলকভাবে বেশি ভোগেন, যেমন উদ্বেগ ও বিষণ্নতার মতো মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা; আর্থ্রাইটিস, পিঠ ও কোমরের ব্যথা এবং রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের মতো দীর্ঘস্থায়ী অটোইমিউন রোগ। এই রোগগুলো নারীদের স্বাভাবিক চলাচল, কর্মক্ষমতা এবং জীবনের গুণগত মান কমিয়ে দেয়। অনেক নারী, বিশেষ করে বয়স্করা, এই অসুস্থতার কারণে ক্রমশ একা হয়ে পড়েন, অবহেলিত হন এবং অর্থনৈতিকভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে যান।

এই বাস্তবতা আমাদের একটি স্পষ্ট বার্তা দেয়, নারীর স্বাস্থ্য কেবল মাতৃত্বের সাথেই সম্পর্কিত নয়। নারীদের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রাতিষ্ঠানিক এবং কাঠামোগত পরিবর্তন অপরিহার্য। মানসিক স্বাস্থ্যসেবা, পুনর্বাসন এবং দীর্ঘমেয়াদী যত্ন, এই বিষয়গুলোকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার মূল ধারায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কমিউনিটি পর্যায়ে সেবার পরিধি বাড়াতে হবে এবং স্বাস্থ্যসেবাকে নারীদের বাস্তব জীবনের প্রেক্ষাপটে আরও সহজলভ্য, গ্রহণযোগ্য এবং সম্মানজনক করে তুলতে হবে।

জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে পুষ্টির অবস্থা

বাংলাদেশ শিশুদের অপুষ্টি মোকাবিলায় প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। ১৯৯৬ সালে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে বয়স-ভিত্তিক উচ্চতার ঘাটতি (স্টান্টিং) ছিল ৬০ শতাংশ, যা ২০২২ সালে উল্লেখযোগ্যভাবে কমে ২৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে (চিত্র ১৬) (১০) । একই সময়ে, ওজন-ভিত্তিক অপুষ্টি (আন্ডারওয়েট) ৫২ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২২ শতাংশে নেমে এসেছে। তবে,

উচ্চতার তুলনায় কম ওজন (ওয়েস্টিং) এখনও ১১ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে, যা জরুরি মনোযোগের দাবি রাখে। অন্যদিকে, শিশুদের মধ্যে অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা (ওভারওয়েট/ওবিসিটি) এখনও তুলনামূলকভাবে কম (২–৩ শতাংশ), তবে খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রার পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এই বিষয়ে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ অত্যাবশ্যক।

তবে, বর্তমানে পুষ্টিখাতে একটি নতুন চ্যালেঞ্জের উদ্ভব হয়েছে—বিশেষত কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে। ১৫–১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের মধ্যে প্রতি চারজনে একজন এখনও অপুষ্টিতে ভুগছে, যেখানে ১২ শতাংশ ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতার ঝুঁকিতে রয়েছে (চিত্র ১৭) (১০)। ২০–৪৯ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে অপুষ্টির হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে মাত্র ৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু একই সময়ে অতিরিক্ত ওজন ও স্থূলতার হার উদ্বেগজনকভাবে ৩৮ শতাংশে পৌঁছেছে। ২০০৭ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে নারীদের মধ্যে স্থূলতার হার দ্বিগুণ হয়েছে, পক্ষান্তরে অপুষ্টির হার অর্ধেকে হ্রাস পেয়েছে—এই দ্রুত পরিবর্তনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সময়ের বিবর্তনে এই পরিবর্তন আরও স্পষ্টতর হয়েছে। ২০০৭ থেকে ২০১৭–১৮ সালের মধ্যে ১৫–৪৯ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে অতিরিক্ত ওজনের হার ১২ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে এবং স্থূলতার হার ২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে (চিত্র ১৮) (১৬) । একই সময়ে, মাঝারি ও তীব্র অপুষ্টি (মডারেট অ্যান্ড সিভিয়ার থিননেস) ১২ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে মাত্র ৪ শতাংশে নেমে এসেছে। এই বিবর্তন সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, বাংলাদেশ একদিকে মাতৃ অপুষ্টি হ্রাসে সাফল্য অর্জন করেছে, অন্যদিকে একটি নবীন পুষ্টিজনিত ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে—যেখানে খাদ্যাভ্যাস ও জীবনধারা সংশ্লিষ্ট দীর্ঘস্থায়ী রোগ এবং বিপাকজনিত (মেটাবলিক) রোগ ক্রমশ প্রধান উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে (১৭)।

এই প্রেক্ষাপটে, পুষ্টিনীতিতে একটি সুষম পুনর্বিন্যাস অত্যাবশ্যক। অপুষ্টি হ্রাসের অর্জিত অগ্রগতি ধরে রাখার পাশাপাশি অতিপুষ্টি ও এর ফলস্বরূপ সৃষ্ট দীর্ঘস্থায়ী রোগ প্রতিরোধের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এই লক্ষ্যে প্রয়োজন: জীবনচক্র-ভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রম; স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও জীবনধারা প্রসারে ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি; খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগ। বিশেষত নারীদের জন্য স্বাস্থ্য সহায়ক পুষ্টিনীতি নিশ্চিত করা অপরিহার্য, যা তাদের সুস্থ জীবন যাপনে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে সহায়ক হবে। এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, নীতি নির্ধারকদের জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রণয়নে আমি প্রস্তুত। আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী সেই বিষয়েও সহায়তা করতে পারি।

Figure ১৬: *বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের পুষ্টির অবস্থার পরিবর্তনের ধারা (সূত্র: বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে ২০২২)*

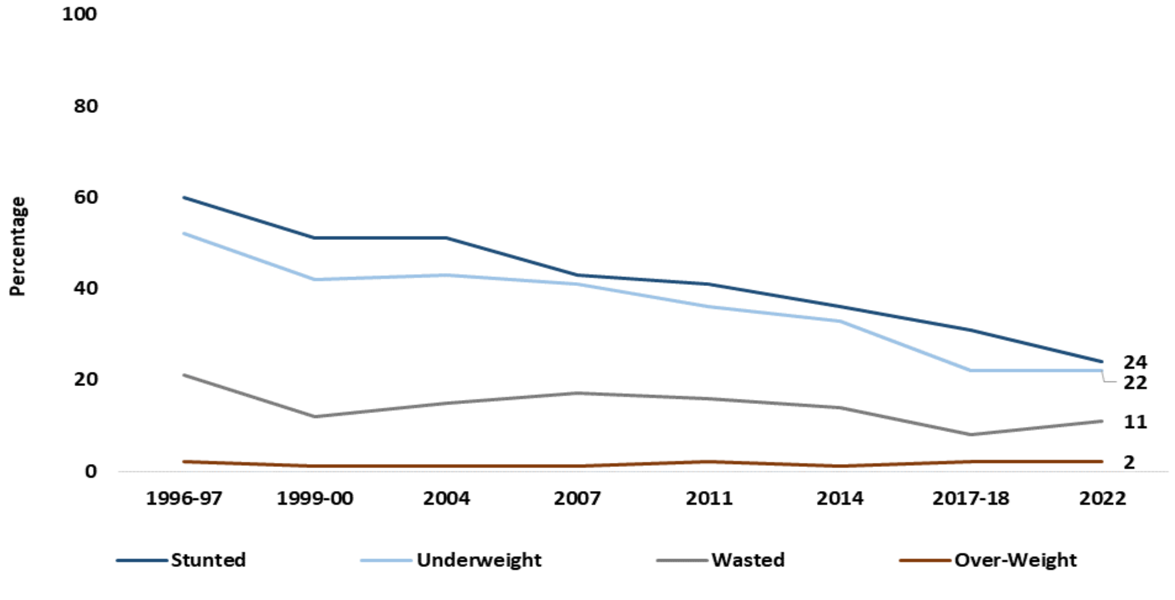

Figure ১৭: বাংলাদেশে কিশোরী মেয়েদের পুষ্টির অবস্থা (সূত্র: বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে ২০২২)

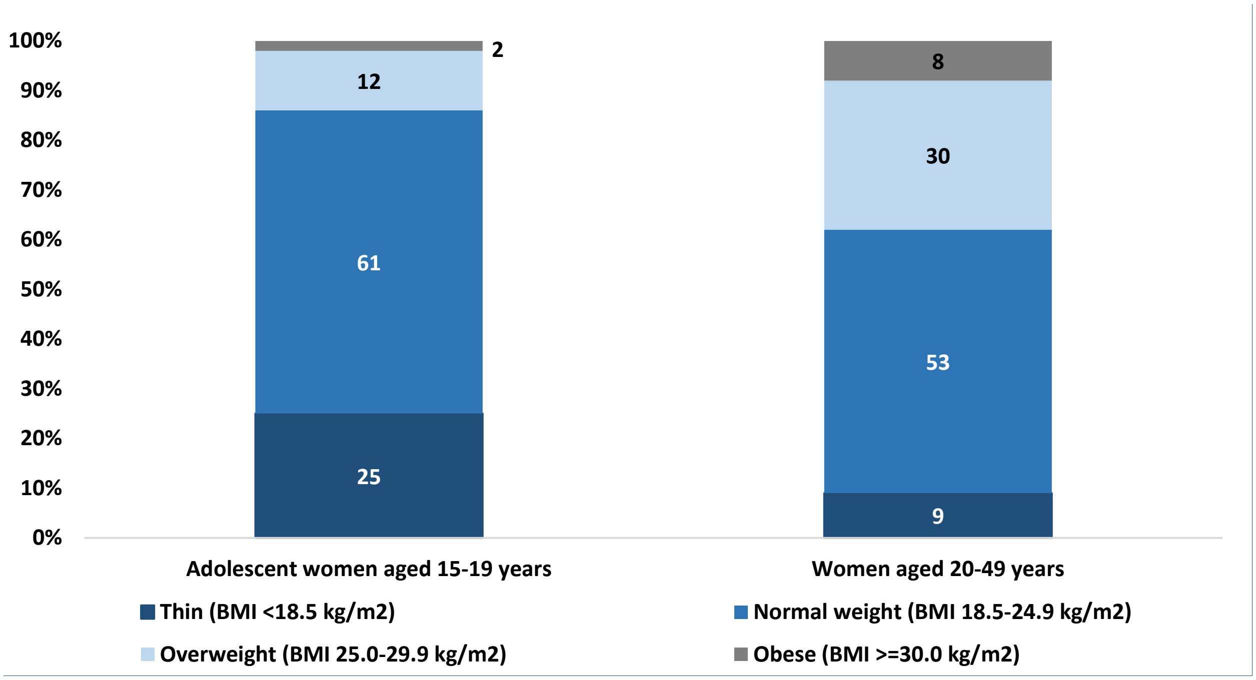

Figure ১৮: বাংলাদেশে ১৫–৪৯ বছর বয়সী নারীদের পুষ্টিগত অবস্থার পরিবর্তনের ধারা (উৎস: বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে ২০১৭-১৮)

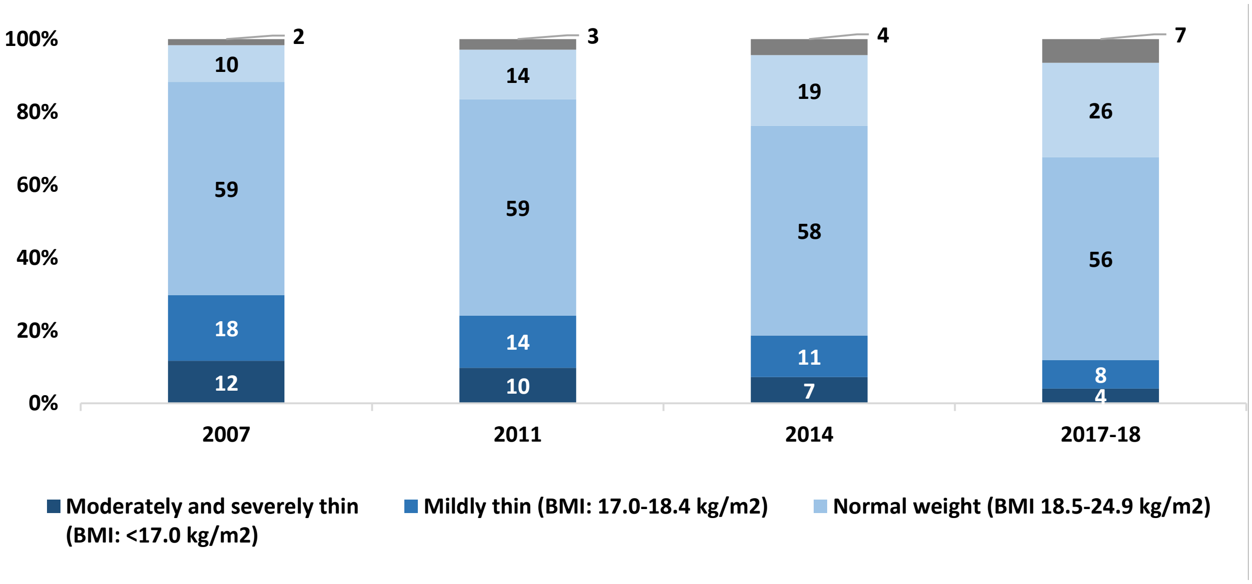

অর্থনীতি এবং উন্নয়ন

দেশের সামগ্রিক আর্থিক সক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হলো মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), যা একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত সকল পণ্য ও পরিষেবার মোট আর্থিক মূল্যকে উপস্থাপন করে। চিত্র ১৯-এ ২০০০ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জিডিপি'র গতিধারা তুলে ধরা হয়েছে, যা বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল হেলথ অ্যাকাউন্টস (বিএনএইচএ)-এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত (১৮-২০)।

উক্ত তিনটি সূত্রই সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করে, বিগত দুই দশকে বাংলাদেশ স্থিতিশীল ও অভিন্ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ২০০০ সালে দেশের চলতি বাজারদরে (nominal) জিডিপি ছিল ৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০২১ সালে প্রায় আটগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৪১৬ বিলিয়নে উন্নীত হয়েছে। প্রাক্কলন অনুযায়ী, ২০২৫ সালের মধ্যে এই অঙ্ক ৫৫০ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করতে পারে। যদিও ২০২০ সালে কোভিড-১৯ অতিমারীর কারণে সাময়িকভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কিছুটা বাধা আসে, তথাপি বাংলাদেশ দ্রুততার সাথে সেই ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

চিত্রটিতে ক্রয়ক্ষমতা সমতা (পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি - পিপিপি) অনুযায়ী জিডিপি'র প্রাক্কলনও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা জীবনযাত্রার ব্যয় বিবেচনায় একটি দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক সক্ষমতা নিরূপণ করে। এই গণনায় ২০২১ সালে বাংলাদেশের জিডিপি ছিল ১.২৫ ট্রিলিয়ন ডলার, যা ক্রমবর্ধমান পারিবারিক আয়, ভোগব্যয় এবং অর্থনীতির বহুমুখিতাকে ইঙ্গিত করে।

এই দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশের জন্য স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ এবং সামাজিক সুরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে বৃহত্তর পরিসরে বিনিয়োগের এক অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তবে কেবল প্রবৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়; এই অর্জনকে ফলপ্রসূ করতে হলে স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয় শুধু অর্থের পরিমাণে নয়, বরং জিডিপি'র শতাংশের হিসেবেও বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক। বিশেষভাবে একটি ক্রমশ বার্ধক্যমুখী সমাজ, ক্রমবর্ধমান দীর্ঘস্থায়ী রোগ এবং শহুরে স্বাস্থ্য বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে এই বিনিয়োগের গুরুত্ব অপরিসীম।

সঠিক পরিকল্পনা ও কৌশলগত নেতৃত্ব বিদ্যমান থাকলে, এই অর্থনৈতিক অগ্রগতি বাংলাদেশের জন্য একটি শক্তিশালী, ন্যায্য ও টেকসই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি স্থাপন করতে পারে, যা জাতীয় উন্নয়নকে জনগণের দৈনন্দিন জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তনে রূপান্তর করবে।

টেবিল ১A ও ১B অনুসারে, ২০২১ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল ২,৪৮৩ মার্কিন ডলার, যা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ এবং অর্থনৈতিকভাবে তুলনীয় দেশগুলোর সাপেক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করে (২১)। দক্ষিণ এশিয়ায় মাথাপিছু আয়ের নিরিখে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫২তম, যা ভারত (২,২৪০ ডলার, ১৫৫তম), পাকিস্তান (১,৪৫৫ ডলার, ১৭০তম), নেপাল (১,২৫৩ ডলার, ১৭৩তম) এবং আফগানিস্তান (৩৫৬ ডলার, ২০৩তম)-এর চেয়ে উন্নত। এটি বাংলাদেশের জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি, কারণ বিগত দশকগুলোতে বাংলাদেশ এই দেশগুলোর তুলনায় পিছিয়ে ছিল।

তবে এই অগ্রগতি সত্ত্বেও, বাংলাদেশ এখনও ভুটান (৩,৫৭১ ডলার), শ্রীলঙ্কা (৩,৯৯৯ ডলার) এবং মালদ্বীপের (১০,১৭৬ ডলার) চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। এই ফারাকের কারণ হলো জনসংখ্যার কাঠামোগত ভিন্নতা, উৎপাদন ব্যবস্থার বহুমুখিতা এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতার পার্থক্য।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে (টেবিল ১B), বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ঘানা (২,৪৪৬ ডলার, ১৫৩তম), উজবেকিস্তান (২,২৫৯ ডলার, ১৫৫তম) এবং কেনিয়ার (২,০৬১ ডলার, ১৫৯তম) মতো দেশগুলোর সমতুল্য, যদিও এই দেশগুলোর জনসংখ্যা বাংলাদেশের তুলনায় অনেক কম এবং উন্নয়নের গতিপথ ভিন্ন।

Figure ১৯: বাংলাদেশে জিডিপির (GDP) প্রবৃদ্ধির ধারা (সূত্র: বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হেলথ অ্যাকাউন্ট ১৯৯৭-২০২০)

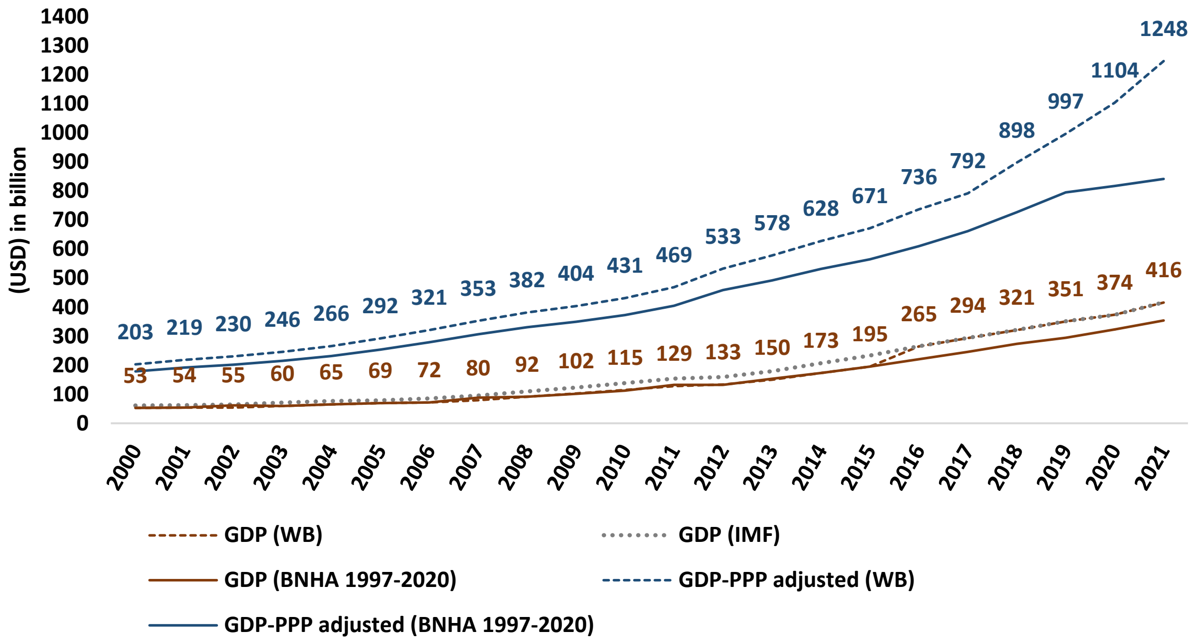

কিন্তু এখানে একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান, বাংলাদেশের মতো ১৬৭ মিলিয়ন মানুষের দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুবিধা ন্যায্যভাবে বণ্টন করা অত্যন্ত জটিল। এই বাস্তবতায়, দেশের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রেখে আয়ের বৈষম্য কমানো এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই মধ্যম আয়ের দেশের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া।

Table ১: ২০২১ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি (সূত্র: বিশ্বব্যাংক)

A: বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপির সাথে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনা

অঞ্চল	দেশ	জনসংখ্যা	মাথাপিছু জিডিপি	মাথাপিছু জিডিপি অনুযায়ী র‍্যাঙ্কিং
দক্ষিণ এশিয়া	আফগানিস্তান	৪০,০০০,৪১২	৩৫৬	২০৩
পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর	মিয়ানমার	৫৩,৩৮৭,১০২	১২৪৩	১৭৪
দক্ষিণ এশিয়া	নেপাল	২৯,৪৭৫,০১০	১২৫৩	১৭৩
দক্ষিণ এশিয়া	পাকিস্তান	২৩৯,৪৭৭,৮০১	১৪৫৫	১৭০
দক্ষিণ এশিয়া	ভারত	১,৪১৪,২০৩,৮৯৬	২২৪০	১৫৫
দক্ষিণ এশিয়া	**বাংলাদেশ**	**১৬৭,৬৫৮,৮৫৪**	**২৪৮৩**	**১৫২**
দক্ষিণ এশিয়া	ভুটান	৭৭৫,৪৪২	৩৫৭১	১৩৯
দক্ষিণ এশিয়া	শ্রীলংকা	২২,১৫৬,০০০	৩৯৯৯	১৩২
দক্ষিণ এশিয়া	মালদ্বীপ	৫১৬,১৫৪	১০১৭৬	৮২

B: বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপির সাথে সমতুল্য জিডিপি এরকম কিছু দেশের তুলনা

অঞ্চল	দেশ	জনসংখ্যা	জিডিপি বিলি)য়ন $)	মাথাপিছু জিডিপি)$)	মাথাপিছু জিডিপি অনুযায়ী র‍্যাঙ্কিং
পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকা	মৌরিতানিয়া	৪,৭৩৪,৮৭৪	৯	১৯৪৮	১৬২
পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর	সলোমন দ্বীপপুঞ্জ	৭৬২,৫৯১	২	১৯৯৭	১৬১
পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকা	নাইজেরিয়া	২১৮,৫২৯,২৮৬	৪৪১	২০১৭	১৬০
পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকা	কেনিয়া	৫৩,২১৯,১৬৬	১১০	২০৬১	১৫৯
লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান	নিকারাগুয়া	৬,৬৪৪,৭৪১	১৪	২১২৯	১৫৮
দক্ষিণ এশিয়া	ভারত	১,৪১৪,২০৩,৮৯৬	৩১৬৮	২২৪০	১৫৭
পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর	কিরিবাতি	১,২৮,৩৭৭	০	২২৫৪	১৫৬
ইউরোপ ও মধ্য এশিয়া	উজবেকিস্তান	৩৪,২৪৩,৬৯৬	৭৭	২২৫৯	১৫৫
পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকা	সাও টোমে ও প্রিনসিপে	২,২১,৯৬১	১	২৩৬৩	১৫৪
পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকা	ঘানা	৩২,৫১৮,৬৬৫	৮০	২৪৪৬	১৫৩
দক্ষিণ এশিয়া	**বাংলাদেশ**	**১৬৭,৬৫৮,৮৫৪**	**৪১৬**	**২৪৮৩**	**১৫২**
পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকা	কঙ্গো, প্রজাতন্ত্র	৫,৮৯২,১৮৩	১৫	২৫১৬	১৫১
পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর	লাওস পিডিআর	৭,৪৫৩,১৯৪	১৯	২৫২৬	১৫০
পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর	পাপুয়া নিউগিনি	১০,০১২,৮৯৬	২৬	২৬০৮	১৪৯
পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকা	কোত দভো'য়ার	২৯,৬৩৯,৭৩৬	৭৯	২৬৪৯	১৪৮
পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর	তিমোরলেস্টে-	১,৩৫০,১৩৯	৪	২৬৮৫	১৪৭
লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান	হন্ডুরাস	১০,২৮৯,৮৭৭	২৮	২৭৩৫	১৪৬
মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা	জিবুতি	১,১২১,২৪৮	৩	৩০২০	১৪৫
পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর	ভানুয়াতু	৩,০৫,৮৬৮	১	৩১০৭	১৪৪
লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান	বলিভিয়া	১১,৯৩৭,৩৬০	৪০	৩৩৮৫	১৪৩
পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর	মাইক্রোনেশিয়া, ফেড . স্টেটস	১,১১,৬২৪	০৪.	৩৪৯৪	১৪২

চিত্র ২০ ও ২১-এর তথ্য স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান করে—বিগত তিন দশকে বাংলাদেশের আয় বৈষম্য প্রায় একই স্তরে স্থির থেকেছে (২২)। এই বিশ্লেষণে গিনি সূচক ব্যবহৃত হয়েছে—যেখানে '০' পূর্ণাঙ্গ সমতা এবং '১০০' প্রকট বৈষম্য নির্দেশ করে। ২০২২ সালে বাংলাদেশের গিনি সহগ ছিল ৩৩, যা মাঝারি মাত্রার বৈষম্য নির্দেশ করলেও এমন এক অবস্থানে বিদ্যমান, যা দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক স্থিতিশীলতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে।

চিত্র ২০-এ দৃষ্টিগোচর হয়, ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের গিনি সূচক ছিল ২৮, যা ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩-এ উপনীত হয়। এরপর থেকে এটি প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে। অর্থাৎ, এই কালপর্বে দেশের অর্থনীতি বহুমাত্রিকভাবে সম্প্রসারিত

হয়েছে এবং চরম দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে—তথাপি আয় বৈষম্যের ক্ষেত্রে কোনো দৃশ্যমান পরিবর্তন সূচিত হয়নি। চিত্র ২১ অনুযায়ী, আয় বৈষম্যের নিরিখে বাংলাদেশ বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বৈষম্যপূর্ণ রাষ্ট্র। গিনি সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ভারতের (৩৩) সমতুল্য হলেও ভুটান (২৯), নেপাল (৩০) ও পাকিস্তানের (৩০)-এর তুলনায় সুস্পষ্টভাবে বেশি।

এই দীর্ঘস্থায়ী বৈষম্য স্বাস্থ্যখাতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলছে। যেখানে আয়ের ভিত্তিতে এত তীব্র বৈষম্য বিরাজমান, সেখানে অভিন্ন ফি-ভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবস্থা অথবা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ব্যয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আরও প্রান্তিক করে তুলছে। গিনি সূচকের এই স্থিতাবস্থা ইঙ্গিত দেয়—সর্বাপেক্ষা পিছিয়ে থাকা পরিবারগুলো এখনও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত হতে পারেনি। ফলস্বরূপ, স্বাস্থ্যসেবা ব্যয়ের ক্ষেত্রে তাদের ঝুঁকি ও দুর্ভোগ সর্বাধিক।

Figure ২০: *বাংলাদেশে আয়ের বৈষম্যের ধারা, যা গিনি সূচকের (Gini coefficient) মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে (সূত্র: বিশ্বব্যাংক)*

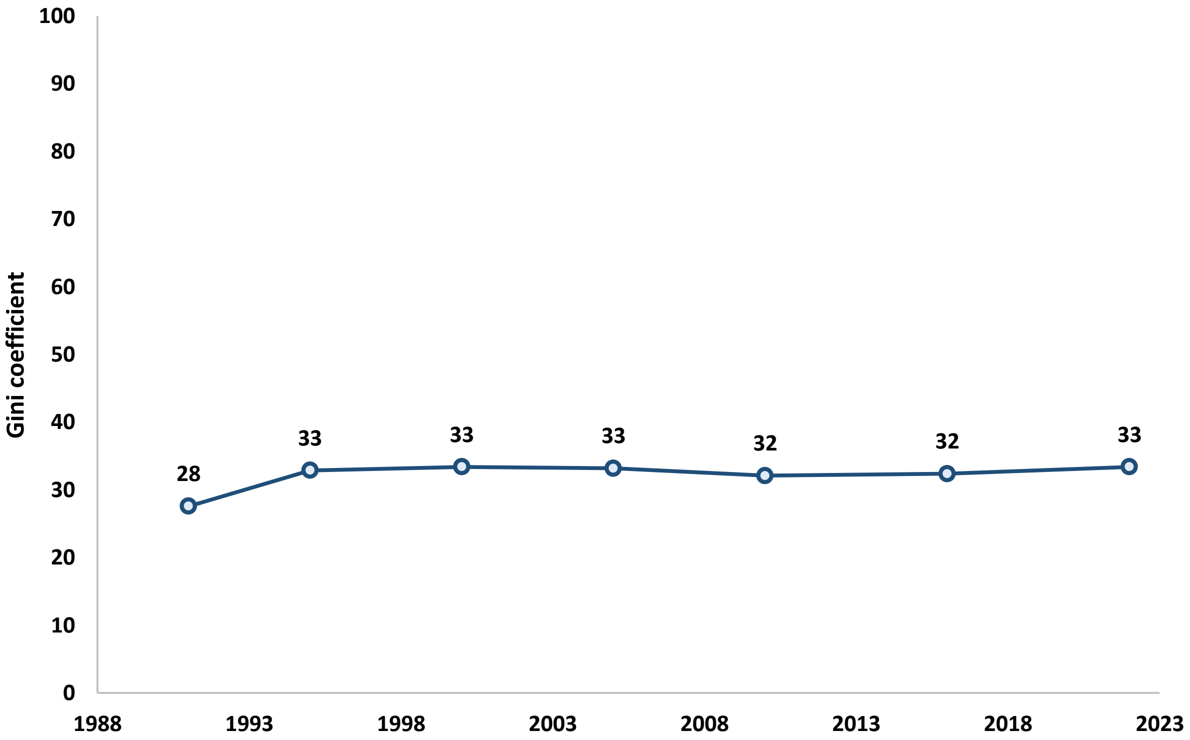

চিত্র ২২ ও ২৩-এর তথ্য বিশ্লেষণে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের দীর্ঘকালীন অগ্রগতি যেমন সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে, তেমনই এর ভৌগোলিক বৈষম্যও প্রকটভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।

২০০০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে, উচ্চ দারিদ্র্যসীমা অনুযায়ী দেশের সামগ্রিক দারিদ্র্যের হার ৪৯ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে, নিম্ন দারিদ্র্যসীমা অনুযায়ী দারিদ্র্য ৩৪ শতাংশ থেকে কমে মাত্র ৬ শতাংশে নেমে এসেছে। অর্থাৎ, গত দুই দশকে দারিদ্র্য কমেছে যথাক্রমে ৬০ শতাংশের বেশি ও ৮০ শতাংশের বেশি—যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম এবং জনগণের আয় বৃদ্ধির সম্মিলিত প্রভাব নির্দেশ করে।

Figure ২১: বাংলাদেশ এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে আয়ের বৈষম্যের তুলনা, যা গিনি সূচকের (Gini coefficient) মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে (সূত্র: বিশ্বব্যাংক)

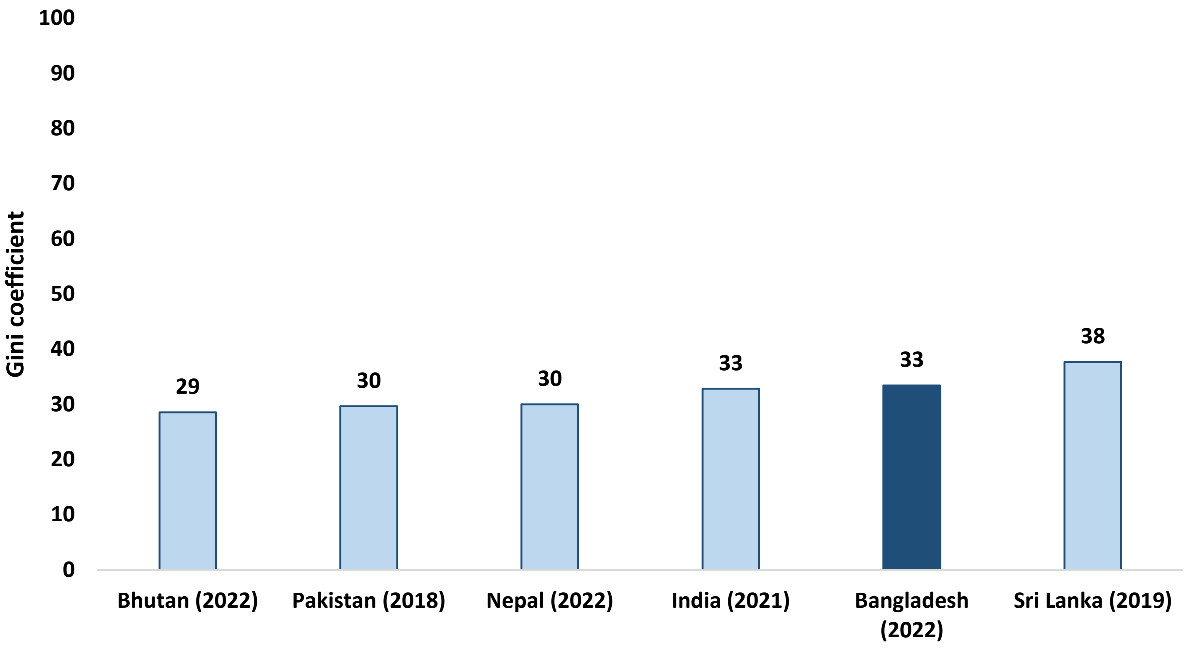

তবে, এই অর্জন দেশের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হয়নি। চিত্র ২২ অনুযায়ী, ২০২২ সালে গ্রামীণ অঞ্চলে দারিদ্র্যের হার এখনও শহরাঞ্চলের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। উচ্চ দারিদ্র্যসীমা অনুযায়ী গ্রামে দারিদ্র্যের হার ২১ শতাংশ, যেখানে শহরে তা ১৫ শতাংশ; নিম্ন দারিদ্র্যসীমার ক্ষেত্রেও গ্রামে এই হার ৭ শতাংশ, যা শহরে ৪ শতাংশ (২৩)। এই পার্থক্য বাংলাদেশের উন্নয়ন কাঠামোর একটি সুস্পষ্ট ভৌগোলিক বৈষম্যের ইঙ্গিত দেয়। তা হলো- জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এখনও তুলনামূলকভাবে অধিক অর্থনৈতিক ঝুঁকির সম্মুখীন।

এই বাস্তবতা স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়নের কাঠামোর জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। একদিকে, দারিদ্র্য হ্রাসের ফলে স্বাস্থ্যখাতে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির একটি অনুকূল সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে, গ্রামীণ দারিদ্র্যের স্থিতিশীলতা এবং দারিদ্র্যসীমার কাছাকাছি থাকা জনগোষ্ঠীর উচ্চ সংখ্যা নির্দেশ করে যে, স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়নের কৌশল কেবল দারিদ্র্য-ভিত্তিক লক্ষ্য নির্ধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সমীচীন হবে না। বরং, অর্থনৈতিক অপ্রত্যাশিত আঘাত থেকে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলোকে সুরক্ষা প্রদান, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ব্যয়ের উপর নির্ভরতা হ্রাস করা এবং শহর ও গ্রামের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবার সহজলভ্যতা ও গুণগত মানের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা এখন সময়ের অপরিহার্য দাবি। যদি এই বাস্তব চিত্রগুলো যথাযথভাবে বিবেচনায় না নেওয়া হয়, তবে স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় বহু পরিবারকে পুনরায় দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে নিক্ষেপ করতে পারে। এমন পরিস্থিতি কেবল স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নকেই ব্যাহত করবে না, বরং জাতীয় অগ্রগতির গতিধারাকে সম্পূর্ণরূপে থামিয়ে দেওয়ার ঝুঁকি তৈরি করবে।

২০০০ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ লক্ষণীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। এই সময়ে দেশের মানব উন্নয়ন সূচক (এইচডিআই) ০.৪৯ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ০.৬৬-এ উন্নীত হয়েছে (চিত্র ২৪) (২৪)। এই অগ্রগতি দক্ষিণ এশিয়ার বহু দেশের তুলনায় সুস্পষ্টভাবে অগ্রগামী এবং বাংলাদেশের একটি শক্তিশালী উন্নয়ন গতিধারাকে প্রতিফলিত করে (চিত্র ২৫) (২৪)। ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশ এইচডিআই সূচকে পাকিস্তান (০.৫৪) ও নেপালকে (০.৫৯) ছাড়িয়ে গেছে এবং ভারতের (০.৬৩) প্রায় সমকক্ষ অবস্থানে পৌঁছেছে। শ্রীলঙ্কা (০.৭৮) ও মালদ্বীপ (০.৭৫) এই অঞ্চলের শীর্ষে অবস্থান করছে, যেখানে আফগানিস্তান ২০১৫ সালের পর থেকে ক্রমশ নিম্নমুখী।

Figure ২২: অবস্থানভিত্তিক দারিদ্র্যের হার, ২০২২ (উৎস: এইচআইইএস ২০২২)

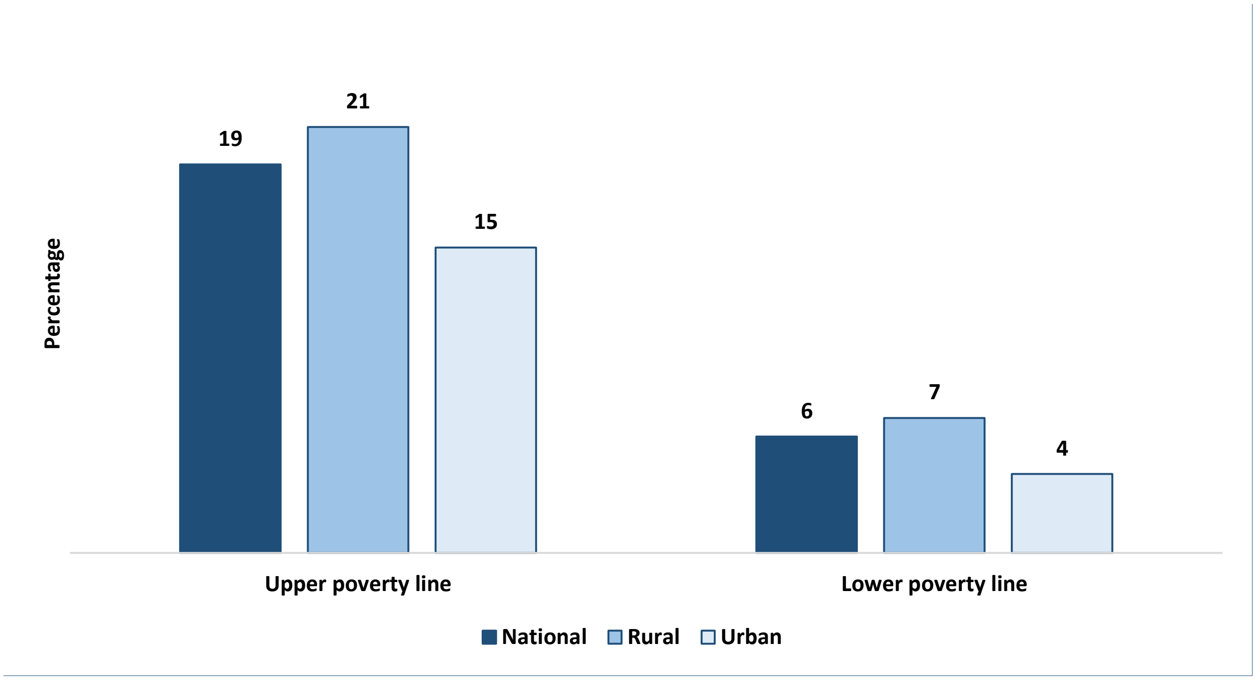

Figure ২৩: দারিদ্র্যসীমার হার (HCR)-এর প্রবণতা শতাংশে (উৎস: এইচআইইএস ২০২২)

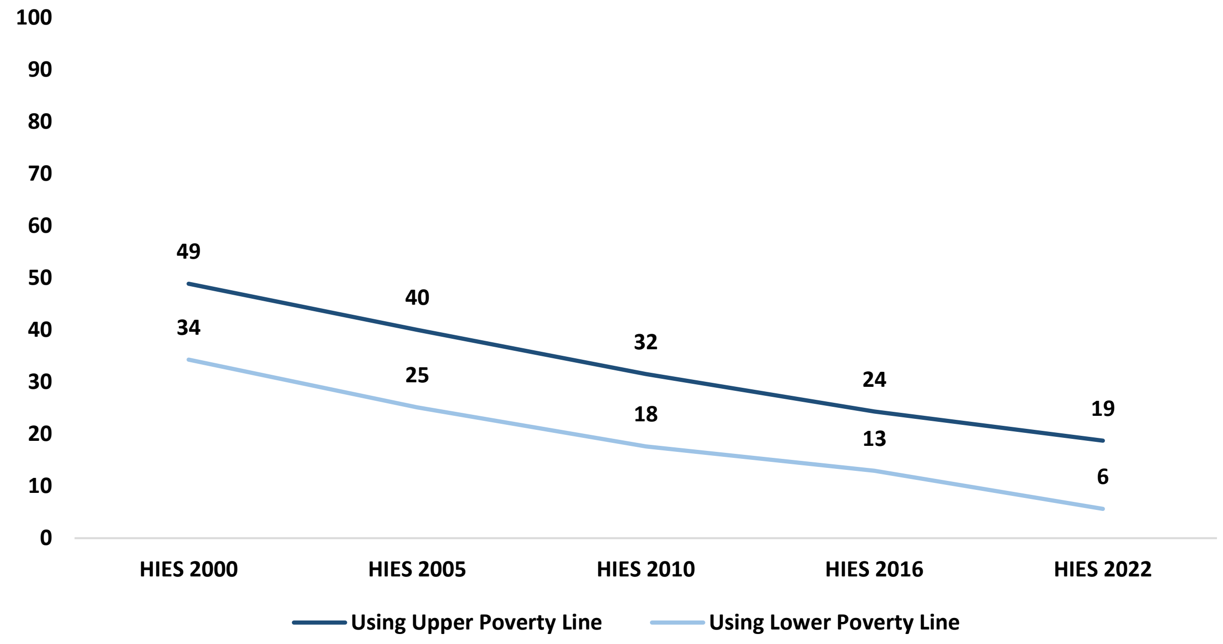

তদুপরি, সমতুল্য অর্থনৈতিক সক্ষমতাসম্পন্ন দেশগুলোর সাথে তুলনা করলেও বাংলাদেশের অগ্রগতি স্পষ্ট (চিত্র ২৬) (২৪)। উদাহরণস্বরূপ, ২০২১ সালে নাইজেরিয়া, কেনিয়া, ঘানা এবং লাও পিডিআর-এর এইচডিআই স্কোর ০.৫৪ থেকে ০.৬২-এর মধ্যে ছিল— যেখানে সবগুলোই বাংলাদেশের চেয়ে পিছিয়ে। যদিও উজবেকিস্তান (০.৭২) এবং নিকারাগুয়া (০.৬৭) তুলনামূলকভাবে এগিয়ে রয়েছে, তথাপি বিশ্বব্যাপী উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান তাৎপর্যপূর্ণ।

এই গতিধারা প্রমাণ করে যে, কেবল মাথাপিছু আয় নয়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবনযাত্রার মানের সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমেই মানব উন্নয়ন সূচকে প্রকৃত অগ্রগতি সম্ভব। বাংলাদেশের এই অগ্রগতি নীতিনির্ধারকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে, উন্নয়ন শুধু সংখ্যায় নয়, জনগণের জীবনে বাস্তব পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমেই সার্থকতা লাভ করে।

Figure ২৪: *বাংলাদেশে মানব উন্নয়ন সূচকের **ধারা** (উৎস: জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি - UNDP)*

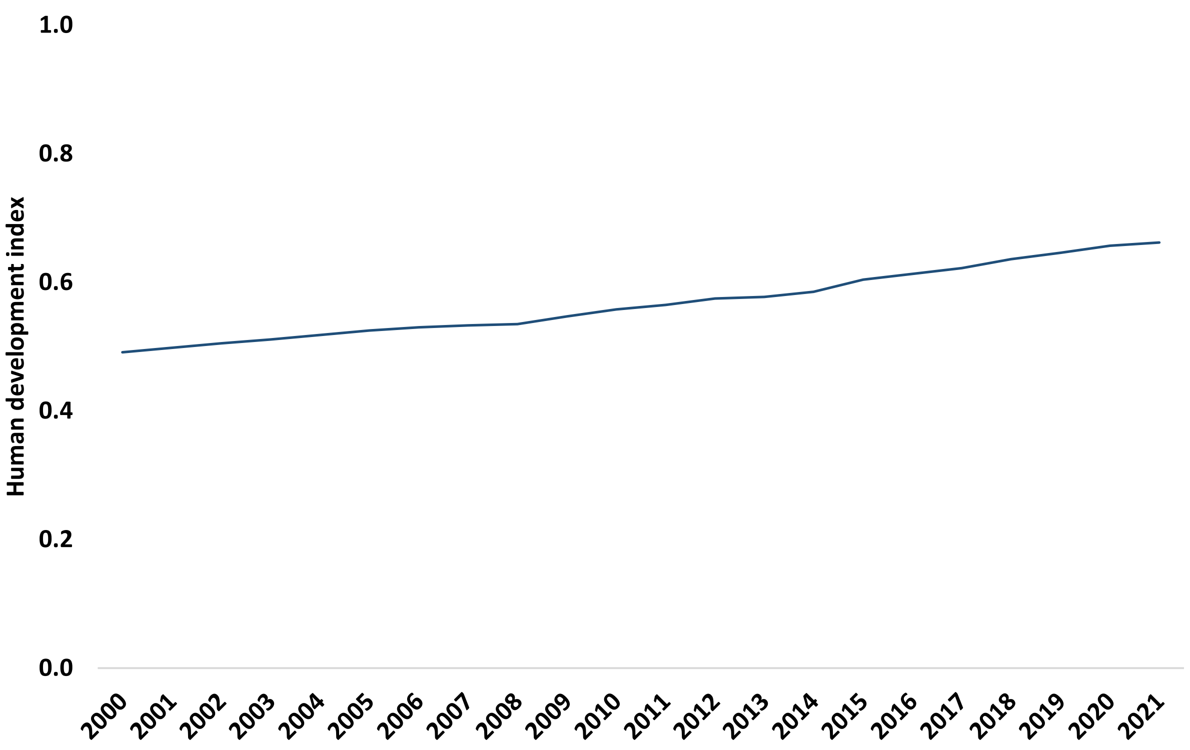

বিগত পনেরো বছরে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের আকার উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। চিত্র ২৭-এ প্রতিভাত হয়, ২০০৬–০৭ অর্থবছরে যেখানে বাজেটের পরিমাণ ছিল মাত্র ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, সেখানে ২০২০–২১ অর্থবছরে তা ৬৭ বিলিয়নে উন্নীত হয়েছে—যা গড়ে প্রতি বছর ১৪.৬ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধির পরিচায়ক (২৫)। এটি সরকারের রাজস্ব আহরণ ও ব্যয় ব্যবস্থাপনার দৃঢ় সক্ষমতাকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে। প্রারম্ভিক পর্যায়ে বাজেট প্রবৃদ্ধির গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর থাকলেও, ২০১০-এর পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতি, শিল্পায়ন এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের সাথে সঙ্গতি রেখে এই প্রবৃদ্ধি বেগবান হয়েছে। বাজেটের এই ধারাবাহিক সম্প্রসারণ প্রমাণ করে যে, সরকার জনকল্যাণে বিনিয়োগের সক্ষমতা ও পরিধি উভয়ই বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

চিত্র ২৮-এ ২০২০–২১ অর্থবছরের খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দের চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রশাসন (২০%) ও শিক্ষা (১৫%) খাত সম্মিলিতভাবে বাজেটের এক-তৃতীয়াংশের অধিক বরাদ্দ লাভ করেছে (২৫)। এরপর পরিবহন ও যোগাযোগ (১১%), স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন (৭%), প্রতিরক্ষা (৬%) এবং সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ (৬%) খাত উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ পেয়েছে। কৃষি, জ্বালানি এবং স্বাস্থ্য প্রতিটি খাত মাত্র ৫ শতাংশ হারে বরাদ্দ লাভ করেছে। এটি সরকারের বহুমাত্রিক উন্নয়ন অগ্রাধিকারকে প্রতিফলিত করলেও, জনসংখ্যাগত পরিবর্তন, অসংক্রামক রোগের ক্রমবর্ধমান বিস্তার এবং নগর স্বাস্থ্যসেবার ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্যখাতে এই বরাদ্দ এখনও সুস্পষ্টভাবে সীমিত।

Figure ২৫: দক্ষিণ এশিয়ায় মানব উন্নয়ন সূচকের প্রবণতা, ২০০০, ২০১৫ ও ২০২১ (লাল: ২০০০, বেগুনি: ২০১৫, সবুজ: ২০২১) (উৎস: UNDP)

Figure ২৬: *সমমানের মাথাপিছু আয়বিশিষ্ট দেশসমূহে মানব উন্নয়ন সূচকের প্রবণতা, ২০০০, ২০১৫ ও ২০২১ (লাল: ২০০০, বেগুনি: ২০১৫, সবুজ: ২০২১);(উৎস: UNDP)*

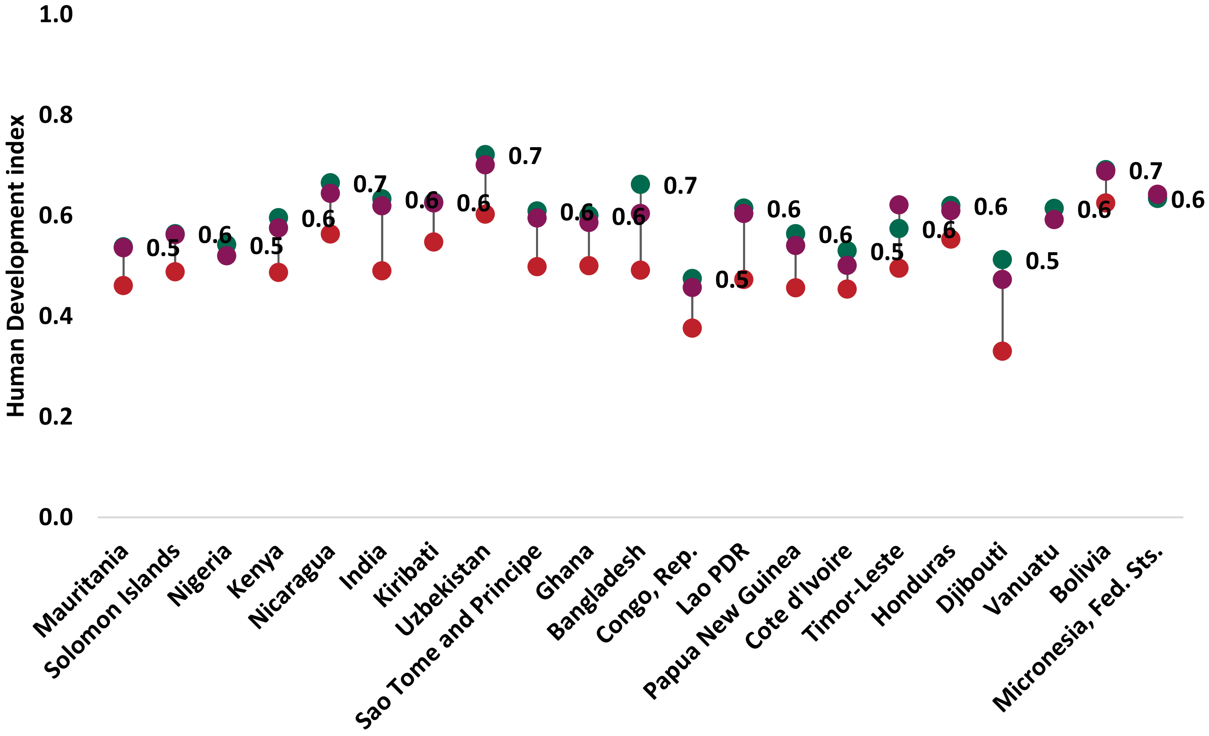

দীর্ঘমেয়াদী বাজেট বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়, গত এক দশকে প্রশাসন ও অবকাঠামো খাতে সরকারি বিনিয়োগে নিয়মিত বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে, বিপরীতে স্বাস্থ্য, কৃষি ও জ্বালানি খাতের বরাদ্দ স্থিতিশীলতা অথবা হ্রাসের প্রবণতা প্রদর্শন করেছে। এটি একদিকে স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধির কাঠামোগত ভিত্তি নির্মাণে সরকারের কৌশলগত গুরুত্ব আরোপকে প্রতিফলিত করে, অন্যদিকে স্বাস্থ্যসহ মানবসম্পদ উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী মনোযোগের অভাবের চিত্রও উন্মোচন করে।

এই প্রেক্ষাপটে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, বাংলাদেশ বর্তমানে বাজেট কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণী সন্ধিক্ষণে উপনীত হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও রাজস্ব আহরণের ক্রমবর্ধমান সক্ষমতার মাধ্যমে সরকার যে সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করেছে, তার পূর্ণাঙ্গ সদ্ব্যবহারের জন্য বাজেট বরাদ্দের কাঠামোতে কৌশলগত পুনর্বিন্যাস অত্যাবশ্যক। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর দ্রুত বর্ধন, অসংক্রামক রোগের ক্রমবর্ধমান চাপ এবং নগর জনসংখ্যার বিস্তার—এই সকল বিষয়ই স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে অধিকতর বিনিয়োগের যৌক্তিক দাবি উত্থাপন করে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হলো—কেবল বাজেটের পরিমাণ বৃদ্ধি করাই যথেষ্ট নয়, বরং এই অর্জিত আর্থিক সক্ষমতাকে সমতা ও দক্ষতাভিত্তিক জনসেবার রূপান্তর ঘটানো। স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দের পরিমাণগত বৃদ্ধির পাশাপাশি জিডিপি'র অনুপাতে এর যথাযথ নির্ধারণ অপরিহার্য। চিত্রগুলো দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্দেশ করে, বাজেট আকারে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করলেও, এই সম্পদকে স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ উন্নয়নে কার্যকরভাবে বিনিয়োগের সুযোগ এখনও সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগানো যায়নি।

পরিশেষে, সম্প্রসারিত বাজেট কাঠামো বাংলাদেশের জন্য কেবল একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনাই নয়—এটি একটি নীতিগত দায়িত্বও বটে। এখনই উপযুক্ত সময়, জনব্যয়ের গঠন ও অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে এমন সুচিন্তিত পুনর্বিন্যাস আনয়ন করা, যা দেশের বাস্তব জনসংখ্যাগত চিত্র, স্বাস্থ্যখাতের চ্যালেঞ্জ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যের সাথে সুনির্দিষ্টভাবে সঙ্গতিপূর্ণ।

Figure ২৭: *বিভিন্ন বছরে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের* ***ধারা*** *(উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়)*

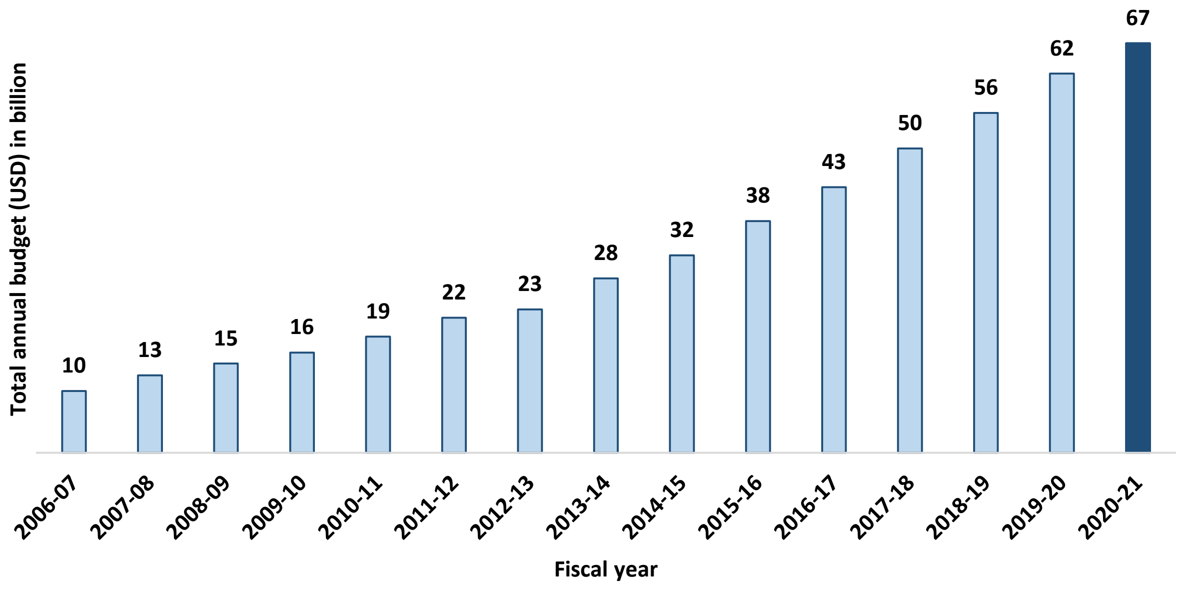

বিগত দুই দশকে বাংলাদেশ রাজস্ব ভিত্তি সম্প্রসারণে প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করলেও, বাজেটের ক্রমবর্ধমান আকার, কর আহরণের গতি, শ্রমবাজারের গঠন এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বর্তমান প্রবণতা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে কিছু অন্তর্নিহিত কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। এই সীমাবদ্ধতাগুলো স্বাস্থ্যখাতে কার্যকর, টেকসই এবং ন্যায্য অর্থায়নের পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে বিদ্যমান।

Figure ২৮: ২০২০–২১ অর্থবছরে বাংলাদেশে সরকারি নীতি ও কর্মসূচির জন্য বাজেট বরাদ্দ (উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়)

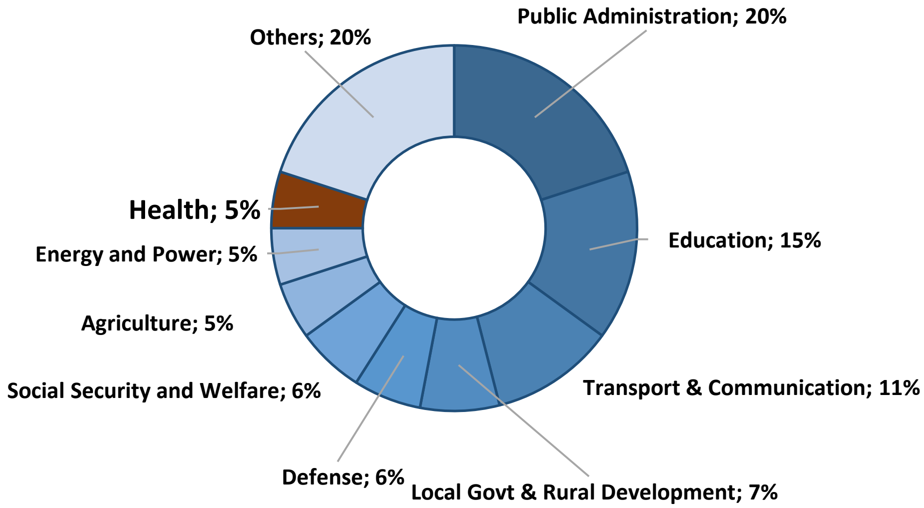

সরকারি ব্যয়ের পরিমাণে নিয়মিত বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হলেও, রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে মন্থর। চিত্র ৩০-এ দৃশ্যমান হয়, ২০০৬ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের কর-রাজস্ব ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩২ বিলিয়নে উন্নীত হয়েছে (২৬)। এই সংখ্যাগত বৃদ্ধি প্রায় আটগুণ হলেও, জিডিপির অনুপাতে কর-রাজস্বের হার ৭ থেকে ৯ শতাংশের মধ্যেই সীমিত রয়েছে (২৭)। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও কর-জিডিপি অনুপাত কখনোই ১০ শতাংশের সীমা অতিক্রম করতে পারেনি—যেখানে তুলনীয় অর্থনীতির দেশগুলোর জন্য ১৫–২০ শতাংশের অনুপাত স্বাভাবিকভাবে প্রত্যাশিত। চিত্র ৩১ ও ৩২-এ প্রতিভাত হয়, এই সূচকে বাংলাদেশ কেবল দক্ষিণ এশিয়ার ভুটান, নেপাল ও শ্রীলঙ্কাই নয়, বরং লাও পিডিআর (১০%), ঘানা (১২%), কেনিয়া (১৪%) এবং থাইল্যান্ডের (১৬%) মতো দেশগুলো থেকেও পিছিয়ে রয়েছে (২৭)। এই সুস্পষ্ট ঘাটতি বাংলাদেশের করনীতির সীমাবদ্ধতা, প্রশাসনিক অদক্ষতা এবং একটি সংকীর্ণ আনুষ্ঠানিক কর কাঠামোর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

চিত্র ৩৩ অনুযায়ী, বাংলাদেশের কর্মসংস্থান-জনসংখ্যা অনুপাত ৫৯ শতাংশ—যা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম উচ্চহার (২৮)। তবে ২০০১ সাল থেকে এই হার ৫৪ থেকে ৫৯ শতাংশের মধ্যে স্থিতিশীল রয়েছে। এর অর্থ হলো, দেশে একটি বৃহৎ এবং সক্রিয় শ্রমশক্তি বিদ্যমান থাকলেও, তা আয়করভিত্তিক রাজস্ব আহরণে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে না। এর মূল কারণ হলো, এই শ্রমশক্তির একটি বিশাল অংশ এখনও অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত—যাদের আয় এবং কর্মপরিধি সরকার কর্তৃক করযোগ্য হিসেবে বিবেচিত নয়। ফলস্বরূপ, দেশের কর ভিত্তি সম্প্রসারিত হচ্ছে না এবং রাজস্ব আহরণের পূর্ণ সম্ভাবনা অব্যবহৃত থাকছে।

এই দুর্বলতা সীমিত আর্থিক অন্তর্ভুক্তির কারণে আরও প্রকট আকার ধারণ করেছে। চিত্র ৩৪-এ প্রতীয়মান হয়, বাংলাদেশের ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ৫৩ শতাংশের একটি ব্যাংক হিসাব বা মোবাইল ভিত্তিক আর্থিক পরিষেবা অ্যাকাউন্ট রয়েছে (২৯)। তুলনামূলকভাবে শ্রীলঙ্কায় এই হার ৯০ শতাংশ, মিয়ানমারে ৮০ শতাংশ এবং ভারতে ৭৮ শতাংশ। এই সীমিত আর্থিক প্রবেশাধিকার কেবল কর আদায়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে না, বরং ভর্তুকি, সামাজিক সুরক্ষা বা স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত সরকারি সুবিধাগুলোর সুষম বণ্টনেও বাধা সৃষ্টি করছে। এর ফলস্বরূপ, সরকারি অর্থনৈতিক নীতিমালার বাস্তবায়ন ক্ষমতা দুর্বল হচ্ছে।

Figure ২৯: বাংলাদেশে সরকারি নীতি ও কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত বার্ষিক বাজেটের শতকরা হারের প্রবণতা (উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়)

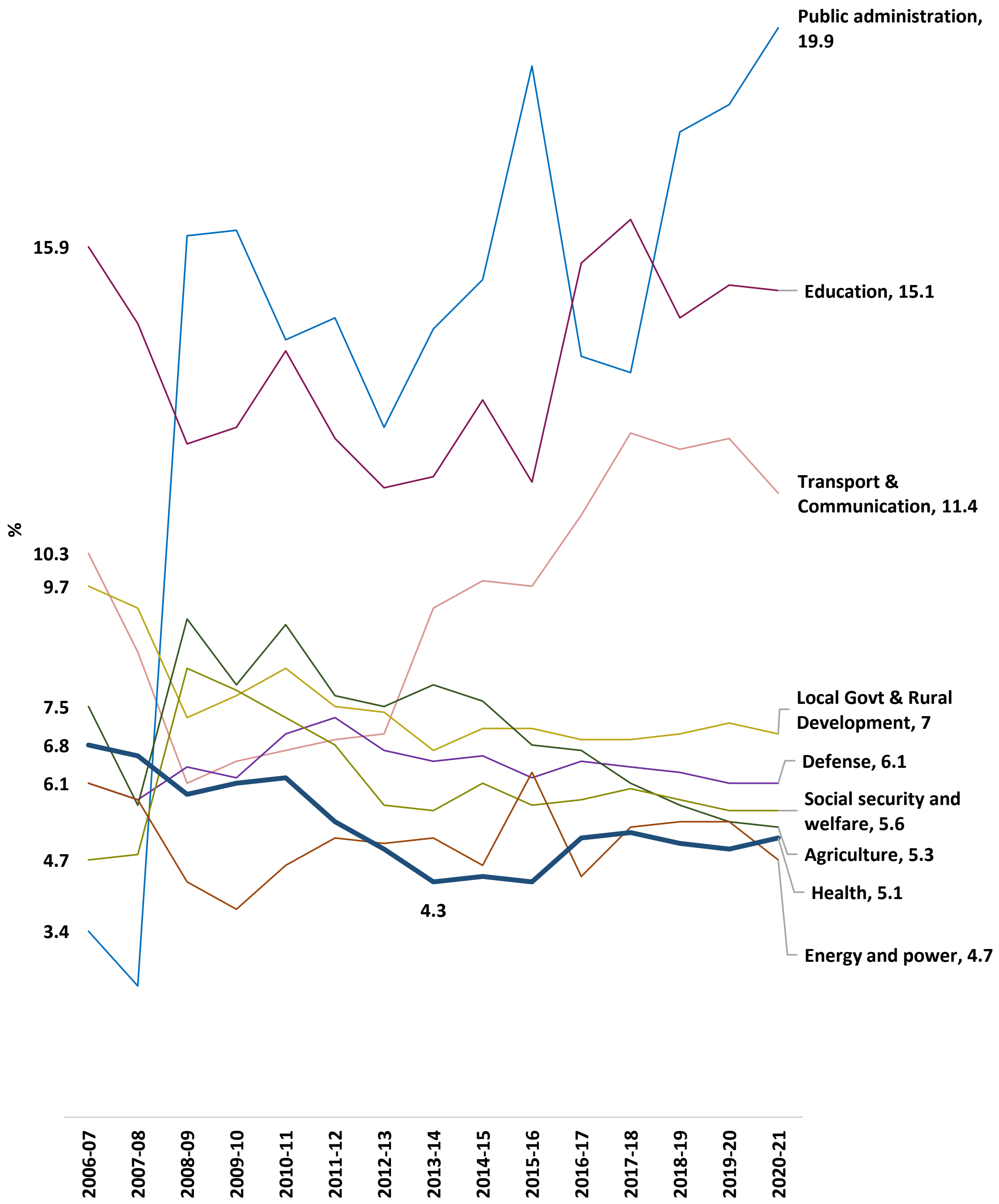

এই চারটি সূচক—কর-জিডিপি অনুপাত, শ্রমশক্তির আনুষ্ঠানিকীকরণ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং রাজস্ব প্রবৃদ্ধির গতিধারা—সম্মিলিতভাবে একটি স্পষ্ট বার্তা প্রদান করে: বাংলাদেশে জনমিতিক ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বিপুল থাকা সত্ত্বেও, কাঠামোগত

দুর্বলতার কারণে রাজস্ব আহরণের সক্ষমতা এখনও সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। যদি করনীতির আধুনিকায়ন, শ্রমবাজারের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সম্প্রসারণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হয়—তবে উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে ন্যায্যতা অর্জনের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিতে থাকবে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য, যদি কর-জিডিপি অনুপাত মাত্র ২–৩ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি করা যায়, তবে বছরে অতিরিক্ত ১২ থেকে ১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রাজস্ব আহরণ সম্ভব—যা স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক সুরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে একটি রূপান্তরমূলক বিনিয়োগের সুযোগ উন্মোচন করতে পারে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য একটি সমন্বিত এবং সাহসী সংস্কার কর্মসূচি অত্যাবশ্যক—যার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে কর ব্যবস্থার ডিজিটাল আধুনিকায়ন, শ্রম বাজারের আনুষ্ঠানিকীকরণ এবং সকল নাগরিকের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক পরিষেবা নিশ্চিতকরণ। এই তিনটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ একটি ন্যায্য, কার্যকর ও টেকসই রাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে—যা জনস্বাস্থ্য ও মানব উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

Figure ৩০: *বাংলাদেশে কর রাজস্ব আয়ের **ধারা** (উৎস: বিশ্বব্যাংক)*

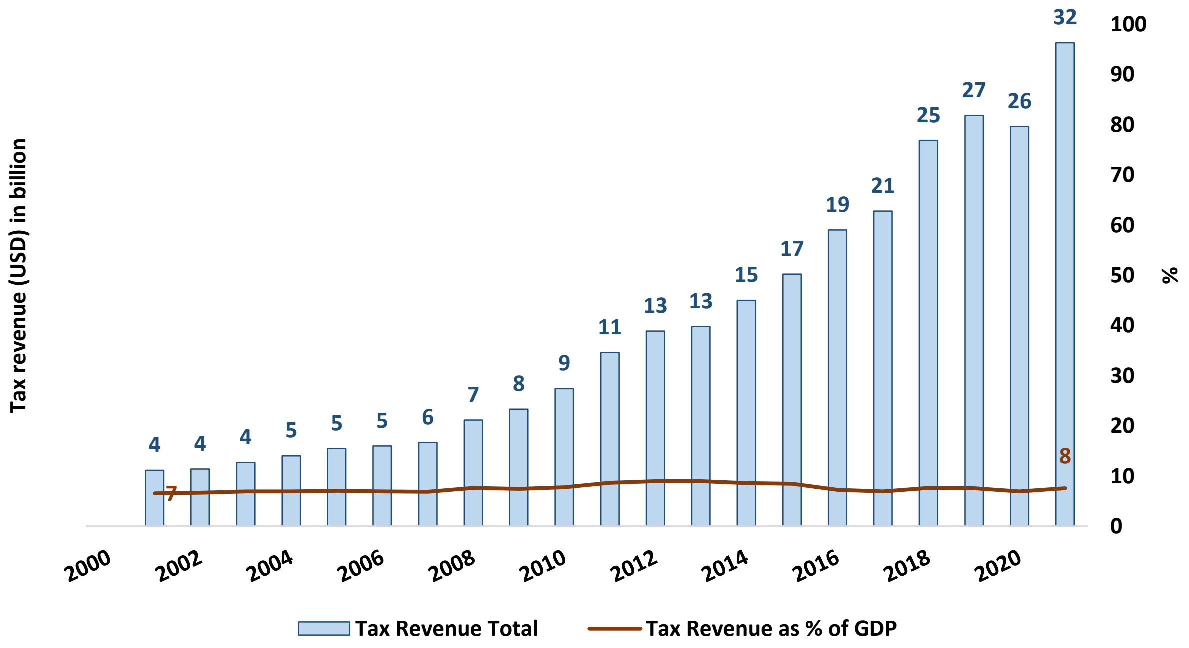

স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়ন এবং রাজস্ব পরিসর

চিত্র ৩৫-এ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারায় স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের দীর্ঘমেয়াদী চিত্র একটি স্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। ১৯৯৭ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত দুই দশকের অধিক সময়ে মোট স্বাস্থ্য ব্যয় (টোটাল হেলথ এক্সপেন্ডিচার - টিএইচই) কখনোই জিডিপির ৩.২ শতাংশের বেশি অতিক্রম করেনি (২০)। ২০০০-এর দশকের শুরুতে ব্যয় ধীরে ধীরে বাড়লেও, ২০১০ সালে ৩.২ শতাংশের শীর্ষে পৌঁছানোর পর তা প্রায় স্থির হয়ে যায়। ২০২০ সালে এই হার আরও কমে ২.৮ শতাংশে নেমে আসে—যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির তুলনায়

***Figure* ৩১: দক্ষিণ এশিয়ায় জিডিপির শতকরা হিসাবে কর রাজস্ব (২০০০, ২০১৫ এবং ২০২১); (লাল: ২০০০, বেগুনি: ২০১৫, সবুজ: ২০২১) (উৎস: বিশ্বব্যাংক)**

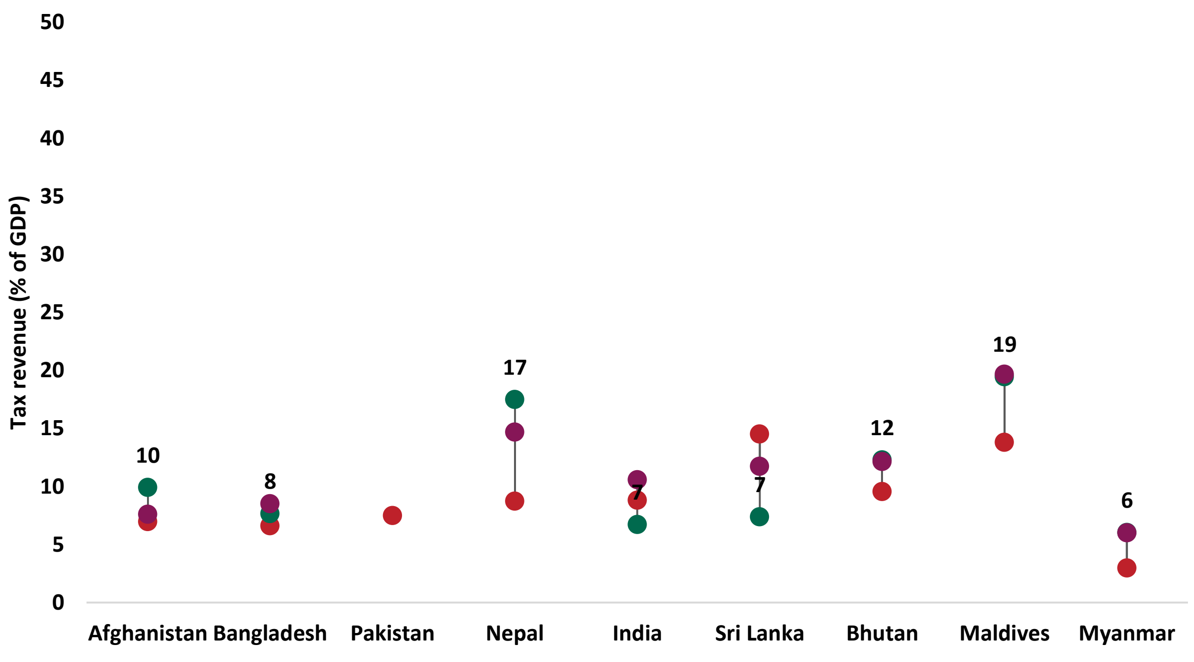

***Figure* ৩২: সমপর্যায়ের জিডিপি বিশিষ্ট দেশসমূহে জিডিপির শতকরা হিসাবে কর রাজস্ব (২০০০, ২০১৫ এবং ২০২১); (লাল: ২০০০, বেগুনি: ২০১৫, সবুজ: ২০২১) (উৎস: বিশ্বব্যাংক)**

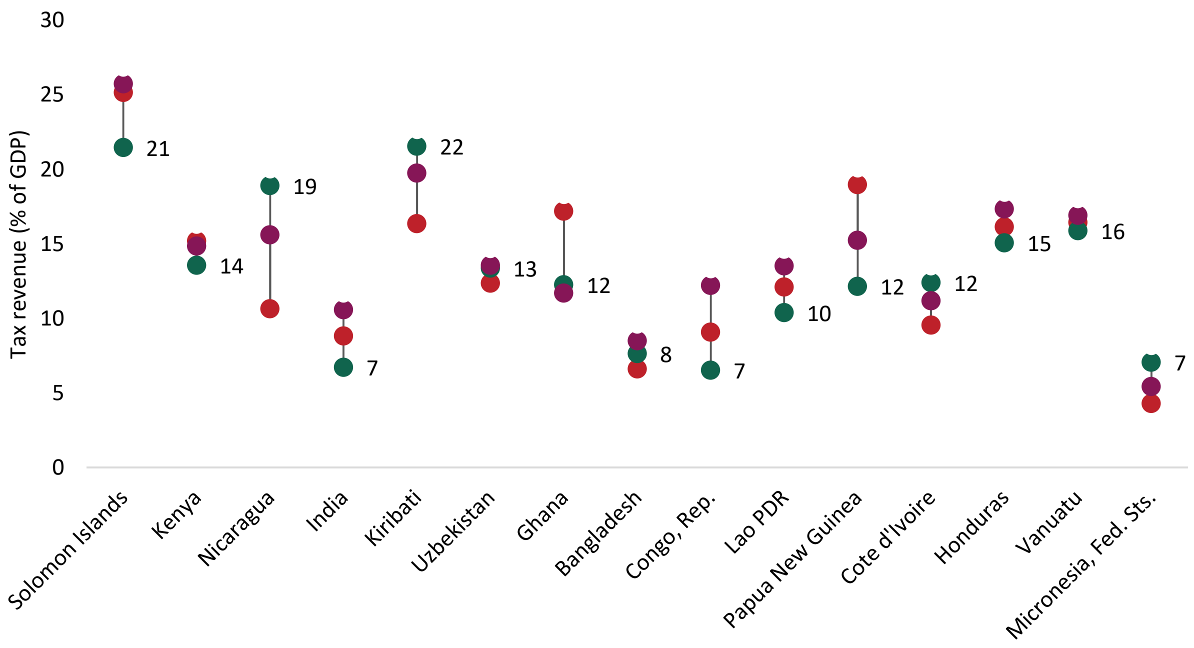

***Figure* ৩৩: বাংলাদেশ ও পার্শ্ববর্তী দেশের মধ্যে কর্মসংস্থান-জনসংখ্যা অনুপাতের (১৫ বছর ও তার উর্ধ্ব বয়সী জনসংখ্যার %) তুলনা, ২০২৩; (আনুমানিক হিসাব: আইএলও মডেল), (উৎস: বিশ্বব্যাংক)**

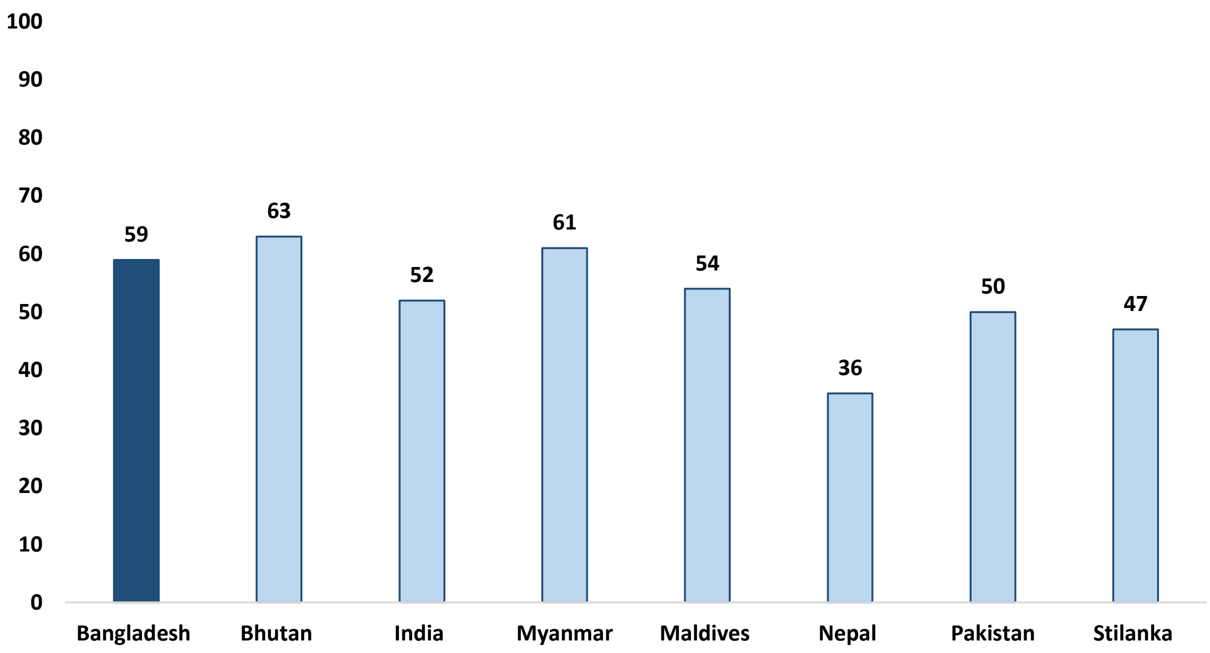

***Figure* ৩৪: বাংলাদেশ ও পার্শ্ববর্তী দেশের মধ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বা মোবাইল অর্থ লেনদেন সেবাদাতার মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট মালিকানার হার (১৫ বছর ও তার উর্ধ্ব বয়সী জনসংখ্যার %) তুলনা, ২০২৩; (উৎস: বিশ্বব্যাংক)**

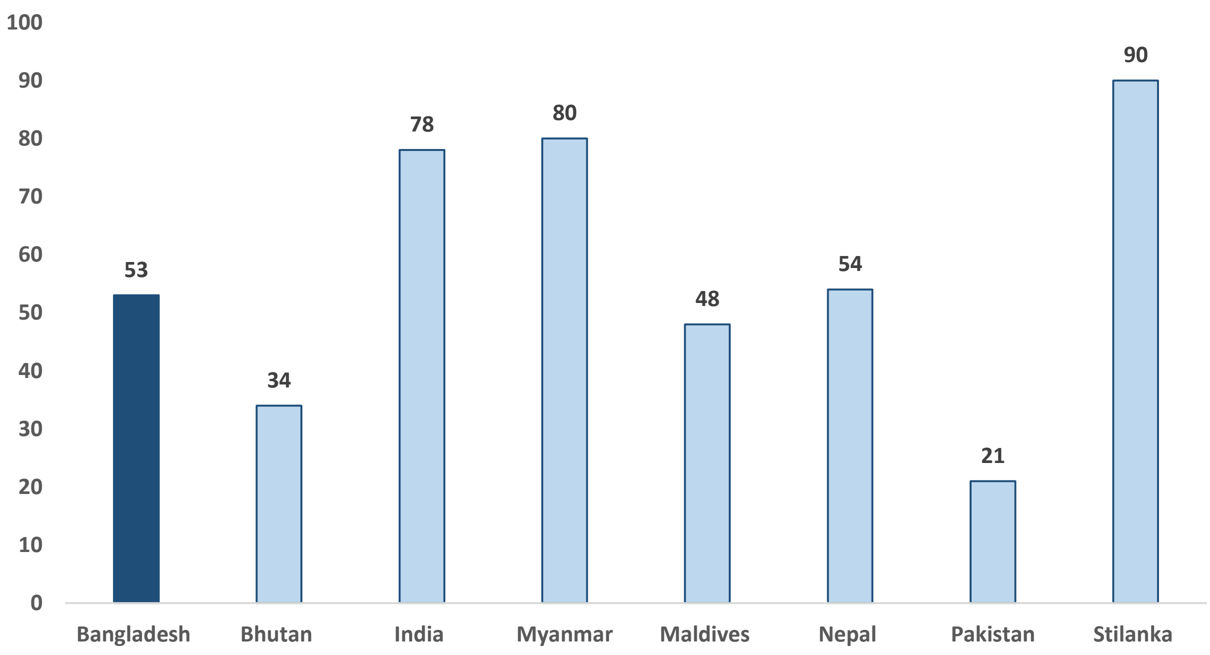

স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দের স্থিতিশীলতা ও সীমাবদ্ধতাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরে। আরও গভীর উদ্বেগের বিষয় হলো, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যয় ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত নিম্নস্তরে রয়ে গেছে। বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এই পুরো সময়কালে সরকারি ব্যয় জিডিপির মাত্র ০.৭ থেকে ০.৮ শতাংশের মধ্যে উঠানামা করেছে—এবং এই হার গত দুই দশকে কার্যত অপরিবর্তিত থেকেছে। অর্থাৎ, দেশের ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্য চাহিদা এবং জনসংখ্যার কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে, সরকার স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত গতি সঞ্চার করতে পারেনি।

এই বাস্তবতা আমাদের এক জরুরি নীতিগত সিদ্ধান্তের মুখোমুখি দাঁড় করায়। স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয় এখন অনতিবিলম্বে এবং উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক—অন্যথায় বার্ধক্যজনিত চ্যালেঞ্জ, অসংক্রামক রোগের ক্রমবর্ধমান বিস্তার এবং নগরায়নের বাস্তবতাকে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা অসম্ভব হবে। জিডিপির অনুপাতে স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি কেবল সেবার গুণগত মানোন্নয়নেই সহায়ক নয়, বরং জনগণের আর্থিক কষ্টের লাঘব, স্বাস্থ্যখাতে সমতা অর্জন এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা (ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ - ইউএইচসি) অর্জনের ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। পরিশেষে, একটি শক্তিশালী, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি হলো স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা—যা আর বিলম্বিত করা উচিত নয়। এটি এখন একটি অত্যাবশ্যকীয় রাষ্ট্রীয় অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

Figure ৩৫: *বাংলাদেশের মোট স্বাস্থ্য ব্যয় (Total Health Expenditure) ও সরকারি স্বাস্থ্য ব্যয় (Government General Health Expenditure) জিডিপির শতাংশ হিসেবে;* ***(উৎস: বিএনএইচএ ১৯৯৭–২০২০)***

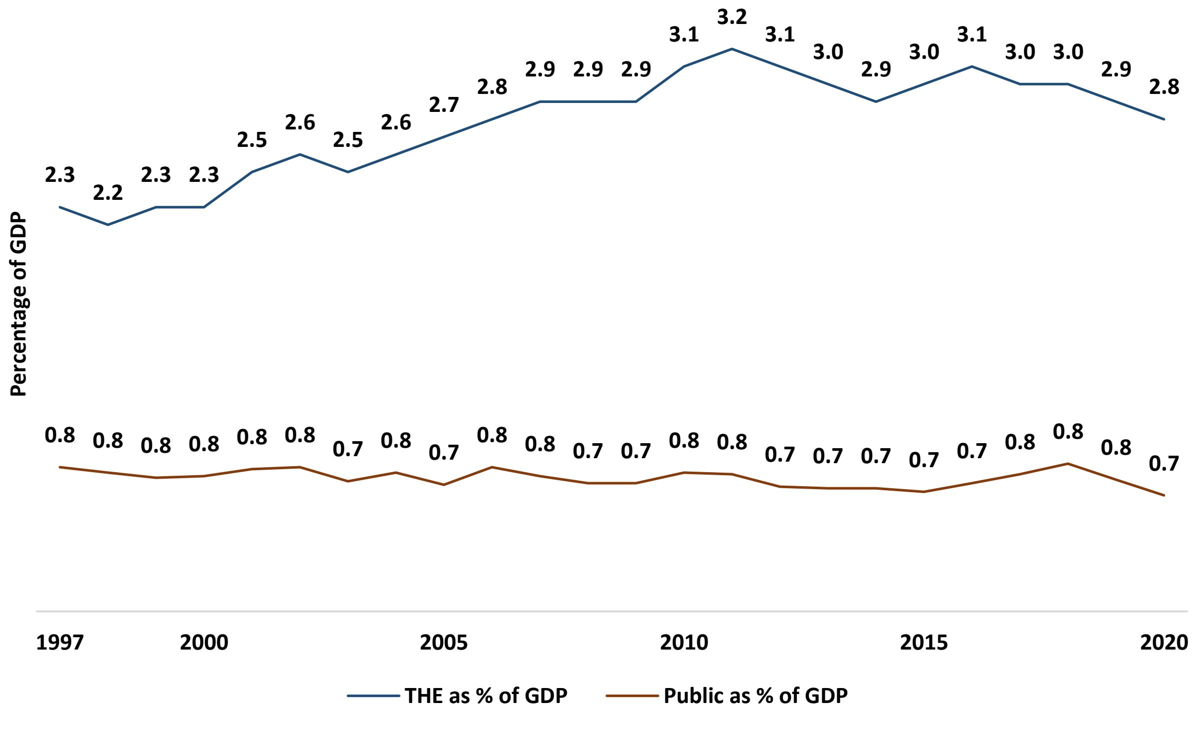

চিত্র ৩৬ থেকে ৩৮-এর তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, তা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড এবং সমতুল্য আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের দেশগুলোর তুলনায় এখনও যথেষ্ট অপ্রতুল। ফলস্বরূপ, ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণ, জনগণের আর্থিক সুরক্ষা সুনিশ্চিতকরণ এবং একটি টেকসই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই ব্যয় স্বল্পতা বর্তমানে একটি কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

চিত্র ৩৬ অনুযায়ী, ২০০০ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু মোট স্বাস্থ্য ব্যয় ছিল প্রায় ১০ মার্কিন ডলার (২০, ৩০, ৩১)। ২০২১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৮ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে—যদিও এটি একটি পরিমাণগত অগ্রগতি, তথাপি জনসংখ্যার বয়স কাঠামোয় পরিবর্তন, অসংক্রামক রোগের উচ্চ প্রাদুর্ভাব, নগরায়ণ এবং স্বাস্থ্যসেবার ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতির প্রেক্ষাপটে এটি স্পষ্টতই অপর্যাপ্ত।

চিত্র ৩৭-এ একই অর্থবছরে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি (৩০)। ভারতে এই ব্যয় ছিল ৭৪ মার্কিন ডলার, নেপালে ৬৭ মার্কিন ডলার, ভুটানে ১০৪ মার্কিন ডলার, শ্রীলঙ্কায় ১৫৭ মার্কিন ডলার এবং মালদ্বীপে তা ১,০০০ মার্কিন ডলারের সীমা অতিক্রম করেছে। এই তুলনামূলক চিত্র দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্দেশ করে যে, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যতম সর্বনিম্ন অবস্থানে অধিষ্ঠিত, যেখানে জনসংখ্যা এবং স্বাস্থ্যসেবার চাহিদার নিরিখে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা বহুলাংশে অধিক।

চিত্র ৩৮ আরও গভীর উদ্বেগের চিত্র উন্মোচন করে। যে সকল দেশের মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের সমতুল্য, যেমন ঘানা, উজবেকিস্তান, নাইজেরিয়া এবং তিমুর-তাদের প্রায় সকলেই স্বাস্থ্যখাতে বাংলাদেশের তুলনায় অধিক আর্থিক সংস্থান বরাদ্দ করে (৩০)। এই তথ্য থেকে সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায় যে, বিদ্যমান অর্থনৈতিক সক্ষমতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এখনও স্বাস্থ্যখাতে প্রত্যাশিত মাত্রায় বিনিয়োগে সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি।

এই তিনটি চিত্রের সমন্বিত বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত বার্তা বহন করে: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং মাথাপিছু আয়ের ঊর্ধ্বগতি সত্ত্বেও, স্বাস্থ্যখাতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ কাঠামোগতভাবে পশ্চাৎপদ। এই ব্যয় স্বল্পতা নিরসন করা না গেলে, জনগণের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ব্যয়ের বোঝা লাঘব করা, স্বাস্থ্যসেবার ন্যায্যতা সুনিশ্চিত করা এবং বার্ধক্যজনিত ও অসংক্রামক রোগজনিত ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবিলা করা দুরূহ হবে। অতএব, স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগকে অনতিবিলম্বে একটি উচ্চ-অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত জাতীয় কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা অপরিহার্য। এটি কেবল স্বাস্থ্যখাতের সূচকগুলোর উন্নয়নই ত্বরান্বিত করবে না, বরং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে জনগণের মানব উন্নয়নে রূপান্তরের একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রাতিষ্ঠানিক পন্থা হিসেবেও বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

Figure ৩৬: *বাংলাদেশে মাথাপিছু মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের প্রবণতা;* ***(****উৎস: বিশ্বব্যাংক, WHO, বিএনএইচএ****)***

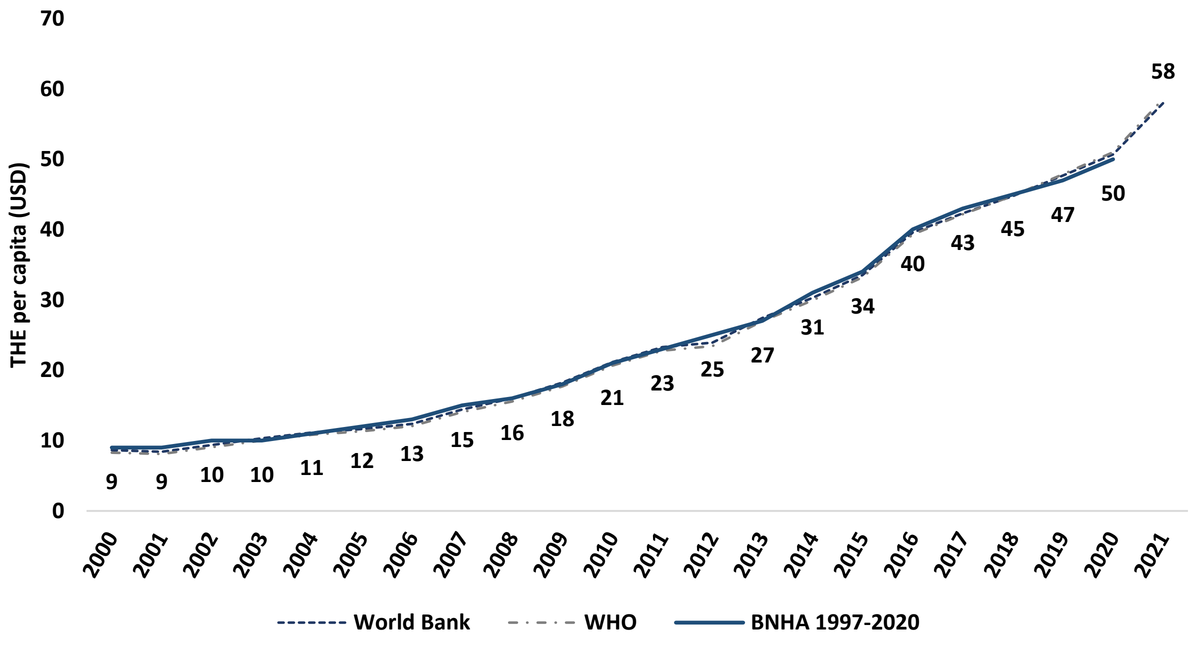

Figure ৩৭: *২০০০, ২০১৫ ও ২০২১ সালে দক্ষিণ এশিয়ায় মাথাপিছু মোট স্বাস্থ্য ব্যয় (লাল: ২০০০, বেগুনি: ২০১৫, সবুজ: ২০২১); (উৎস: বিশ্বব্যাংক)*

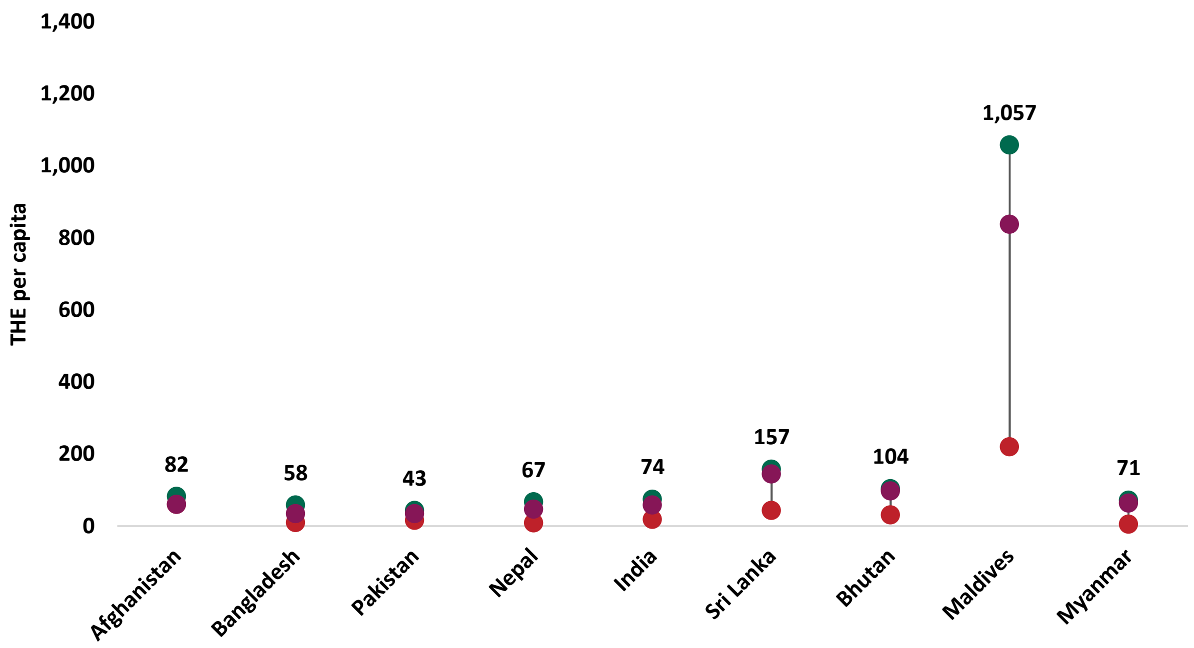

Figure ৩৮: *মাথাপিছু জিডিপি অনুরূপ দেশসমূহে ২০০০, ২০১৫ ও ২০২১ সালে মাথাপিছু মোট স্বাস্থ্য ব্যয় (লাল: ২০০০, বেগুনি: ২০১৫, সবুজ: ২০২১); (উৎস: বিশ্বব্যাংক)*

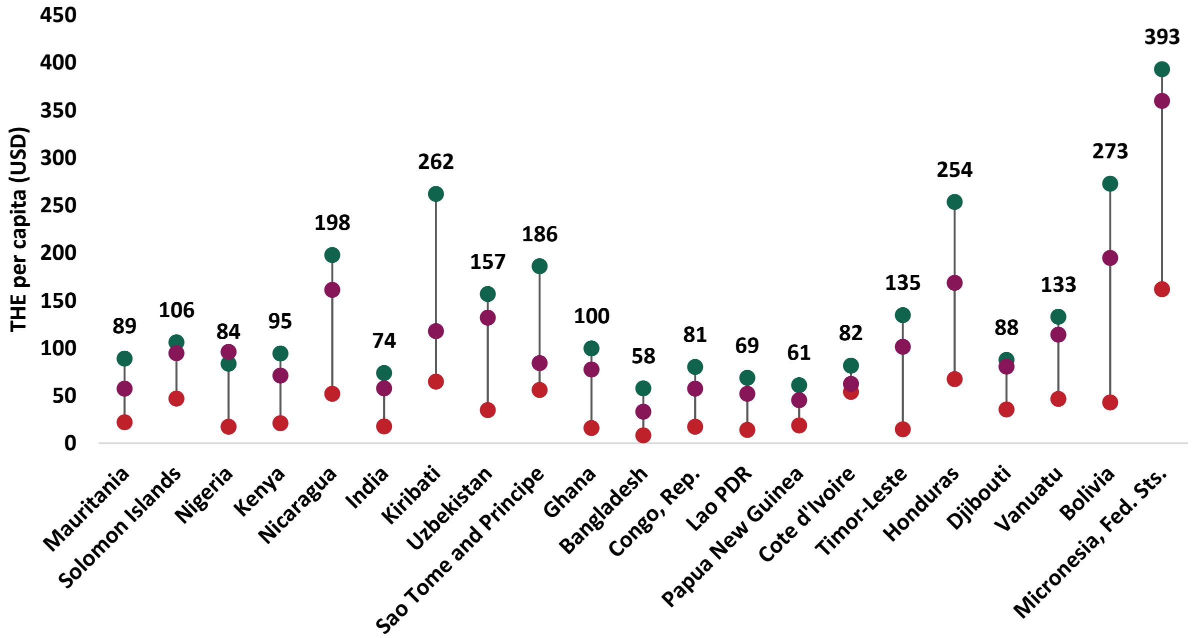

চিত্র ৩৯ থেকে ৪৪ পর্যন্ত উপস্থাপিত তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এর অবস্থান, বাজেট বরাদ্দের অগ্রাধিকারের ক্রম এবং বাস্তবায়ন সক্ষমতার একটি সমন্বিত চিত্র উন্মোচন করে। এই পরিসংখ্যানসমূহ দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রতিপন্ন করে—দেশটি একটি দীর্ঘস্থায়ী কাঠামোগত দুর্বলতার আবর্তে নিমজ্জিত, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো: অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ, ক্রমহ্রাসমান বাজেট অগ্রাধিকার এবং দুর্বল বাস্তবায়ন সক্ষমতা।

প্রথমত, সরকারি পর্যায়ে স্বাস্থ্য ব্যয়—পরিমাপগত ও জিডিপি-অনুপাতের উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে—বাংলাদেশে এখনও সুস্পষ্টভাবে সীমিত। অথচ দেশটি বিগত দশকগুলোতে স্থিতিশীলভাবে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। চিত্র ৩৯ অনুযায়ী, ২০২১ সালে সরকার প্রতি জনগনের স্বাস্থ্যখাতে মাত্র ২৬ মার্কিন ডলার ব্যয় করেছে, যেখানে ভারতে এই ব্যয় ৮১ মার্কিন ডলার, নেপালে ৭৬ মার্কিন ডলার এবং শ্রীলঙ্কায় ২৮৩ মার্কিন ডলার (৩২)। চিত্র ৪০-এ প্রতিভাত হয়, ২০০০ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যয় (জেনারেল গভর্নমেন্ট হেলথ এক্সপেন্ডিচার - জিজিএইচই) বছরে গড়ে মাত্র ৫.৮% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে—যেখানে সমতুল্য নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশগুলোর গড় বৃদ্ধির হার ছিল ৯.৫% (৩২)। এর তাৎপর্য হলো, বাংলাদেশ ক্রমশ বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলক বিনিয়োগের দৌড়ে পশ্চাৎপদ হচ্ছে, যা সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা (ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ - ইউএইচসি) অর্জনের পথে একটি মৌলিক অন্তরায়।

দ্বিতীয়ত, জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্যখাতের আনুপাতিক বরাদ্দও ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে, যা দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্দেশ করে—এই খাতটির নীতিগত গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। চিত্র ৪১ অনুযায়ী, ২০০০-এর দশকের শুরুতে যেখানে বাজেটের ৬% স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ ছিল, ২০২১ সালে তা হ্রাস পেয়ে ৪.২%-এ দাঁড়িয়েছে (৩১)। চিত্র ৩৮-এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয়, বাংলাদেশের আর্থিক সক্ষমতার নিকটবর্তী দেশগুলো বাজেটের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ প্রদান করে থাকে। এর নিহিতার্থ হলো, এটি কেবল সম্পদের অভাবের বিষয় নয়, বরং নীতিনির্ধারণে অগ্রাধিকারের সুস্পষ্ট ঘাটতি।

তৃতীয়ত, স্বাস্থ্যখাতের জন্য যে সীমিত বাজেট বরাদ্দ বিদ্যমান, তারও বাস্তবায়ন হার উদ্বেগজনকভাবে নিম্ন। চিত্র ৪৪ অনুযায়ী, ২০১০ সালে যেখানে স্বাস্থ্য বাজেটের বাস্তবায়ন হার ছিল ৯২%, ২০২১ সালে তা হ্রাস পেয়ে ৬৯%-এ দাঁড়িয়েছে; এমনকি ২০১৭ সালে এই হার মাত্র ৪৫% ছিল (২৫)। একই সময়ে শিক্ষাখাতে বাস্তবায়ন হার ৯০%-এর ঊর্ধ্বে স্থিতিশীল ছিল, যা প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায় একটি সুস্পষ্ট বৈষম্য নির্দেশ করে। স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বাস্তবায়নের এই দুর্বলতা কার্যত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ক্রয় ব্যবস্থাপনার ত্রুটি, প্রশাসনিক জটিলতা এবং দক্ষতার অভাবকে প্রকট করে তোলে—যা বাজেটের কার্যকারিতা সীমিত করে এবং জনগণের আস্থায় চিড় ধরায়।

এই তথ্যসমষ্টি সম্মিলিতভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা উন্মোচন করে: বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত একটি ‘নীতি নির্ধারণগত দুষ্টচক্রে’ আবদ্ধ—যেখানে অপর্যাপ্ত বরাদ্দ, নিম্ন অগ্রাধিকার এবং দুর্বল বাস্তবায়ন একে অপরের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে চলেছে। এই দুষ্টচক্র থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে অনতিবিলম্বে নিম্নলিখিত তিনটি সমন্বিত রূপান্তরমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা অপরিহার্য:

- স্বাস্থ্যখাতে সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণগত ও আনুপাতিক উভয় ক্ষেত্রেই তাৎপর্যপূর্ণ বৃদ্ধি;
- জাতীয় বাজেট কাঠামোয় স্বাস্থ্যখাতকে উচ্চতর অগ্রাধিকার প্রদান; এবং
- পরিকল্পনা প্রণয়ন, অর্থায়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদারকরণ।

এই কাঠামোগত সংস্কারগুলো ব্যতিরেকে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত আর্থিকভাবে দুর্বল, কর্মক্ষমতায় পশ্চাৎপদ এবং স্বাস্থ্যসেবার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবিলায় অপ্রস্তুত অবস্থায় থেকে যাবে—যা কেবল স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মানকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে না, বরং জাতীয় উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের অঙ্গীকারকেও হুমকির মুখে পতিত করবে।।

***Figure ৩৯:** বাংলাদেশ ও নিম্ন-মধ্যম আয়বিশিষ্ট দেশসমূহে মাথাপিছু সরকারি স্বাস্থ্য ব্যয়ের **ধারা ;** (উৎস: বিশ্বব্যাংক)*

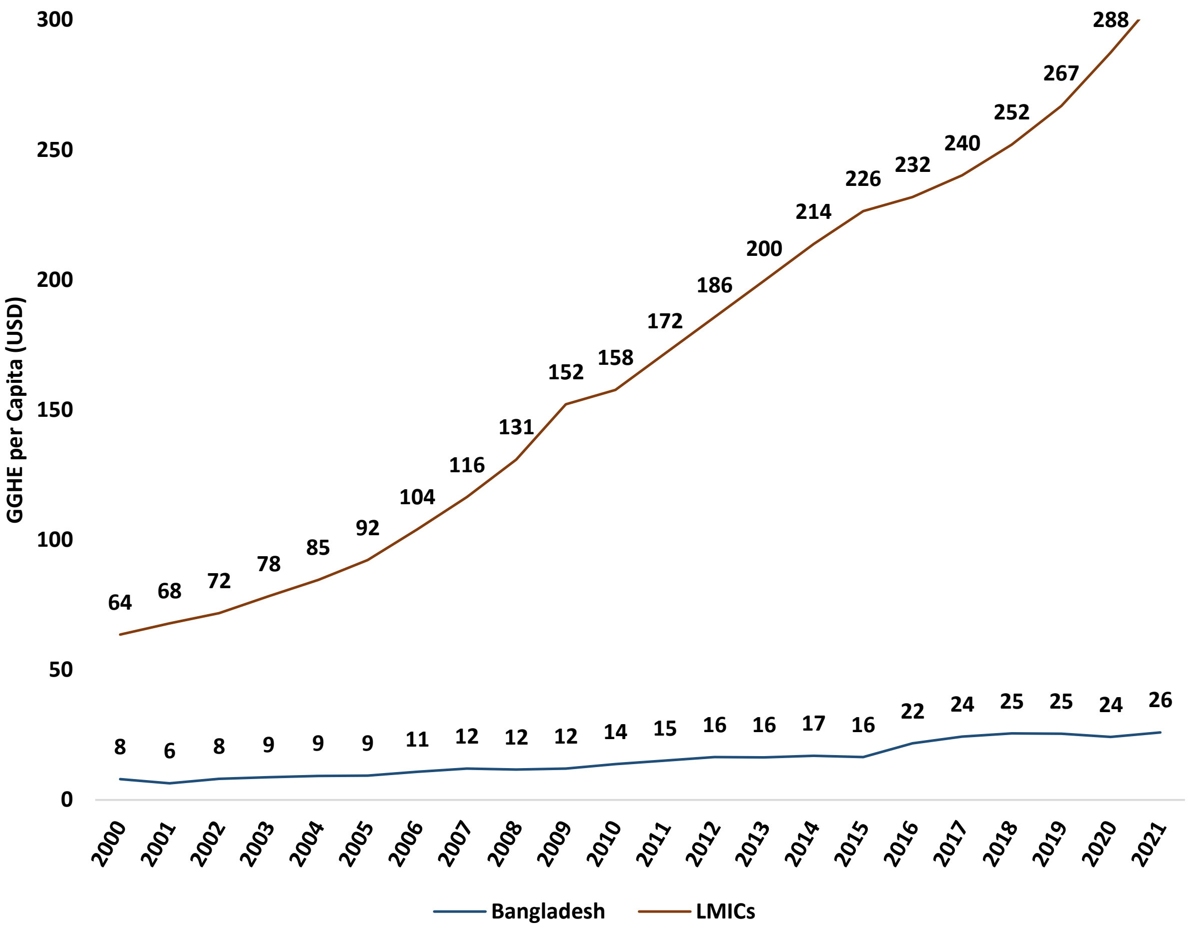

চিত্র ৪৫ থেকে ৪৭ পর্যন্ত উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়ন কাঠামোর এক গভীরতর সংকট উন্মোচন করে, যেখানে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনে ব্যাক্তি পর্যায়ের ব্যয়-এর ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা এখনও জাতীয় স্বাস্থ্য অর্থায়নের মূল ভিত্তি হিসেবে বিদ্যমান। এই প্রকট প্রবণতা বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক উভয় প্রেক্ষাপটেই বাংলাদেশের অবস্থানকে উদ্বেগজনকভাবে পশ্চাৎপদ করে রেখেছে।

প্রথমত, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অর্থায়ন এখনও মূলত ব্যয়-প্রণোদিত (এক্সপেন্স-ড্রাইভেন) এবং ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। চিত্র ৪৫ অনুযায়ী, ২০০১ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের (টোটাল হেলথ এক্সপেন্ডিচার, THE)-এর ৬০ শতাংশের অধিক সরাসরি এসেছে ব্যক্তিগত তহবিল থেকে, অর্থাৎ স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনে ব্যাক্তি পর্যায়ের ব্যয় (২০, ৩১, ৩৩)। যদিও ২০০১ সালে এই অনুপাত ছিল ৬৭%, এবং ২০২১ সালে তা ৬২%-এ সামান্য হ্রাস পেয়েছে, এই পরিবর্তন নীতিনির্ধারণের দৃষ্টিকোণ থেকে নগণ্য। এর অর্থ—অধিকাংশ মানুষ এখনও স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সময় অত্যাবশ্যকীয়ভাবে নগদ অর্থ প্রদানে বাধ্য, যা দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিপর্যয়মূলক স্বাস্থ্য ব্যয় (ক্যাটাস্ট্রফিক হেলথ এক্সপেন্ডিচার) এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে পতিত হওয়ার (ইম্পভারিশমেন্ট) ঝুঁকি বহুগুণে বৃদ্ধি করে।

Figure ৪০: *২০২১ সালে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ায় মাথাপিছু সরকারি স্বাস্থ্য ব্যয়; (উৎস: বিশ্বব্যাংক)*

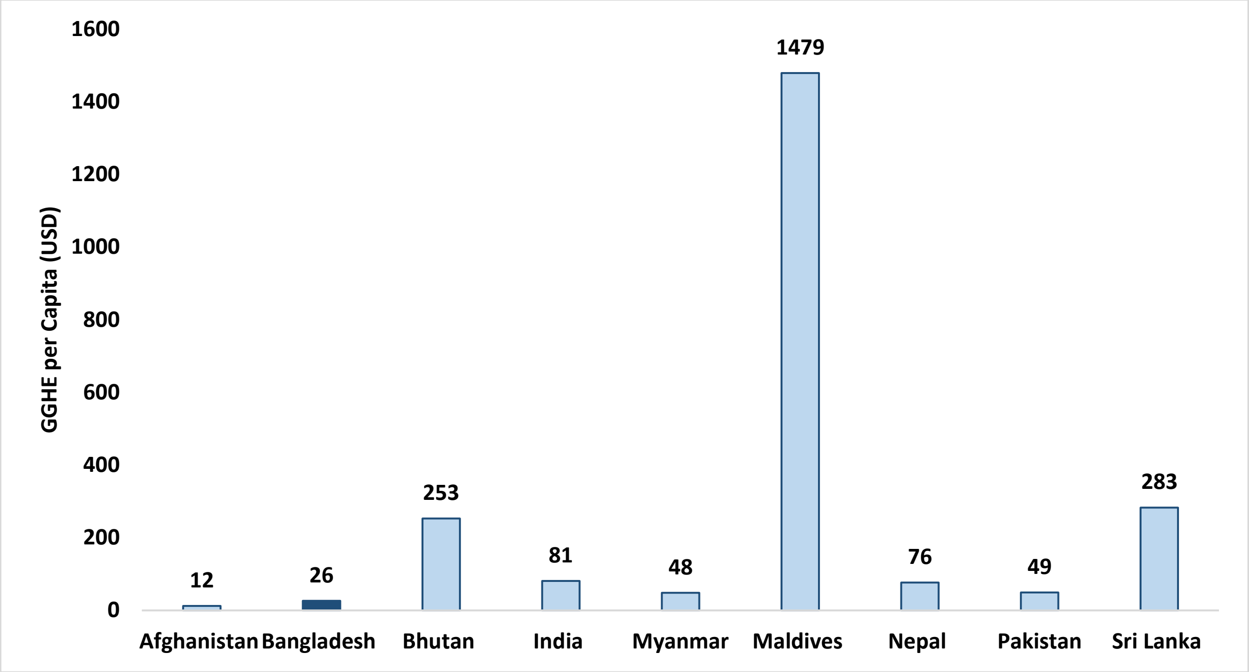

Figure ৪১: *বাংলাদেশে মোট সরকারি ব্যয়ের (GGE) অনুপাতে স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয়ের (GGHE)* ***ধারা ;*** *(উৎস: WHO)*

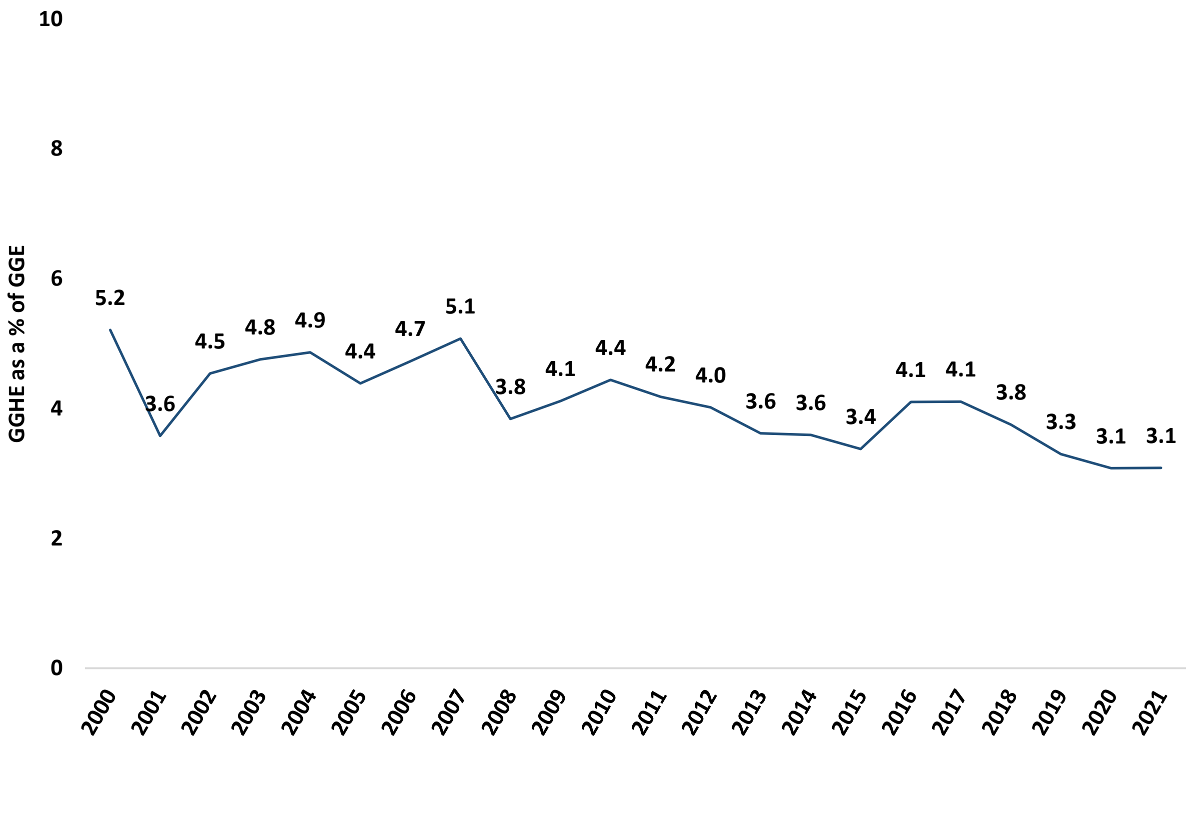

Figure ৪২: দক্ষিণ এশিয়ায় মোট সরকারি ব্যয়ের (GGE) অনুপাতে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যয় (GGHE), ২০০০, ২০১৫ ও ২০২১ সালে (লাল: ২০০০, বেগুনি: ২০১৫, সবুজ: ২০২১); (উৎস: WHO)

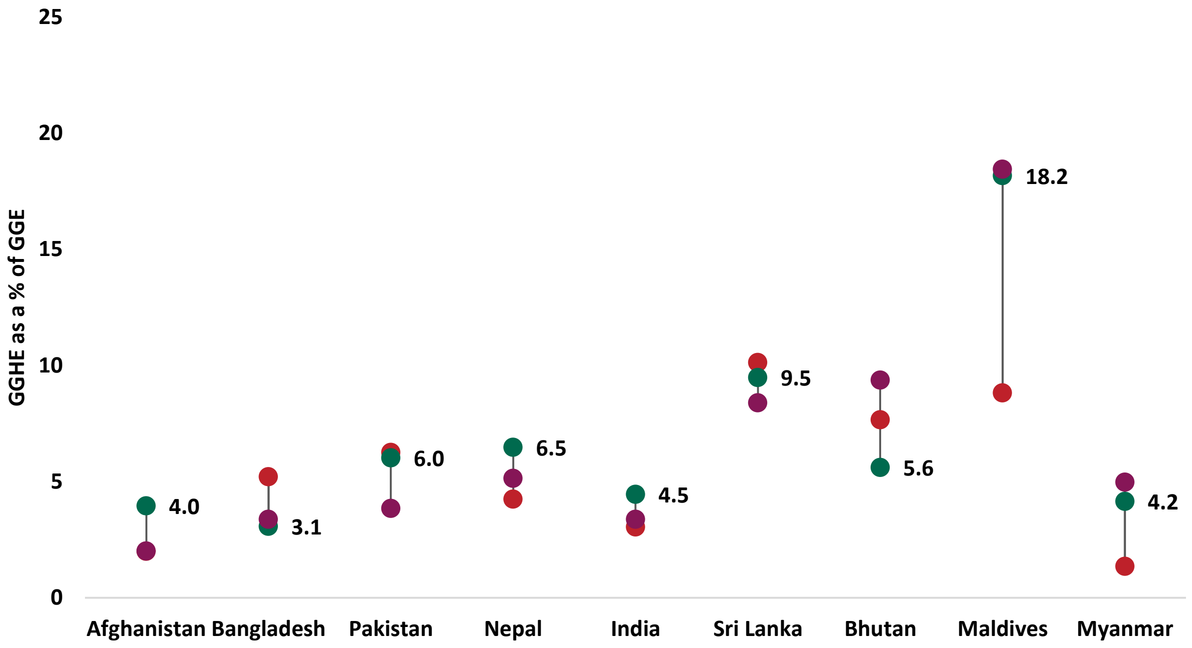

Figure ৪৩: *অনুরূপ মাথাপিছু আয়সম্পন্ন দেশগুলোতে মোট সরকারি ব্যয়ের (GGE) অনুপাতে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যয় (GGHE), ২০০০, ২০১৫ ও ২০২১ সালে (লাল: ২০০০, বেগুনি: ২০১৫, সবুজ: ২০২১); (উৎস: WHO)*

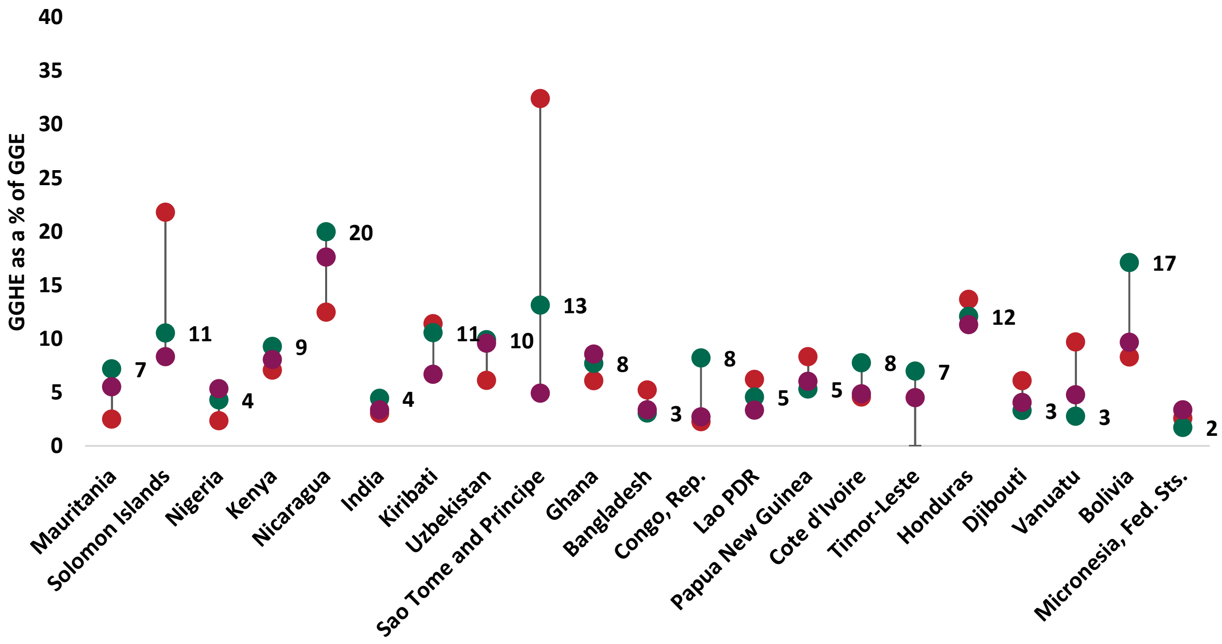

Figure 88: স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে বাজেট বাস্তবায়নের (হার) প্রবণতা; (উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়)

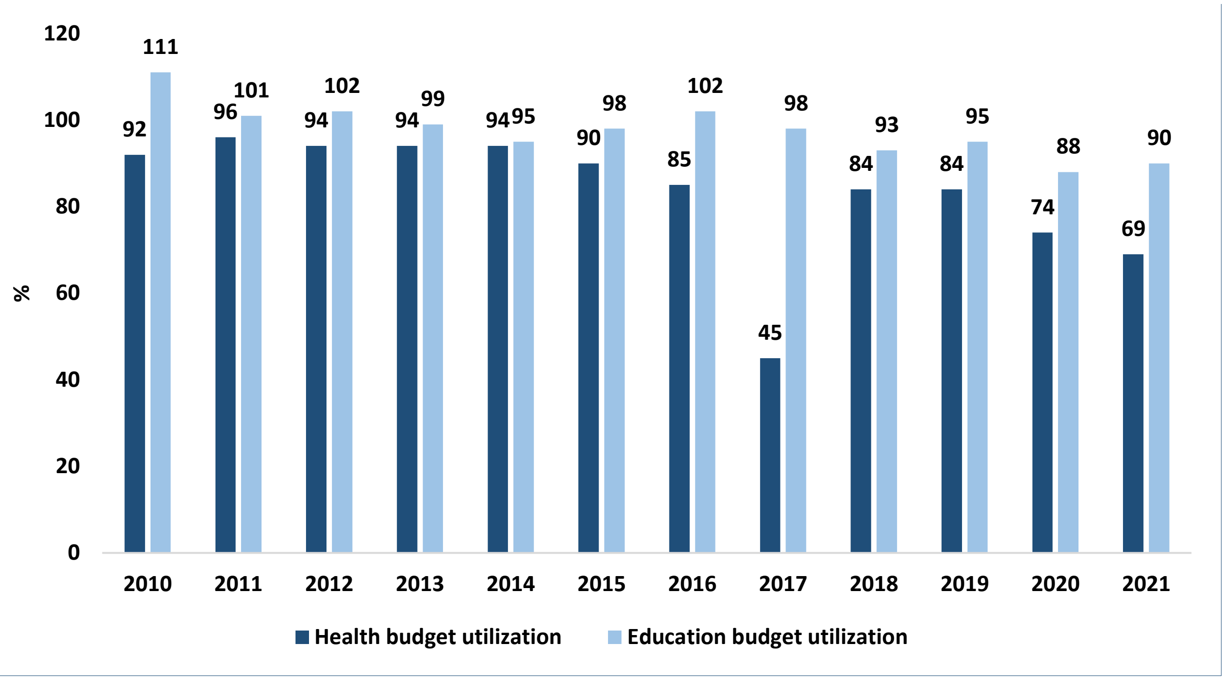

দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থান আরও অধিক উদ্বেগজনক। চিত্র ৪৬ অনুসারে, ২০২১ সালে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ ছিল দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনে ব্যাক্তি পর্যায়ের ব্যয়-নির্ভর দেশ, কেবল যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানের পরেই (৩৩)। পক্ষান্তরে, ভুটান ও মালদ্বীপ সফলভাবে তাদের স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনে ব্যাক্তি পর্যায়ের ব্যয়-এর অনুপাত ২৫%-এর নিচে হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে, যা একটি কার্যকর প্রিপেমেন্ট মডেল, ঝুঁকি-পুলিং ব্যবস্থা এবং জনস্বাস্থ্য বিনিয়োগের সুস্পষ্ট প্রতিফলন। এমনকি শ্রীলঙ্কা, ভারত ও নেপালের মতো উন্নয়নশীল দেশেও স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনে ব্যাক্তি পর্যায়ের ব্যয়-এর অনুপাত বাংলাদেশের তুলনায় বহুলাংশে কম, যা এই গুরুত্বপূর্ণ সূচকে বাংলাদেশকে একটি নেতিবাচক ব্যতিক্রম হিসেবে প্রতিপন্ন করে।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশের সমতুল্য আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের দেশগুলোর সঙ্গেও এই সূচকে এর অবস্থান পশ্চাৎপদ। চিত্র ৪৭ অনুযায়ী, ঘানা, কেনিয়া ও তিমোর-লেস্তের মতো দেশগুলো স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনে ব্যাক্তি পর্যায়ের ব্যয় ৪০%-এর নিচে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে (৩৩)। অথচ বাংলাদেশের হার এখনও ৬০%-এর উর্ধ্বে, যা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে নীতিনির্ধারণ, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং রাজনৈতিক অগ্রাধিকার—এই ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রেই আমাদের সুস্পষ্ট ঘাটতি বিদ্যমান।

এই জটিল প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অর্থায়ন ব্যবস্থাকে আমূল পুনর্গঠন করা অপরিহার্য, যাতে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনে ব্যাক্তি পর্যায়ের ব্যয়ের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা ধীরে ধীরে প্রশমিত করা যায় এবং একটি সুরক্ষিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। এই অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য তিনটি কৌশলগত পদক্ষেপ অত্যাবশ্যক:

- সরকারি স্বাস্থ্য ব্যয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ও সুচিন্তিত বৃদ্ধি;
- সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা, ভর্তুকিভিত্তিক সেবা ও প্রিপেমেন্ট ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ; এবং
- সেবাদান কাঠামোর কার্যকারিতা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি।

এই পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়িত না হলে, স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় লক্ষ লক্ষ পরিবারকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে নিপতিত করতে পারে এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা (ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ, UHC) অর্জনের জাতীয় লক্ষ্য সুদূরপরাহত হয়ে পড়বে।

Figure ৮৫: *বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে মোট ব্যয়ের শতকরা হিসাবে ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয়ের প্রবণতা; (উৎস: বিশ্বব্যাংক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিএনএইচএ)*

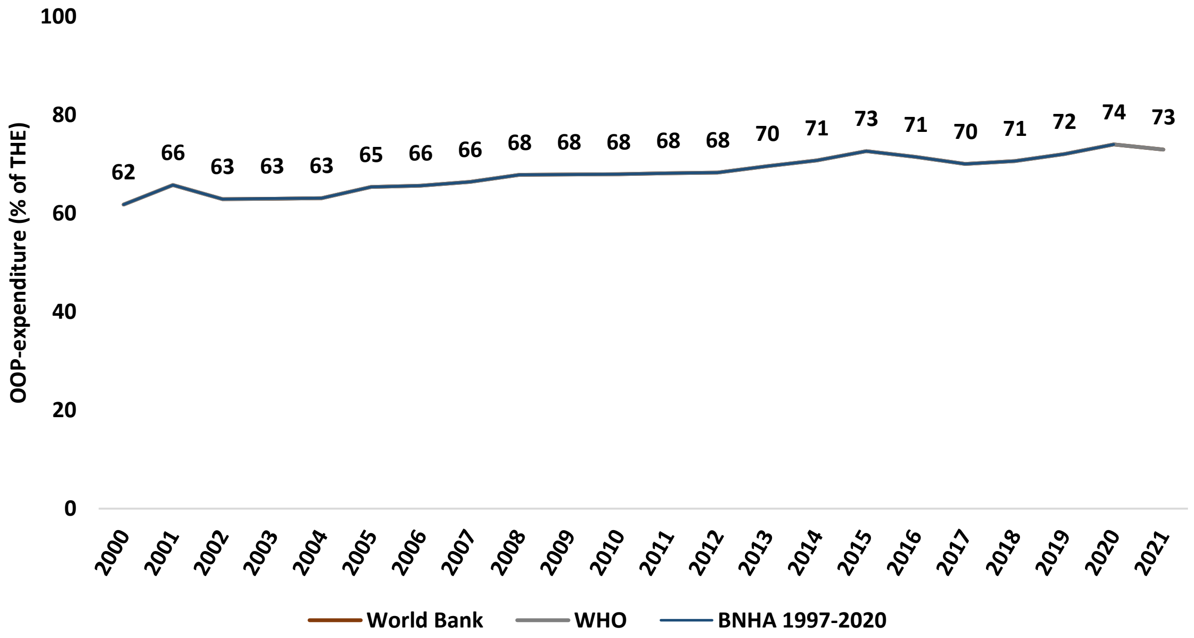

Figure ৮৬: *দক্ষিণ এশিয়ায় স্বাস্থ্যখাতে মোট ব্যয়ের শতকরা হিসাবে ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয় (২০০০, ২০১৫ ও ২০২১ সালে); (লাল: ২০০০, বেগুনি: ২০১৫, সবুজ: ২০২১); (উৎস: বিশ্বব্যাংক)*

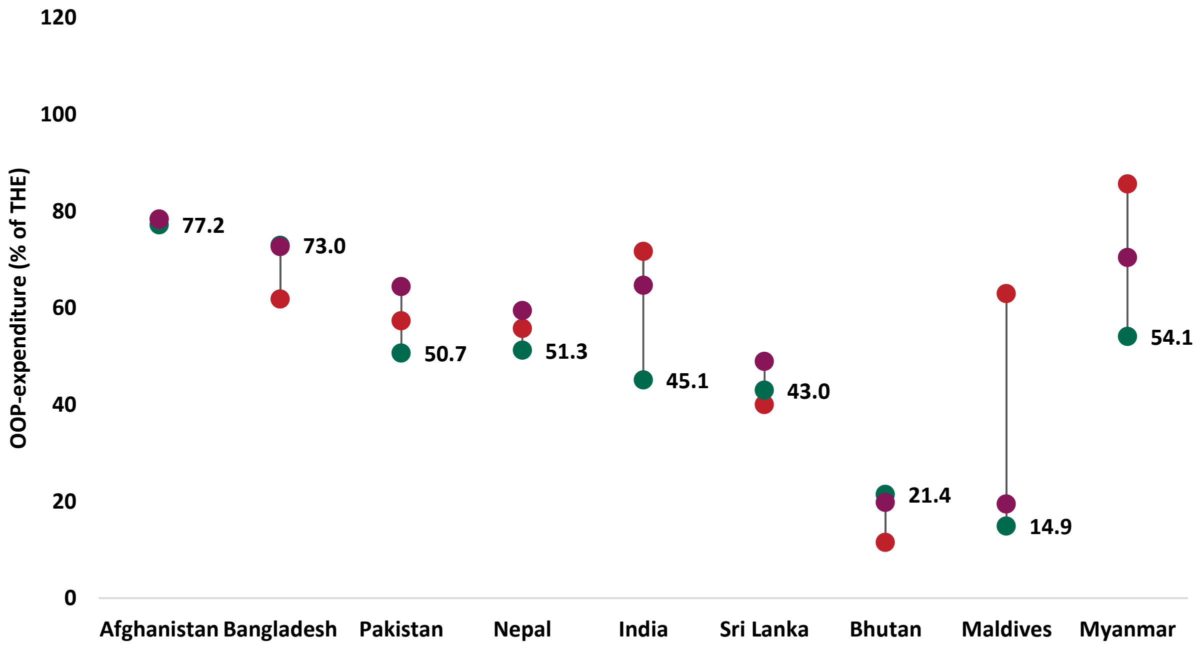

Figure ৪৭: সমপর্যায়ের মাথাপিছু জিডিপি বিশিষ্ট দেশগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্যখাতে মোট ব্যয়ের শতকরা হিসাবে ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয়ের হার (২০০০, ২০১৫ ও ২০২১ সালে); (লাল: ২০০০, বেগুনি: ২০১৫, সবুজ: ২০২১); (উৎস: বিশ্বব্যাংক)

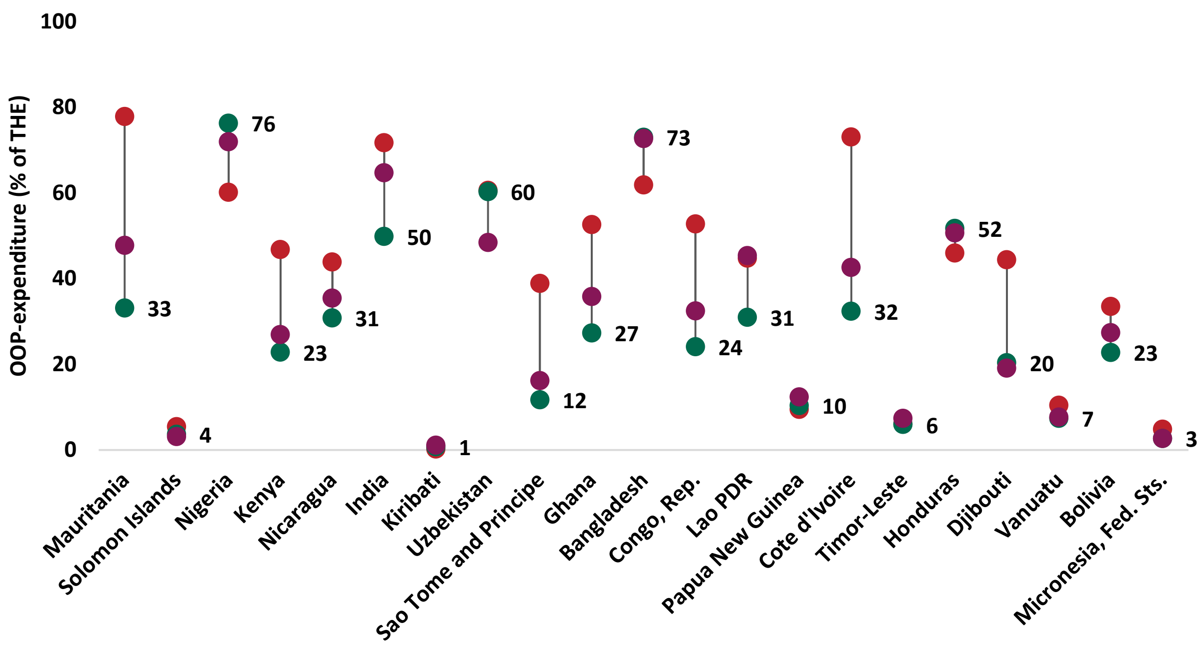

চিত্র ৪৮ ও চিত্র ৪৯ বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনে ব্যাক্তি পর্যায়ের ব্যয়ের কাঠামো এবং এর প্রধান নিয়ামকগুলো উন্মোচন করে। এই বিশ্লেষণ আমাদের অবহিত করে—সাধারণ জনগণ কোন খাতে সর্বাধিক আর্থিক সংস্থান ব্যয় করে এবং রোগের ধরণ ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে সেই ব্যয়ের মাত্রায় কতটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমত, স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনে ব্যাক্তি পর্যায়ের ব্যয়ের সিংহভাগ ব্যয় হয় ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয়ে—যা আমাদের ব্যয় কাঠামোর একটি গুরুতর অসামঞ্জস্য নির্দেশ করে। চিত্র ৪৮ অনুযায়ী, ব্যক্তিপর্যায়ের মোট ব্যয়ের ৬২ শতাংশ ওষুধ ও অন্যান্য স্বল্পমেয়াদী চিকিৎসা সামগ্রীর জন্য ব্যয়িত হয় (২০)। বিপরীতে, বহির্বিভাগীয় সেবায় ব্যয় হয় ১১ শতাংশ, ভর্তিকৃত সেবায় ৯ শতাংশ, ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় ৭ শতাংশ এবং ইমেজিং সেবায় মাত্র ৫ শতাংশ। এই বৈষম্যপূর্ণ ব্যয় কাঠামো সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান করে যে, ওষুধের অত্যধিক মূল্য এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক স্বাস্থ্যসেবার ওপর নির্ভরশীলতা স্বাস্থ্যসেবাকে পরিবারগুলোর জন্য আর্থিকভাবে আরও কঠিন করে তুলছে। ওষুধ সরবরাহ ব্যবস্থার দুর্বলতা, কার্যকর মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এবং স্বাস্থ্যবীমা সুবিধার সীমিত প্রসার এখানে একটি কাঠামোগত দুর্বলতার প্রতিফলন।

দ্বিতীয়ত, রোগ ও হাসপাতালভিত্তিক ব্যয়ের ধরণ বিশ্লেষণ করলে সুস্পষ্ট বিভাজন পরিলক্ষিত হয়। চিত্র ৪৯ অনুযায়ী, ভর্তিকৃত রোগীদের ব্যয় রোগের প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে ব্যাপকভাবে ভিন্ন হয় এবং বেসরকারি হাসপাতালসমূহে এই ব্যয় তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি (৩৪)। উদাহরণস্বরূপ, ক্যান্সারের চিকিৎসায় বেসরকারি হাসপাতালে গড় ব্যয় ৫০,০০০ টাকার উর্ধ্বে, যেখানে সরকারি হাসপাতালে এই ব্যয় অর্ধেকেরও কম। একই প্রবণতা হৃদরোগ, কিডনি রোগ ও পক্ষাঘাতজনিত জটিলতার ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। এই তথ্য-উপাত্ত নির্দেশ করে যে, দীর্ঘস্থায়ী অসংক্রামক রোগসমূহ বর্তমানে ব্যক্তি পর্যায়ে সর্বোচ্চ আর্থিক ঝুঁকির প্রধান উৎস হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। যদিও ডায়রিয়া ও ম্যালেরিয়ার মতো সংক্রামক রোগের চিকিৎসা ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম, তথাপি দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য এই ব্যয়ও বিপজ্জনক হতে পারে—বিশেষত যখন তারা বেসরকারি খাতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে বাধ্য হয়।

এই বিশ্লেষণগুলো আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত বাস্তবতার সম্মুখীন করে—স্বাস্থ্যখাতে আর্থিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে হলে ওষুধ এবং অসংক্রামক রোগ ব্যবস্থাপনায় কাঠামোগত হস্তক্ষেপ অপরিহার্য। প্রথমত, সরকারি পর্যায়ে ওষুধ সরবরাহ ব্যবস্থার

বিস্তার ঘটাতে হবে এবং কার্যকর মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, বহির্বিভাগীয় ও ভর্তিকৃত উভয় প্রকার স্বাস্থ্যসেবার জন্য স্বাস্থ্যবীমা সুবিধার পরিধি সম্প্রসারিত করতে হবে—বিশেষত দীর্ঘস্থায়ী অসংক্রামক রোগ সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা সেবায়।

তদুপরি, সরকারি হাসপাতালের গুণগত মানোন্নয়ন, সহজলভ্যতা বৃদ্ধি ও জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধার করা গেলে বেসরকারি খাতের ওপর জনগণের নির্ভরতা হ্রাস পাবে, যা স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনে ব্যাক্তি পর্যায়ের ব্যয় কমাতে সহায়ক হবে। পরিশেষে, কেবল বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করাই যথেষ্ট নয়—প্রয়োজন হবে আরও দক্ষ, কৌশল-ভিত্তিক এবং চাহিদা-সংবেদনশীল অর্থায়ন কাঠামো, যা জনগণের জন্য কার্যকর আর্থিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে পারবে এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জনের পথে একটি সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করবে।।

***Figure ৪৮:** বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয়ের প্রধান উৎসসমূহ (উৎস: বিএনএইচএ ১৯৯৭–২০২০)*

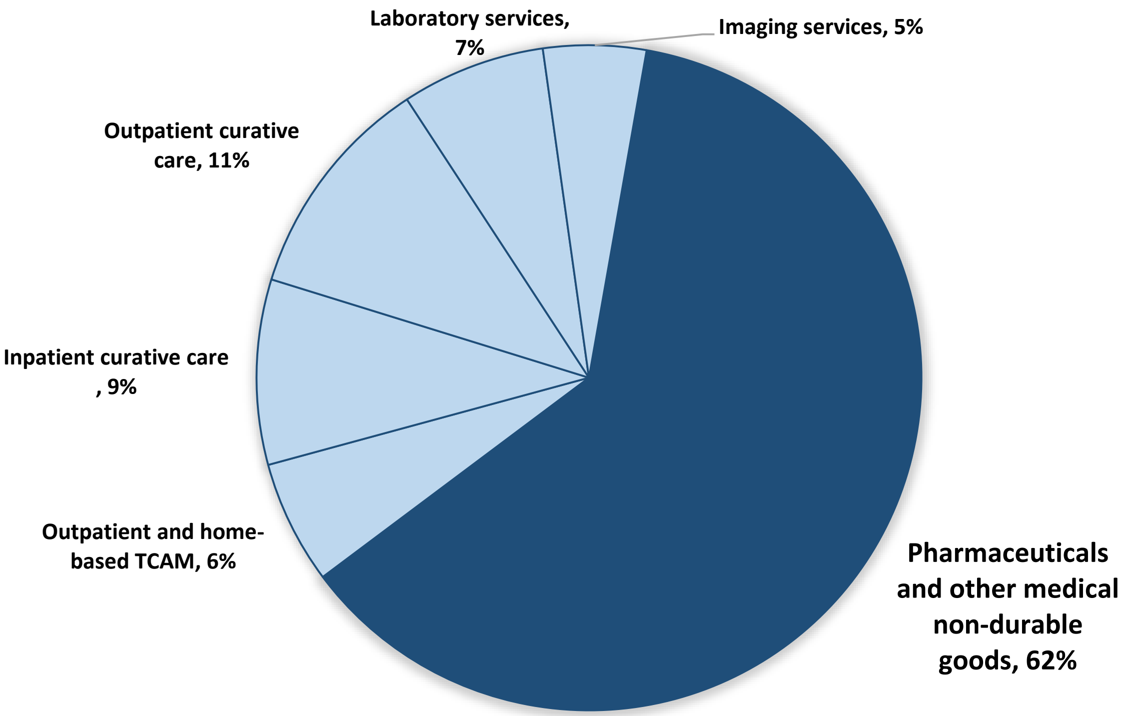

চিত্র ৫১ থেকে চিত্র ৫৩ বাংলাদেশের পরিবারগুলোর ওপর স্বাস্থ্য ব্যয়ের ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাপ এবং এর সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক অভিঘাত স্পষ্টভাবে চিত্রায়িত করে। এই তথ্যসমষ্টি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে—কীভাবে চিকিৎসার ব্যয় বহু পরিবারকে আর্থিক সংকটের দিকে ধাবিত করছে, কোন রোগগুলো ব্যয় বৃদ্ধির প্রধান অনুঘটক এবং জনগণ কীভাবে এই ব্যয় নির্বাহ করতে বাধ্য হচ্ছে।

প্রথমত, বাংলাদেশে বর্তমানে উদ্বেগজনক সংখ্যক পরিবার স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে বিপর্যয়কর ব্যয়ের সম্মুখীন। এই ব্যয় সেই পরিস্থিতিকে সংজ্ঞায়িত করে, যখন একটি পরিবার তাদের মোট আয় বা ব্যয়ের ১০ শতাংশ বা তার অধিক কেবল স্বাস্থ্যসেবার জন্য বরাদ্দ করতে বাধ্য হয়। চিত্র ৫১ অনুযায়ী, ২০০০ সালে যেখানে ১৫ শতাংশ পরিবার এই প্রকার আর্থিক চাপের শিকার হতো, ২০১৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে (৩৫)। এমনকি ২৫ শতাংশ বা তারও বেশি ব্যয় করছে এমন পরিবারের আনুপাতিক হারও বৃদ্ধি পেয়েছে—২০০০ সালে ৫ শতাংশ থেকে ২০১৬ সালে ৮ শতাংশে পৌঁছেছে।

Figure ৪৯: *রোগভিত্তিক ও হাসপাতাল ধরনের ভিত্তিতে গড় ব্যক্তি পর্যায়ের হাসপাতালে ব্যয় (উৎস: Sheikh et al., ২০২২ থেকে গ্রহণকৃত)*

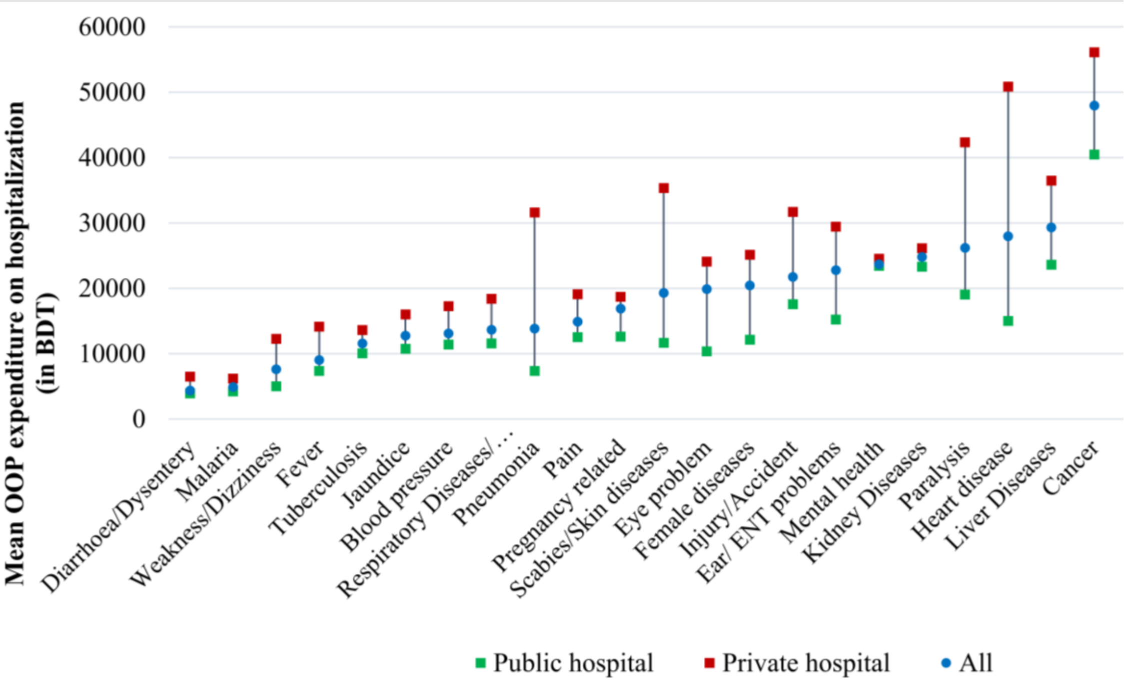

Figure ৫০: *বিভিন্ন বয়সভিত্তিক শ্রেণিতে ব্যক্তি পর্যায়ের স্বাস্থ্য ব্যয় (উৎস: Sarker et al., ২০২২ থেকে গ্রহণকৃত)*

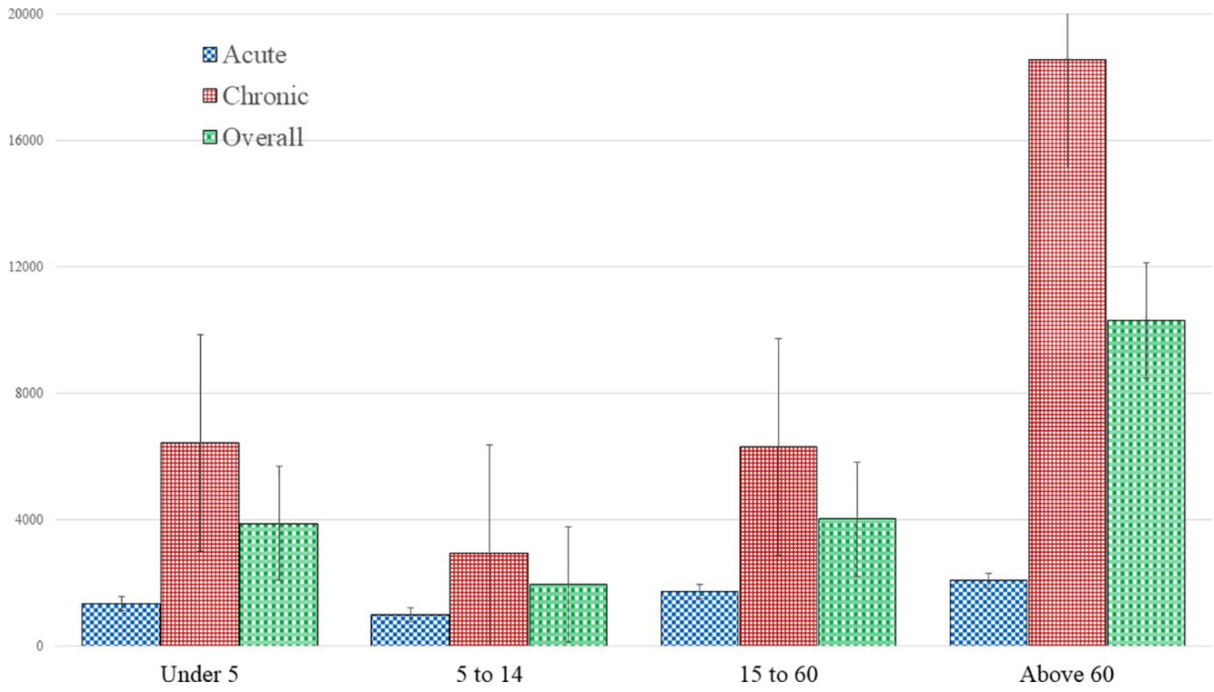

চিত্র ৫১ থেকে চিত্র ৫৩ বাংলাদেশের পরিবারগুলোর ওপর স্বাস্থ্য ব্যয়ের ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাপ এবং এর সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক অভিঘাত স্পষ্টভাবে চিত্রায়িত করে। এই তথ্যসমষ্টি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে—কীভাবে চিকিৎসার ব্যয় বহু পরিবারকে আর্থিক সংকটের দিকে ধাবিত করছে, কোন রোগগুলো ব্যয় বৃদ্ধির প্রধান অনুঘটক এবং জনগণ কীভাবে এই ব্যয় নির্বাহ করতে বাধ্য হচ্ছে।

প্রথমত, বাংলাদেশে বর্তমানে উদ্বেগজনক সংখ্যক পরিবার স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে বিপর্যয়কর ব্যয়ের সম্মুখীন। এই ব্যয় সেই পরিস্থিতিকে সংজ্ঞায়িত করে, যখন একটি পরিবার তাদের মোট আয় বা ব্যয়ের ১০ শতাংশ বা তার অধিক কেবল স্বাস্থ্যসেবার জন্য বরাদ্দ করতে বাধ্য হয়। চিত্র ৫১ অনুযায়ী, ২০০০ সালে যেখানে ১৫ শতাংশ পরিবার এই প্রকার আর্থিক চাপের শিকার হতো, ২০১৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে (৩৫)। এমনকি ২৫ শতাংশ বা তারও বেশি ব্যয় করছে এমন পরিবারের আনুপাতিক হারও বৃদ্ধি পেয়েছে—২০০০ সালে ৫ শতাংশ থেকে ২০১৬ সালে ৮ শতাংশে পৌঁছেছে।

দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থান আরও প্রকট। চিত্র ৫২ অনুসারে, স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে বিপর্যয়কর ব্যয়ের নিরিখে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশ—কেবল যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানের পরেই (৩৫)। এমনকি ভারত, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার মতো উন্নয়নশীল অর্থনীতির তুলনায়ও বাংলাদেশের চিত্র অত্যন্ত নাজুক। এটি সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করে যে, আঞ্চলিকভাবে স্বাস্থ্যব্যয়ে আর্থিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ক্রমশ পশ্চাৎপদ হচ্ছে।

তৃতীয়ত, সুনির্দিষ্ট রোগ এই বিপর্যয়কর ব্যয়কে বহুগুণে তীব্র করে তোলে। চিত্র ৫৩ অনুযায়ী, ক্যান্সার, হৃদরোগ, কিডনি রোগ এবং মানসিক অসুস্থতার মতো দীর্ঘমেয়াদি ও জটিল অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত ৪০ শতাংশেরও বেশি পরিবার স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে বিপর্যয়কর ব্যয়ের সম্মুখীন হয় (৩৪)। উপরন্তু, বহু পরিবার চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের নিরুপায়ে ঋণভারে জর্জরিত হতে, মূল্যবান সম্পদ বিক্রি করতে অথবা বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়—যা অর্থনীতিতে ডিস্ট্রেস ফাইন্যান্সিং নামে পরিচিত। এই পরিস্থিতি কেবল স্বাস্থ্যসেবা খাতেই নয়, সামগ্রিকভাবে পারিবারিক জীবনে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক অনিশ্চয়তা তৈরি করে।

চতুর্থত, এই সংকটের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে অসংক্রামক রোগসমূহ। সংক্রামক রোগের তুলনায় এসব রোগের চিকিৎসা অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল, দীর্ঘমেয়াদি এবং অধিকাংশই বহিঃপ্রতিষ্ঠানিক। সরকারি পর্যায়ে এসব রোগের চিকিৎসা সহজলভ্য না হওয়ায়, জনগণ বাধ্য হয়ে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে ব্যক্তিখাতের ওপর নির্ভরশীল হচ্ছে, যা পরিবারগুলোকে ক্রমশ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করে তুলছে।

নীতিগত বার্তা অত্যন্ত স্পষ্ট: স্বাস্থ্যখাতে কার্যকর আর্থিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ব্যতীত সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন অসম্ভব। এই সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে হলে—(১) স্বাস্থ্যখাতে সরকারি অর্থায়ন বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক; (২) ব্যয়বহুল ও দীর্ঘমেয়াদি রোগের চিকিৎসায় সুনির্দিষ্ট সরকারি ভর্তুকি ও বিশেষ সহায়তার প্রবর্তন অপরিহার্য; এবং (৩) স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে ব্যক্তিপর্যায়ের ব্যয়ের ওপর নির্ভরশীলতা কৌশলগতভাবে হ্রাস করতে হবে, বিশেষত দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য। এই লক্ষ্যে প্রি-পেমেন্ট এবং স্বাস্থ্য বীমা কাঠামোর ব্যাপক সম্প্রসারণ, প্রয়োজনীয় ওষুধে সরকারি সরবরাহ জোরদারকরণ এবং দীর্ঘমেয়াদি রোগ ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত সেবা কাঠামো গড়ে তোলা জরুরি।

Figure ৫১: *বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবায় বিপর্যয়কর ব্যয়ের প্রবণতা (পরিবারভিত্তিক মোট ব্যয় বা আয়ের ১০% ও ২৫%-এর বেশি স্বাস্থ্য ব্যয়ে ব্যয়কারী পরিবারের হার); (উৎস: WHO)*

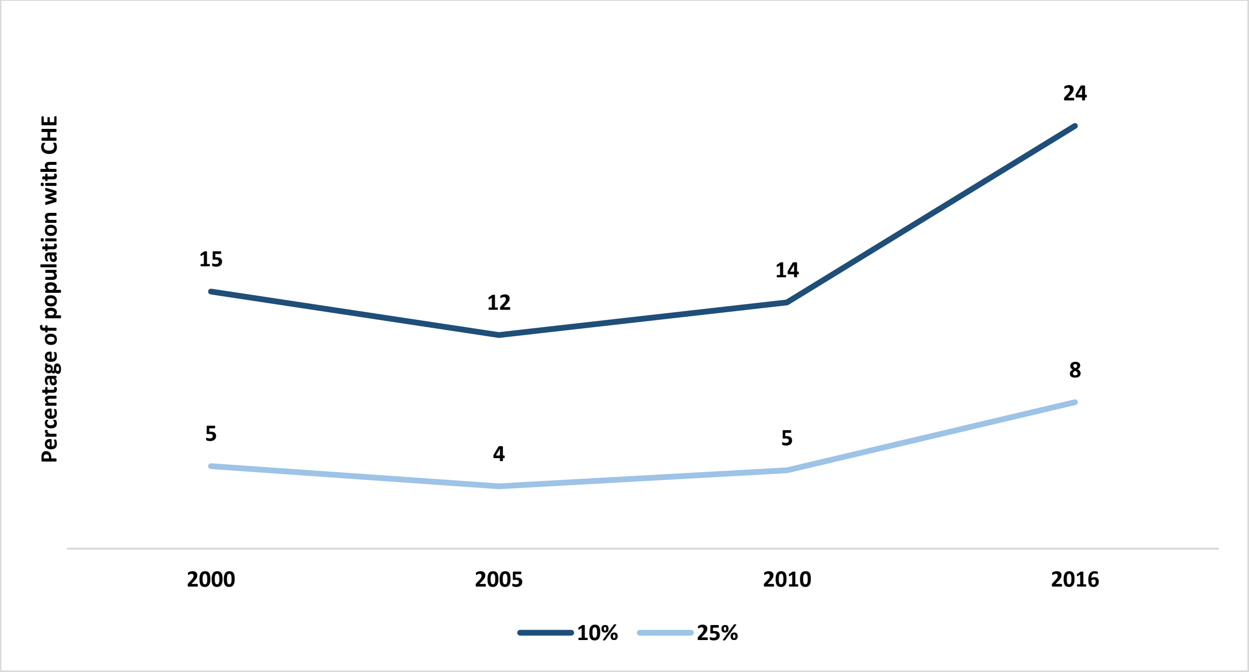

Figure ৫২: *বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, ভুটান, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় পরিবারের মোট ব্যয় বা আয়ের ১০% ও ২৫%-এর বেশি স্বাস্থ্য ব্যয়ে ব্যয়কারী জনসংখ্যার অনুপাত (উৎস: WHO GHO)*

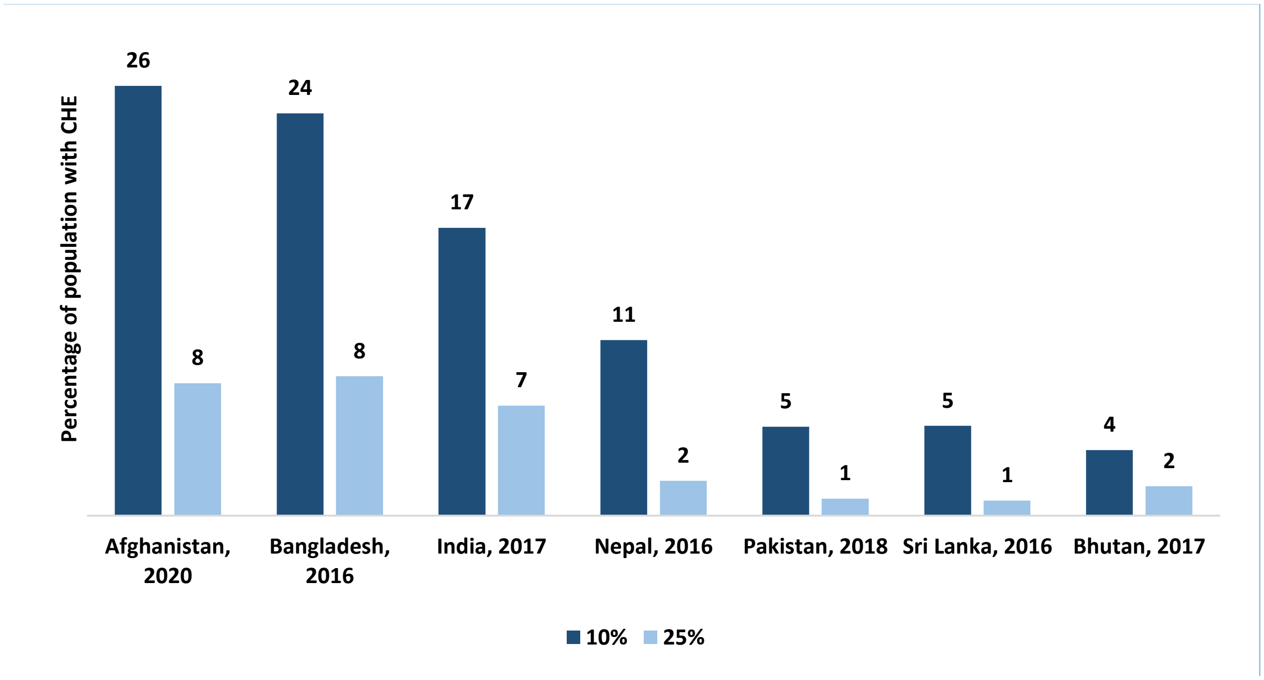

Figure ৫৩: হাসপাতালে ভর্তি চিকিৎসার ক্ষেত্রে THCE-এর ১০% এবং NFE-এর ২৫% ব্যয়ের ভিত্তিতে বাংলাদেশে বিপর্যয়কর ও দুর্বিষহ স্বাস্থ্য ব্যয়ের পরিমাণ (উৎস: Sheikh et al., ২০২২)

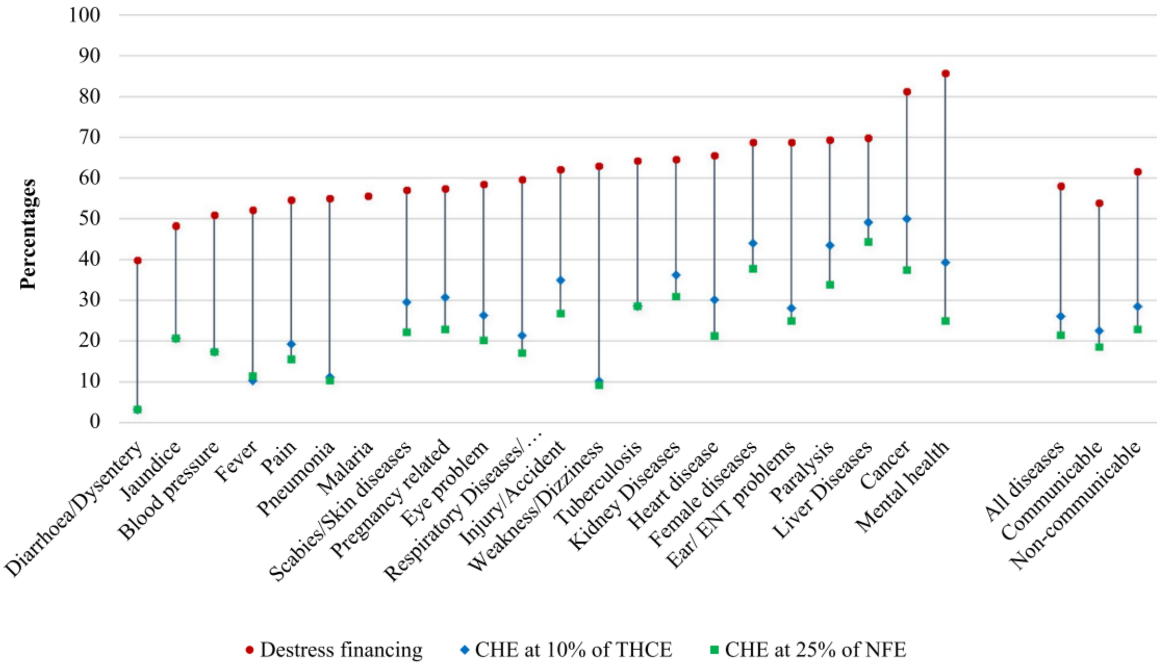

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে অর্থপ্রবাহের কাঠামো: উৎস, মধ্যস্থতাকারী এবং বরাদ্দ

(চিত্র ৫৪–৫৯ অনুসারে)

বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে আর্থিক সংস্থান কীভাবে বিভিন্ন উৎস থেকে আহরিত হয়ে বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে পরিশেষে কোথায় ব্যবহৃত হয়—তা চিত্র ৫৪-এ সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত করা হয়েছে। এই জটিল অথচ আন্তঃসংযুক্ত কাঠামোর মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হয় যে, সরকারি ও বেসরকারি খাতের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমেই দেশের স্বাস্থ্য অর্থায়ন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে (৩৬)।

সরকারি খাতে অর্থায়নের মূল উৎস হলো অর্থ মন্ত্রণালয়, যা প্রত্যক্ষ কর (যেমন—আয়কর, কোম্পানি কর) এবং পরোক্ষ কর (যেমন—মূল্য সংযোজন কর, ভ্যাট)-এর মতো রাজস্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করে। এই আহরিত রাজস্ব জাতীয় বাজেটের ভিত্তি স্থাপন করে, যেখান থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (MoHFW) রাজস্ব ও উন্নয়ন উভয় খাতেই আর্থিক বরাদ্দ লাভ করে। এই বরাদ্দ পরবর্তীতে জাতীয় পর্যায়ের বিশেষায়িত হাসপাতাল থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায়ের ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে বিতরণ করা হয়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি মন্ত্রণালয়—যেমন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়—তাদের নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য স্বতন্ত্র স্বাস্থ্যসেবা পরিচালনা করে এবং তাদের স্ব স্ব বাজেট থেকে এই খাতে ব্যয় নির্বাহ করে। উপরন্তু, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সরকারি সংস্থা বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনগুলোকে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য লক্ষ্যভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে (চিত্র ৫৫ দ্রষ্টব্য) (৩৬)।

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ দেশের স্বাস্থ্যখাতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাঁরা একদিকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেটের অংশীদার হিসেবে সহযোগিতা প্রদান করেন, অন্যদিকে বিভিন্ন এনজিও অথবা অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের পরিচালিত স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে সরাসরি আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। এই তহবিল কখনও সরকারি চ্যানেলের মাধ্যমে, আবার কখনও সরাসরি সংশ্লিষ্ট সংস্থার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় (চিত্র ৫৬ দ্রষ্টব্য) (৩৬)।

কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো—যেমন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান—তাদের কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় বহন করে। কিছু প্রতিষ্ঠান নিজস্ব স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিচালনা করে, আবার কিছু স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যবিমা অথবা আউটসোর্সড মেডিকেল সেবা গ্রহণ করে। এছাড়াও, বহু প্রতিষ্ঠান কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর)-এর আওতায় এনজিও পরিচালিত স্বাস্থ্যসেবায় আর্থিক অনুদান প্রদান করে থাকে (চিত্র ৫৭ দ্রষ্টব্য) (৩৬)।

চিত্র ৫৮-তে প্রতিভাত হয় যে, এনজিওসমূহ স্বাস্থ্যসেবা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে আর্থিক সংস্থান সংগ্রহ করে—যার মধ্যে সরকারি অনুদান, উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা এবং তাদের নিজস্ব আয় অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত এসব সেবা দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য প্রদান করা হয় এবং কখনও সরাসরি, আবার কখনও বেসরকারি হাসপাতাল ও ফার্মেসির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে বাস্তবায়ন করা হয় (৩৬)।

অন্যদিকে, চিত্র ৫৯-এ বেসরকারি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে নিজস্ব তহবিল গঠন করে, অফিস অথবা কারখানার অভ্যন্তরে স্বাস্থ্য ক্লিনিক পরিচালনা করে, অথবা স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সরাসরি চুক্তিবদ্ধ হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে। এনজিও এবং কর্পোরেট খাত—উভয়ই ক্রমশ বেসরকারি হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং ফার্মেসিকে স্বাস্থ্যসেবার সরবরাহ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করছে (৩৬)।

সার্বিকভাবে, এই পরিসংখ্যানগুলো বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অর্থায়নের একটি বিস্তৃত ও বাস্তব চিত্র উন্মোচন করে—যেখানে বহুবিধ উৎস, বহুবিধ মাধ্যম এবং বহুবিধ উদ্দেশ্য আন্তঃসংযুক্ত। এই অর্থপ্রবাহকে কার্যকর ও ন্যায্য করে তুলতে একটি সমন্বিত, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক নীতি কাঠামোর প্রবর্তন অপরিহার্য।

যদিও বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সংস্থানের একটি অংশ সম্মিলিতভাবে ঝুঁকি ভাগাভাগি ও তহবিল একত্রীকরণের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, তথাপি স্বাস্থ্যসেবার প্রধান আর্থিক ভার এখনও পরিবারগুলোর ওপরই ন্যস্ত থাকে। স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়নের একটি উল্লেখযোগ্য অনুপাত এখনও স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনে ব্যাক্তি পর্যায়ের ব্যয় থেকে আসে, যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সীমিত করে এবং আর্থিক ঝুঁকিকে আরও ঘনীভূত করে।

এই কাঠামোগত বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে সরকার স্বাস্থ্যসেবায় তহবিল একত্রীকরণ ও ঝুঁকি সমন্বয়ের নীতিতে অগ্রসর হয়েছে। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হলো স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (Shasthyo Surokhsha Karmasuchi - SSK)। এটি একটি সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা ব্যবস্থা, যার মূল উদ্দেশ্য দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী (Below Poverty Line - BPL) জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা (৩৭)।

Figure ৫৪: বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আর্থিক প্রবাহের চিত্র

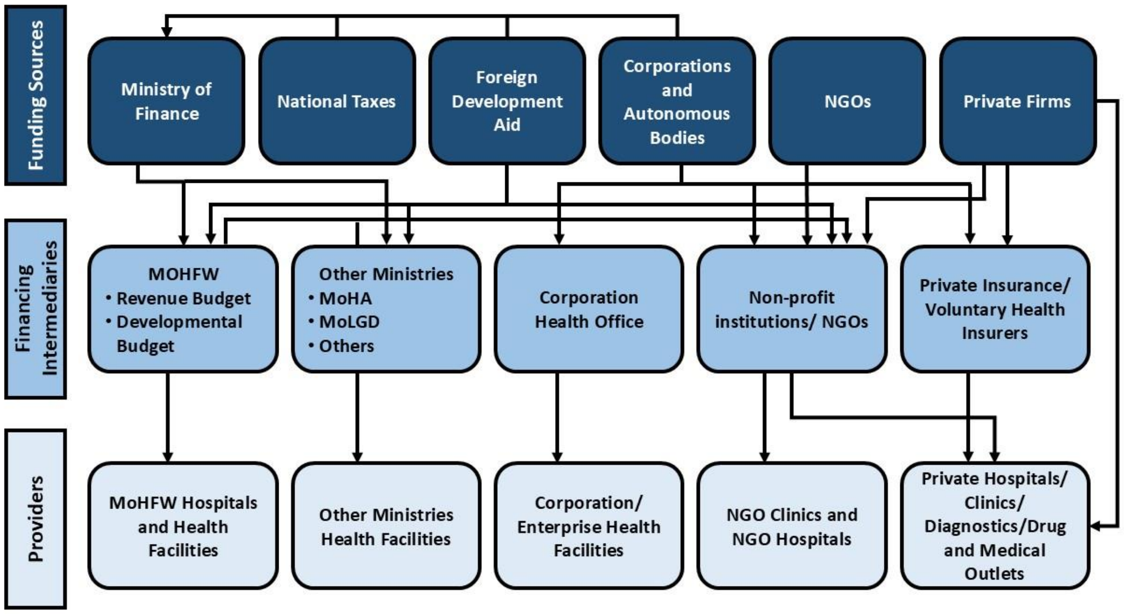

Figure ৫৫: অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আর্থিক প্রবাহ

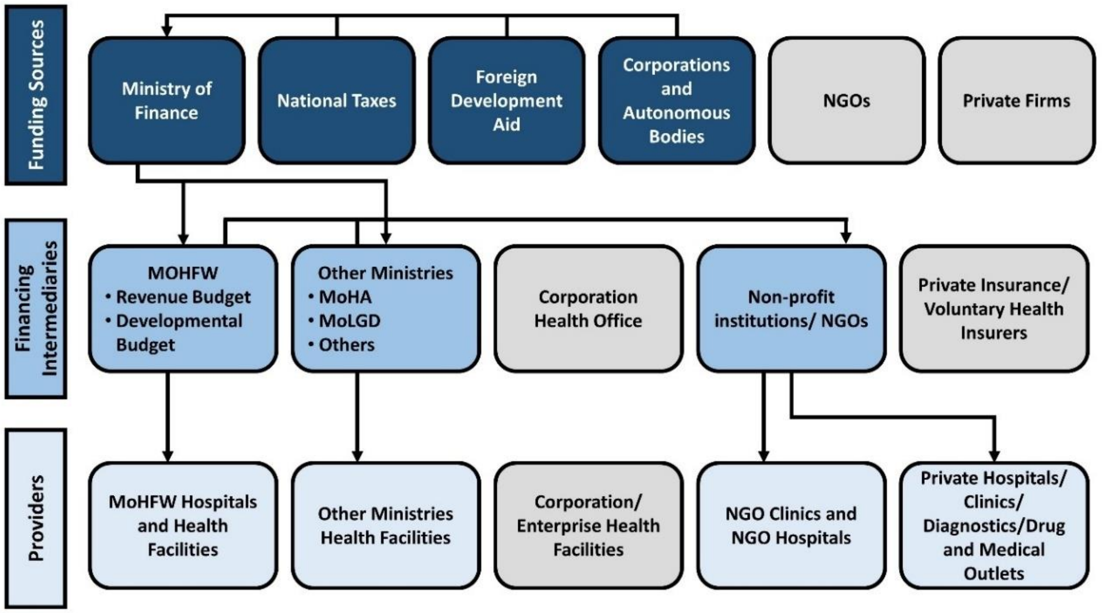

Figure ৫৬: *বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আর্থিক প্রবাহ*

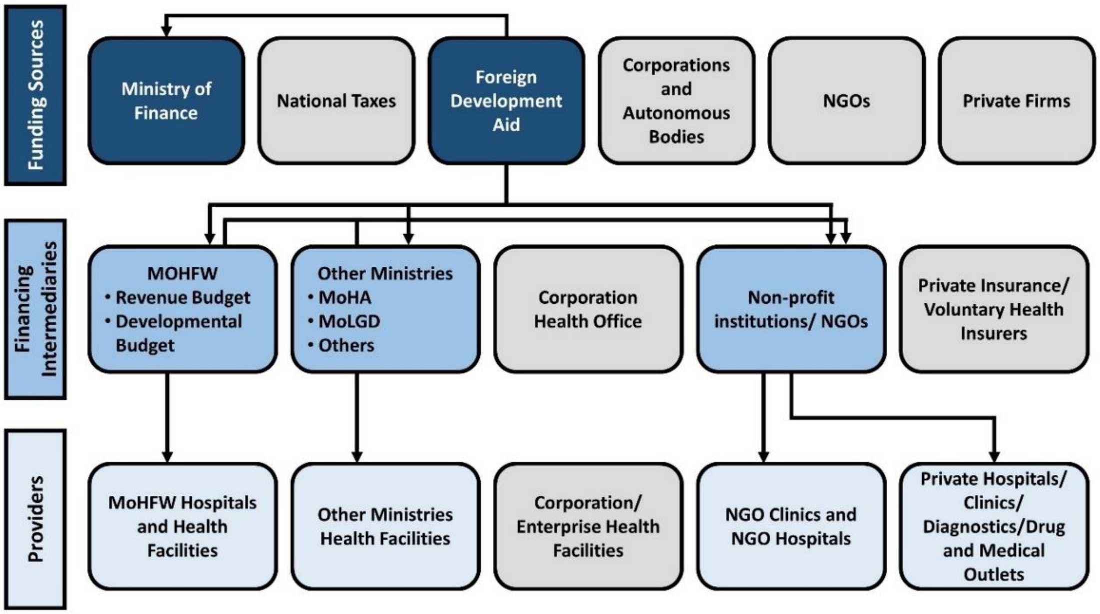

Figure ৫৭: *করপোরেশন ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আর্থিক প্রবাহ*

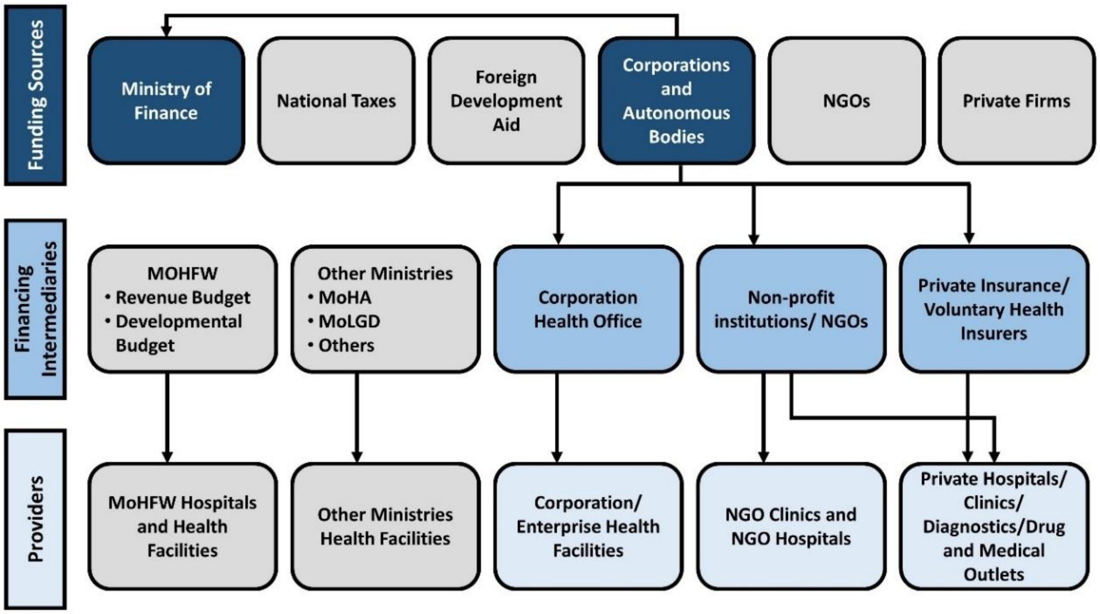

Figure ৫৮: এনজিওর মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আর্থিক প্রবাহ

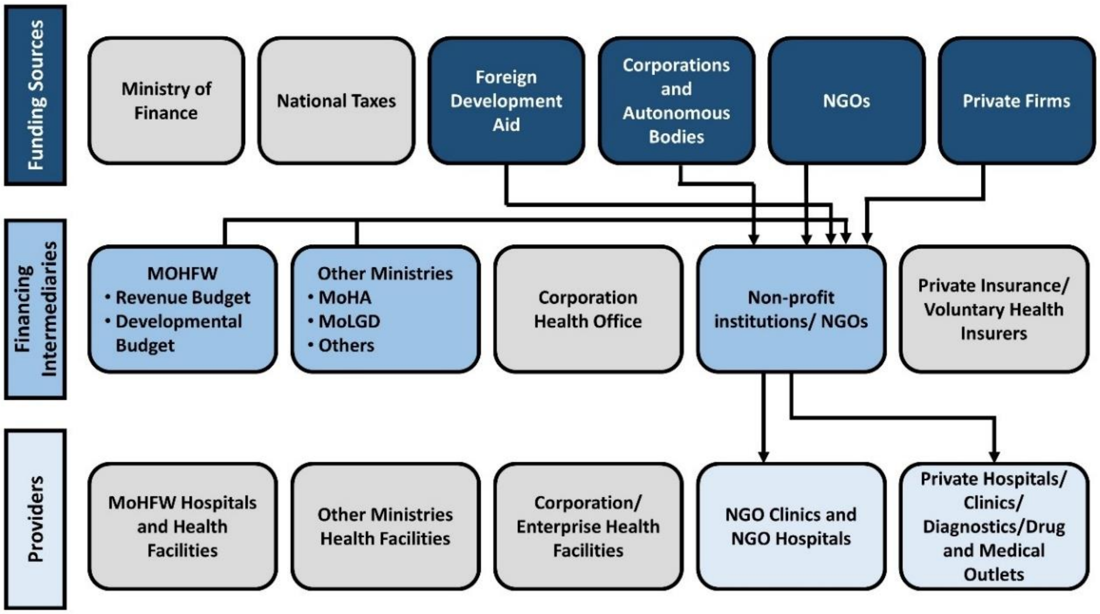

Figure ৫৯: বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আর্থিক প্রবাহ

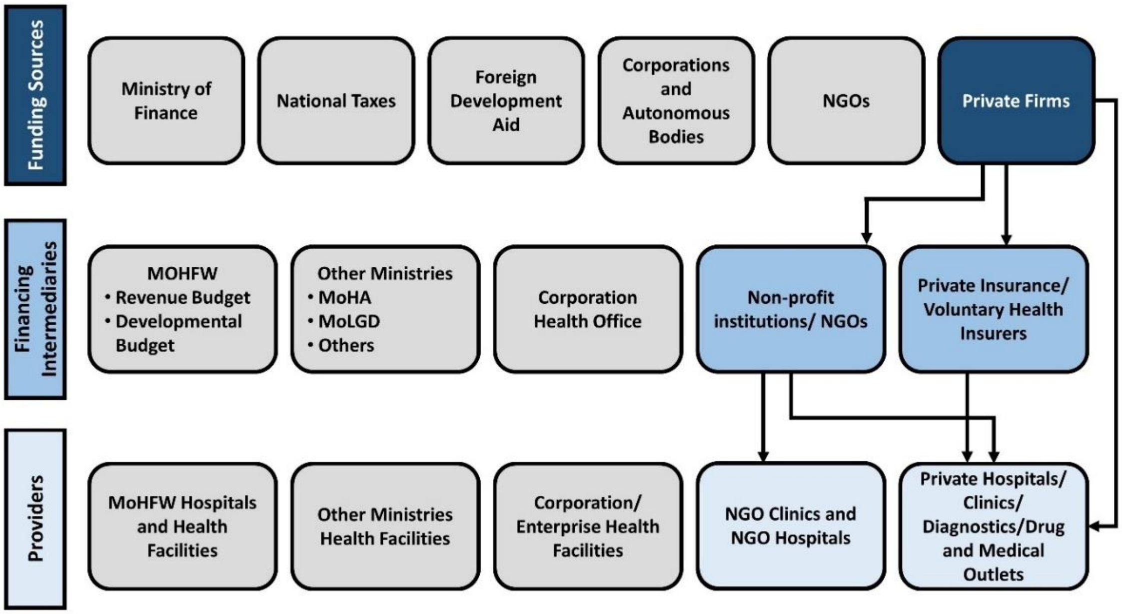

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে আর্থিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ও উদ্যোগ

২০১৬ সাল থেকে, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট (Health Economics Unit - HEU), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে, SSK কর্মসূচির পাইলট বাস্তবায়ন তিনটি উপজেলায় (কালিহাতি, মধুপুর, ঘাটাইল) পরিচালনা করছে। গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে অংশীদারিত্বে এই কর্মসূচি বীমা প্রদান, স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ, ক্লেইম ব্যবস্থাপনা এবং পরিসেবার পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে। প্রতিটি উপজেলায় ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি স্থানীয় কমিটি এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করে।

এই প্রকল্পের আওতায় ৭৮টি চিহ্নিত রোগের জন্য হাসপাতালে ভর্তি চিকিৎসাসেবা, বহির্বিভাগীয় পরামর্শ, প্রয়োজনীয় ঔষধ ও রোগ নির্ণয় সেবা বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। প্রতিটি পরিবার বার্ষিক ১,০০০ টাকা প্রিমিয়ামের বিনিময়ে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য সুরক্ষা কভারেজ লাভ করে। হাসপাতালগুলো পূর্বনির্ধারিত কেস-ভিত্তিক পেমেন্ট মডেলের মাধ্যমে ৩০ দিনের মধ্যে তাদের ব্যয় পরিশোধিত হয়।

SSK সেল একটি সমন্বিত তথ্যভান্ডার (data warehouse) এবং ডিজিটাল হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা সিস্টেম পরিচালনা করছে, যা ক্লেইম প্রক্রিয়াকরণ এবং জালিয়াতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। অব্যবহৃত অর্থ স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মানোন্নয়নে পুনঃবিনিয়োগ করা হয় (৩৮)।

এই উদ্যোগটি প্রধানত তিনটি অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখছে:

১. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য হাসপাতালে ভর্তি চিকিৎসার ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা হ্রাসকরণ।

২. স্থানীয় পর্যায়ে হাসপাতালের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ।

৩. কর্মসম্পাদন-ভিত্তিক অর্থায়নের (Performance-Based Financing) একটি কার্যকর মডেল প্রবর্তন।

SSK কর্মসূচি ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয় এবং স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনে বিপর্যয়কর ব্যয় হ্রাসে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। চিত্র ৬০ অনুসারে, হস্তক্ষেপকৃত এলাকায় (কালিহাতি, মধুপুর, ঘাটাইল) মাসিক গড় স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনে ব্যাক্তি পর্যায়ের ব্যয় ছিল ১,৩০৬ টাকা, যেখানে তুলনামূলক এলাকায় (গোপালপুর, শাখিপুর, বাসাইল) তা ছিল ১,৫৮৩ টাকা। চিত্র ৬১-এ প্রতিভাত হয়, হস্তক্ষেপকৃত এলাকায় স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনে বিপর্যয়কর ব্যয়-এর হার ছিল ৩৬.৪%, যেখানে তুলনামূলক এলাকায় এই হার ছিল ৫৪.৬% (৩৮)।

তবে, চিত্র ৬২ অনুযায়ী স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (SSK) তার পূর্ণাঙ্গ অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি (৩৮)। এর পশ্চাতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান—উপকারভোগী নির্বাচনে দুর্বলতা, স্বাস্থ্যসেবার সীমিত ব্যবহার এবং সেবা প্রদানে বিদ্যমান ঘাটতি।

SSK-এর ঝুঁকি একত্রীকরণ ব্যবস্থা মূলত দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী (BPL) পরিবারগুলোর জন্য প্রণীত, যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু রোগজনিত হাসপাতালে ভর্তির ব্যয় বহন করার কথা। কিন্তু BPL পরিবার শনাক্তকরণ প্রক্রিয়ায় ত্রুটির কারণে প্রকৃত দরিদ্র জনগোষ্ঠী বাদ পড়ে এবং আর্থিকভাবে সচ্ছল পরিবার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। প্রকল্প এলাকায় স্কিমের নিজস্ব মানদণ্ডে যাচাই করে দেখা যায়—৪১.৬% পরিবার প্রকৃতপক্ষে BPL শ্রেণীভুক্ত ছিল না, যেখানে ৫৮.৪% ছিল প্রকৃত BPL (৩৮)। এই অসঙ্গতি ঝুঁকি পুলের সমতা ও কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে।

এছাড়াও, স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহে বিদ্যমান দুর্বলতা—যেমন পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর অভাব, ক্লেইম নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ ও ডায়াগনস্টিক সেবার ঘাটতি—উপকারভোগীদের আস্থা ও সন্তুষ্টি কমিয়ে আনে, ফলস্বরূপ আর্থিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

SSK সেবার ব্যবহারও প্রত্যাশার চেয়ে কম। এর প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে—স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণে বিলম্ব, দুর্বল রেফারেল ব্যবস্থা এবং প্রদত্ত সেবার গুণগত মান নিয়ে অসন্তোষ, যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সেবা গ্রহণে নিরুৎসাহিত করে।

- ৮২% BPL পরিবারের কাছে SSK কার্ড পৌঁছালেও, ১৬.৭% পরিবার এখনও কার্ড পায়নি এবং ১.৩% পরিবার কার্ড হারিয়েছে।

- বিগত এক বছরে, তিনটি SSK উপজেলায় ১৬.৩% পরিবারের হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হলেও, মাত্র ৫.২% পরিবার SSK-এর আওতায় সেবা গ্রহণ করেছে; অবশিষ্ট ১১.১% পরিবার অন্য উৎস থেকে চিকিৎসা নিয়েছে।
- এমনকি যাদের কাছে স্বাস্থ্য কার্ড ছিল, তাদের প্রায় অর্ধেক SSK-এর ইনপেশেন্ট সেবা গ্রহণ করেনি।

SSK উপকারভোগীদের সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে পছন্দের সুযোগের অভাব ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা। তাদের মূলত উপজেলা হাসপাতালের মতো নির্দিষ্ট SSK তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা নিতে উৎসাহিত করা হতো। যদিও এই হাসপাতালগুলোকে বিশেষায়িত চিকিৎসার জন্য রেফারেল ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করার কথা ছিল, তালিকাভুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের সীমিত পরিধি এবং পছন্দের স্বাধীনতা না থাকায় অনেক সময় রোগীরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য কোথাও চিকিৎসা নিতে পারত না। এর ফলে রোগীর সন্তুষ্টি এবং চিকিৎসা গ্রহণে অনীহা সৃষ্টি হতো।

এই নির্দিষ্ট হাসপাতালগুলোতে সেবা গ্রহণে অনীহার পেছনে বেশ কিছু কারণ চিহ্নিত করা গেছে—

- হাসপাতালের ভৌগোলিক দূরত্ব।
- স্বাস্থ্যকর্মীদের যথাযথ আচরণের অভাব।
- তালিকাভুক্ত হাসপাতালে নির্দিষ্ট কিছু রোগের চিকিৎসার অনুপস্থিতি।
- জেলা হাসপাতালে রেফার করা হলে অতিরিক্ত ব্যয়ের আশঙ্কা।
- রাতে অথবা ছুটির দিনে SSK হেল্পডেস্কের সেবা বন্ধ থাকা।
- পর্যাপ্ত জনবলের অভাবে মাঝে মাঝে সেবা কার্যক্রম বন্ধ রাখা।

এসব কারণে অনেক উপকারভোগী এই নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা নিতে দ্বিধা বোধ করত।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ ছিল SSK-এর আওতাভুক্ত ৭৮টি রোগের সীমিত তালিকা (৩৮)। এই তালিকায় অনেক সাধারণ অথচ গুরুতর রোগ, যেমন আর্থ্রাইটিস, পেপটিক আলসার অথবা তীব্র পেটব্যথা—অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এর ফলে অনেক চিকিৎসক ভুল রোগ কোড ব্যবহার করে চিকিৎসা প্রদান করত, যা চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা ও রিপোর্টিং সিস্টেমে জটিলতা সৃষ্টি করত এবং ক্লেইম নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াকেও বিলম্বিত করত। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তারা ইতিমধ্যেই এই তালিকা স্থানীয় রোগ পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি রেখে হালনাগাদ করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন।

SSK স্কিমকে আরও কার্যকর করতে হলে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোতে উন্নয়ন অপরিহার্য—

- প্রকৃত দরিদ্র (BPL) পরিবারগুলোকে নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করা।
- স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- কর্মসূচির সুবিধা সম্পর্কে তথ্য প্রচার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

এছাড়াও, রোগের তালিকার পরিধি সম্প্রসারণ এবং রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে পছন্দের সুযোগ তৈরি করাও অত্যন্ত জরুরি। একটি পুনর্গঠিত কাঠামো এবং লক্ষ্যভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক কৌশল SSK স্কিমের সফল বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

Figure ৬০: *স্বাস্থ্যসেবার জন্য মাসিক মধ্যম ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয় (median OOPE): SSK হস্তক্ষেপ এলাকা ও তুলনামূলক এলাকা অনুযায়ী*

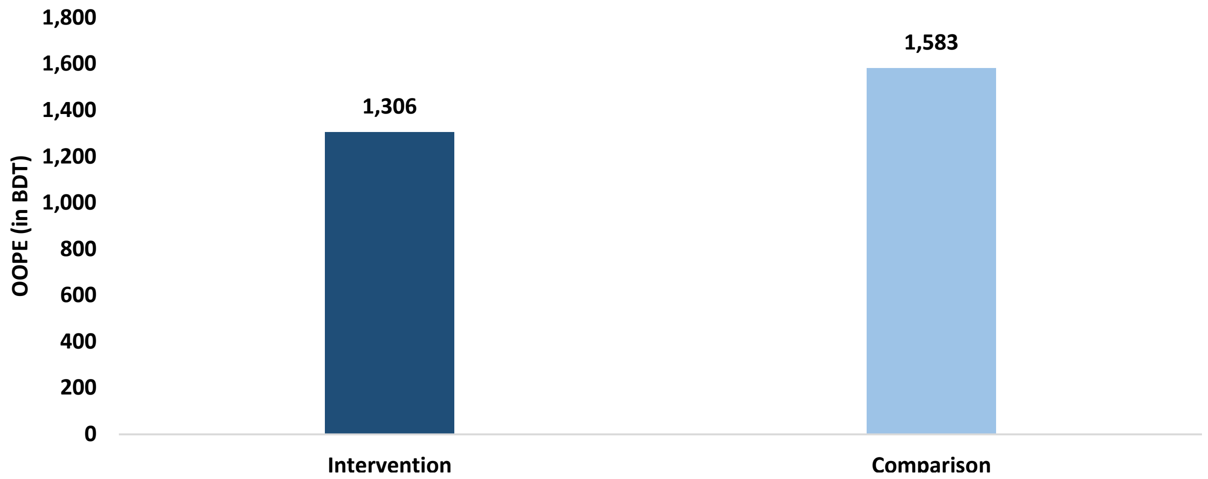

Figure ৬১: *SSK হস্তক্ষেপ এলাকা ও তুলনামূলক এলাকায় স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে বিপর্যয়কর ব্যয়ের (CHE) হার*

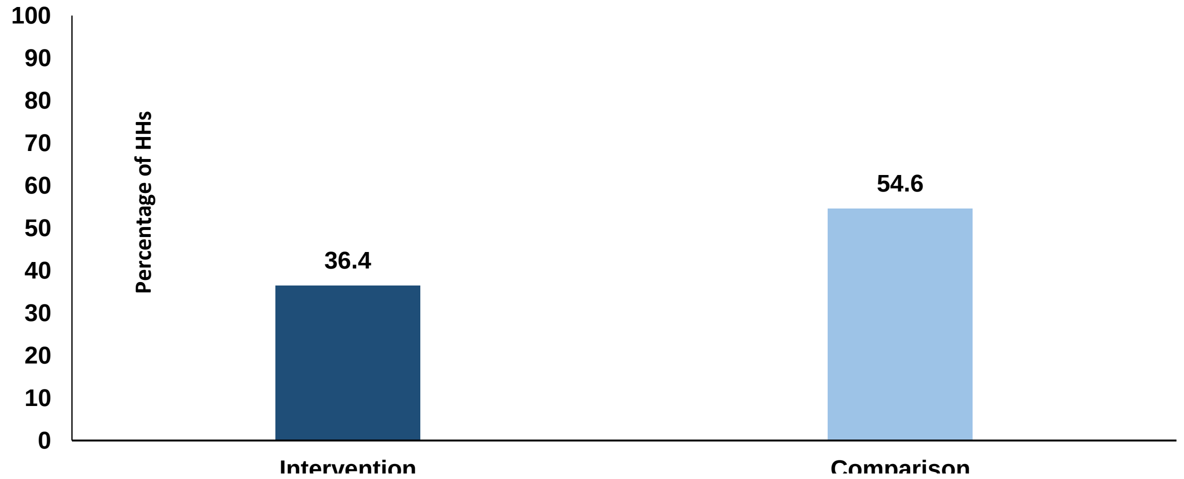

Figure ৬২: *SSK কার্ড থাকার অবস্থা অনুসারে SSK পরিষেবার ব্যবহার (মোট নমুনা=১১৭০)*

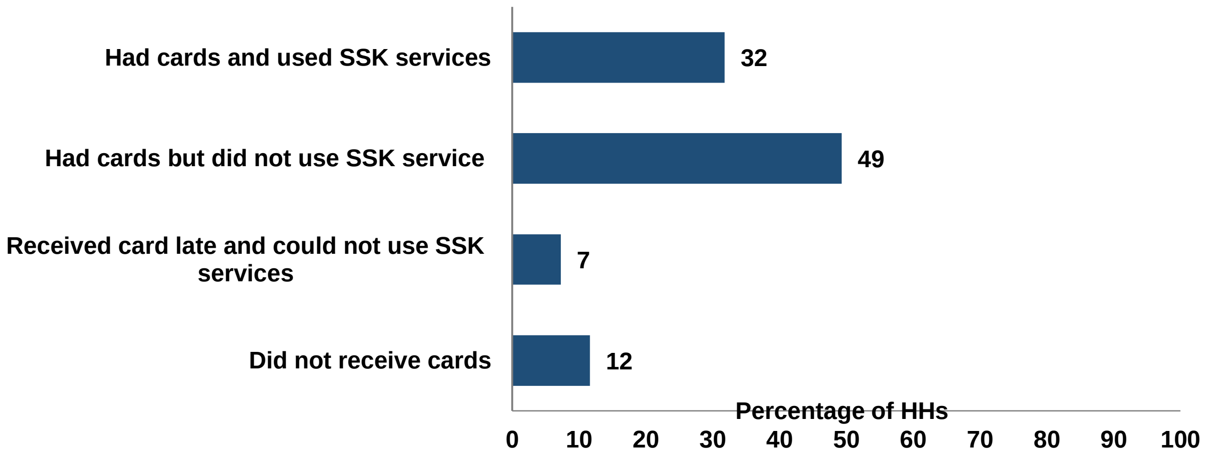

হেলথ ফাইন্যান্সিং প্রগ্রেস ম্যাট্রিক্স (HFPM): স্বাস্থ্য অর্থায়ন ব্যবস্থার কাঠামোগত মূল্যায়নের একটি বৈশ্বিক মানদণ্ড

হেলথ ফাইন্যান্সিং প্রগ্রেস ম্যাট্রিক্স (Health Financing Progress Matrix – HFPM) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মূল্যায়ন কাঠামো। এই কাঠামোর মূল অভীষ্ট হলো—একটি দেশের স্বাস্থ্য অর্থায়ন ব্যবস্থা কতটা সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা (Universal Health Coverage - UHC) অর্জনের অভীষ্ট লক্ষ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে ন্যায্যতা, স্থিতিশীলতা ও দক্ষতার নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত কিনা, তা নিরূপণ করা (৩৯)।

এই ম্যাট্রিক্সে ৭টি প্রধান নীতিগত ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এই ক্ষেত্রগুলোর অধীনে ৩৩টি সুনির্দিষ্ট মূল্যায়ন প্রশ্ন সন্নিবেশিত রয়েছে। এই প্রশ্নাবলী ১৯টি কাঙ্ক্ষিত কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত। এর মাধ্যমে একটি দেশের স্বাস্থ্য অর্থায়ন ব্যবস্থার সুস্পষ্ট শক্তিশালী দিকসমূহ, বিদ্যমান কাঠামোগত দুর্বলতাসমূহ এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের অগ্রাধিকারগুলো স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়।

এই বিস্তৃত মূল্যায়নের সাতটি মুখ্য ক্ষেত্র নিম্নরূপ:

১. স্বাস্থ্য অর্থায়ন নীতি ও শাসন কাঠামো: এই ক্ষেত্রটি দেশের স্বাস্থ্যখাতে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় প্রমাণের ব্যবহার এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাত্রা মূল্যায়ন করে।

২. রাজস্ব আহরণ ব্যবস্থা: এই ক্ষেত্রটি স্বাস্থ্যখাতে সরকারি অর্থায়নের ভিত্তি, করনীতির প্রগতিশীলতা এবং জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্যখাতের সুদৃঢ় অবস্থান বিশ্লেষণ করে।

৩. তহবিল একত্রীকরণ ও ঝুঁকি সমন্বয়: এই ক্ষেত্রটি স্বাস্থ্য তহবিলের একত্রীকরণের মাত্রা, ঝুঁকি ভাগাভাগির সুযোগের কার্যকারিতা এবং ব্যবস্থাটি কতটা সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে, তা মূল্যায়ন করে।

৪. স্বাস্থ্যসেবা ক্রয় ও অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: এই অংশে চাহিদা-ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ, সেবাদানকারীদের জন্য উপযুক্ত প্রণোদনা কাঠামোর উপস্থিতি এবং সম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনার বিষয়াবলী বিশ্লেষণ করা হয়।

৫. সেবা প্রাপ্যতা ও প্রবেশাধিকার: এই ক্ষেত্রটি সুবিধাভোগীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবার পরিধি, সেবার ক্ষেত্রে ন্যায্যতা এবং জনগণের স্বাস্থ্য চাহিদার সাথে খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা মূল্যায়ন করে।

৬. সরকারি অর্থব্যবস্থাপনা (Public Financial Management): এই অংশে বাজেট ব্যবহারের নমনীয়তা, বরাদ্দকৃত তহবিল বাস্তবায়নের সক্ষমতা এবং অগ্রাধিকারভিত্তিক ব্যয় নিশ্চিতকরণের দক্ষতা বিশ্লেষণ করা হয়।

৭. জনস্বাস্থ্য কার্যক্রম ও প্রস্তুতি: এই ক্ষেত্রটি জরুরি স্বাস্থ্য হুমকির জন্য প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা, বিভিন্ন জনস্বাস্থ্য কর্মসূচির কার্যকর সমন্বয় এবং জাতীয় স্বাস্থ্য নিরাপত্তার সামগ্রিক সক্ষমতা মূল্যায়ন করে।

এই মূল্যায়ন কাঠামো কেবল তথ্য সংগ্রহের একটি পদ্ধতি নয়—বরং এটি স্বাস্থ্য অর্থায়নের কৌশলগত সংস্কার পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় নীতিগত দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করে। HFPM ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার স্বাস্থ্য অর্থায়ন ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করতে পারে, আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে তার দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী ভবিষ্যৎ সংস্কারের উদ্যোগগুলোকে বাস্তবভিত্তিক ও সময়োপযোগী করে তুলতে পারে।

Table ২: বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা (২০২১ হেলথ ফাইন্যান্সিং প্রগ্রেস ম্যাট্রিক্স মূল্যায়ন)

মূল্যায়ন এলাকা (Assessment Area)	অবস্থা	মূল হাইলাইট
১. স্বাস্থ্য অর্থায়ন নীতি প্রক্রিয়া এবং শাসনব্যবস্থা (Health Financing Policy Process & Governance)	প্রতিষ্ঠিত (Established)	সমগ্রিক স্বাস্থ্যসেবা অর্থায়ন কৌশল (২০১২–২০৩২) বিদ্যমান, যা বহুপক্ষীয় পরামর্শের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছে।
২. রাজস্ব বৃদ্ধি (Revenue Raising)	প্রাথমিক পর্যায়ে (Emerging)	দেশে স্বাস্থ্য ব্যয়ের ৭২% ব্যক্তিগতভাবে বহন করা হয় (OOP), যেখানে সরকারি স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় জাতীয় বাজেটের মাত্র ৫%।
৩. পুলিং রাজস্ব (Pooling Revenues)	উন্নয়নশীল (Progressing)	বিচ্ছিন্ন স্বাস্থ্য কর্মসূচি: বর্তমানে SSK, মাতৃত্বকালীন ভাউচারসহ বিভিন্ন পৃথক স্বাস্থ্যসেবা পরিকল্পনা জনসংখ্যার ২২% এরও কম অংশকে অন্তর্ভুক্ত করছে।
৪. ক্রয় এবং প্রদানকারী পেমেন্ট (Purchasing & Provider Payment)	প্রাথমিক পর্যায়ে (Emerging)	সংস্থান বরাদ্দ কাঠামোগতভাবে ইনপুট-নির্ভর: বর্তমানে শয্যা সংখ্যা ও অন্যান্য স্থাপনাগত সূচকের ভিত্তিতে স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দ নির্ধারিত হয়, যা বাস্তব চাহিদার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
৫. একসেস সুবিধা এবং শর্তাবলী (Benefits & Conditions of Access)	উন্নয়নশীল (Progressing)	সার্বজনীন প্রয়োজনীয় সেবা প্যাকেজ (ESP) ২৩৪টি স্বাস্থ্যসেবা অন্তর্ভুক্ত করে, তবে তাদের ব্যয়-কার্যকারিতা মূল্যায়নের ঘাটতি রয়েছে।
৬. সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা (Public Financial Management)	উন্নয়নশীল (Progressing)	বাজেট বাস্তবায়নে কম বরাদ্দ: তহবিল ছাড়ের বিলম্ব ও ক্রয়-প্রক্রিয়ার জটিলতার কারণে স্বাস্থ্যখাতের কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।
৭. জনস্বাস্থ্য কার্যাবলী এবং কর্মসূচি (Public Health Functions & Programs)	উন্নয়নশীল (Progressing)	কোভিড-১৯ মোকাবেলা ব্যবস্থা ক্রয়-প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করেছে; আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যবিধির মৌলিক সক্ষমতা এখনও অনুদাননির্ভর।

প্রধান মূল্যায়ন ক্ষেত্রগুলির মূল চ্যালেঞ্জগুলি নিম্নরূপ:

১) স্বাস্থ্য অর্থায়ন নীতি প্রক্রিয়া এবং শাসনব্যবস্থা (Health Financing Policy Process & Governance)

a) নীতির বাস্তবায়ন ধীরগতি সম্পন্ন: শক্তিশালী কৌশল থাকা সত্ত্বেও সংস্কারের অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়ন স্পষ্ট নয়, যা কার্যক্রমের গতি ও প্রভাবকে বাধাগ্রস্ত করছে।

b) দায়বদ্ধতার দুর্বলতা: সংসদীয় পর্যবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত সক্ষমতা নেই, যার ফলে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের কার্যকরতা সীমিত হচ্ছে। এই সীমাবদ্ধতা বাজেট ব্যবহারের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

c) সীমিত আইনি কাঠামো: স্বাস্থ্য খাতের নীতিমালা, যেমন বাজেট লক্ষ্য নির্ধারণ, আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক নয়। ফলে নীতি বাস্তবায়ন ও আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে কার্যকরী তদারকি ও জবাবদিহিতার ঘাটতি রয়ে যাচ্ছে।

২) রাজস্ব বৃদ্ধি (Revenue Raising)

a) অতিরিক্ত ব্যক্তিগত ব্যয়ে নির্ভরতা: বাংলাদেশের পরিবারগুলোকে স্বাস্থ্য খাতে মোট ব্যয়ের ৭৩% নিজস্ব অর্থ থেকে বহন করতে হয়, যার ফলে ২০১৬ সালে ১৪.৮% পরিবার চরম অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে। এই পরিস্থিতি স্বাস্থ্যসেবার প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আরও ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয় এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে টেকসই করে তুলতে বাধা সৃষ্টি করে। স্বাস্থ্যসেবাকে সবার জন্য সহজলভ্য ও ব্যয়-সাশ্রয়ী করতে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যবীমার প্রসার এবং নীতি কাঠামোর পুনর্গঠন জরুরি।

b) স্বল্প সরকারি বিনিয়োগ: স্বাস্থ্য খাতে মোট জাতীয় বাজেটের মাত্র ৫% বরাদ্দ করা হয়েছে, যা ১৫% লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অনেক কম। এই সীমিত বিনিয়োগ স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সুলভ

চিকিৎসা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বড় বাধা সৃষ্টি করছে। জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কার্যকর উন্নয়নের জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো ও দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক পরিকল্পনা গ্রহণ অপরিহার্য।

c) অপ্রতুল স্বাস্থ্যবান্ধব কর ব্যবস্থাপনা: ২০১৫ সালে প্রবর্তিত ১% তামাক সারচার্জ কার্যকরভাবে ডিজাইন করা হয়নি, যার ফলে আদায়কৃত রাজস্ব পুরোপুরি স্বাস্থ্য খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে না। এই সীমাবদ্ধতা তামাক নিয়ন্ত্রণ ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের সম্ভাবনাকে ব্যাহত করছে। দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যসেবা বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে, সারচার্জের অর্থ সুনির্দিষ্টভাবে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ করা জরুরি।

৩) পুলিং রাজস্ব (Pooling Revenues)

a) স্বাস্থ্যসেবার বিভাজন: ১০টিরও বেশি পৃথক প্রকল্প (যেমন SSK, শহরে PHC) কার্যকর সংহতকরণের অভাবে স্বাস্থ্যসেবার প্রবাহে বৈষম্য সৃষ্টি করছে। এর ফলে, সবচেয়ে দরিদ্র ২০% জনগোষ্ঠী মাত্র ১৭.৪% প্রসবপূর্ব সেবা পাচ্ছে, যেখানে সবচেয়ে ধনী ২০% জনগোষ্ঠী ৬৫.৮% সেবা গ্রহণ করছে।

b) স্বাস্থ্যসেবা ঝুঁকি ভারসাম্য: সরকারি কর্মকর্তা ও অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য সুবিধার সুযোগ-সুবিধা অত্যন্ত বৈষম্যমূলক।

c) আন্তসংযোগের ঘাটতি: স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় একীভূত রোগী শনাক্তকরণ নম্বর (Patient ID) বা বিলিং ব্যবস্থা অনুপস্থিত।

৪) ক্রয় এবং প্রদানকারী পেমেন্ট (Purchasing & Provider Payment)

a) বৈষম্যপূর্ণ বরাদ্দ: স্বাস্থ্য খাতে তহবিল বরাদ্দ মূলত পূর্ববর্তী ব্যয়ের তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়, জনগণের প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে নয়।

b) মিশ্র অর্থপ্রদান মডেল: সরকারি খাত কঠোর লাইন-আইটেম বাজেট ব্যবহারের কারণে নমনীয়তা সীমিত করে, অন্যদিকে বেসরকারি খাত ফি ফর সার্ভিস পদ্ধতির মাধ্যমে অতিরিক্ত চিকিৎসাকে উৎসাহিত করে, যা স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় ও গুণগত মানে অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করতে পারে।

c) দুর্বল মাননিয়ন্ত্রণ: বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য কোনও মানসম্পন্ন প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি বা একীভূত মানদণ্ড নেই।

৫) একসেস সুবিধা এবং শর্তাবলী (Benefits & Conditions of Access)

a) পুরনো ESP: সর্বশেষ ২০১৬ সালে সংস্কার করা হয়েছে, কিন্তু এতে অসংক্রামক রোগ (NCDs) সম্পর্কিত নতুন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত নেই, যা মোট মৃত্যুর ৬৭% এর জন্য দায়ী।

b) স্বল্প সচেতনতা: পর্যাপ্ত প্রসবপূর্ব সেবা গ্রহণের হার অত্যন্ত নিম্ন, যেখানে মাত্র ৩৬.৬% নারী এই সুবিধা গ্রহণ করছেন।

c) অআর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা: স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ থেকে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর জন্য দূরত্ব, সাংস্কৃতিক কুসংস্কার, ও লিঙ্গবৈষম্য অন্যতম প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৬) জনস্বাস্থ্য কার্যাবলী এবং কর্মসূচি (Public Financial Management)

a) বাজেট কাঠামো: ইনপুটভিত্তিক বরাদ্দ স্বাস্থ্যসেবার অর্থায়নের নমনীয়তাকে সীমিত করছে, ফলে প্রয়োজনীয় খাতে পুনঃবিন্যাস করা কঠিন হয়ে পড়ছে। এর ফলে ESP ব্যয়ের ৫৭% এখনও অপর্যাপ্ত অর্থায়নের আওতায়, যা স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন ও টেকসই সম্প্রসারণকে বাধাগ্রস্ত করছে।

b) বাস্তবায়নে বিলম্ব: ক্রয় প্রক্রিয়ার জটিলতা ও প্রশাসনিক বাধাগুলোর কারণে ওষুধের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে, যা জরুরি স্বাস্থ্যসেবা ব্যাহত করছে। বার্ষিক বাজেটের মাত্র ৫–২৯% কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, বাকিটা প্রশাসনিক বিলম্ব ও অদক্ষতার কারণে অপূর্ণ রয়ে যায়।

c) কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ: স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবহারকারীর ফি সংরক্ষণ বা তহবিল পুনর্বিন্যাস করতে পারে না, যার ফলে জরুরি চাহিদার প্রতি দ্রুত সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা বাধাগ্রস্ত হয়।

৭) জনস্বাস্থ্য কার্যাবলী এবং কর্মসূচি (Public Health Functions & Programs)

a) দাতাসংস্থার উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা: রোগ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাসহ আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যবিধির মৌলিক সক্ষমতা বহিরাগত অর্থায়নের উপর নির্ভরশীল, যা দীর্ঘমেয়াদী টেকসইতার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

b) ক্রয় প্রক্রিয়ার বিলম্ব: বিশ্বব্যাংকের পর্যালোচনা অনুযায়ী COVID-১৯ সংকট জরুরি ক্রয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধীরগতি উন্মোচন করেছে, যা স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে।

c) বিচ্ছিন্ন স্বাস্থ্য কর্মসূচি: রোগকেন্দ্রিক তহবিল (যেমন যক্ষা, এইচআইভি সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি) পৃথকভাবে পরিচালিত হওয়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সমন্বয় দুর্বল হয়ে পড়ছে।

চিত্র ৬৩ ও ৬৪ বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়নের কাঠামোগত সক্ষমতা ও কৌশলগত লক্ষ্যগুলোর একটি পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন তুলে ধরে। এই মূল্যায়ন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) প্রণীত ২০২১ সালের ফ্রেমওয়ার্ক অনুসারে সম্পাদিত হয়েছে (৩৯)।

প্রথমত, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অগ্রগতি এখনও খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ। চিত্র ৬৩ অনুযায়ী, 'স্বাস্থ্য অর্থায়ন নীতি ও শাসন কাঠামো' সূচকে বাংলাদেশের স্কোর ৩ (Established)—যা নির্দেশ করে একটি আনুষ্ঠানিক নীতিমালা বিদ্যমান এবং কিছু আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ও অর্জিত হয়েছে। তবে 'তহবিল একত্রীকরণ ও ঝুঁকি সমন্বয়', 'সরকারি অর্থব্যবস্থাপনা', এবং 'জনস্বাস্থ্য কার্যক্রম' খাতে স্কোর ২ (Progressing), যা ইঙ্গিত দেয়—এই খাতগুলোর কাঠামো আংশিকভাবে বিকশিত হয়েছে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এখনও সুদূর। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—'রাজস্ব সংগ্রহ', 'সেবা ক্রয় ও পেমেন্ট ব্যবস্থা', এবং 'সুবিধা ও প্রবেশাধিকার'—এই তিনটি অত্যাবশ্যকীয় খাতে স্কোর ১ থেকে ২-এর মধ্যে অবস্থান করছে, যা স্পষ্ট করে যে, এই খাতগুলো এখনও মৌলিক সক্ষমতার ঘাটতিতে ভুগছে এবং প্রত্যক্ষভাবে সেবার মান ও আর্থিক সুরক্ষাকে ব্যাহত করছে (৩৯)।

দ্বিতীয়ত, কৌশলগত লক্ষ্যপূরণে অগ্রগতি এখনও দুর্বল ও অসম। চিত্র ৬৪ অনুযায়ী, ন্যায্যতা, দক্ষতা, আর্থিক সুরক্ষা এবং জবাবদিহিতা—এই চারটি মূল সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান 'Emerging' থেকে 'Progressing' স্তরের মধ্যে সীমিত (৩৯)। এর অর্থ, নীতিগত কাঠামো বিদ্যমান থাকলেও, মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের ঘাটতি রয়ে গেছে। এই বাস্তবতা পূর্ববর্তী বিশ্লেষণগুলোর সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ—যেখানে উচ্চ স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনে ব্যাক্তি পর্যায়ের ব্যয়, বাজেট বাস্তবায়নের দুর্বলতা এবং অপর্যাপ্ত সরকারি ব্যয়ের বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে উঠে এসেছে।

এই মূল্যায়নের প্রধান বার্তাটি হলো—কৌশল ও নীতিমালা প্রণীত হলেও, বাস্তব সক্ষমতা এখনও প্রত্যাশিত মানে উন্নীত হয়নি। পরিকল্পনা কার্যকর বাস্তবায়নের অভাবে কাঠামোগত রূপান্তরের সুফল জনগণ পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না।

সারসংক্ষেপে, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অর্থায়ন ব্যবস্থাকে কার্যকর ও টেকসই রূপে প্রতিষ্ঠা করতে হলে তিনটি ক্ষেত্রে রূপান্তরমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি:

১) তহবিল একত্রীকরণ ও ঝুঁকি সমন্বয় ব্যবস্থার সুদৃঢ়করণ,
২) সেবা প্রদানকারীদের জন্য প্রণোদনা-ভিত্তিক ও কার্যকর পেমেন্ট ব্যবস্থার প্রবর্তন, এবং
৩) বাজেট বাস্তবায়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা জোরদারকরণ।

এই সংস্কারগুলো ব্যতিরেকে, প্রণীত নীতিমালাসমূহ কার্যকর বাস্তবতায় রূপ নেবে না এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা (UHC) অর্জনের পথে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলো অপসারিত হবে না। এখন নীতি নির্ধারণের স্তর থেকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শক্তিশালী ও দৃশ্যমান অগ্রগতি অপরিহার্য।

Figure ৬৩: ২০২১ সালে বাংলাদেশে মূল্যায়ন ক্ষেত্র অনুযায়ী গড় স্কোর (১: প্রাথমিক পর্যায়ে, ২: উন্নয়নশীল, ৩: প্রতিষ্ঠিত, ৪: অগ্রসর); (উৎস: WHO)

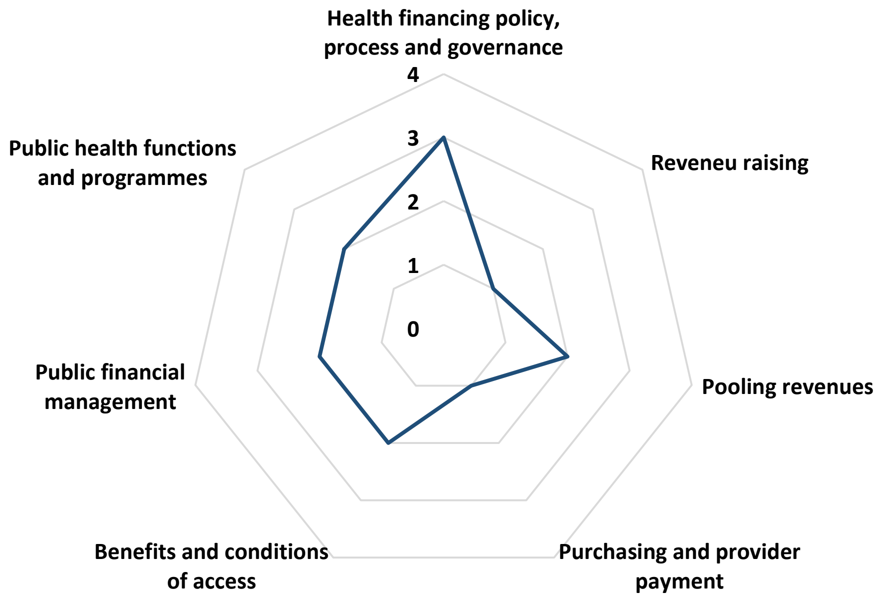

Figure ৬৪: ২০২১ সালে বাংলাদেশে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী গড় স্কোর (১: প্রাথমিক পর্যায়ে, ২: উন্নয়নশীল, ৩: প্রতিষ্ঠিত, ৪: অগ্রসর); (উৎস: WHO)

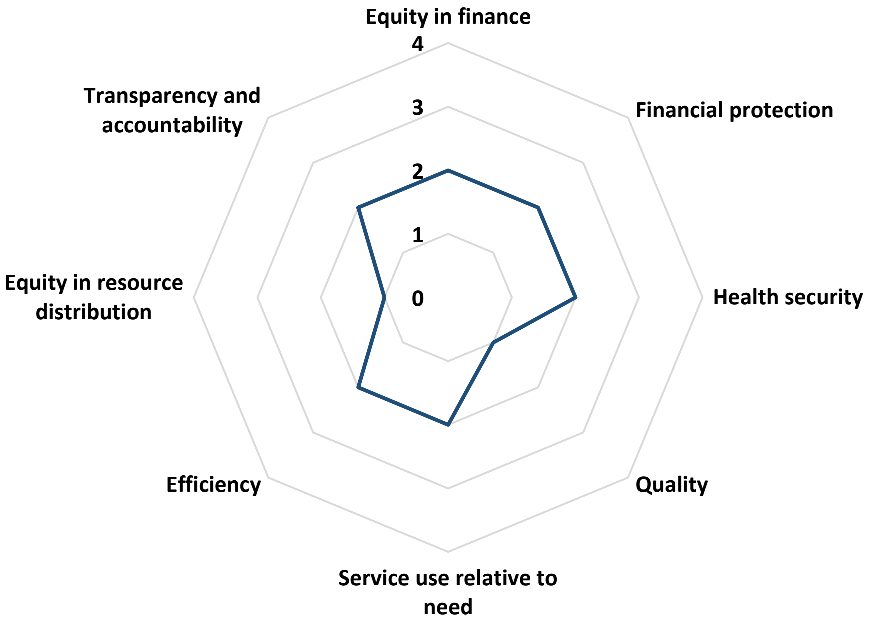

সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা

সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা: বর্তমান প্রেক্ষাপট ও বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা

সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা (Universal Health Coverage – UHC) একটি মৌলিক নীতিগত অঙ্গীকার, যার অভীষ্ট হলো—জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিক যেন অর্থনৈতিক কষ্টের সম্মুখীন না হয়ে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা লাভ করতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সংজ্ঞা অনুযায়ী, UHC কেবল স্বাস্থ্যসেবার সুযোগের সমতা নিশ্চিত করে না, বরং গুণমানসম্পন্ন ও ন্যায্য সেবা প্রদানেরও প্রতিশ্রুতি বহন করে।

সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা মূল্যায়নের নিমিত্ত WHO চারটি প্রধান স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে কিছু সুনির্দিষ্ট সূচক ব্যবহার করে, যা UHC ট্রেসার ইন্টারভেনশন (সারণী ৩) নামে পরিচিত (৪০):

১) প্রজনন, মাতৃ, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য
২) সংক্রামক রোগ
৩) অসংক্রামক রোগ
৪) সেবা প্রদানের সক্ষমতা ও প্রাপ্যতা
বাংলাদেশ এই সূচকগুলোর মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, শিশুদের টিকাদান কর্মসূচি এবং যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা কাভারেজ বর্তমানে ৮০% বা তার উর্ধ্বে, যা এই খাতগুলোতে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার ও কার্যকর কর্মক্ষমতা প্রদর্শন করে।

তবে, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এখনও বিদ্যমান ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। গর্ভকালীন সেবার কাভারেজ মাত্র ৩৭%, নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে যথাযথ চিকিৎসা প্রাপ্তির হার ৪৬%, এবং HIV সংক্রমিত রোগীদের মধ্যে চিকিৎসা আওতাভুক্তির হার মাত্র ২৩%। এই পরিসংখ্যান সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এখনও সকল স্তরের জনগণের জন্য সমতাভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি।

অসংক্রামক রোগ ব্যবস্থাপনাও একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিদ্যমান। পাশাপাশি, স্বাস্থ্যসেবার ভৌত অবকাঠামো ও মানবসম্পদ ভিত্তিক সক্ষমতা এখনও সীমিত পর্যায়ে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র ৫০% এবং স্বাস্থ্যকর্মীর ঘনত্ব আদর্শ মানের তুলনায় প্রায় ২৫%, যা একটি উল্লেখযোগ্য ঘাটতি। এই সীমাবদ্ধতাগুলো স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান করে যে, কেবল নীতি প্রণয়নই যথেষ্ট নয়, বরং বাস্তব সক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য অনতিবিলম্বে স্বাস্থ্যখাতে টেকসই বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং কাঠামোগত সংস্কার বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

সার্বিকভাবে, UHC অর্জনের অভিমুখে বাংলাদেশের অগ্রগতি নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক, তবে একে একটি বাস্তব রূপ দিতে হলে এখনও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ও লক্ষ্যভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা (Universal Health Coverage – UHC) সেবার কভারেজ সূচক একটি এককবিহীন (unitless) সংক্ষিপ্ত পরিমাপ, যা ০ থেকে ১০০ স্কেলে প্রকাশিত হয়। এটি একটি দেশের জনগণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবার বাস্তব কভারেজ কতটা অর্জিত হয়েছে, তা নিরূপণের একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদণ্ড।

এই সূচকটি ১৪টি সুনির্দিষ্ট ট্রেসার সূচকের জ্যামিতিক গড়ের ভিত্তিতে সংকলিত হয় (৪১)। প্রথম ধাপে, চারটি প্রধান স্বাস্থ্যসেবা শ্রেণির—(১) প্রজনন, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, (২) সংক্রামক রোগ, (৩) অসংক্রামক রোগ, এবং (৪) সেবাদানের সক্ষমতা ও প্রাপ্যতা—প্রত্যেকটির অন্তর্গত সূচকগুলোর জ্যামিতিক গড় নির্ধারণ করা হয়। অতঃপর, এই চারটি শ্রেণির গড়কে পুনরায় একটি চূড়ান্ত জ্যামিতিক গড়ের মাধ্যমে সমন্বিত UHC কভারেজ সূচক নির্ণয় করা হয়।

এই সূচক কেবল স্বাস্থ্যসেবার একটি সংখ্যাগত চিত্রায়ণ নয়, বরং এটি একটি দেশের ন্যায্যতা, অভিগম্যতা এবং আর্থিক সুরক্ষার প্রতি অঙ্গীকারের প্রতিফলন—যা সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার অভিমুখে অর্জিত অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়।

সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা সূচক গণনার সূত্রটি নীচে দেওয়া হল:

$$RMNCH = (FP * ANC * DTP3 * Pneumonia)^{1/4}$$

$$Infectious = (ART * TB * WASH * ITN)^{1/4}$$

$$NCD = (BP * FPG * Tobacco)^{1/3}$$

$$Capacity = (Hospital * HWD * IHR)^{1/3}$$

$$\boldsymbol{UHC\ service\ coverage\ index = (RMNCH * Infectious * NCD * Capacity)^{1/4}}$$

Table ৩: *সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা (UHC) পরিমাপের জন্য ট্রেসার সূচকসমূহ এবং বাংলাদেশে* ***এদের*** *বর্তমান অবস্থা (উৎস: WHO)*

সূচক ক্ষেত্র	সূচকের পূর্ণ নাম	২০২১ সালে পরিস্থিতি (%)
I. প্রজনন, মাতৃ, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য		
১) পরিবার পরিকল্পনা .FP)	আধুনিক পদ্ধতির মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজন পূরণকারী প্রজননক্ষম বয়সের (বছর ৪৯-১৫)বিবাহিত বা দাম্পত্য সম্পর্কিত নারীদের শতাংশ	৭৩
২ মাতৃত্বকালীন যত্ন .)ANC)	অন্তত চারবার গর্ভকালীন সেবা গ্রহণকারী, জীবিত সন্তানের মা এমন নারীদের শতাংশ	৩৭
৩) শিশু টিকাদান .DTP৩)	ডিফথেরিয়াপার্টুসিস টিকার তিন ডোজ প্রাপ্ত শিশুদের শতাংশ-টিটেনাস-	>=৮০
৪শিশু রোগ নিরাম .য় নিউমোনি)য়া(	জরিপের দুই সপ্তাহ পূর্বে একিউট রেসপিরেটরি ইনফেকশন (এআরআই) লক্ষণযুক্ত পাঁচ বছরেরনিচে শিশুদের মধ্যে যারা সেবা বা চিকিৎসা গ্রহণ করেছে তাদের শতাংশ	৪৬
II. সংক্রামক রোগ		
১) যক্ষ্মা .TB)	শনাক্তকৃত ও চিকিৎসাধীন যক্ষ্মা রোগের ঘটনার শতাংশ	>=৮০
২ এইডস/এইচআইভি .)ART)	অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি গ্রহণকারী এইচআইভি আক্রান্ত প্রাপ্তব-য়স্ক ও শিশুদের শতাংশ	২৩
৩ম্যালেরি .য়া) ITN)	ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকায় কীটনাশকযুক্ত মশারি ব্যবহৃত জনগণের শতাংশ	৫৩
৪পানি ., স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি)WASH)	মৌলিক স্যানিটেশন সুবিধা ব্যবহৃত জনগণের শতাংশ	৫৩
III. অসংক্রামক রোগ		
১) উচ্চ রক্তচাপ .BP)	উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসা গ্রহণকারী প্রাপ্তবয়স্কদের শতাংশ	৫২
২ডা .য়াবেটিস)FPG)	প্রাপ্তবয়স্কদের (বছর বা তদূর্ধ্ব ১৮)গড় উপবাসকালীন প্লাজমা গ্লুকোজের মাত্রা (লিটার/মিমোল)	৬৯
৩তামাক .	ধূমপানযুক্ত বা ধূমপানহীন তামাক ব্যবহারকারী ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের ব্যক্তিদের শতাংশ	৪৯
IV. সেবা সক্ষমতা ও অ্যাক্সেস		

১হাসপাতালের সুবিধা .	প্রতি ১০,০০০ জনসংখ্যার জন্য হাসপাতালের শয্যা ঘনত্ব সর্বোচ্চ সীমা) -১৮এর তুলনায়(	৫০
২) স্বাস্থ্য কর্মী .HWD)	চিকিৎসক, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জনের ঘনত্ব (প্রতি মাথাপিছু), প্রতি ক্যাডারের জন্য সর্বোচ্চ সীমার তুলনায়	২৫
৩) স্বাস্থ্য নিরাপত্তা .IHR)	আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিধি)IHR) কোর সক্ষমতা সূচকের গড় শতাংশ	৬৭

Figure ৬৫: *সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার (UHC) ট্রেসার সূচকের **ন্যায্যতা** সঙ্ক্রান্ত অবস্থা; শতকরা হারে উপস্থাপিত*

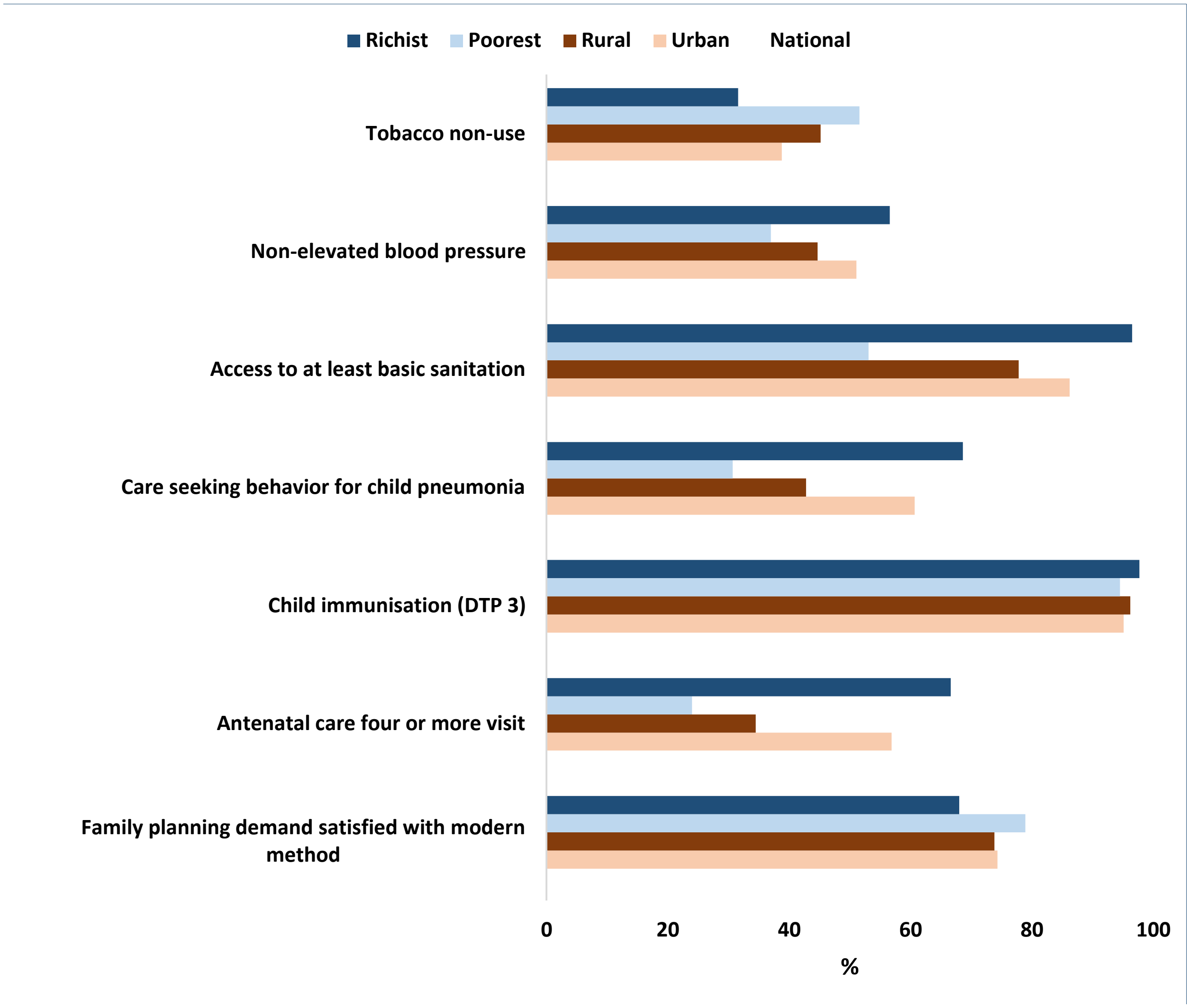

চিত্র ৬৬ থেকে ৬৯ পর্যন্ত উপস্থাপিত তথ্যসমষ্টি বাংলাদেশের সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা (UHC) সূচকের দীর্ঘমেয়াদী অগ্রগতি, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক তুলনামূলক কার্যকারিতা এবং মাথাপিছু আয়ের বিপরীতে অর্জিত বাস্তব অগ্রগতির একটি বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে। এই চিত্রাবলী সম্মিলিতভাবে নির্দেশ করে—যদিও বাংলাদেশ গত দুই দশকে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করেছে, তথাপি অর্থনৈতিক সক্ষমতার নিরিখে এই অগ্রগতি এখনও সীমিত, এবং অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পথে বেশ কিছু কাঠামোগত ও নীতিগত দুর্বলতা বিদ্যমান।

প্রথমত, সামগ্রিক সূচকে দৃশ্যমান অগ্রগতি অর্জিত হলেও, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সেই অগ্রগতির গতি হ্রাস পেয়েছে। চিত্র ৬৬ অনুযায়ী, ২০০০ সালে UHC সূচক ছিল মাত্র ২৩, যা ২০২১ সালে ৫২-তে উন্নীত হয়েছে—অর্থাৎ দুই দশকে সূচকটি দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে (৪২)। তবে এই অগ্রগতির মূল পর্যায়টি সংঘটিত হয়েছে ২০০৫ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে। তৎপরবর্তী সময়ে অগ্রগতির গতি উল্লেখযোগ্যভাবে স্থবির হয়ে পড়েছে, যা স্বাস্থ্যসেবার বিস্তার এবং গভীরতা বৃদ্ধিতে কৌশলগত শ্লথতার ইঙ্গিত বহন করে। এই বর্তমান গতিধারা অব্যাহত থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক UHC লক্ষ্যমাত্রা অর্জন দুরূহ হয়ে পড়বে।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ এখনও আঞ্চলিক প্রতিবেশী এবং সমরূপ মাথাপিছু আয়ের দেশগুলোর তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। চিত্র ৬৭ অনুযায়ী, ২০২১ সালে বাংলাদেশের সূচক মান ৫২—যা শ্রীলঙ্কা (৬৭), ভারত (৬৩), ভুটান (৬০) এবং মালদ্বীপের (৬১) চেয়ে কম (৪২)। এমনকি নেপালও (৫৪) বাংলাদেশের চেয়ে সামান্য এগিয়ে রয়েছে। চিত্র ৬৮ অনুযায়ী, উজবেকিস্তান (৭৫), নিকারাগুয়া (৭০), ও হন্ডুরাস (৬৪)-এর মতো দেশগুলো বাংলাদেশের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে ভালো ফল প্রদর্শন করছে, যদিও তাদের আর্থিক সংস্থান প্রায় একই রকম (৪২)। এই অসঙ্গতি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান করে যে বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ কেবল আর্থিক সীমাবদ্ধতা নয়, বরং স্বাস্থ্যখাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ ও কার্যকর নীতিগত অগ্রাধিকারের অভাবও বিদ্যমান।

তৃতীয়ত, মাথাপিছু আয় এবং স্বাস্থ্য কভারেজের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট বৈষম্য বিদ্যমান। চিত্র ৬৯ অনুযায়ী, UHC সূচক বনাম মাথাপিছু আয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে—বাংলাদেশ প্রত্যাশিত ট্রেন্ডলাইনের নিচে অবস্থান করছে (২১, ৪২)। এমন অনেক দেশ রয়েছে, যাদের মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের চেয়েও কম, কিন্তু তারা স্বাস্থ্যসেবা কভারেজের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে রয়েছে। এটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্বয়ংক্রিয়ভাবে জনস্বাস্থ্য অগ্রগতি নিশ্চিত করে না; সেই প্রবৃদ্ধিকে স্বাস্থ্যসেবার বাস্তব উন্নয়নে রূপান্তর করতে না পারলে, কাঙ্ক্ষিত জনস্বাস্থ্য অগ্রগতি অর্জন সম্ভব নয়।

এই প্রেক্ষাপটে, UHC অর্জনের গতিপথকে পুনরায় বেগবান করতে বাংলাদেশকে কিছু সুনির্দিষ্ট কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্যে সর্বাগ্রে রয়েছে—প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার ওপর কৌশলগত অগ্রাধিকার বৃদ্ধি, সেবাদান কাঠামোর সক্ষমতা জোরদার করা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা। কেবল বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করাই যথেষ্ট নয়; সেই বরাদ্দ যেন কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয় এবং জনগণের জন্য মানসম্মত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে—এই দিকেই এখন সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা অপরিহার্য। অর্থনৈতিক অগ্রগতি তখনই অর্থবহ হবে, যখন তা জনগণের উন্নত ও সুস্থ জীবনযাত্রায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হবে।

Figure ৬৬: *বাংলাদেশে সর্বজনীন স্বাস্থ্য **সুরক্ষার** (UHC) **সমন্বিত** কভারেজ সূচকের ধারা (উৎস: WHO)*

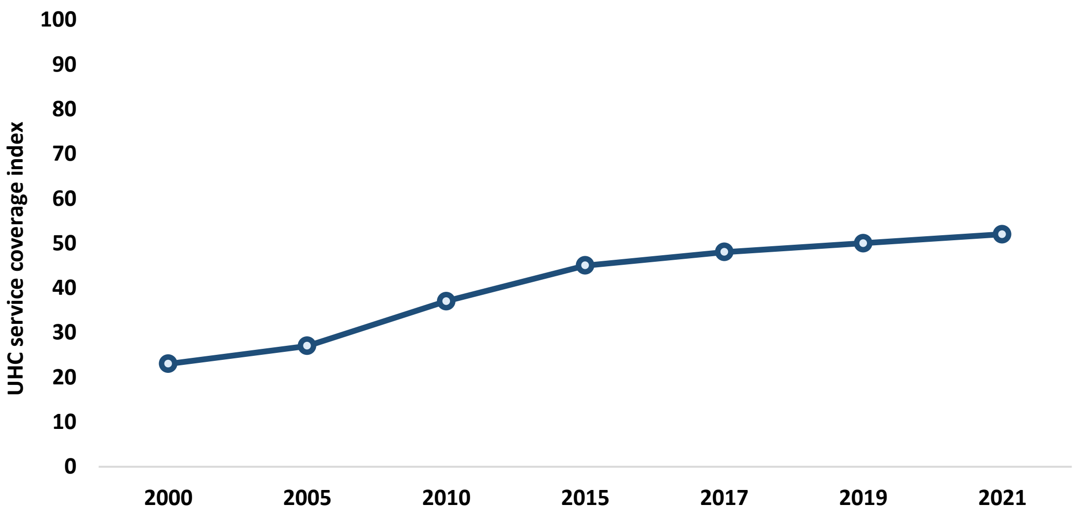

Figure ৬৭: দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার (UHC) সমন্বিত কভারেজ সূচ**কের অবস্থা** (লাল: ২০০০, বেগুনি: ২০১৫, সবুজ: ২০২১); (উৎস: WHO)

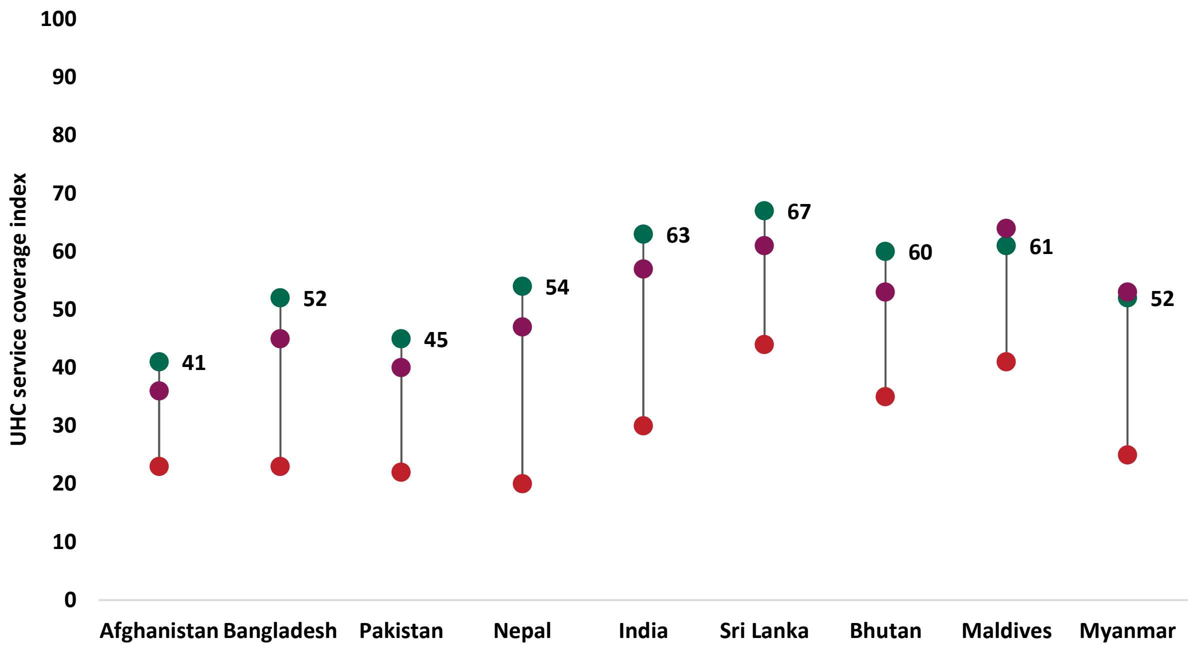

***Figure ৬৮:** সমপর্যায়ের মাথাপিছু আয়সম্পন্ন দেশগুলোতে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার (UHC) সমন্বিত কভারেজ সূচকের অবস্থা (লাল: ২০০০, বেগুনি: ২০১৫, সবুজ: ২০২১); (উৎস: WHO)*

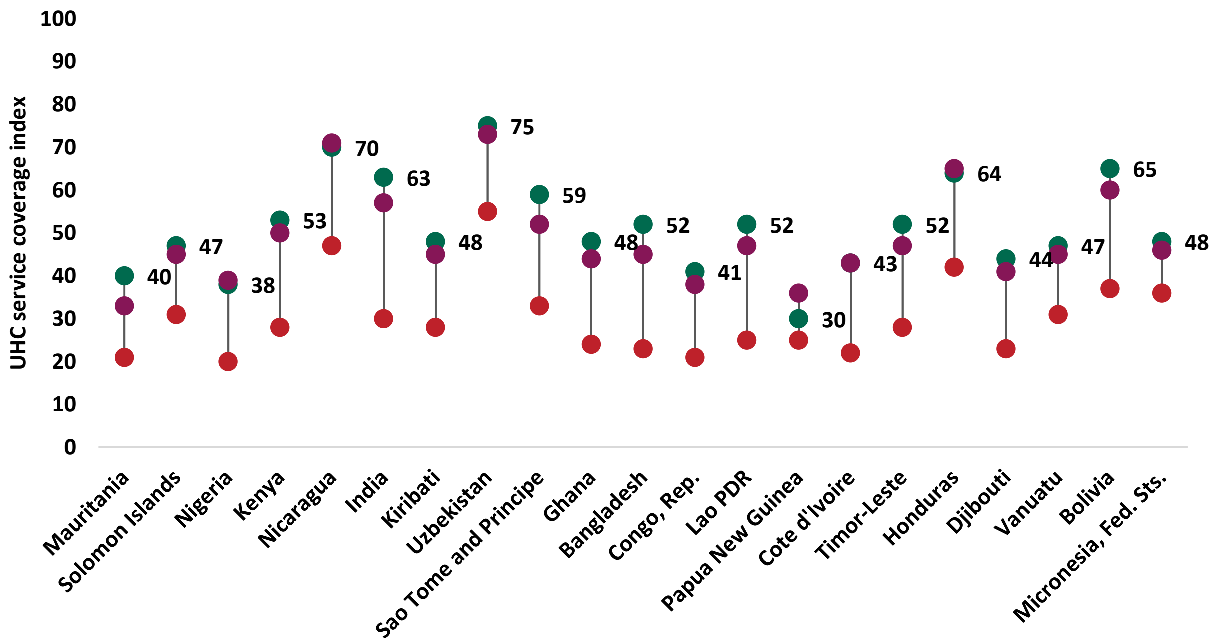

Figure ৬৯: বিশ্বব্যাপি সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার (UHC) সমন্বিত কভারেজ সূচকের অবস্থা (উৎস: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্বব্যাংক)

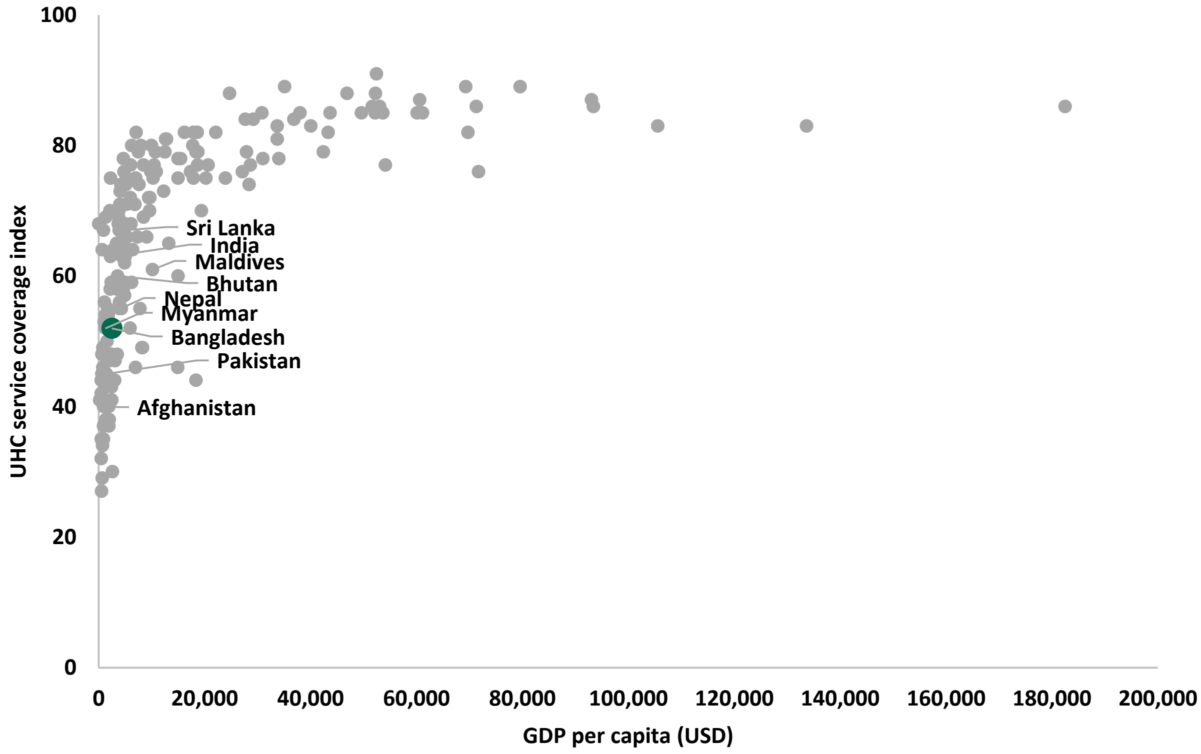

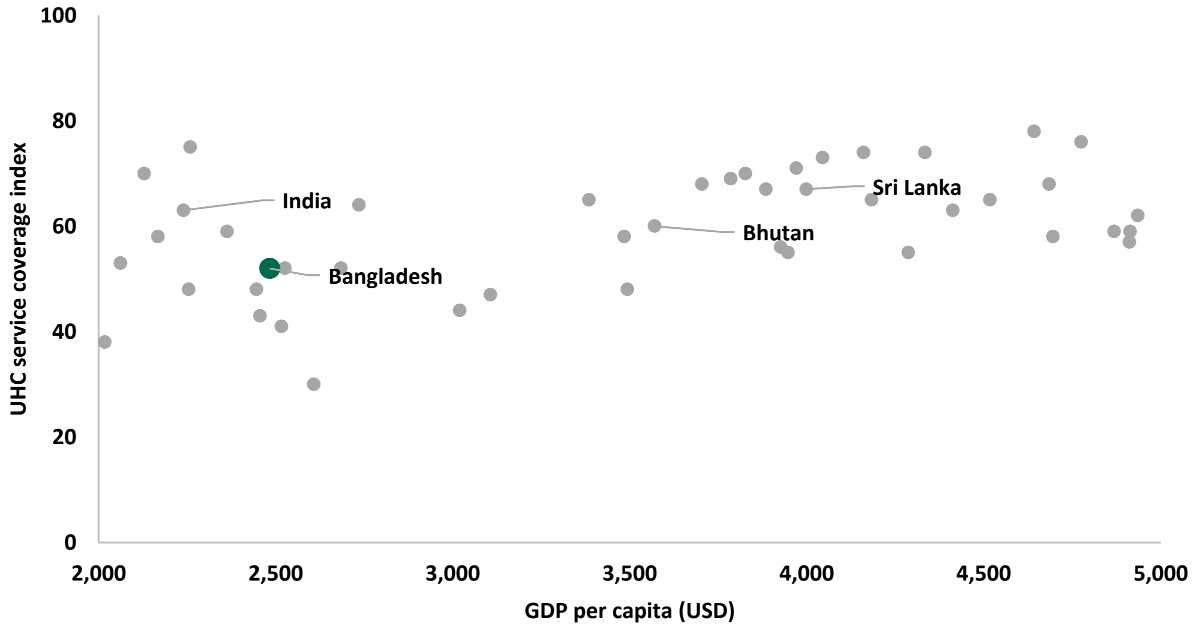

সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

নিচে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত মূল বার্তাসমূহ (Key Messages) উপস্থাপন করা হলো।

জনসংখ্যা ও জনমিতি:

- জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ও শহরায়ণ অব্যাহত রয়েছে, বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম জনবহুল দেশ।
- জনঘনত্ব অত্যন্ত বেশি, বিশেষত ঢাকা অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত।
- কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর প্রাধান্য থাকলেও, ২০৫০ সালের মধ্যে বয়স্ক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে—যা নীতিগত প্রস্তুতি দাবি করে।
- মোট প্রজনন হার প্রতিস্থাপন স্তরের কাছাকাছি স্থিতিশীল।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি:

- অকালমৃত্যু হ্রাস ও দীর্ঘমেয়াদী অক্ষমতা মোকাবেলা—এই দ্বৈত চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান।
- হৃদরোগ মৃত্যুর প্রধান কারণ, এরপর শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ ও অসংক্রামক রোগ গুরুত্বপূর্ণ।
- শিশু অপুষ্টি (খর্বতা ও কম ওজন) উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, তবে উচ্চতা অনুযায়ী কম ওজন এবং অতিরিক্ত ওজন নজরদারির বিষয়।
- নারীদের মধ্যে কম ওজন হ্রাস পেলেও, অতিরিক্ত ওজন ও স্থূলতা বৃদ্ধি পেয়েছে—দ্বিমুখী পুষ্টি কৌশল প্রয়োজন।

অর্থনীতি ও উন্নয়ন:

- জিডিপি ও ক্রয়ক্ষমতা সমতায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।
- মাথাপিছু আয় দক্ষিণ এশিয়ার কিছু দেশের চেয়ে এগিয়ে থাকলেও সামগ্রিকভাবে অবস্থান মাঝারি।
- আয়বৈষম্য মাঝারি পর্যায়ে স্থিতিশীল রয়েছে।
- দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, তবে গ্রামীণ দারিদ্র্য এখনও বেশি।
- জাতীয় বাজেটের আকার বৃদ্ধি পেলেও স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ আনুপাতিকভাবে হ্রাস পেয়েছে।
- কর আদায় বৃদ্ধি পেলেও জিডিপির অনুপাতে কম।
- কর্মসংস্থান অনুপাত উচ্চ হলেও, প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবার ব্যবহার সীমিত।

স্বাস্থ্য অর্থায়ন ও রাজস্ব সক্ষমতা:

- মোট স্বাস্থ্য ব্যয় জিডিপির অনুপাতে কম ও স্থিতিশীল, সরকারি ব্যয় আরও কম।
- মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয় আঞ্চলিক দেশগুলোর তুলনায় পিছিয়ে।
- সরকারি স্বাস্থ্য ব্যয়ের বার্ষিক গড় বৃদ্ধি নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশগুলোর তুলনায় কম।
- সরকারি বাজেটে স্বাস্থ্য খাতের অংশ হ্রাস পেয়েছে, যা দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বনিম্ন পর্যায়ে অন্যতম।
- স্বাস্থ্য বাজেটের ব্যয় বাস্তবায়ন হার হ্রাস পেয়েছে, যা প্রশাসনিক দুর্বলতা নির্দেশ করে।
- ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ব্যয় (OOP) অত্যন্ত বেশি, যার একটি বড় অংশ ওষুধে ব্যয় হয়।

সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা (UHC):

- শিশু টিকাদান ও যক্ষ্মা চিকিৎসায় উচ্চ কাভারেজ অর্জিত হলেও, গর্ভকালীন সেবা, নিউমোনিয়া ও এইচআইভি চিকিৎসায় ঘাটতি রয়েছে।
- অসংক্রামক রোগ ব্যবস্থাপনা, হাসপাতালের শয্যা ও স্বাস্থ্যকর্মীর ঘনত্ব এখনও চ্যালেঞ্জিং।

- UHC অর্জনে অগ্রগতি মন্থর হয়েছে, যা ২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।
- বাংলাদেশের UHC সূচক প্রতিবেশী ও সমতুল্য আয়ের দেশগুলোর তুলনায় কম, যা নীতিগত দুর্বলতা নির্দেশ করে।
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও UHC কর্মক্ষমতা প্রত্যাশার নিচে, যা স্বাস্থ্যখাতে কৌশলগত বিনিয়োগ ও সুশাসনের অভাব ইঙ্গিত করে।

প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

পরিস্থিতি বিশ্লেষণে স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অর্থায়ন ব্যবস্থা বহুস্তর এবং গভীরভাবে প্রোথিত কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে সমতা, দক্ষতা ও স্থিতিস্থাপকতা অর্জনে বড় বাধার সম্মুখীন। এই চ্যালেঞ্জগুলো পাঁচটি আন্তঃসম্পর্কিত ক্ষেত্রে শ্রেণিবদ্ধ করা যায়:

১. প্রাধান্যহীনতা: স্বাস্থ্যখাত এখনও জাতীয় অগ্রাধিকারের পর্যায়ে পৌঁছায়নি। ২০২৪–২৫ অর্থবছরে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ ছিল জাতীয় বাজেটের মাত্র ৫.২% এবং GDP-এর ০.৭৪%—যা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বনিম্ন। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক প্রান্তিকতা, মধ্যমেয়াদি বিনিয়োগ কৌশলের অভাব এবং দুর্বল জবাবদিহিতা এই দুরবস্থার মূল কারণ। এর ফলে সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ অতিরিক্ত চাপের মুখে পড়ছে, স্বাস্থ্যকর্মীর ঘাটতি দেখা দিচ্ছে এবং কাঙ্ক্ষিত সংস্কার বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হচ্ছে।

২. অপর্যাপ্ত রাজস্ব আহরণ: কর-জিডিপি অনুপাত এখনও ৮%-এর নিচে রয়ে গেছে। সংকুচিত করভিত্তি, অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির ব্যাপ্তি, কর প্রশাসনের সীমিত দক্ষতা এবং স্বাস্থ্য-সমর্থক কর প্রয়োগে অনীহার কারণে স্বাস্থ্যখাতে পর্যাপ্ত অর্থায়নের সুযোগ তৈরি হচ্ছে না। এই আর্থিক সংকীর্ণতা স্বাস্থ্যখাতকে অন্যান্য রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ খাতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দুর্বল করে তোলে।

৩. অযথাযথ ঝুঁকি একত্রিকরণ: স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে ব্যক্তিপর্যায়ের ব্যয় এখনও অত্যন্ত উচ্চ (৬২%) এবং বিপর্যয়কর ব্যয়ের হার ক্রমবর্ধমান। সবচেয়ে বড় ব্যয়ের উৎস হলো ওষুধ। জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা বা একটি কার্যকর তহবিল একত্রীকরণ ও ঝুঁকি সমন্বয় ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, বিচ্ছিন্ন স্কিমের আধিপত্য এবং উচ্চঝুঁকির জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক সুরক্ষার অভাব এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

৪. বরাদ্দের অসামঞ্জস্যতা ও ক্রয়ের অদক্ষতা: বাজেট বরাদ্দে খাতভিত্তিক বৈষম্য এবং বাজেট বাস্তবায়নে ধারাবাহিক পতন (২০১০ সালে ৯২% থেকে ২০২১ সালে ৬৯%) লক্ষ্য করা গেছে। সমস্যার মূল কারণগুলো হলো: অনমনীয় ইনপুট-ভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থা, কৌশলগত ক্রয় ও পেমেন্ট পদ্ধতির অভাব, কার্যকর প্যাকেজ ডিজাইনের অনুপস্থিতি এবং অপর্যাপ্ত অর্থায়নপ্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ সেবা (যেমন রোগ নির্ণয়, বহির্বিভাগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা ও জরুরি পরিবহন)। দরিদ্রবান্ধব, লক্ষ্যভিত্তিক ও ব্যয়-কার্যকর সেবা প্যাকেজ ডিজাইন এখন সময়ের দাবি।

৫. অদক্ষতা ও অপচয়: রাজস্ব সংগ্রহ, পুলিং, বরাদ্দ ও সেবা ক্রয়—সকল স্তরেই বিদ্যমান অদক্ষতা ও অপচয় স্বাস্থ্যখাতের সক্ষমতাকে সীমিত করছে। ২০১৭ সালে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট বাস্তবায়ন মাত্র ৪৫%-এ নেমে আসে। এর পেছনে রয়েছে: সরবরাহ কেনায় বিলম্ব ও ব্যয়বৃদ্ধি, অব্যবহৃত অবকাঠামো, পুনরাবৃত্তিমূলক ও খণ্ডিত প্রকল্প এবং দুর্বল সরকারি অর্থব্যবস্থাপনা (Public Financial Management - PFM)। এই চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে হলে জরুরি ভিত্তিতে PFM শক্তিশালীকরণ, তথ্যব্যবস্থার একীকরণ এবং কর্মসম্পাদন-নির্ভর অর্থায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন অপরিহার্য।

৫ স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়নের টেকসই সংস্কারের সুপারিশমালা

বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজন একটি পর্যাপ্ত (adequate), ন্যায্য (equitable) এবং টেকসই (sustainable) অর্থায়ন ব্যবস্থা। স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়ন ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য আমরা তথ্য-প্রমাণ নির্ভর (evidence-based) এবং বাস্তবভিত্তিক (feasible) সুপারিশমালা উপস্থাপন করছি। এই সুপারিশগুলোকে পাঁচটি কৌশলগত স্তম্ভে (strategic pillar) ভাগ করা হয়েছে। প্রথম স্তম্ভটি স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়নের মৌলিক ভিত্তি (fundamental value) সংক্রান্ত। পরবর্তী তিনটি স্তম্ভ স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়নের মূল কার্যক্রম (core functions) সংক্রান্ত। শেষ স্তম্ভটি পুরো ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অপচয় হ্রাসের সঙ্গে সম্পর্কিত।

এই পাঁচটি স্তম্ভ হলো:

ক)স্বাস্থ্যকে জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং স্বাস্থ্যখাতে টেকসই অর্থায়নকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া;

খ) স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়নের জন্য রাজস্ব আহরণ ও তহবিল সংগ্রহ ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী করা;

গ)সম্পদ একত্রিকরণ ও ঝুঁকি হ্রাসের সমন্বিত পদ্ধতি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা;

ঘ) সম্পদের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করা এবং ব্যয়-সাশ্রয়ী (cost-effective) ক্রয় প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করা;

ঙ) সার্বিক ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি ও অপচয় হ্রাস করা

এই সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার পরিধি (coverage) ও গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে, বিপর্যয়কর চিকিৎসা ব্যয় (catastrophic heath expenditure) হ্রাস পাবে এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা (Universal Health Coverage) অর্জনের পথ আরও গতিশীল হবে।

স্তম্ভ ক: স্বাস্থ্যকে জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং স্বাস্থ্য খাতে টেকসই অর্থায়নকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া

একটি জনমুখী (people-centered), সহজলভ্য (accessible) এবং সর্বজনীন (universal) স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন একটি কার্যকর (effective) ও দীর্ঘমেয়াদি (sustainable) অর্থায়ন কাঠামো। স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগ কেবল মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করে না, বরং এটি জাতীয় অর্থনীতিকে গতিশীল করে, সামাজিক সংহতি (social cohesion) বজায় রাখে এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে (human development) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তবে স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়নের পর্যাপ্ততা, ন্যায্যতা এবং টেকসই হওয়া নির্ভর করে রাষ্ট্র স্বাস্থ্যকে কতটা অগ্রাধিকার দিচ্ছে তার ওপর। যদি স্বাস্থ্য রাজনৈতিক আলোচনা, আইনি কাঠামো, নীতিমালা এবং কৌশলগত পরিকল্পনার কেন্দ্রে না থাকে, তবে একটি কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন কাঠামো নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

সুতরাং, এখনই সময়—স্বাস্থ্যকে জাতীয় ও রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসার। একটি পর্যাপ্ত, ন্যায্য এবং টেকসই অর্থায়ন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে স্বাস্থ্যকে আমাদের সংবিধান, আইন, নীতি ও জাতীয় কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এই প্রেক্ষাপটে আমরা নিম্নোক্ত কর্মপন্থাগুলো সুপারিশ করছি:

৫.১ সুপারিশ: সংবিধান সংশোধন করে স্বাস্থ্যকে বাধ্যতামূলক অধিকার এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া

স্বাস্থ্যকে বাধ্যতামূলক অধিকার (Obligatory Right) হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃতি দিতে হবে। এতে এটি রাষ্ট্রের একটি সাংবিধানিক দায়িত্বে পরিণত হবে। অর্থাৎ, সরকারকে সীমিত সম্পদের মধ্যেও পরিকল্পিত ও ধারাবাহিক পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে ধাপে ধাপে দেশের প্রতিটি নাগরিকের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করা যায়। পাশাপাশি, প্রাথমিক

স্বাস্থ্যসেবাকে (Primary Health Care - PHC) মৌলিক অধিকার (fundamental right) হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। এতে প্রতিটি নাগরিক আইনি ভিত্তিতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সব ধরনের পরিসেবা কোনো আর্থিক চাপ ছাড়াই পাওয়ার অধিকার অর্জন করবেন। সংবিধানে স্বীকৃত বাধ্যতামূলক অধিকার ধাপে ধাপে বাস্তবায়নযোগ্য হলেও, মৌলিক অধিকার তাৎক্ষণিকভাবে রাষ্ট্রীয় কর্তব্যে পরিণত হয়। এই দুটি সাংবিধানিক স্বীকৃতি সম্মিলিতভাবে স্বাস্থ্যকে একটি জনকল্যাণমুখী খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব আরও স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করবে।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাও এই প্রস্তাবের পক্ষে শক্তিশালী প্রমাণ হাজির করে।উদাহরণস্বরূপ, থাইল্যান্ড ২০০২ সালে সংবিধানে স্বাস্থ্যকে মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে এবং Universal Coverage Scheme (UCS) চালু করে। এর ফলে ব্যক্তিপর্যায়ের ব্যয় (out-of-pocket expenditure) উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। দক্ষিণ আফ্রিকাও একই পথে হেঁটেছে। ১৯৯৪ সালে গর্ভবতী নারী ও শিশুদের জন্য, এবং ১৯৯৬ সালে সব নাগরিকের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিনামূল্যে চালু করে—এর পেছনে ছিল সংবিধানে স্বাস্থ্যকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত। এই অভিজ্ঞতাগুলো দেখায়, সংবিধানে স্বাস্থ্যকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিলে তা টেকসই রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং পর্যাপ্ত অর্থায়নের পথ তৈরি করে। এমনকি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও এই অগ্রাধিকার অটুট থাকে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এক্ষেত্রে রয়েছে শক্তিশালী জনসমর্থন। স্বাস্থ্যখাত সংস্কার বিষয়ে পরিচালিত এক জাতীয় জনমত জরিপে দেখা গেছে—৯২ শতাংশ মানুষ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে (PHC) সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। এ ধরনের সাংবিধানিক পরিবর্তন স্বাস্থ্যখাতে পর্যাপ্ত, ন্যায্য এবং টেকসই অর্থায়নের জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা জোরদার করতে সহায়ক হবে।

৫.২ সুপারিশ: স্বাস্থ্যখাতে পর্যাপ্ত, ন্যায্য এবং টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিত করতে একটি "স্বাস্থ্য অর্থায়ন সুরক্ষা আইন" প্রণয়ন করা

স্বাস্থ্যখাতে পর্যাপ্ত, ন্যায্য এবং টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিত করতে একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে হবে—যা "স্বাস্থ্য অর্থায়ন সুরক্ষা আইন" নামে পরিচিত হতে পারে। এই আইন একটি আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপ করবে, যাতে সরকার প্রতি বছর মোট জাতীয় আয়ের (GDP) একটি নির্দিষ্ট শতাংশ এবং বার্ষিক বাজেটের একটি নুন্যতম অংশ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ দিতে বাধ্য হয়। এছাড়া, এই আইন নিশ্চিত করবে যে, স্বাস্থ্যখাত বার্ষিক বাজেটের সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত খাতগুলোর একটি হিসেবে বিবেচিত হয়। এই আইন সরকারি, বেসরকারি ও এনজিও খাতের সম্পদ একত্রিকরণ ও ঝুঁকি হ্রাসের (resource and risk pooling)–এর জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দেবে, এবং বিভিন্ন উৎস থেকে পরিসেবা ক্রয় (service purchasing) ও কৌশলগত ক্রয়ের (strategic purchase)স্থায়ী ভিত্তি তৈরি করবে। একই সঙ্গে, এটি স্বাস্থ্য বিষয়ক সকল নীতি ও কৌশল প্রণয়ন, এবং কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে তথ্য-প্রমাণ নির্ভরতা, ব্যয়-সাশ্রয়িতা (cost-effectiveness) এবং অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ (economic impact analysis) বাধ্যতামূলক করবে।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা এই ধরনের আইনের কার্যকারিতা স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। ব্রাজিল ২০০০ সালে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও স্থানীয় সরকারকে স্বাস্থ্য খাতে একটি ন্যূনতম ব্যয়ের বাধ্যবাধকতার আওতায় আনে। এর পর ২০১২ সালে 'Complementary Law No. ১৪১' নামে একটি আইন পাস করা হয়, যা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে যে ফেডারেল সরকারকে কমপক্ষে তার আয়ের ১৫%, রাজ্য সরকারকে ১২% এবং পৌর সরকারকে ১৫% স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করতে হবে। এই আইনি বাধ্যবাধকতা ব্রাজিলকে অর্থনৈতিক মন্দার সময়েও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ বজায় রাখতে সহায়তা করেছে। অন্যদিকে রুয়ান্ডা ২০০৮ সালে একটি স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়ন আইন প্রণয়ন করে, যার ফলে তারা দেশের প্রায় ৯০% জনগণকে কমিউনিটি-ভিত্তিক স্বাস্থ্য বীমার আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী, সরকারকে প্রতি বছর স্বাস্থ্য খাতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে। পাশাপাশি, সরকারি, দাতা এবং ব্যক্তিগত উৎস থেকে পাওয়া অর্থ একত্র করে একটি সমন্বিত তহবিল ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। রুয়ান্ডা এই ধরনের কাঠামো ব্যবহার করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পেরেছে এবং জনগণের আর্থিক সুরক্ষাও অনেক বেড়েছে।

এই অভিজ্ঞতা দেখায়, বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য অর্থায়ন আইন থাকলে সরকার আরও দায়বদ্ধ হয়, স্বাস্থ্য খাতের জন্য নিয়মিত অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত হয়, এবং রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সংকটের মাঝেও স্বাস্থ্যখাত সুরক্ষিত থাকে। এমন একটি আইন একটি কার্যকর, সাশ্রয়ী ও টেকসই স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে দৃঢ় ভিত্তি তৈরি করে।

৫.৩ সুপারিশ: জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি সংশোধন করে স্বাস্থ্যকে একটি জনকল্যাণমূলক ও মেধা-ভিত্তিক খাত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া, যা জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কৌশলগত উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা

জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিকে এমনভাবে সংশোধন করতে হবে যাতে স্বাস্থ্যকে একটি জনকল্যাণমূলক (public good) এবং মেধা-ভিত্তিক (merit good) খাত হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে । একে জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কৌশলগত চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এই নীতিমালায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে যে, সকল অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ, জাতীয় কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত টিকা, অত্যাবশ্যকীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং স্বাস্থ্য তথ্যব্যবস্থা—এসবই জাতীয় নিরাপত্তা ও সহনশীলতা (resilience) গঠনের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ খাত। এখানে আত্মনির্ভরতা অর্জন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে সেবাদান কাঠামোর মূলভিত্তি হিসেবে স্থাপন করতে হবে। একইসঙ্গে, কার্যকর রেফারেল এবং স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়নকে অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা জরুরি।

বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে স্বাস্থ্যকে জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের অংশ হিসেবে বিবেচনা করলে স্বাস্থ্য সমতা ও সহনশীলতায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, থাইল্যান্ড তাদের স্বাস্থ্য নীতিকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুরক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত করে দ্রুত সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা (Universal Health Coverage - UHC) অর্জনের দিকে এগিয়েছে। শ্রীলঙ্কা স্বাধীনতার পর থেকে বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে (Primary Health Care) তাদের উন্নয়ন কৌশলে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং জনগণের সামগ্রিক কল্যাণের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছে। এর ফলে, কম ব্যয়ের মধ্যে দেশটি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সুযোগ ও পরিসর বৃদ্ধি এবং সেবার সমতা নিশ্চিত করতে পেরেছে।

বাংলাদেশের জন্য এ ধরনের সংস্কার সময়োচিত ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি সাহসী ও সমন্বিত স্বাস্থ্য নীতি স্বাস্থ্যখাতে আর্থিক বরাদ্দ ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করবে, খাতভিত্তিক সমন্বয়কে উৎসাহিত করবে এবং সর্বোপরি, স্বাস্থ্যকে বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের কেন্দ্রে স্থাপন করবে।

৫.৪ সুপারিশ: সব নীতিতে স্বাস্থ্যকে অন্তর্ভুক্ত করা, এবং সকল জাতীয় ও খাতভিত্তিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য প্রভাব মূল্যায়ন (HEALTH IMPACT ASSESSMENT) বাধ্যতামূলক করা

একটি সহনশীল (resilient), সমতাভিত্তিক (equitable) এবং টেকসই (sustainable) স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে "সব নীতিতে স্বাস্থ্য" (Health in All Policies - HiAP) ধারণাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। মানুষের স্বাস্থ্য শুধুমাত্র স্বাস্থ্যখাতের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে না; বরং শিক্ষা, পরিবেশ, কৃষি, কর্মসংস্থান ও অবকাঠামোসহ বিভিন্ন অ-স্বাস্থ্য খাতের নীতি ও কর্মপরিকল্পনার ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। এসব খাতে কৌশলগত বিনিয়োগ (strategic investments) করলে রোগের প্রকোপ কমে, দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় হ্রাস পায়, এবং স্বাস্থ্য অর্থায়নের জন্য নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়। HiAP কার্যকর করতে জাতীয় ও খাতভিত্তিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য প্রভাব মূল্যায়ন (health impact assessment) বাধ্যতামূলক করতে হবে; স্বাস্থ্যবান্ধব রাজস্ব নীতিমালা (health-promoting fiscal policies) গ্রহণ করতে হবে—যেমন তামাক, চিনি-যুক্ত পানীয় এবং দূষণকারী শিল্প থেকে প্রাপ্ত আয়ের নির্দিষ্ট অংশ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ রাখা; এবং যৌথ অর্থায়ন কাঠামো (co-financing mechanisms) গড়ে তুলতে হবে, যেখানে বিভিন্ন খাতের বিনিয়োগ জনস্বাস্থ্য অগ্রাধিকারের সঙ্গে সমন্বিত হয়। সফল বাস্তবায়নের জন্য শক্তিশালী আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় (inter-ministerial collaboration) এবং যৌথ দায়বদ্ধতা (joint accountability) নিশ্চিত করতে হবে।

বিশ্বব্যাপী বেশ কিছু দেশ ইতিমধ্যেই HiAP কাঠামো সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। ফিনল্যান্ড HiAP ধারণাকে নীতিনির্ধারণের কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাস্থ্য লক্ষ্য সংযুক্ত করতে শক্তিশালী আন্তঃখাতীয় শাসন কাঠামো

(intersectoral governance) গড়ে তুলেছে। থাইল্যান্ড তাদের Universal Coverage Scheme (UCS) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষা, কৃষি, পরিবেশ এবং নগর উন্নয়ন খাতের সঙ্গে সমন্বয় করে জনস্বাস্থ্যে বিনিয়োগ বাড়িয়েছে। WHO-এর "More Money for Health, More Health for the Money" ধারণা দেখায়—যদি সব খাতে স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, তবে একই বিনিয়োগ থেকে আরও বেশি স্বাস্থ্য ফলাফল অর্জন করা সম্ভব।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে HiAP কাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করলে নতুন রাজস্ব উৎস (revenue streams) সৃষ্টি হবে, নীতিমালার খণ্ডতা ও অর্থায়নের বিচ্ছিন্নতা কমবে, এবং সরকারের একটি সম্মিলিত প্রয়াসে স্বাস্থ্য সমতার (health equity) পথে অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে। এই সংস্কার শুধুমাত্র বিদ্যমান বিনিয়োগের ফলাফলকে আরও কার্যকর করবে না, বরং সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা (Universal Health Coverage - UHC) অর্জন এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার পথও সুদৃঢ় করবে।

৫.৫ সুপারিশ: জাতীয় স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়ন কৌশল সংস্কার করা; প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে এর মূল ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা; এবং ব্যক্তিপর্যায়ে ব্যয়ের ঝুঁকি, বিশেষ করে বিপর্যয়কর চিকিৎসা ব্যয় কমাতে লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচি চালু করা

বাংলাদেশে একটি কার্যকর এবং টেকসই স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়তে হলে জাতীয় স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়ন কৌশলকে (National Health Financing Strategy)-কে সার্বিকভাবে সংশোধন ও পরিমার্জন করতে হবে। এই কৌশলের কেন্দ্রে থাকতে হবে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, যাতে তা সহজলভ্য ও সর্বজনীন হয়। একইসঙ্গে, এই কৌশলে কিছু লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচি নির্ধারন করতে হবে যেন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে ব্যক্তিগত ব্যয় (out-of-pocket expenditure), বিশেষত বিপর্যয়কর চিকিৎসা ব্যয় (catastrophic health expenditure) হ্রাস পায়। এক্ষেত্রে বিপর্যয়কর চিকিৎসা ব্যয়ের মূল কারণসমূহ—যেমন উচ্চমূল্যের ওষুধ, দীর্ঘমেয়াদি রোগ ব্যবস্থাপনা (chronic disease management), জটিল অস্ত্রোপচার (complex surgeries), জরুরি চিকিৎসা (emergency services, ইত্যাদি- চিহ্নিত করে আর্থিক সুরক্ষার কৌশল নির্ধারনে তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। এই কৌশলে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে একটি শক্তিশালী প্রিপেমেন্ট পদ্ধতি (prepayment) এবং একটি সমন্বিত তহবিল একত্রিতকরণ ও ঝুকি সমন্বয় ব্যবস্থাপনা (risk pooling)। অর্থ বরাদ্দে ব্যয়-সাশ্রয়িতা (cost-effectiveness) এবং ফলাফলভিত্তিক বিনিয়োগ (impact-based investment) উপর জোর দিতে হবে, যাতে প্রতিটি টাকার সর্বোচ্চ ফল পাওয়া যায়।

ঘানা (Ghana) ও ভিয়েতনাম (Vietnam)-এর অভিজ্ঞতা আমাদের দেখিয়েছে যে, যখন স্বাস্থ্যখাতের অর্থায়ন কৌশলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়, তখন তা সেবার পরিধি (service coverage) বৃদ্ধি করে, নাগরিকদের জন্য আর্থিক সুরক্ষা (financial protection) নিশ্চিত করে এবং বাজেট ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও স্থিতিশীলতা নিয়ে আসে। এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশকে অবশ্যই এমন একটি কৌশল তৈরি করতে হবে, যেখানে অগ্রাধিকার ঠিক করে ধাপে ধাপে বাস্তবায়নযোগ্য (phased implementation) টেকসই অর্থায়ন (sustainable financing) কাঠামো নিশ্চিত করা হবে।

এই সংস্কার হবে বাংলাদেশের জন্য একটি রূপান্তরমূলক পদক্ষেপ, যা "More Money for Health, More Health for the Money" নীতির বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করবে। এর মাধ্যমে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, দক্ষ, এবং জনগণের চাহিদার প্রতি সাড়া দিতে সক্ষম স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে উঠবে—যেখানে প্রতিটি টাকার বিনিয়োগ সরাসরি মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা, কার্যকারিতা এবং দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সুরক্ষা (long-term financial protection) নিশ্চিত করতে কাজে লাগবে।

স্তম্ভ ২: স্বাস্থ্য অর্থায়নের জন্য রাজস্ব আহরণ শক্তিশালীকরণ"

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে পর্যাপ্ত, ন্যায্য এবং টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হলে বিদ্যমান সম্পদের সুষ্ঠু আহরণ ও ব্যবস্থাপনাকে আরও দক্ষ ও শক্তিশালী করা প্রয়োজন । এজন্য কর আদায়ের পদ্ধতি উন্নত করা এবং জনস্বাস্থ্য-সম্পর্কিত খাতে কর (health-related taxes) কার্যকরভাবে আরোপ ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। রাজস্ব বৃদ্ধির এই পদক্ষেপগুলো সরকারের স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দযোগ্য অর্থের পরিসর (fiscal space for health) বাড়াবে, ব্যক্তি পর্যায়ে স্বাস্থ্য ব্যয়ের (out-of-pocket expenditure) চাপ কমাবে এবং একইসঙ্গে স্বাস্থ্যবান্ধব আচরণ (healthier behaviors) গঠনে উৎসাহিত করবে।

নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো জাতীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উদাহরণ হিসেবে সেরা অনুশীলনের (international best practices) ভিত্তিতে প্রণীত, যা বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে টেকসই জনসম্পদ বৃদ্ধি করতে সহায়ক হবে।

৫.৬ সুপারিশ: কর আদায় সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ট্যাক্স-টু-জিডিপি অনুপাত বাড়ানো, এবং সর্বোচ্চ আয়শ্রেণি থেকে আদায়কৃত করের অন্তত ৫% স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দের জন্য নির্ধারিত করা

বাংলাদেশের ট্যাক্স-টু-জিডিপি অনুপাত বিশ্বের অন্যতম সর্বনিম্ন, যা দেশের স্বাস্থ্য খাতে টেকসই অর্থায়নের অন্যতম প্রধান বাধা। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় কর ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, রাজস্ব প্রশাসনে স্বচ্ছতা, কর ফাঁকি রোধ, ডিজিটাল কর ব্যবস্থাপনা এবং কর কাঠামোর সরলীকরণসহ একটি সমন্বিত সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি। পাশাপাশি, অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিকে আনুষ্ঠানিক খাতে নিয়ে আসা এবং উচ্চ আয়ের ব্যক্তিদের কর পরিধি আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বৃহত্তর কর সংস্কার কৌশলের অংশ হিসেবে, সর্বোচ্চ আয়শ্রেণি থেকে আদায়কৃত করের অন্তত ৫% স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ দিতে হবে। এই ধরণের লক্ষ্যভিত্তিক বরাদ্দ একটি পূর্বানুমেয় ও স্বচ্ছ অর্থায়নের ধারা তৈরি করবে—বিশেষত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, এবং দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে। এটি একটি নীতিগত পরিবর্তনের বার্তা দেবে—যেখানে স্বাস্থ্যকে রাষ্ট্রীয় অগ্রাধিকারের কেন্দ্রে রাখা হবে এবং আর্থিক সুরক্ষা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাস্থ্য বৈষম্য কমানো সম্ভব হবে।

আঞ্চলিক দেশগুলোর অভিজ্ঞতা বলে, ট্যাক্স-টু-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও সামাজিক খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা যায়। ভিয়েতনাম ২০০০-এর দশকের শুরুতে কর সংস্কার করে ই-ফাইলিং, সহজ করপদ্ধতি এবং কর অফিস বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে কর আহরণ সক্ষমতা বাড়ায়, যার ফলস্বরূপ শিক্ষা ও সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। ভারত ২০১৭ সালে একাধিক কর বাতিল করে গুছানো একটি পণ্য ও সেবা কর (GST) প্রবর্তন করে এবং আয়কর ব্যবস্থাকে ডিজিটাল করে, PAN-আধার সংযোগ ও বিশ্লেষণভিত্তিক কর ফাঁকি শনাক্তকরণ প্রযুক্তি চালু করে। এই ব্যবস্থাগুলোর ফলে রাজস্ব বৃদ্ধি ও সুশাসন নিশ্চিত হয় এবং স্বাস্থ্যখাতে 'আয়ুষ্মান ভারত'-এর মতো বৃহৎ কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

বাংলাদেশের জন্য এই ধরনের কর সংস্কার এবং উচ্চ আয় শ্রেণির করের একটি অংশ স্বাস্থ্য খাতে নির্ধারিত করা একটি সময়োপযোগী ও সাহসী পদক্ষেপ। এটি শুধু স্বাস্থ্য খাতে দেশীয় অর্থায়নের একটি টেকসই ভিত্তি গড়ে তুলবে না, বরং দাতা নির্ভরতা ও ব্যক্তিগত ব্যয়ের চাপও কমাবে। সর্বোপরি, এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি শক্তিশালী, ন্যায্য এবং আর্থিকভাবে সুরক্ষিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি তৈরি করবে।

৫.৭ সুপারিশ: স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ভোগ্যপণ্যের ওপর আবগারি করা আরোপ/বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যখাতের জন্য নির্দিস্ট বরাদ্দ সংরক্ষণ করা

বাংলাদেশে স্বাস্থ্যঝুঁকি কমানো এবং স্বাস্থ্যখাতে টেকসই অর্থায়নের (sustainable health financing) লক্ষ্যে তামাক (tobacco), চিনি-যুক্ত পানীয় (sugar-sweetened beverages), ক্যাফেইনসমৃদ্ধ এনার্জি ড্রিংক (caffeinated energy drinks), বুকের দুধের বিকল্প (breast milk substitutes), অ্যালকোহল (alcohol), অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবার (ultra-processed foods), ট্রান্স ফ্যাটযুক্ত প্যাকেটজাত খাবার, অতিরিক্ত লবণযুক্ত ভাজা স্ন্যাকস, উচ্চমাত্রায় প্রক্রিয়াজাত ইনস্ট্যান্ট নুডলস এবং সুইটেনড কনডেন্সড মিল্ক-এর মতো স্বাস্থ্যক্ষতিকর পণ্যের ওপর) আবগারি কর (excise tax) আরোপ করা বা বৃদ্ধি করতে হবে, এবং স্বাস্থ্যখাতের জন্য পুর্বনির্ধারিত বরাদ্দ সংরক্ষণ করা। এসব পণ্য বাংলাদেশের বাজারে সহজলভ্য এবং শহরাঞ্চল ও তরুণদের মধ্যে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এর ফলে ডায়াবেটিস (diabetes), উচ্চ রক্তচাপ (hypertension), হৃদরোগ (cardiovascular diseases) এবং ক্যান্সারের মতো অসংক্রামক রোগের (non-communicable diseases - NCDs) হার ক্রমবর্ধমান। এই পণ্যে আবগারি কর আরোপ করলে একদিকে এর ব্যবহার কমবে, অন্যদিকে স্বাস্থ্য খাতে টেকসই ও পূর্বানুমেয় আয় (predictable revenue) সৃষ্টি হবে। এই কর থেকে প্রাপ্ত আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ স্বাস্থ্যখাতের জন্য নির্ধারিত (earmarked) রাখতে হবে, বিশেষ করে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য কর্মসূচি

(preventive health programs), স্বাস্থ্য সচেতনতা কার্যক্রম (health promotion initiatives) এবং আর্থিক সুরক্ষা ব্যবস্থার (financial protection mechanisms) জন্য।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা নির্দেশ করে যে, আবগারি কর জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়নের জন্য একটি কার্যকর পদ্ধতি। উদাহরণস্বরূপ, ফিলিপাইন ২০১২ সালে "Sin Tax Reform Law" পাস করে, যা তামাক ও অ্যালকোহলের ওপর কর বৃদ্ধি করে এবং সেই কর থেকে প্রাপ্ত অর্থ সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা (Universal Health Care) সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে ব্যয় করা হয়। থাইল্যান্ড উচ্চ হারে চিনি-যুক্ত পানীয় ও তামাকজাত পণ্যে কর আরোপ করে, যার রাজস্ব "Health Promotion Foundation"-এ বরাদ্দ হয় এবং তা প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা (primary care) ও রোগ প্রতিরোধে (disease prevention) ব্যয় করা হয়। মেক্সিকো একটি সোডা ট্যাক্স (soda tax) চালু করে, যার ফলে প্রথম দুই বছরে চিনি-যুক্ত পানীয়ের ব্যবহার ৭.৬% হ্রাস পায় এবং এই কর স্থূলতা প্রতিরোধ কর্মসূচির (obesity prevention efforts) অর্থায়নে সহায়তা করে। WHO সুপারিশ করে যে, তামাকজাত পণ্যের খুচরা মূল্যের অন্তত ৭৫ শতাংশ কর হিসাবে আরোপ করা উচিত এবং অন্যান্য ক্ষতিকর পণ্যের ওপরও অনুরূপ কৌশল প্রয়োগ করা উচিত।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রয়েছে এই পদক্ষেপের জন্য দৃঢ় জনসমর্থন। স্বাস্থ্যখাত সংস্কার বিষয়ে পরিচালিত জাতীয় জনমত জরিপে দেখা গেছে—১০০ শতাংশ মানুষ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ভোগ্যপণ্যের ওপর শুল্ক ও কর বাড়ানোর পক্ষে মত দিয়েছেন। এই প্রেক্ষাপটে, স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত আবগারি কর (health-related excise tax) সম্প্রসারণ বাংলাদেশের জন্য একটি সাহসী ও সময়োপযোগী নীতিগত পদক্ষেপ হতে পারে—যা একদিকে অসংক্রামক রোগের বিস্তার রোধে সহায়ক হবে, অন্যদিকে জনস্বাস্থ্যবান্ধব আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। একইসঙ্গে, এই সংস্কার জাতীয় স্বাস্থ্যখাতে টেকসই অর্থায়নের জন্য একটি নতুন ও নির্ভরযোগ্য উৎস তৈরি করবে। এর মাধ্যমে সরকার ন্যায্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জনমুখী স্বাস্থ্যসেবায় বিনিয়োগের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে পারবে।

৫.৮ সুপারিশ: অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসবহুল পণ্য ও সেবার ওপর পৃথক স্বাস্থ্য কর চালু করা

বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিত করতে অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসবহুল পণ্য ও সেবার ওপর মূসক (VAT) ভিত্তিক পৃথক একটি স্বাস্থ্য কর (Health Levy) চালু করতে হবে। এই কর কৌশলগতভাবে নির্ধারণ করা এবং এমন সব পণ্য ও সেবায় আরোপ করা, যা সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় নয়—যেমন শীতাতপনিয়ন্ত্রিত রেস্টুরেন্ট, তিন তারকা ও তার উর্ধ্বের প্রিমিয়াম হোটেল, বিলাসবহুল শপিং মল (centrally air-conditioned), অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, মাল্টিপ্লেক্স সিনেমা হল, উচ্চমূল্যের ইলেকট্রনিক্স, বিলাসবহুল বিউটি ও ওয়েলনেস স্পা এবং অভিজাত প্রাইভেট ক্লাব। এই করটি এমনভাবে নকশা করতে হবে যাতে নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর ওপর কোনো অতিরিক্ত চাপ না পড়ে এবং এই আয়ের সম্পূর্ণ অংশ যেন শুধুমাত্র স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করার জন্য সংরক্ষিত (earmarked) থাকে।

দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা এই ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। দেশটি ২০১৮ সালে মূসক কাঠামোর অংশ হিসেবে চিনি-যুক্ত পানীয়ের ওপর স্বাস্থ্য প্রচার কর (Health Promotion Levy) চালু করে। খুচরা মূল্যের আনুমানিক ১১ শতাংশের সমপরিমাণ এই কর একদিকে যেমন চিনি-যুক্ত পানীয়ের ক্রয় উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে দেয়, তেমনি স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ কর্মসূচিতে ব্যয়যোগ্য একটি উল্লেখযোগ্য সরকারি আয়ও সৃষ্টি করে। ঘানা তার জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা কর্মসূচি (National Health Insurance Scheme - NHIS) অর্থায়নের জন্য মূসকের একটি নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারিত রেখেছে, যার মাধ্যমে একটি পূর্বানুমেয় এবং টেকসই রাজস্বধারা নিশ্চিত হয়। এই অভিজ্ঞতাগুলো দেখায় যে, অপ্রয়োজনীয় বা স্বাস্থ্য-ক্ষতিকর পণ্য ও সেবার ওপর লক্ষ্যভিত্তিক মূসক স্বাস্থ্য কর আরোপ করলে তা একদিকে যেমন আয় বৃদ্ধির মাধ্যম হয়, তেমনি জনস্বাস্থ্য উন্নয়নেও কার্যকর অবদান রাখে।

বাংলাদেশের জন্য স্বাস্থ্য খাত-নির্ভর একটি পৃথক মূসক স্বাস্থ্য কর প্রবর্তন একটি নির্ভরযোগ্য ও অভ্যন্তরীণ রাজস্ব উৎস তৈরি করবে—যা প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ, প্রয়োজনীয় ওষুধ ও ডায়াগনস্টিক সেবায় ভর্তুকি প্রদান, এবং সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা

(social health insurance) বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। এই পদক্ষেপটি দেশের জনস্বাস্থ্য অবকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে এবং একটি অধিক ন্যায্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও আর্থিক ভাবে সুরক্ষিত স্বাস্থ্যব্যবস্থার দিকে বাংলাদেশের উত্তরণ নিশ্চিত করবে।

৫.৯ সুপারিশ: করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) কাজে লাগিয়ে জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা তহবিল গঠন করা

স্বাস্থ্যখাতে টেকসই দেশীয় অর্থায়ন নিশ্চিত করতে একটি 'জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা তহবিল' (National Health Impact Fund) গঠন করতে হবে। ওষুধ, ব্যাংক, বীমা, টেলিযোগাযোগ ও রাসায়নিক শিল্পসহ বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর সিএসআর বাজেটের একটি নির্দিষ্ট অংশ—কমপক্ষে ২০ শতাংশ—এই তহবিলে জমা রাখা বাধ্যতামূলক করতে হবে। তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য একটি স্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে, যাতে এই অর্থ শুধু স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় হয় এবং সরকারের অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচিতে সরাসরি ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। তহবিলটি স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের যৌথ তত্ত্বাবধানে, একটি স্বাধীন এবং বেসরকারি হস্তক্ষেপমুক্ত ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে। এ তহবিল থেকে মা ও শিশু স্বাস্থ্য, অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, ডিজিটাল স্বাস্থ্য অবকাঠামো, জরুরি সেবা এবং পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে সেবা সম্প্রসারণে লক্ষ্যভিত্তিক বিনিয়োগ করা হবে। প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের অবদানের কার্যকারিতা পর্যালোচনার জন্য একটি প্রকল্পভিত্তিক ড্যাশবোর্ড ও প্রতিবেদন ব্যবস্থার মাধ্যমে ফলাফল পর্যবেক্ষণ করতে পারবে—যা জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বাড়াবে। বাধ্যতামূলক অবদানের পাশাপাশি স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত অবদান উৎসাহিত করতে সরকার ধাপে ধাপে 'Health Impact Champions' স্বীকৃতি, সরকারি অনুষ্ঠানে সম্মাননা, নীতিনির্ধারণী ফোরামে অংশগ্রহণের সুযোগ এবং কর ছাড় বা সিএসআর ক্রেডিটের মতো আর্থিক প্রণোদনার ব্যবস্থা চালু করতে পারে। এই উদ্যোগ স্বাস্থ্যখাতে বেসরকারি অংশীদারিত্বকে আরও সংগঠিত ও প্রভাবসৃষ্টিকারী রূপ দেবে।

ভারতের ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী, বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের নিট মুনাফার ২% সিএসআর-এ ব্যয় করতে হয়—যার অনেকটাই স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন খাতে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় CSR অর্থায়ন জাতীয় এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ এবং ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে কর্মক্ষেত্র-ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে ব্যবহৃত হয়েছে।

বাংলাদেশে এই জাতীয় স্বাস্থ্য তহবিল চালু হলে সিএসআর বিনিয়োগ আরও সংগঠিত, স্বচ্ছ ও প্রভাবসৃষ্টিকারী হবে। এটি জাতীয় স্বাস্থ্য কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি কার্যকর পাবলিক-প্রাইভেট অংশীদারত্ব গড়ে তুলবে এবং স্বাস্থ্য খাতের জন্য টেকসই অর্থায়নের নতুন পথ উন্মোচন করবে।

৫.১০ সুপারিশ: প্রবাসী বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের স্বাস্থ্য খাতকে শক্তিশালী করার জন্য স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রবাসী বন্ড চালু করা

স্বাস্থ্য খাতে টেকসই অর্থায়নের নতুন উৎস তৈরি করতে সরকার একটি সরকারি গ্যারান্টিযুক্ত বিশেষ বন্ড চালু করতে পারে—'স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রবাসী বন্ড'। এই বন্ডের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিরা সরাসরি দেশের স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ করতে পারবেন। বিনিয়োগকারীদের জন্য থাকবে প্রতিযোগিতামূলক মুনাফার হার, কর ছাড় বা কর রেয়াত, এবং বৈদেশিক মুদ্রায় বিনিয়োগের সুবিধা। প্রাপ্ত অর্থ শুধুমাত্র স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত হবে। এই তহবিল থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা হবে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো উন্নয়ন, সরকারি হাসপাতালের মানোন্নয়ন, ডিজিটাল স্বাস্থ্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, সামাজিক স্বাস্থ্য বীমার বিস্তার এবং জরুরি স্বাস্থ্যসেবার প্রস্তুতি ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে একটি স্বচ্ছ, দক্ষ ও যৌথ প্রশাসনিক কাঠামো প্রয়োজন—যেখানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয় যৌথভাবে তহবিল ব্যবস্থাপনা করবে। প্রবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে দূতাবাস, কনস্যুলেট এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রচারণা চালাতে হবে। এই প্রচারণায় তুলে ধরতে হবে—তাদের বিনিয়োগ কীভাবে দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নত করতে ব্যবহার হচ্ছে। এই উদ্যোগ দেশের উপর বিদেশি সহায়তার নির্ভরতা কমাবে এবং স্বাস্থ্য খাতে দীর্ঘমেয়াদি, নিজস্ব ও টেকসই অর্থায়নের একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করবে। পাশাপাশি, এটি প্রবাসীদের দেশপ্রেমকে একটি গর্বিত ও কার্যকর জাতীয় উদ্যোগে রূপান্তর করবে।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় যে প্রবাসী বন্ড উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অর্থায়নের একটি কার্যকর মাধ্যম হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ভারত তাদের প্রবাসী বন্ডের মাধ্যমে ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সংগ্রহ করেছে, যা বিভিন্ন অবকাঠামো এবং স্বাস্থ্য প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে। ইথিওপিয়াও ডায়াসপোরা বন্ডের মাধ্যমে প্রবাসীদের সম্পৃক্ত করে বিদ্যুৎ ও রেলসহ জাতীয় অবকাঠামো খাতে অর্থ বিনিয়োগ করেছে। এই অভিজ্ঞতা দেখায়, সঠিক কাঠামো ও স্বচ্ছতা থাকলে প্রবাসী বন্ড হতে পারে টেকসই ও নিরাপদ অর্থায়নের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস।

বাংলাদেশের জন্য "স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রবাসী বন্ড" একটি অনন্য উদ্যোগ হবে, যা প্রবাসীদের দেশের উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেবে। এটি শুধু বিনিয়োগকারীদের সুনিশ্চিত আর্থিক রিটার্ন দেবে না, বরং দেশের স্বাস্থ্যখাতের মানোন্নয়নে সরাসরি অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

৫.১১ সুপারিশ: জাতীয় বায়োব্যাংক গঠন করা—স্বাস্থ্য গবেষণা, উদ্ভাবন এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য একটি কৌশলগত প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করা

বাংলাদেশে একটি জাতীয় বায়োব্যাংক গঠন করা সময়োপযোগী এবং কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত অবকাঠামোর মাধ্যমে জীববৈজ্ঞানিক নমুনা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং গবেষণার জন্য ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হবে। এর ফলে রোগনির্ণয়, নতুন ওষুধ উদ্ভাবন, ব্যক্তিক স্বাস্থ্যসেবা (personalized medicine) এবং জনস্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি আসবে। এই বায়োব্যাংক দেশের জন্য একটি জাতীয় সম্পদ হিসেবে কাজ করবে, যা দেশীয় গবেষণা সক্ষমতা বাড়াবে এবং আন্তর্জাতিক গবেষণায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। একইসঙ্গে, এটি দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্য খাতে টেকসই রাজস্ব সৃষ্টি করবে, যা স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগ ও উদ্ভাবনকে আরও শক্তিশালী করবে।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, একটি কার্যকর বায়োব্যাংক শুধু গবেষণার জন্য নয়—স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ ও অর্থায়নের একটি লাভজনক ক্ষেত্র হিসেবেও কাজ করতে পারে। ধারণা করা হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী এই খাতের বাজার ২০৩০ সালের মধ্যে ১৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। ভারত, যুক্তরাজ্য এবং দক্ষিণ কোরিয়া ইতোমধ্যে বায়োব্যাংক ব্যবহারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ওষুধ কোম্পানি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে, যা দেশীয় রাজস্ব আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসে পরিণত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের ক্যান্সার গ্রিড বায়োব্যাংক ও GenomeIndia প্রকল্প, এবং যুক্তরাজ্যের UK Biobank তথ্য ব্যবহারের বিনিময়ে গবেষকদের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করছে। এই অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, উন্নত তথ্য ব্যবস্থাপনা ও গোপনীয়তা রক্ষার নিশ্চয়তা থাকলে একটি জাতীয় বায়োব্যাংক জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশ যদি জাতীয় বায়োব্যাংক গঠন করে, তাহলে এটি হবে একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ। এটি প্রমাণভিত্তিক গবেষণা ও স্বাস্থ্যনীতি তৈরিতে সহায়তা করবে, বহুজাতিক গবেষণা ও বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে, এবং বিশ্বমানের চিকিৎসা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সঙ্গে বাংলাদেশকে সংযুক্ত করবে। সবচেয়ে বড় কথা, জাতীয় বায়োব্যাংক স্বাস্থ্য খাতে রাজস্ব সৃষ্টির একটি নতুন ও টেকসই উৎস হিসেবে কাজ করবে, যেখানে গবেষণা ও বিনিয়োগ জনস্বার্থে কাজে লাগবে। এইভাবে, বাংলাদেশ বৈশ্বিক পর্যায়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা ও উদ্ভাবনের শুধুমাত্র ব্যবহারকারী নয়, বরং একজন সক্রিয় অংশীদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

স্তম্ভ ৩: তহবিল একত্রিকরন এবং ঝুঁকি সমন্বয় ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করে স্বাস্থ্য অর্থায়নে ন্যায্যতা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা

একটি টেকসই, ন্যায্য ও কার্যকর স্বাস্থ্য অর্থায়ন কাঠামো গড়ে তুলতে বাংলাদেশকে একটি মিশ্র মডেল গ্রহণ করতে হবে, যেখানে সাধারণ কর রাজস্ব, সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা (Social Health Insurance) এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত খরচ ভাগাভাগির (cost-sharing) পদ্ধতি একত্রে কার্যকর হবে। এই পদ্ধতি বৃহৎ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ঝুঁকির পুল তৈরি করবে, যা প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় সর্বজনীন প্রবেশাধিকার, বিশেষায়িত সেবায় সমতা এবং বিপর্যয়কর স্বাস্থ্য ব্যয়ের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

৫.১২ সুপারিশ: প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় শতভাগ সরকারি অর্থায়ন নিশ্চিত করা

বাংলাদেশে একটি ন্যায্য, প্রতিক্রিয়াশীল ও আর্থিকভাবে সুরক্ষিত স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে শতভাগ সরকারি অর্থায়নের মাধ্যমে সর্বজনীন ও বিনামূল্যে নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য একটি করভিত্তিক (Beveridge model) অর্থায়ন কাঠামো গ্রহণ করা প্রয়োজন, যেখানে মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য, টিকাদান, সাধারণ রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমসহ সকল প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা রাজস্ব থেকে অর্থায়িত হবে এবং মূলত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে প্রদান করা হবে। এই মডেল চালু হলে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয় হ্রাস পাবে এবং নাগরিকরা আয়, অঞ্চল বা সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে প্রয়োজনীয় সেবার ন্যায্য অধিকার লাভ করবে।

এই মডেল বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সফলভাবে কার্যকর হয়েছে। যুক্তরাজ্যের National Health Service (NHS) প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় শতভাগ করভিত্তিক অর্থায়নের মাধ্যমে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার ও আর্থিক সুরক্ষার একটি বিশ্বমানের উদাহরণ। থাইল্যান্ডের Universal Coverage Scheme (UCS) এবং শ্রীলঙ্কার সরকারি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাও দেখিয়েছে, যখন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সর্বজনীন ও বিনামূল্যে প্রদান করা হয়, তখন স্বাস্থ্যগত বৈষম্য কমে, জনগণের স্বাস্থ্য সূচক উন্নত হয় এবং out-of-pocket ব্যয়ের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।

বাংলাদেশে এই মডেল চালু করা হলে এটি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জনস্বাস্থ্যের প্রতি একটি স্পষ্ট ও সাহসী প্রতিশ্রুতি হিসেবে দেখা যাবে। এতে গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে, স্বাস্থ্যখাতে জনআস্থা জোরদার হবে এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার (UHC) ভিত্তি আরও মজবুত হবে। এটি হবে একটি নীতিগত মাইলফলক, যা ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য খাতে দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই পরিবর্তনের পথ তৈরি করবে।।

৫.১৩ সুপারিশ: হাইব্রিড অর্থায়ন মডেল চালু করে সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি সেবায় সমতা, সক্ষমতা ও আর্থিক সুরক্ষা বৃদ্ধি করা

প্রাথমিক সেবার বাইরেও, বিশেষ করে সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি সেবায় একটি হাইব্রিড অর্থায়ন মডেল চালু করতে হবে। এই মডেলে অগ্রাধিকারভিত্তিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ সেবা—যেমন মাতৃত্বকালীন সেবা, জরুরি অস্ত্রোপচার এবং দীর্ঘমেয়াদি রোগ ব্যবস্থাপনা—সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে সরকারি অর্থায়নে প্রদান করা হবে। পাশাপাশি, এসব সেবাকে সবার জন্য সহজলভ্য করতে সরকার মূল্যনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতির মাধ্যমে বেসরকারি খাত থেকেও সেবা গ্রহণের সুযোগ তৈরি করবে। এই মিশ্র ব্যবস্থা জনগণের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করবে, সেবায় সমতা বজায় রাখবে এবং পুরো ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা ও টেকসই অগ্রগতি নিশ্চিত করবে।।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা দেখায়, এই ধরনের হাইব্রিড মডেল স্বাস্থ্যসেবার ভারসাম্য রক্ষা এবং সামর্থ্য অনুযায়ী সেবায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে কার্যকর। থাইল্যান্ডে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে হাসপাতালে ভর্তি হতে পারে, আর উচ্চ ও মধ্যম আয়ের জনগণ নির্ধারিত সহ-অর্থায়নে সেবা গ্রহণ করে—সবই একটি একীভূত নীতিমালার অধীনে। কলম্বিয়ার স্বাস্থ্যব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি সেবাপ্রদান একই নিয়ন্ত্রিত কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হয়, যার ফলে সেবা বিভাজন কমে এবং কার্যকারিতা বাড়ে। এসব মডেল দেখায়—একটি সুসংহত হাইব্রিড ব্যবস্থা স্বাস্থ্যখাতকে আরও টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলে।

বাংলাদেশে এই মডেল চালু করা হলে প্রাথমিক ও জটিল সেবা উভয় ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ও আর্থিক সুরক্ষা বাড়বে। এটি মধ্যম আয়ের জনগণের জন্য একটি সাশ্রয়ী বিকল্প তৈরি করবে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সেবা দেবে এবং সরকারি হাসপাতালের ওপর অপ্রয়োজনীয় চাপ কমাবে। এর ফলে স্বাস্থ্যব্যবস্থা আরও প্রতিক্রিয়াশীল, ব্যয়সাশ্রয়ী এবং ন্যায্য হয়ে উঠবে।

৫.১৪ সুপারিশ: বাধ্যতামূলক সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা চালু করা এবং সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে ব্যয়বহুল চিকিৎসায় আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা। অনানুষ্ঠানিক খাতকে ধাপে ধাপে অন্তর্ভুক্ত করা

বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা (Social Health Insurance - SHI) চালু করতে হবে। এই বীমার মাধ্যমে ক্যান্সার, কিডনি বিকল, জটিল অস্ত্রোপচার এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি রোগ—যা বিপর্যয়কর চিকিৎসা ব্যয়ের ঝুঁকি তৈরি করে—

তা থেকে আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি পেশাজীবীদের বাধ্যতামূলকভাবে এই বীমায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীর যৌথ প্রিমিয়ামের ভিত্তিতে বীমা পরিচালনা করা। একইসঙ্গে, সরকার কর্তৃক ভর্তুকি দিয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে এই বীমার আওতায় আনা। পরবর্তী পর্যায়ে টার্গেটেড ভর্তুকি ও আংশিক অর্থপ্রদানের মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করা।

জার্মানি, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ভিয়েতনাম বাধ্যতামূলক প্রিমিয়াম, ভর্তুকি ও বহুমাত্রিক তহবিল একীভূত করে SHI কার্যকর করেছে। রুয়ান্ডা প্রাতিষ্ঠানিক খাতে SHI চালুর পাশাপাশি কমিউনিটি-ভিত্তিক বীমার মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক খাতকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে। এসব অভিজ্ঞতা দেখায়—সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা ধাপে ধাপে চালু করা সম্ভব, এমনকি স্বল্প সম্পদের দেশেও।

বাংলাদেশে SHI চালুর মাধ্যমে উচ্চ ব্যয়ের চিকিৎসা সেবায় প্রবেশাধিকার বাড়বে, ব্যয়জনিত দারিদ্র্য হ্রাস পাবে এবং স্বাস্থ্য খাতে পূর্বানুমেয়, সমন্বিত ও স্থিতিশীল অর্থায়নের ভিত্তি তৈরি হবে। এটি সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জনের পথকে আরও স্পষ্ট, শক্তিশালী ও টেকসই করে তুলবে।

স্তম্ভ ৪: সম্পদের কার্যকর বরাদ্দ (Responsive Allocation of Resources) ও সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা ক্রয় (Cost-Effective Purchasing) নিশ্চিত করা

স্বাস্থ্যখাতে টেকসই এবং ন্যায্য অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হলে, বাংলাদেশকে একদিকে স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়নের পরিমাণ বাড়াতে হবে, অন্যদিকে চালু করতে হবে চাহিদাভিত্তিক ও ফলাফলনির্ভর বাজেটিং প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতিতে বাজেট বরাদ্দ জনস্বাস্থ্য চাহিদা এবং সেবার বাস্তব ফলাফলের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে—ফলে সম্পদের ব্যবহার হবে আরও কৌশলগত, লক্ষ্যভিত্তিক ও কার্যকর। এর মাধ্যমে জনগণের জন্য মানসম্মত সেবায় প্রবেশাধিকার, আর্থিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যের অবস্থা—সব ক্ষেত্রেই দৃশ্যমান উন্নয়ন ঘটবে।।

৫.১৫ সুপারিশ: স্বাস্থ্যখাতে জিডিপির অন্তত ৫% এবং জাতীয় বাজেটের ~১৫% বরাদ্দ নিশ্চিত করা

সরকারকে এখনই স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে—সামগ্রিক জনস্বাস্থ্য ব্যয় জিডিপির অন্তত ৫ শতাংশ এবং মোট বাজেটের প্রায় ১৫ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। এই বিনিয়োগের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা বিস্তৃত হবে, ব্যক্তিগত ব্যয়ের (Out-of-Pocket Expenditure) চাপ কমবে এবং জনগণের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত হবে। পাশাপাশি, স্বাস্থ্য অবকাঠামো, জনবল, অত্যাবশ্যক ওষুধ এবং আধুনিক স্বাস্থ্য প্রযুক্তিতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি হবে।

বিশ্বব্যাপী যেসব দেশ সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা (UHC) অর্জনে এগিয়ে আছে, তারা স্বাস্থ্যখাতে জিডিপির ৫% বা তার বেশি ব্যয় করছে। থাইল্যান্ড সরকার তার মোট বাজেটের ১৪%-এর বেশি ব্যয় করে UCS পরিচালনা করছে, যা দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। রুয়ান্ডা ২০০০-এর দশকে যেখানে জিডিপির মাত্র ৪% ব্যয় করত, এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭%-এর বেশি—এই বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে দেশে মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার কমেছে এবং দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

বাংলাদেশেও এই মাত্রার বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, প্রতিক্রিয়াশীল ও জনগণকেন্দ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে উঠবে—যা সর্বজনীন স্বাস্থ্যসুরক্ষার ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।।

৫.১৬ সুপারিশ: প্রয়োজন ও চাহিদাভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে স্বাস্থ্য বাগেটের >৫০% বরাদ্দ নিশ্চিত করা

বাংলাদেশকে একটি চাহিদাভিত্তিক বাজেট পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, যেখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, রোগ প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। মোট সরকারি স্বাস্থ্য ব্যয়েরঅন্তত ৫০% প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য বরাদ্দ

নিশ্চিত করতে হবে, বিশেষ করে প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটাতে। বরাদ্দ নির্ধারণের সময় অবশ্যই জনসংখ্যাগত পরিবর্তন, অনু-সংক্রামক রোগের (NCDs) ক্রমবৃদ্ধি এবং প্রবীণ জনগণের স্বাস্থ্য চাহিদা বিবেচনায় নিতে হবে।

ব্রাজিলের বিকেন্দ্রীকৃত বাজেট পদ্ধতি এবং ইথিওপিয়ার স্বাস্থ্য এক্সটেনশন প্রোগ্রামসহ বিভিন্ন উদাহরণ প্রমাণ করে—চাহিদাভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ বৈষম্য কমাতে, সেবার প্রবেশাধিকার বাড়াতে এবং জনগণের দোরগোড়ায় কার্যকর সেবা পৌঁছে দিতে সক্ষম। এই ধরনের ব্যবস্থা স্বাস্থ্য খাতে অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং সিস্টেমের প্রতিক্রিয়াশীলতা বাড়ায়।

বাংলাদেশেও এই পদ্ধতি চালু করতে হবে। তাহলেই প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার প্রবেশাধিকার বাড়বে, বাজেট ব্যবহারে দক্ষতা আসবে, এবং ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয়—বিশেষ করে ওষুধ, বহির্বিভাগ ও ডায়াগনস্টিক সেবার খরচ—উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে।।

৫.১৭ সুপারিশ: বাজেট বরাদ্দে ফলাফল ও দক্ষতা ভিত্তিক পদ্ধতির প্রবর্তন করে ঐতিহাসিক বাজেটিং থেকে ধাপে ধাপে সরে আসা

বাংলাদেশের উচিত ঐতিহাসিক বাজেটিং থেকে বেরিয়ে এসে আউটপুট ও পারফরম্যান্স-ভিত্তিক বাজেটিং ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে বাজেট বরাদ্দ নির্ধারিত হয় সেবার পরিমাণ, মান, রোগীর স্বাস্থ্য অবস্থা এবং ক্লিনিক্যাল গাইডলাইন অনুসরণের ভিত্তিতে। সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচিগুলো নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন করলে তারা অতিরিক্ত বরাদ্দ ও প্রণোদনা পাবে।

থাইল্যান্ড NHSO-এর মাধ্যমে এই মডেল বাস্তবায়ন করেছে, যেখানে সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আউটপুট ও মানের উপর ভিত্তি করে অর্থ দেওয়া হয়। রুয়ান্ডার PBF ব্যবস্থা টিকাদান কাভারেজ ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের মতো সূচকের ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ করে।

বাংলাদেশে এই পদ্ধতি চালু হলে, সীমিত সম্পদ ব্যবহার আরও কৌশলগত হবে, সেবার গুণগত মান বাড়বে, এবং ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

৫.১৮ সুপারিশ: জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা অফিস গঠন করা এবং কৌশলগত ক্রয়ক্ষমতা জোরদার করা

সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা (Social Health Insurance - SHI) কার্যক্রম পরিচালনা ও স্বাস্থ্যসেবা ক্রয়ে কৌশলগত ভূমিকা পালনের জন্য বাংলাদেশে একটি স্বশাসিত জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা অফিস (NHSO) গঠন করতে হবে। NHSO-এর প্রধান দায়িত্ব হবে প্রিমিয়াম সংগ্রহ (Premium Collection), তহবিল পুলিং (Fund Pooling), সেবাদাতা চুক্তি (Provider Contracting), এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পেমেন্ট ব্যবস্থাপনা।

থাইল্যান্ডের NHSO, এবং ঘানার National Health Insurance Authority (NHIA) এর অনুকরণে, বাংলাদেশে NHSO গঠিত হলে এটি SHI-এর প্রশাসনিক দক্ষতা, পুলড ফান্ড ব্যবহারে স্বচ্ছতা, এবং সেবার মান বাড়াতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

৫.১৯ সুপারিশ: প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কার্যকরিতা ও ব্যয়-সাশ্রয়িতা বিশ্লেষণের জন্য একটি স্বাস্থ্য প্রযুক্তি মূল্যায়ন ইউনিট গঠন করা

বাংলাদেশে একটি স্বাধীন স্বাস্থ্য প্রযুক্তি মূল্যায়ন (HTA) ইউনিট গঠন করতে হবে, যা নতুন প্রযুক্তির (যেমন: ওষুধ, ডায়াগনস্টিক, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, চিকিৎসা পদ্ধতি ও কর্মসূচী) নিরাপত্তা (Safety), কার্যকারিতা (Effectiveness), ব্যয়- সাশ্রয়িতা (Cost-Effectiveness) এবং বাজেট প্রভাব (Budget Impact) মূল্যায়ন করবে। এই ইউনিট স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও NHSO-এর জন্য নীতিনির্ধারণে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবে।

যুক্তরাজ্যের NICE, থাইল্যান্ডের HITAP এবং ভারতের HTAIn এই মডেলের সফল উদাহরণ। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য প্রযুক্তি মূল্যায়ন ইউনিট চালু হলে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমবে, সর্বোত্তম প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ নিশ্চিত হবে এবং জনগণের আস্থা বাড়বে।

৫.২০ সুপারিশ: স্বাস্থ্যখাতে জনক্রয় বিধিমালা (PUBLIC PROCUREMENT RULES) সংস্কার করা

বাংলাদেশের বর্তমান জনক্রয় বিধিমালায় নমনীয়তা ও সময়োচিততা নেই, যা ওষুধ, টিকা ও ডায়াগনস্টিক সরঞ্জাম সংগ্রহে বিলম্ব ঘটায়। স্বাস্থ্যখাতের ক্রয় প্রক্রিয়ার বিশেষ চাহিদাকে বিবেচনা করে পৃথক স্বাস্থ্য জনক্রয় বিধিমালা প্রনয়ন করতে হবে।

বাংলাদেশেও এই সংস্কার বাস্তবায়িত হলে সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত হবে, ঘাটতি ও দেরি কমবে, এবং প্রতিটি টাকার কার্যকারিতা বাড়বে।

৫.২১ সুপারিশ: স্বাস্থ্য খাতের সকল ক্রয়ে বাধ্যতামূলক ই-জিপি (চালু করা

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্যখাতের সকল ক্রয়ে বাধ্যতামূলকভাবে ই-জিপি চালু করতে হবে। এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ক্রয় প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ রেকর্ড করবে এবং রিয়েল টাইমে মনিটরিং নিশ্চিত করবে।

ফিলিপাইনের PhilGEPS ও রুয়ান্ডার Umucyo ব্যবস্থা প্রমাণ করেছে, ই-জিপি ঘুষ, দুর্নীতি ও বিলম্ব কমাতে কার্যকর। বাংলাদেশে CPTU ইতোমধ্যে প্রাথমিক সাফল্য দেখিয়েছে—এখন সময় এসেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে তা পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়নের।

৫.২২ সুপারিশ: সরকারি হাসপাতালসমূহে ধাপে ধাপে আর্থিক স্বায়ত্তশাসন চালু করে ব্যবহারকারী ফি সংরক্ষণ ও হাসপাতালের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সরঞ্জাম ক্রয়ে ব্যবহারের ক্ষমতা দেওয়া। পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে স্বাধীনতার পরিসর বাড়ানো।

সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ধাপে ধাপে আর্থিক স্বায়ত্তশাসন চালু করতে হবে—প্রথম পর্যায়ে তৃতীয় স্তরের (Tertiary) হাসপাতাল থেকে শুরু করে। আর্থিক স্বায়ত্তশাসনের আওতায় হাসপাতালগুলিকে ব্যবহারকারী ফি (user fee) সংরক্ষণ -এর অনুমতি দেওয়া এবং সেই অর্থ মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সরঞ্জাম ও লজিস্টিকস ক্রয়ের জন্য সরাসরি ব্যবহার করার ক্ষমতা দেওয়া। প্রতিষ্ঠানের পারফরম্যান্স ও জবাবদিহিতার নির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করা। নির্ধারিত বেঞ্চমার্ক অর্জনের পর আর্থিক স্বায়ত্তশাসনের পরিসর ধাপে ধাপে বাড়ানো। স্বায়ত্তশাসনের সাথে সাথে তদারকি ও আর্থিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে একটি শক্তিশালী নজরদারি ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

AIIMS-সহ ভারতের হাসপাতাল বোর্ড, ইথিওপিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার পারফরম্যান্স চুক্তিভিত্তিক মডেল ইতোমধ্যে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশে এই সংস্কার চালু হলে উদ্ভাবন উৎসাহিত হবে, প্রশাসনিক জটিলতা কমবে এবং সেবার গুণগত মান ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে।

পিলার ৫: খণ্ডিততা দূর করা, দক্ষতা বাড়ানো, এবং সব খাতে অপচয় রোধ করা

৫.২৩ সুপারিশ: ইডিসিএলকে আধুনিক ও সক্ষম করে জাতীয় অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের উৎপাদন সম্প্রসারণ করা। সীমিত সক্ষমতার ক্ষেত্রে বেসরকারি উৎপাদকদের কাছ থেকে খরচভিত্তিক মূল্যে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের কৌশলগত কেনাকাটা নিশ্চিত করা।

অত্যাবশ্যক ঔষধ সর্বস্তরে সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী করতে হলে, Essential Drugs Company Limited (ইডিসিএল)–কে যুগোপযোগীভাবে আধুনিক ও সক্ষম করতে হবে। একই সঙ্গে, দীর্ঘমেয়াদি ও কৌশলগত চুক্তির মাধ্যমে বেসরকারি খাত থেকে ক্রয় প্রক্রিয়াকে জোরদার করতে হবে, যেন অত্যাবশ্যক ঔষধের সরবরাহে কোনো বিঘ্ন না ঘটে।

ঔষধে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে ব্যক্তি-পর্যায়ের খরচ কমাতে, ইডিসিএলের উৎপাদন সক্ষমতা জাতীয় অত্যাবশ্যক ঔষধ তালিকার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে সম্প্রসারিত করতে হবে। এই তালিকা হবে WHO নির্দেশনা ও দেশের স্বাস্থ্য অগ্রাধিকার অনুসারে হালনাগাদ। ইডিসিএলের সক্ষমতা যেখানে সীমিত, সেখানে স্বচ্ছ ও খরচভিত্তিক মূল্যে, দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির ভিত্তিতে বেসরকারি উৎপাদকদের কাছ থেকে ঔষধ কেনা হবে। এছাড়া, অত্যাবশ্যক না হলেও চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক রেফারেন্স মূল্যনীতি অনুসরণ করা উচিত।

ব্রাজিল ও ইথিওপিয়া এই ধরনের হাইব্রিড মডেল (সরকারি উৎপাদন + বেসরকারি কৌশলগত কেনাকাটা) ব্যবহার করে ঔষধের প্রাপ্যতা ও খরচ দুই-ই নিয়ন্ত্রণে এনেছে। WHO-এর গবেষণায় দেখা গেছে, কেন্দ্রীভূত কেনাকাটা, যৌথ দরপত্র প্রক্রিয়া এবং খরচভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি ঔষধের যৌক্তিক মূল্য নিশ্চিত করে এবং সবার জন্য সহজলভ্যতা বাড়ায়।

এই সংস্কার বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে ব্যক্তি-পর্যায়ের খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে, সরবরাহ ব্যবস্থার খণ্ডিততা দূর হবে এবং সরকারি ঔষধ তহবিলের ব্যবহারে কৌশলগত দক্ষতা বাড়বে।

৫.২৪ সুপারিশ: এপিআই (API) উৎপাদনে কর-প্রণোদনা ও কৌশলগত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দেশীয় উৎপাদন সক্ষমতা গড়ে তোলা

বাংলাদেশে ঔষধ শিল্পের স্বনির্ভরতা বাড়াতে হলে Active Pharmaceutical Ingredients (API)–এর দেশীয় উৎপাদন জোরদার করতে হবে। এজন্য সরকারকে কর রেয়াত, স্বল্পসুদে ঋণ এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) প্রণোদনা দিতে হবে।

বিশেষ করে যেসব প্রতিষ্ঠান জাতীয় অত্যাবশ্যক ঔষধ তালিকা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় API উৎপাদনে বিনিয়োগ করতে চায়, তাদের জন্য ভ্যাট রিফান্ড, কাঁচামাল আমদানিতে শূন্য শুল্ক, এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্যারান্টিতে দীর্ঘমেয়াদি স্বল্পসুদের ঋণ নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে, যারা প্রথম কোনো গুরুত্বপূর্ণ API, বায়োসিমিলার বা বায়োলজিক উৎপাদনে সফল হবে, তাদের জন্য উদ্ভাবনী পুরস্কার ও মাইলস্টোন-ভিত্তিক প্রণোদনা চালু করা যেতে পারে।

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে, আন্তর্জাতিক প্রস্তুতকারকদের সঙ্গে যৌথ বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর চুক্তি গড়ে তোলা উচিত। ভারতে API পার্ক এবং চীনের দেশীয় প্রণোদনা মডেল ব্যবহার করে আমদানি নির্ভরতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো গেছে। আজ ভারত নিজ দেশে ৭০ শতাংশের বেশি অগ্রাধিকার API উৎপাদন করে।

বাংলাদেশের জন্য এই সংস্কার ঔষধের দাম কমাবে, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করবে এবং স্বাস্থ্যখাতে আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জনে সহায়ক হবে।

৫.২৫ সুপারিশ: 'ন্যাশনাল ফার্মেসি নেটওয়ার্ক' গড়ে তুলে অত্যাবশ্যক ওষুধের সহজ, সাশ্রয়ী ও ন্যায্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা

বাংলাদেশে সকল সরকারি হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং জেনারেল প্র্যাকটিশনার (GP) ক্লিনিকে ২৪ ঘণ্টা খোলা ইন-হাউজ লাইসেন্সপ্রাপ্ত ফার্মেসি চালু করে 'ন্যাশনাল ফার্মেসি নেটওয়ার্ক (NPN)' গড়ে তুলতে হবে, যাতে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিনামূল্যে অথবা ভর্তুকিমূল্যে অত্যাবশ্যক ঔষধ পায়।

এই ফার্মেসিগুলোতে জাতীয় অত্যাবশ্যক ঔষধ তালিকা অনুযায়ী ঔষধের পর্যাপ্ত মজুত নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রশিক্ষিত ফার্মাসিস্ট দ্বারা পরিচালিত করতে হবে, যারা ঔষধ ব্যবহারে পরামর্শ ও যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারে উৎসাহ দেবেন। হাসপাতালে ভর্তি রোগী ও বহির্বিভাগের রোগী—উভয়ের জন্য এই ফার্মেসির সেবা প্রযোজ্য হবে। ঔষধ সরবরাহ ও বিতরণ ডিজিটালি ট্র্যাকিং করে আগাম চাহিদা নির্ধারণ এবং চুরি/অপচয় রোধ করা যাবে।

শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রীয় ফার্মেসি এবং থাইল্যান্ডের ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ প্রোগ্রামের আওতাধীন হাসপাতাল ফার্মেসি ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের জন্য কার্যকর উদাহরণ।

এই ব্যবস্থা চালু হলে, অনিয়ন্ত্রিত বেসরকারি ফার্মেসির উপর নির্ভরতা কমবে, সরবরাহ ব্যবস্থার স্বচ্ছতা বাড়বে এবং ঔষধ সরবরাহে সরকারি ব্যয়ের কার্যকারিতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

৫.২৬ সুপারিশ: হাসপাতাল ও প্রাথমিক সেবাকেন্দ্রে ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্ট নিয়োগ করে ওষুধের যৌক্তিক ব্যবহার ও ব্যয়-সাশ্রয়িতা নিশ্চিত করা

বাংলাদেশের প্রতিটি হাসপাতাল ও প্রাথমিক সেবা কেন্দ্রে ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্ট নিয়োগ করতে হবে, যাতে ঔষধ ব্যবহারে নিরাপত্তা, কার্যকারিতা ও খরচ-সাশ্রয়িতা নিশ্চিত হয়। তাঁদের সক্রিয়ভাবে চিকিৎসা রাউন্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যেন তারা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবস্থাপনা ও ঔষধবিষয়ক পরামর্শ প্রদান করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্টের উপস্থিতি অনিয়ন্ত্রিত ঔষধ ব্যবহারের হার কমায়, polypharmacy প্রতিরোধ করে এবং চিকিৎসার মান ও ফলাফল উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে। যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডার মতো দেশে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ঔষধজনিত ভুল ও অপচয় কমেছে এবং প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

বাংলাদেশেও এই সংস্কার চালু করতে হবে। এতে চিকিৎসা খরচে সাশ্রয় হবে, সেবার গুণগত মান বাড়বে এবং ঔষধ ব্যবহারে দক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে—যা স্বাস্থ্য খাতে আর্থিক সুরক্ষার ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করবে।।

৫.২৭ সুপারিশ: 'ন্যাশনাল এসেনশিয়াল ডায়াগনস্টিক লিস্ট' প্রণয়ন এবং পরীক্ষার মূল্য নির্ধারণে একটি নিয়ন্ত্রিত কাঠামো চালু করা

বাংলাদেশে ডায়াগনস্টিক সেবার মান নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যয় সাশ্রয় নিশ্চিত করতে একটি জাতীয় 'এসেনশিয়াল ডায়াগনস্টিক লিস্ট (EDL)' চালু করতে হবে। এই তালিকা WHO নির্দেশনা ও দেশের রোগপ্রবণতা অনুযায়ী প্রণয়ন করতে হবে এবং এটিকে সকল সরকারি ও বেসরকারি ল্যাবরেটরির জন্য মানদন্ড হিসেবে কার্যকর করতে হবে। এর পাশাপাশি, এসেনশিয়াল ডায়াগনস্টিক লিস্ট এর টেস্টগুলোর জন্য খরচভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যেখানে সেবার ধরণ ও অঞ্চলের ভিত্তিতে যুক্তিসঙ্গত ভিন্নতা অনুমোদিত থাকবে—কিন্তু শহরাঞ্চলে অতিরিক্ত মূল্যের অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

বিশ্বব্যাপী উদাহরণ থেকে দেখা গেছে, এই ধরনের উদ্যোগ কার্যকরভাবে বৈষম্য কমায় ও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় রোধ করে। ভারতের ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্টস অ্যাক্টের আওতায় অনেক রাজ্যে নির্দিষ্ট ডায়াগনস্টিক পরীক্ষার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। WHO-এর Essential Diagnostics List ইতোমধ্যেই ২০টিরও বেশি দেশ গ্রহণ করেছে, যার ফলে ডায়াগনস্টিক সেবার প্রবেশাধিকার বেড়েছে এবং ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

বাংলাদেশেও এই ব্যবস্থা দ্রুত চালু করতে হবে। এতে প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলোর আওতা বাড়বে, জনগণের ওপর আর্থিক চাপ কমবে, এবং ডায়াগনস্টিক সেবায় অপচয় কমে দক্ষতা বাড়বে—যা একটি সাশ্রয়ী, ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।।

৫.২৮ সুপারিশ: মেডিকেল ডিভাইস উৎপাদনে দেশীয় শিল্প গড়ে তোলা, ব্যয় হ্রাস এবং আমদানি নির্ভরতা কমানো

বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী স্থানীয় মেডিকেল ডিভাইস শিল্প গড়ে তোলা উচিত, যেখানে প্রাথমিকভাবে লো-কমপ্লেক্সিটি যন্ত্রপাতি যেমন ব্লাড প্রেসার মনিটর, গ্লুকোমিটার, থার্মোমিটার ইত্যাদি উৎপাদনের ওপর জোর দিতে হবে। এই লক্ষ্যে সরকারকে টার্গেটেড ট্যাক্স ইনসেনটিভ, স্বল্পসুদের অর্থায়ন ও আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি হস্তান্তর সহযোগিতা দিতে হবে। উৎপাদন যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানিতে কম শুল্ক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের সুযোগ দিতে হবে, যাতে দেশীয় শিল্পে বিনিয়োগ টেকসই হয়। পাশাপাশি, জটিল যন্ত্রপাতি তৈরিতে আন্তর্জাতিক উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ গড়ে তোলা দরকার।

ভিয়েতনাম ধাপে ধাপে উৎপাদন কৌশল ব্যবহার করে স্থানীয় মেডিকেল ডিভাইস শিল্প গড়ে তুলেছে, আর ব্রাজিল তাদের "প্রোডাকটিভ ডেভেলপমেন্ট পলিসি"–এর মাধ্যমে ৭০ শতাংশ ডায়াগনস্টিক ও থেরাপিউটিক যন্ত্রপাতির স্থানীয় উৎপাদন নিশ্চিত করেছে।

বাংলাদেশে এই সংস্কার সেবা সরবরাহ ব্যয় কমাবে, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করবে, সরকারি ক্রয়ের দক্ষতা বাড়াবে এবং স্বাস্থ্যখাতে স্থানীয় অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী করবে।

৫.২৯ সুপারিশ: জরুরি সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে একটি জাতীয় অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা

বাংলাদেশে সমগ্র দেশের জন্য একটি কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত 'ন্যাশনাল অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস নেটওয়ার্ক' গড়ে তোলা জরুরি, যা শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত এলাকাতেও সময়মতো, মানসম্পন্ন এবং সমতাভিত্তিক জরুরি পরিবহন সেবা নিশ্চিত করবে। এই নেটওয়ার্কে থাকবে GPS-সক্ষম যানবাহন, কেন্দ্রীয় কল সেন্টার ও ধাপে ভাগ করা যানবাহন বহর, যার অর্থায়ন হবে সরকার, কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (CSR) ফান্ড ও স্বেচ্ছা অবদানের মাধ্যমে। সামাজিক ব্যবসা মডেল–ভিত্তিক বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কাভারেজ বাড়ানো যেতে পারে, যাতে অর্থনৈতিকভাবে টেকসই একটি কাঠামো গড়ে ওঠে।

ভারতের "১০৮ এমারজেন্সি মেডিকেল রেসপন্স সার্ভিস" এবং রুয়ান্ডার "সামু (SAMU)" সিস্টেম এই ধরনের সরকারি সমন্বিত অ্যাম্বুলেন্স সেবার কার্যকর উদাহরণ, যা প্রাণ বাঁচায় এবং ব্যক্তিগত পরিবহন খরচ কমায়।

বাংলাদেশে এটি চালু হলে, চিকিৎসা পেতে দেরি কমবে, জরুরি সেবা পৌঁছাবে সবার কাছে, এবং প্রাইভেট পরিবহনের কারণে সৃষ্ট বিপর্যয়কর স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে ব্যক্তি-পর্যায়ের খরচ হ্রাস পাবে—একটি আরও সংবেদনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক স্বাস্থ্যব্যবস্থার পথ খুলে যাবে।

৫.৩০ সুপারিশ: ওষুধ ব্যবস্থাপনা, যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার ও ব্যয়-সাশ্রয়িতা নিশ্চিত করতে সার্বিকভাবে 'ই-প্রেসক্রিপশন' ব্যবস্থা চালু করা

বাংলাদেশে সব সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রে একটি কেন্দ্রীয় 'ই-প্রেসক্রিপশন' ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যা প্রেসক্রিপশনের অপব্যবহার, ঔষধ ক্রয়ে অনিয়ম এবং আর্থিক অপচয় রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এই ব্যবস্থা জাতীয় স্বাস্থ্য তথ্য অবকাঠামোর সঙ্গে সমন্বিত হতে হবে এবং ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত করতে হবে। ই-প্রেসক্রিপশন প্ল্যাটফর্মে রিয়েল-টাইম প্রেসক্রিপশন মনিটরিং, অতিরিক্ত প্রেসক্রিপশনের জন্য স্বয়ংক্রিয় সতর্কতা, এবং ঔষধ ক্রয়ের পূর্বাভাস ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রেসক্রাইবারদের জন্য ধাপে ধাপে বাধ্যতামূলক ব্যবহার এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বলছে—ই-প্রেসক্রিপশন ব্যবস্থার মাধ্যমে ঔষধ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও সাশ্রয় নিশ্চিত করা সম্ভব। এস্তোনিয়ায় এখন ১০০% প্রেসক্রিপশন ইলেকট্রনিকভাবে হয়, যার ফলে ঔষধের অপব্যবহার ব্যাপকভাবে কমেছে। ভারতের "National Digital Health Mission (NDHM)"–এও ই-প্রেসক্রিপশন সিস্টেম চালুর মাধ্যমে ঔষধ সরবরাহ ও স্বাস্থ্য বিমা দাবির প্রক্রিয়া একীভূত করা হয়েছে।

বাংলাদেশেও এই ব্যবস্থা দ্রুত চালু করতে হবে। এর মাধ্যমে ঔষধ খাতে সাশ্রয় নিশ্চিত হবে—যা দেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল স্বাস্থ্যব্যয়ের খাতে (ঔষধ) বড় পরিবর্তন আনবে। একইসঙ্গে চিকিৎসার গুণগত মান, জবাবদিহিতা ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে।।

৫.৩১ সুপারিশ: সকল সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ব্যক্তি পর্যায়ে সেবা দানকারী চিকিৎসকদের মধ্যে প্রেসক্রিপশন নিরীক্ষা চালু করা এবং নিরীক্ষার ফলাফল ব্যবহার করে আর্থিক অপচয় রোধ ও সেবার মান উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা

সকল সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী চিকিৎসকদের (প্রাইভেট প্র্যাকটিস) মধ্যে প্রেসক্রিপশন নিরীক্ষা (Prescription Audit) চালু করতে হবে এবং এটিকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার একটি নিয়মিত ও কাঠামোবদ্ধ কার্যক্রম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নিরীক্ষার মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয়, অকার্যকর বা অনর্থক ঔষধ ব্যবহারের প্রবণতা চিহ্নিত

করতে হবে এবং ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। এই নিরীক্ষার ফলাফল ব্যবহার করে চিকিৎসক ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়ন, অর্থায়ন, পেমেন্ট এবং ক্রয় সিদ্ধান্তে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

দক্ষিণ কোরিয়ার HIRA (Health Insurance Review and Assessment Service) ও যুক্তরাজ্যের NHS Business Services Authority জাতীয় পর্যায়ে প্রেসক্রিপশন ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করে ঔষধ ও চিকিৎসা খাতে বহু বিলিয়ন ডলারের অপচয় রোধ করেছে। এসব অভিজ্ঞতা দেখায়—যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য খরচে সাশ্রয় আনে এবং চিকিৎসা সেবায় গুণগত পরিবর্তন ঘটায়।

বাংলাদেশেও এই ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করতে হবে। এতে ঔষধ ও ডায়াগনস্টিক ব্যবহারে যুক্তিসঙ্গততা আসবে, অপব্যবহার ও অতিরিক্ত খরচ রোধ হবে, এবং একটি জবাবদিহিমূলক ও ব্যয়-কর্মক্ষম চিকিৎসা সংস্কৃতি গড়ে উঠবে—যা স্বাস্থ্য খাতে সাশ্রয় ও কার্যকারিতার জন্য অপরিহার্য।

৫.৩২ সুপারিশ: জনগণের সেবা প্রাপ্তি বাড়াতে, প্রাইভেট সেবার ওপর নির্ভরতা কমাতে এবং ব্যয়-সাশ্রয় নিশ্চিত করতে সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোর কার্যকাল সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত (সপ্তাহে পাঁচদিন) বর্ধিত করা।

জনগণের স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকারের সুযোগ বাড়াতে এবং প্রাইভেট সেবা গ্রহণের প্রয়োজন কমাতে, সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোর দৈনিক কার্যক্রম সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত (পাঁচদিন) বর্ধিত করতে হবে।

এই সময়সীমা প্রযোজ্য হবে আউটডোর বিভাগ, ফার্মেসি ও ডায়াগনস্টিক ল্যাবের ওপর, যাতে রোগীরা কর্মঘণ্টার বাইরেও চিকিৎসা নিতে পারেন। এর ফলে চিকিৎসাসেবা নিতে ছুটি নেওয়ার প্রয়োজন কমবে, ভিড় ও দীর্ঘ অপেক্ষা সময় হ্রাস পাবে, এবং কর্মজীবী মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা আরও সহজলভ্য হবে।

কেনিয়া ও তানজানিয়ায় করা গবেষণায় দেখা গেছে, সরকারি সেবার সময়সীমা বাড়ানোর ফলে প্রাইভেট সেবার উপর নির্ভরতা কমেছে এবং বিদ্যমান অবকাঠামো ব্যবহারে দক্ষতা বেড়েছে।

বাংলাদেশে এটি বাস্তবায়িত হলে, অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত ব্যয় কমবে, সেবাদান হবে আরও মানুষ-কেন্দ্রিক, এবং সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত হবে, যা স্বাস্থ্যখাতে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করবে।

৫.৩৩ সুপারিশ: মহামারি, জলবায়ুজনিত দুর্যোগ ও অন্যান্য জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া দিতে একটি স্বতন্ত্র 'ইমারজেন্সি হেলথ ফান্ড' গঠন করা।

ভবিষ্যতের মহামারি, সংক্রামক রোগের বিস্তার কিংবা অন্য যেকোনো জনস্বাস্থ্য জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত, সমন্বিত ও আর্থিকভাবে সুরক্ষিত প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করতে বাংলাদেশে একটি 'ইমারজেন্সি হেলথ ফান্ড' গঠন করতে হবে। এই তহবিল পূর্বনির্ধারিত ঝুঁকির মাত্রা অতিক্রম করলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সক্রিয় হবে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ দ্রুত ছাড় করা যাবে। এই তহবিল যৌথভাবে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হবে। অর্থ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত থাকবে পূর্বপ্রণীত নির্দেশিকা, জবাবদিহিমূলক নজরদারি ব্যবস্থা এবং সংক্রামক রোগের নজরদারি তথ্য বা WHO ঘোষণার ভিত্তিতে অর্থ ছাড়ের স্বচ্ছ প্রক্রিয়া।

ভিয়েতনাম তাদের "National Contingency Fund for Disease Outbreaks"–এর মাধ্যমে নজরদারি তথ্য অনুযায়ী দ্রুত অর্থ বরাদ্দ করতে সক্ষম হয়েছে, যা তাদের সংকট মোকাবেলায় কার্যকর প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আফ্রিকান ইউনিয়নের "Africa CDC" ইতোমধ্যে একটি "Emergency Preparedness and Response Authority" প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছে, যার নিজস্ব পূর্ব-প্রস্তুত তহবিল রয়েছে।

বাংলাদেশেও এই তহবিল গঠন করতে হবে। এতে জনস্বাস্থ্য সংকটে প্রতিক্রিয়ার সময় কমবে, প্রাণহানি ও অর্থনৈতিক ক্ষতি হ্রাস পাবে, এবং দেশের স্বাস্থ্য খাতে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক স্থিতিশীলতা ও ঝুঁকিপ্রতিরোধ সক্ষমতা নিশ্চিত হবে।

৫.৩৪ সুপারিশ: পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, বাজেট ব্যবস্থাপনা ও সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে দক্ষতা জোরদারে জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে PFM-প্রোকিউরমেন্ট সহায়ক দল গঠন করা

জনস্বাস্থ্য খাতে কার্যকর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও বাজেট ব্যবহারে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো মাঠপর্যায়ের ব্যবস্থাপক ও জাতীয় পর্যায়ের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অনেকেই সরকারি ক্রয় বিধিমালা (Public Procurement Rules - PPR) এবং সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা (Public Financial Management - PFM) সম্পর্কিত পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবে ভোগেন। ফলস্বরূপ, অনেক সময় বাজেট সময়মতো ব্যয় হয় না, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিলম্ব হয় এবং অডিট আপত্তির সংখ্যা বেড়ে যায়। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রতিটি বিভাগে এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি বিশেষায়িত ‘PFM–Procurement Support Team’ গঠন করতে হবে। এই টিমে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (CAG) থেকে প্রেষিত বিশেষজ্ঞ অর্থ ও ক্রয় কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকবেন। টিমটি মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ, হাসপাতাল ব্যবস্থাপক, সিভিল সার্জন এবং সংশ্লিষ্ট পরিচালকগণকে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত, বাজেট রিলিজ ও ব্যয়, টেন্ডার আহ্বান, দরপত্র মূল্যায়ন ও চুক্তি বাস্তবায়ন পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।

এই সহায়ক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করলে মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য বাজেট বাস্তবায়নের সক্ষমতা বাড়বে, স্বাস্থ্য পরিকল্পনার গতি ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে এবং অপ্রয়োজনীয় অডিট আপত্তি ও আর্থিক জটিলতা কমবে। একইসঙ্গে এটি স্বাস্থ্য খাতে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও অপচয় রোধে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করবে। এটি অপচয় হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং ক্রয় ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমাবে।

৫.৩৫ সরকারি হাসপাতালে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত প্রাথমিক সেবা চিকিৎসকের রেফারেল বাধ্যতামূলক করা

রেফারেল ব্যবস্থাকে কাঠামোবদ্ধ, বাধ্যতামূলক এবং কার্যকর করতে হবে। সরকারি হাসপাতালে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত প্রাথমিক সেবা চিকিৎসকের (Primary Care Provider) রেফারেলপত্র বাধ্যতামূলক করতে হবে—জরুরি চিকিৎসা ছাড়া অন্যান্য সব ক্ষেত্রে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি হাসপাতালগুলোতে কেবল প্রয়োজনীয় রোগীদের সেবা নিশ্চিত করা যাবে, স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় দক্ষতা বাড়বে, এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে।

অনেক দেশেই রেফারেল ব্যবস্থাকে স্বাস্থ্যখাতে দক্ষতা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। যুক্তরাজ্যে NHS-এর e-Referral Service এবং NHS Pathways সিস্টেমের মাধ্যমে রেফারেল ছাড়া উচ্চতর পর্যায়ের সেবা সীমিত করা হয়েছে, যার ফলে সেবার গুণগত মান উন্নত হয়েছে এবং সম্পদের অপচয় কমেছে। থাইল্যান্ডের Universal Coverage Scheme (UCS)-এ প্রাথমিক সেবা প্রদানকারীর রেফারেল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যা সিস্টেমকে আরও দক্ষ করেছে এবং স্বাস্থ্য ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। রুয়ান্ডায় ২০২০ সালে "Integrated National Health Sector Referral Guidelines" চালু করে রেফারেল ব্যবস্থাকে আনুষ্ঠানিক ও কার্যকর করা হয়েছে, যার ফলে স্বাস্থ্য বিনিয়োগে আরও বেশি রিটার্ন (value for money) নিশ্চিত হয়েছে। এসব অভিজ্ঞতা দেখায়—একটি শক্তিশালী রেফারেল ব্যবস্থা স্বাস্থ্যসেবার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং সম্পদের অপচয় কমায়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও রেফারেল ব্যবস্থার জন্য শক্তিশালী জনসমর্থন রয়েছে। বিবিএস পরিচালিত জাতীয় জনমত জরিপে ৭১ শতাংশ মানুষ মত দিয়েছেন—হাসপাতালে বিশেষায়িত সেবা গ্রহণের আগে প্রাথমিক সেবা চিকিৎসকের রেফারেল বাধ্যতামূলক করা উচিত। রেফারেল ব্যবস্থা কাঠামোবদ্ধ ও বাধ্যতামূলক করা হলে সরকারি হাসপাতালের সীমিত সম্পদ আরও দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহৃত হবে, অপ্রয়োজনীয় সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি সেবার চাপ কমবে, এবং সেবার গুণগত মান উন্নত হবে। একইসঙ্গে স্বাস্থ্য খাতে অপচয় কমবে এবং বিনিয়োগ থেকে আরও বেশি মূল্য ফেরত (value for money) পাওয়া যাবে।

৫.৩৬ স্বাস্থ্য গবেষণায় জাতীয় স্বাস্থ্য বাজেটের কমপক্ষে ২.৫% বরাদ্দ দিতে হবে—যাতে উদ্ভাবন, খরচ-সাশ্রয়িতা ও স্থানীয় সমাধান উৎসাহিত হয়

স্বাস্থ্যখাতে গবেষণা ও উদ্ভাবনের জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য বাজেটের অন্তত ২.৫% নির্ধারিতভাবে বরাদ্দ দিতে হবে। এই বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশে একটি গবেষণাভিত্তিক সংস্কৃতি (research-oriented culture) গড়ে উঠবে, যা স্বাস্থ্যের সকল শাখায় বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত, উদ্ভাবনী সমাধান এবং প্রযুক্তিনির্ভর সেবা মডেল তৈরি করতে সহায়ক হবে। এই তহবিলের মাধ্যমে স্থানীয় প্রেক্ষাপটে উপযোগী ও ব্যয়-সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা মডেল, নতুন প্রযুক্তির সম্ভাব্য ব্যবহার, চিকিৎসা পদ্ধতির ফলাফল বিশ্লেষণ, এবং ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রীর খরচ কমানোর উপায় খুঁজে বের করা সম্ভব হবে। উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা ও ক্লিনিক্যাল রিসার্চের জন্য উৎসাহ তৈরির পাশাপাশি, গবেষণার ফলাফল স্বাস্থ্য নীতিনির্ধারণ ও বাজেট পরিকল্পনায় কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যাবে।

বিশ্বের অনেক দেশেই গবেষণাভিত্তিক বিনিয়োগের ফলে স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ভারত, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো উদীয়মান অর্থনীতিগুলো স্বাস্থ্য গবেষণায় জাতীয় বাজেটের একটি বড় অংশ বরাদ্দ করে স্থানীয় উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তিনির্ভর সাশ্রয়ী সমাধান তৈরিতে সফল হয়েছে।

বাংলাদেশেও গবেষণায় এই বরাদ্দ চালু করতে হবে। এতে তরুণ গবেষকদের অংশগ্রহণ বাড়বে, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্বাস্থ্য বিষয়ক নীতি নির্ধারকদের কার্যকর সমন্বয় গড়ে উঠবে, এবং একটি তথ্য-ভিত্তিক, ব্যয়-কর্মক্ষম ও ভবিষ্যতমুখী স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি তৈরি হবে।

৫.৩৭ সুপারিশ: নারীর স্বাস্থ্যকে জাতীয় স্বাস্থ্য অর্থায়নের অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করে, বাজেটের একটি নির্দিষ্ট অংশ (অন্তত ৫%) নারীর জীবনচক্রভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবায় বরাদ্দ করতে হবে এবং একটি বিশেষ 'নারী স্বাস্থ্য তহবিল' গঠন করতে হবে।

নারীর স্বাস্থ্য শুধু একটি খাতভিত্তিক বিষয় নয়, এটি একটি মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান নিয়ামক। নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য ছাড়াও কৈশোর, গর্ভাবস্থা, প্রসবপরবর্তী এবং বার্ধক্যকালীন প্রতিটি ধাপে উপযুক্ত সেবা নিশ্চিত না হলে, স্বাস্থ্য খাতে অসমতা বাড়ে এবং দেশের সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, নারীর স্বাস্থ্যসেবায় বিনিয়োগ করলে শিশু মৃত্যুর হার কমে, পরিবারে স্বাস্থ্য আচরণে উন্নতি ঘটে এবং কর্মক্ষমতা ও আয়ক্ষমতা বাড়ে। UNFPA ও WHO-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, নারীর স্বাস্থ্য সমস্যা প্রতিরোধে বিনিয়োগ করলে প্রতিটি ডলারে ৮-৯ ডলার পর্যন্ত অর্থনৈতিক সুফল পাওয়া যায়।

বিশ্বের অনেক দেশেই নারীর স্বাস্থ্যসেবায় পৃথক তহবিল গঠন করা হয়েছে। যেমন, থাইল্যান্ডের Universal Coverage Scheme নারীর মাতৃত্বকালীন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাজেট বরাদ্দ করে। কলম্বিয়া ও রুয়ান্ডায় নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য যৌথ অর্থায়নের (co-financing) বিশেষ কাঠামো গঠন করা হয়েছে।

বাংলাদেশেও নারীর স্বাস্থ্য উন্নয়নে একটি বিশেষ 'নারী স্বাস্থ্য তহবিল' গঠন করতে হবে, যা মাতৃত্বকালীন সেবা, কিশোরী স্বাস্থ্য, মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, গাইনোকলজিক ক্যান্সার প্রতিরোধ ও বার্ধক্যকালীন স্বাস্থ্যসেবায় ব্যয় করা হবে। এই তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে এবং বাজেট পরিকল্পনায় নারীর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য-প্রমাণ ও গবেষণা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

নারীর স্বাস্থ্যকে যদি জাতীয় অর্থায়নের মূলস্রোতে আনা যায়, তাহলে শুধু স্বাস্থ্যগত বৈষম্যই কমবে না—আরও কার্যকর, সাশ্রয়ী এবং টেকসই স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে, যা নারীর মর্যাদা, অধিকার এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে একযোগে এগিয়ে নেবে। নারীর স্বাস্থ্য কেবল মাতৃত্ব বা প্রজননের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি একটি জীবনচক্রব্যাপী বাস্তবতা, যার অন্তর্ভুক্ত তিনটি প্রধান ক্ষেত্র হলো—প্রজনন ও মাতৃস্বাস্থ্য, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য (SRH), এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও সামাজিক বৈষম্যজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকি। এই তিনটি ক্ষেত্রেই নারীরা আজও নানাবিধ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন, যা শুধু চিকিৎসা-সংক্রান্ত নয়, বরং সামাজিক ও কাঠামোগতও। প্রথমত, মাতৃস্বাস্থ্যে কিছু অগ্রগতি এলেও প্রসব-পরবর্তী জটিলতা যেমন ফিস্টুলা, দীর্ঘমেয়াদি পেলভিক ব্যথা

কিংবা প্রসব-পরবর্তী বিষণ্ণতা এখনো সেবাব্যবস্থার বাইরে থেকে গেছে। এসব অবস্থায় আক্রান্ত অনেক নারী পারিবারিক অবহেলা, সামাজিক লজ্জা বা এমনকি পরিত্যক্ত হওয়ার পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। দ্বিতীয়ত, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে কিশোরীদের জন্য নিরাপদ, সম্মানজনক এবং গোপনীয় সেবা কার্যত অনুপস্থিত। কিশোরী মাতৃত্ব, অনিরাপদ গর্ভপাত, বন্ধ্যত্ব চিকিৎসা বা মেনোপজ-পরবর্তী সেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা এখনো মূলধারার সেবা কাঠামোয় ঠাঁই পায়নি। অধিকাংশ SRH সেবা বিবাহিত নারীদের জন্য পরিকল্পিত হওয়ায় তরুণী, অবিবাহিত বা প্রান্তিক নারীদের স্বাস্থ্য চাহিদা উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। তৃতীয়ত, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা—যেমন যৌন নির্যাতন, পারিবারিক সহিংসতা, বিয়ের আগ্রাসন বা অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ—নারীর মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে। অথচ বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে এই বিষয়গুলো চিহ্নিত, পরিমাপযোগ্য বা সমন্বিত সেবার আওতায় আনা হয়নি। স্বাস্থ্যকর্মীদের অনেকেই এখনও সহিংসতা-পরবর্তী যত্ন ও মনোসামাজিক সহায়তা দিতে প্রস্তুত নন। একই সঙ্গে, নারীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে বিভিন্ন কাঠামোগত বৈষম্যের কারণে—যেমন, ওষুধ ও চিকিৎসা গবেষণায় নারীদের অন্তর্ভুক্তি কম, ক্লিনিক্যাল গাইডলাইন ও ওষুধ অনুমোদন প্রক্রিয়ায় নারীদেহের জৈবিক প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় নেওয়া হয় না, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্ষদগুলোতে নারীর প্রতিনিধিত্ব অনেক কম। ফলে, নারীর স্বাস্থ্যসেবা অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষকেন্দ্রিক, অসম্পূর্ণ ও বৈষম্যমূলক থেকে যাচ্ছে। জীবনচক্রভিত্তিক সেবা কাঠামো না থাকায় শিশুকাল, কৈশোর, বার্ধক্য কিংবা মানসিক স্বাস্থ্য—এসব গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলো নারীদের জন্য একধরনের 'সেবাশূন্য পর্ব' হয়ে দাঁড়ায়।

উপরোক্ত বাস্তবতায় বাংলাদেশের স্বাস্থ্যনীতি ও বাজেট কাঠামোয় নারীর জীবনচক্রকে ঘিরে একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি জরুরি হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে নারীর স্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নয়নে বাংলাদেশকে এখনই কাঠামোগত রূপান্তরের পথে এগোতে হবে। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে একটি জাতীয় নারীস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত প্রয়োজন, যেখানে নারীস্বাস্থ্য বিষয়ে গবেষণা, জনবল উন্নয়ন, নীতিনির্ধারণ এবং সেবাপ্রদান—all-in-one—ধরনের একক কাঠামো তৈরি হবে। এটি নারীস্বাস্থ্যকে প্রজননের সীমা থেকে বের করে একটি সার্বিক স্বাস্থ্যের ধাঁচে উন্নীত করবে। এই ইনস্টিটিউটে থাকবে উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন বিশেষায়িত ইউনিট, যেমন: মাতৃত্ব ও প্রসব-পরবর্তী সেবা, প্রজনন চিকিৎসা ও বন্ধ্যত্ব ব্যবস্থাপনা, স্ত্রীরোগ বিষয়ক ক্যান্সার চিকিৎসা (Gynecological Oncology), ইউরো-গাইনোকলজি, গর্ভাবস্থার জটিলতা ও শিশুর সুরক্ষা বিষয়ক ইউনিট (Fetal-Maternal Medicine), মেনোপজ ক্লিনিক. স্তন রোগ বিষয়ক ব্রেস্ট ক্লিনিক, কিশোরীদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা কেন্দ্র. দ্বিতীয়ত, দেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহরের বড় হাসপাতালগুলোতে সমন্বিত নারীস্বাস্থ্য ইউনিট গঠন করতে হবে, যেখানে এক ছাদের নিচে মানসিক স্বাস্থ্য, দীর্ঘমেয়াদি অসংক্রামক রোগ, গর্ভকালীন ও বার্ধক্যজনিত সেবাসহ প্রজনন ও সহিংসতা-পরবর্তী সেবা নিশ্চিত করা হবে। তৃতীয়ত, নারী-বান্ধব সেবা মানদণ্ড প্রণয়ন করে তা সরকারি-বেসরকারি সব স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক করতে হবে, যার ভিত্তিতে নারীর মর্যাদা, গোপনীয়তা ও সম্মান রক্ষা নিশ্চিত হবে এবং লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে এই মানদণ্ড পর্যালোচনার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। চতুর্থত, ফিস্টুলা রোগের জন্য আলাদা স্ক্রিনিং ও সেবাব্যবস্থা চালু করে তা উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণ করতে হবে। ফিস্টুলার চিকিৎসা জেলা পর্যায় পর্যন্ত বিস্তার করতে হবে। পঞ্চমত, ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম অনুমোদনের ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক তথ্যপ্রমাণ বাধ্যতামূলক করতে হবে, যাতে নারীর শরীরভিত্তিক নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা যাচাই করা যায়। ষষ্ঠত, চিকিৎসা গাইডলাইন প্রণয়ন ও পর্যালোচনায় নারীর জৈবিক পার্থক্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং সব নীতিনির্ধারণী কমিটিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব আইনি বাধ্যবাধকতা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। সপ্তমত, স্থানীয় গবেষণা, টেলিহেলথ এবং উদ্ভাবন কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে, বিশেষ করে দুর্গম এলাকার নারীদের জন্য ডিজিটাল হেলথ সেবা প্রসারে জোর দিতে হবে। অষ্টমত, নারীস্বাস্থ্য সংক্রান্ত আলাদা তথ্যব্যবস্থা ও নজরদারি কাঠামো গড়ে তুলতে হবে, যাতে প্রজনন-বহির্ভূত অসংক্রামক রোগ, সহিংসতা, মানসিক স্বাস্থ্য বা বয়স্ক নারীদের ঝুঁকি চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। এবং নবমত, বিদ্যমান মাতৃস্বাস্থ্য কর্মসূচিগুলোর পরিধি ও মান উন্নয়ন করতে হবে, যাতে তা শুধু প্রসবকেন্দ্রিক না থেকে নারীর পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য চাহিদাকে কাভার করতে পারে এবং SDG ৩, ৫ ও ১০ অর্জনের পথে বাস্তব ভিত্তি গড়ে তোলে। এসব সুপারিশ বাস্তবায়ন হলে নারীস্বাস্থ্য আর স্বাস্থ্যখাতের একটি উপখাত নয়, বরং বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায় এবং মানবিক অগ্রগতির চালিকাশক্তি হয়ে উঠবে।

পরিচ্ছেদ ১০

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (স্বাপকম)-এর উন্নয়ন পরিকল্পনায় পদ্ধতিগত পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বর্তমানে করণীয় বিষয়য় স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশনের সুপারিশ/ পরামর্শ/ প্রস্তাবনা:

১. পাঁচ বছর ব্যাপী খাত-ভিত্তিক সেক্টর ওয়াইড পরিকল্পনা (HPNSP) পদ্ধতি পরিত্যাগ করার পক্ষে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় (স্বাপকম) যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তা থেকে উত্তরণের জন্য আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে স্বাপকম একটি ২-বছর মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর আওতায় গুটিকয়েক প্রকল্পের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের অধীনে অত্যাবশ্যকীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড চালিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

২. উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয় সাধারণত ৫-বছরব্যাপী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। তাই এই দুই বছর ব্যাপী অন্তর্বর্তীকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়য়র মধ্যেই স্বাপকম-এর পক্ষে একটি পাঁচ বছর ব্যাপী পরিকল্পনা প্রস্তুত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় যা রাষ্ট্রের নতুন বাস্তবতাকে ধারণ করবে। এই পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচির পরিকল্পনায় যে সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন সে বিষয়ে এই রূপান্তরকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালেই তার আলোচনা শুরু করা প্রাসঙ্গিক হবে।

৩. চারটি সেক্টর প্রোগ্রাম ধারাবাহিকভাবে জুলাই ১৯৯৮ থেকে জুন ২০২৪ - এর মধ্যে বাস্তবায়িত হয়। এর ফলে অর্জিত অভিজ্ঞতায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা বিষয়ে যে সমস্ত লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ এখনো পিছিয়ে আছে তা চিহ্নিত করে একটি প্রাগ্রসর ও বাস্তবমুখী দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা প্রজন। এরকম দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামোগত সংস্কারের পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত করাও বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন পরিকল্পনার দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৪. উপরে বর্ণিত বাস্তবতার আলোকে স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করার জন্য মন্ত্রণালয়ের (স্বাপকম) দৃষ্টি আকর্ষণ করছে-

(ক) প্রথমত পরিকল্পনা (প্রজেক্ট, প্রোগ্রাম) গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে তা দূর করার জন্য নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এর উদ্দেশ্য হল পরবর্তীতে সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের আলোকে গৃহীত বৃহত্তর ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপকগণ উল্লেখিত বিষয়সমূহের পরিকল্পনা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হবেন ও পারদর্শিতা অর্জন করে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবেন। এছাড়াও বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থায় আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস করা এই কর্মপরিকল্পনার অঙ্গ হতে হবে।

(খ) সংস্কার কমিশন যে প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করেছে সেগুলির বাস্তবায়নকালে বর্তমান কমিশনের সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ। তাই ২০২৬ সাল এবং তৎপরবর্তী সংস্কার বাস্তবায়নকালে কমিশনের সদস্যদের পরামর্শ, প্রস্তাবাবলীর ব্যাখ্যা প্রদান, প্রস্তাব সুস্পষ্টকরন এবং বাস্তবায়নের কাজ সুচারুরূপে সমাধা করার জন্য কমিশনের সদস্যদের বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত রাখতে হবে।

৫. অনুচ্ছেদ ৪-এ প্রস্তাবিত কার্যক্রম গ্রহণ করার সুবিধার্থে কারিগরি সহায়তা লাভ করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে দেশি ও বিদেশী সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে আহবান করা যেতে পারে। এছাড়াও মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে এই দুইটি বিষয়য় ঘনিষ্ঠ তদারকের মাধ্যমে অগ্রগতি লাভের জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক পদক্ষেপ নেয়া যুক্তিযুক্ত হবে।

FURTHER READINGS / REFERENCES

পরিচ্ছেদ ৩: স্বাস্থ্য সেবাদান ও ভৌত অবকাঠামো

FURTHER READINGS

1. Zezai, D., van Rensburg, A. J., Babatunde, G. B., Kathree, T., Cornick, R., Levitt, N., ... & Petersen, I. (2024). Barriers and facilitators for strengthening primary health systems for person-centred multimorbid care in low-income and middle-income countries: a scoping review. *BMJ open*, *14*(11), e087451.
2. De Maeseneer, J., Van Weel, C., Daeren, L., Leyns, C., Decat, P., Boeckxstaens, et al. (2012). From" patient" to" person" to" people": the need for integrated, people centered health care. *International Journal of Person Centered Medicine*, *2*(3), 601-614.
3. Zaman, S., & Rifat, M. (2024). Tuberculosis, community engagement, and person-centred care in Bangladesh: Successes and challenges. In *A Brief Social History of Tuberculosis* (pp. 60-75). Routledge.
4. Inglis, R., Leaver, M., Pell, C., Ahmad, S., Akter, S., Bhuia et al. (2024). Understanding patient and family experiences of critical care in Bangladesh and India: What are the priority actions to promote person-centred care?. *PLOS Global Public Health*, *4*(6), e0003372.
5. Mazumder, T., Rahman, A. E., Hoque, E., Al Mahmud, M., Siddique, M. A. B., Rahman, M. et al. (2018). Advancing people-centered maternal and newborn health care through birth preparedness and complication readiness in rural Bangladesh. *International Journal of Person Centered Medicine*, *7*(2), 107.
6. Hoque, M. R., Uddin, R., Khan, M. M. R., Shumi, F. R., & Sarwar, F. (2016). The Impact of Health Card On Citizens' Quality Of Life: Evidence In Bangladesh. European Scientific Journal, 12(6).
7. Touchton, M., & Wampler, B. (2014). Improving social well-being through new democratic institutions. Comparative Political Studies, 47(10), 1442-1469.
8. Wilson, L. M., Jain, M. S., & Geetha, S. Aadhar Card Based Wellbeing Records Observing Framework.
9. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=aadhaar+card%2C+healthcare%2C+well+being&btnG=#d=gs_cit&t=1736682789438&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3Armdgco0BP8J%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Den
10. John, S., Hussain, I., & Aqueel, U. (2019). Aadhaar: Another milestone for Indian public healthcare information system integration. International Journal of Research and Analytical Reviews, 6(2).
11. Leonardi, M., Lee, H., Kostanjsek, N., Fornari, A., Raggi, A., Martinuzzi, A., ... & Kraus de Camargo, O. (2022). 20 years of ICF—international classification of functioning, disability

and health: uses and applications around the world. International journal of environmental research and public health, 19(18), 11321

12. Wu, S., Wang, R., Zhao, Y., Ma, X., Wu, M., Yan, X., & He, J. (2013). The relationship between self-rated health and objective health status: a population-based study. BMC public health, 13, 1-9.
13. Rosenbaum, P., & Gorter, J. W. (2012). The ‘F‐words’ in childhood disability: I swear this is how we should think!. Childcare, health and development, 38(4), 457-463.
14. Soper, A. K., Cross, A., Rosenbaum, P., & Gorter, J. W. (2019). Exploring the international uptake of the “F‐words in childhood disability”: A citation analysis. Child: Care, Health and Development, 45(4), 473-490.
15. Tariq, Qandeel, Scott Lanyon Fleming, Jessey Nicole Schwartz, Kaitlyn Dunlap, Conor Corbin, Peter Washington, Haik Kalantarian, Naila Z. Khan, Gary L. Darmstadt, and Dennis Paul Wall. "Detecting developmental delay and autism through machine learning models using home videos of Bangladeshi children: development and validation study." Journal of medical Internet research 21, no. 4 (2019): e13822.
16. Schroeder, K., Chan, W. S., & Fahey, T. (2011). Recognizing red flags in general practice. InnovAiT.
17. Maselli, F., Palladino, M., Barbari, V., Storari, L., Rossettini, G., & Testa, M. (2022). The diagnostic value of Red Flags in thoracolumbar pain: A systematic review. Disability and Rehabilitation, 44(8), 1190-1206.
18. Perkins, A. (2018). The red flags of child abuse. Nursing made Incredibly Easy, 16(2), 34-41.
19. Heslon, K., Hanson, J. H., & Ogourtsova, T. (2024). Mental health in children with disabilities and their families: red flags, services' impact, facilitators, barriers, and proposed solutions. Frontiers in Rehabilitation Sciences, 5, 1347412.
20. Spikol, A., McAteer, D., & Murphy, J. (2019). Recognising autism: A latent transition analysis of parental reports of child autistic spectrum disorder ‘red flag’traits before and after age 3. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 54, 703-713.
21. Warren, S., & Gite, A. (2017). G302 (P) Red-flags–what do parents perceive?. Archives of Disease in Childhood, 102(Suppl 1), A118-A119.
22. De Maeseneer, J., Van Weel, C., Daeren, L., Leyns, C., Decat, P., Boeckxstaens, P., ... & Willems, S. (2012). From "patient" to "person" to "people": the need for integrated, people-centered health care. International Journal of Person Centered Medicine, 2(3), 601-614.
23. Heslon, K., Hanson, J. H., & Ogourtsova, T. (2024). Mental health in children with disabilities and their families: red flags, services' impact, facilitators, barriers, and proposed solutions. Frontiers in Rehabilitation Sciences, 5, 1347412.
24. Hoque, M. R., Uddin, R., Khan, M. M. R., Shumi, F. R., & Sarwar, F. (2016). The impact of health card on citizens' quality of life: Evidence in Bangladesh. European Scientific Journal, 12(6).

25. Inglis, R., Leaver, M., Pell, C., Ahmad, S., Akter, S., Bhuia, F. I. A., ... & Faiz, M. A. (2024). Understanding patient and family experiences of critical care in Bangladesh and India: What are the priority actions to promote person-centred care?. PLOS Global Public Health, 4(6), e0003372.

26. John, S., Hussain, I., & Aqueel, U. (2019). Aadhaar: Another milestone for Indian public healthcare information system integration. International Journal of Research and Analytical Reviews, 6(2).

27. Leonardi, M., Lee, H., Kostanjsek, N., Fornari, A., Raggi, A., Martinuzzi, A., ... & Kraus de Camargo, O. (2022). 20 years of ICF—international classification of functioning, disability and health: uses and applications around the world. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(18), 11321.

28. Maselli, F., Palladino, M., Barbari, V., Storari, L., Rossettini, G., & Testa, M. (2022). The diagnostic value of red flags in thoracolumbar pain: A systematic review. Disability and Rehabilitation, 44(8), 1190-1206.

29. Mazumder, T., Rahman, A. E., Hoque, E., Al Mahmud, M., Siddique, M. A. B., Rahman, M. M., ... & Perkins, J. (2018). Advancing people-centered maternal and newborn health care through birth preparedness and complication readiness in rural Bangladesh. International Journal of Person Centered Medicine, 7(2), 107.

30. Perkins, A. (2018). The red flags of child abuse. Nursing made Incredibly Easy, 16(2), 34-41.

31. Rosenbaum, P., & Gorter, J. W. (2012). The ‘F-words’ in childhood disability: I swear this is how we should think! Child: Care, Health and Development, 38(4), 457-463.

32. Schroeder, K., Chan, W. S., & Fahey, T. (2011). Recognizing red flags in general practice. InnovAiT.

33. Soper, A. K., Cross, A., Rosenbaum, P., & Gorter, J. W. (2019). Exploring the international uptake of the “F-words in childhood disability”: A citation analysis. Child: Care, Health and Development, 45(4), 473-490.

34. Spikol, A., McAteer, D., & Murphy, J. (2019). Recognising autism: A latent transition analysis of parental reports of child autistic spectrum disorder ‘red flag’ traits before and after age 3. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 54, 703-713.

35. Tariq, Q., Scott Lanyon Fleming, Jessey Nicole Schwartz, Kaitlyn Dunlap, Conor Corbin, Peter Washington, Haik Kalantarian, Naila Z. Khan, Gary L. Darmstadt, and Dennis Paul Wall. (2019). Detecting developmental delay and autism through machine learning models using home videos of Bangladeshi children: development and validation study. Journal of Medical Internet Research, 21(4), e13822.

36. Touchton, M., & Wampler, B. (2014). Improving social well-being through new democratic institutions. Comparative Political Studies, 47(10), 1442-1469.

37. Warren, S., & Gite, A. (2017). G302 (P) Red-flags–what do parents perceive?. Archives of Disease in Childhood, 102(Suppl 1), A118-A119.

38. Wilson, L. M., Jain, M. S., & Geetha, S. Aadhaar Card Based Wellbeing Records Observing Framework.

39. Wu, S., Wang, R., Zhao, Y., Ma, X., Wu, M., Yan, X., & He, J. (2013). The relationship between self-rated health and objective health status: a population-based study. BMC Public Health, 13, 1-9.

40. Zaman, S., & Rifat, M. (2024). Tuberculosis, community engagement, and person-centred care in Bangladesh: Successes and challenges. In A Brief Social History of Tuberculosis (pp. 60-75). Routledge.

41. Zezai, D., van Rensburg, A. J., Babatunde, G. B., Kathree, T., Cornick, R., Levitt, N., ... & Petersen, I. (2024). Barriers and facilitators for strengthening primary health systems for person-centred multimorbid care in low-income and middle-income countries: a scoping review. BMJ Open, 14(11), e087451.

42. Bradford, B. F., Wilson, A. N., Portela, A., McConville, F., Fernandez Turienzo, C., & Homer, C. S. E. (2022). Midwifery continuity of care: A scoping review of where, how, by whom and for whom? PLOS Global Public Health, 2(10), e0000935. https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000935

43. Crowther, C. A., McKinlay, C. J., Middleton, P., & Harding, J. E. (2015). Repeat doses of prenatal corticosteroids for women at risk of preterm birth for improving neonatal health outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2015(7).

44. El Arifeen, S., Mullany, L. C., Shah, R., Mannan, I., Rahman, S. M., Talukder, M. R., Begum, N., Al-Kabir, A., Darmstadt, G. L., Santosham, M., & Black, R. E. (2012). The effect of cord cleansing with chlorhexidine on neonatal mortality in rural Bangladesh: a community-based, cluster-randomised trial. The Lancet, 379(9820), 1022-1028.

45. Gamberini, C., Angeli, F., & Ambrosino, E. (2022). Exploring solutions to improve antenatal care in resource-limited settings: an expert consultation. BMC Pregnancy and Childbirth, 22, 449. https://doi.org/10.1186/s12884-022-04778-w

46. Lawn, J. E., Bhutta, Z. A., Ezeaka, C., & Saugstad, O. (2023). Ending preventable neonatal deaths: Multicountry evidence to inform accelerated progress to the Sustainable Development Goal by 2030. Neonatology, 120(4), 491-499. https://doi.org/10.1159/000530496

47. Moller, A. B., Petzold, M., Chou, D., & Say, L. (2017). Early antenatal care visit: a systematic analysis of regional and global levels and trends of coverage from 1990 to 2013. The Lancet Global Health, 5(10), e977-e983.

48. National Institute of Population Research and Training (NIPORT) and ICF. (2023). Bangladesh Demographic and Health Survey 2022: Key Indicators Report. Dhaka, Bangladesh, and Rockville, Maryland, USA: NIPORT and ICF.

49. Pervin, J., Gustafsson, F. E., Moran, A. C., Roy, S., Persson, L. Å., & Rahman, A. (2015). Implementing kangaroo mother care in a resource-limited setting in rural Bangladesh. Acta Paediatrica, 104(5), 458-465.

50. Rahman, A., Moran, A., Pervin, J., Rahman, A., Rahman, M., Yeasmin, S., Begum, H., Rashid, H., Yunus, M., Hruschka, D., Arifeen, S. E., Streatfield, P. K., Sibley, L., Bhuiya, A.,

& Koblinsky, M. (2011). Effectiveness of an integrated approach to reduce perinatal mortality: recent experiences from Matlab, Bangladesh. BMC Public Health, 11, 914. https://doi.org/10.1186/1471-2458-11-914

51. United Nations Population Fund. (2019). Maternal and Perinatal Death Surveillance and Response (MPDSR) in Bangladesh: Progress and Highlights in 2019. Dhaka: Government of the People's Republic of Bangladesh.

52. World Health Organization. (2014). WHO recommendations on postnatal care of the mother and newborn. Geneva: WHO.

53. World Health Organization. (2016). WHO Recommendation on Antenatal Care for Positive Pregnancy Experience. Geneva: WHO.

54. https://www.exemplars.health/topics/under-five-mortality/bangladesh/challenges

55. Hossain, A. T., et al. (2022). Measuring coverage and quality of supportive care for inpatient neonatal infections: EN-BIRTH multi-country validation study. Journal of Global Health, 12.

56. Hossain, A. T., et al. (2024). Effective multi-sectoral approach for rapid reduction in maternal and neonatal mortality: the exceptional case of Bangladesh. BMJ Global Health, 9(Suppl 2), e011407.

57. Kuruvilla, S., et al. (2014). Success factors for reducing maternal and child mortality. Bulletin of the World Health Organization, 92, 533-544.

58. National Institute of Population Research and Training (NIPORT) and ICF. (2020). Bangladesh Demographic and Health Survey 2017-18: Final Report. Dhaka, Bangladesh, and Rockville, Maryland, USA: NIPORT and ICF.

59. National Institute of Population Research and Training (NIPORT) and ICF. (2024). Bangladesh Demographic and Health Survey 2022 (Secondary Analysis).

60. National Institute of Population Research and Training (NIPORT) and ICF. (2024). Bangladesh Demographic and Health Survey 2022: Final Report. Dhaka, Bangladesh, and Rockville, Maryland, USA: NIPORT and ICF.

61. Newnham, J. P., et al. (2014). Strategies to prevent preterm birth. Frontiers in Immunology, 5, 584.

62. Perin, J., et al. (2022). Global, regional, and national causes of under-5 mortality in 2000–19: an updated systematic analysis with implications for the Sustainable Development Goals. The Lancet Child & Adolescent Health, 6(2), 106-115.

63. Rahman, A. E., et al. (2021). Antibiotic use for inpatient newborn care with suspected infection: EN-BIRTH multi-country validation study. BMC Pregnancy and Childbirth, 21, 1-17.

64. Rahman, A. E., et al. (2021). Child mortality in Bangladesh–why, when, where and how? A national survey-based analysis. Journal of Global Health, 11.

65. World Health Organization. (2013). Pocket book of hospital care for children: guidelines for the management of common childhood illnesses. Geneva: WHO.

66. World Health Organization. (2014). Every newborn: an action plan to end preventable deaths. Geneva: WHO.

67. Anwar, Syeda. Data from PICU Dhaka Medical College Hospital (data provided by Prof Syeda Anwar, previous HOD Pediatrics, DMC).

68. Heath, B. W., Coffey, J. S., Malone, P., & Courtney, J. (2000). Pediatric office emergencies and emergency preparedness in a small rural state. Pediatrics, 106(6), 1391-1396. https://doi.org/10.1542/peds.106.6.1391

69. Kabir, Farhat Lamisa. Data from PICU, Bangladesh Shishu Hospital and Institute (data provided by Dr Farhat Lamisa Kabir, Registrar, PICU).

70. Mehra, Bharat, & Gupta, Suresh. (2018). Common pediatric medical emergencies in office practice. Indian Journal of Pediatrics, 85(1), 35-43. https://doi.org/10.1007/s12098-017-2370-9

71. Santillanes, Genevieve, Gausche-Hill, M., & Sosa, B. (2006). Preparedness of selected pediatric offices to respond to critical emergencies in children. Pediatric Emergency Care, 22(11), 694-698. https://doi.org/10.1097/01.pec.0000238744.73735.0e

72. Children's Hospital of Philadelphia. (2021, October 24). Intimate partner violence: Lifelong harm in children. Retrieved from https://www.chop.edu/news/health-tip/intimate-partner-violence-life-long-harm-children.

73. Ferdousy, E. Z., & Matin, M. A. (2015). Association between intimate partner violence and child morbidity in South Asia. Journal of Health, Population and Nutrition, 33, 1-7.

74. Hamadani, J. D., Huda, S. N., Khatun, F., & Grantham-McGregor, S. M. (2006). Psychosocial stimulation improves the development of undernourished children in rural Bangladesh. The Journal of Nutrition, 136(10), 2645-2652.

75. Hamadani, J. D., Mehrin, S. F., Tofail, F., Hasan, M. I., Huda, S. N., Baker-Henningham, H., Ridout, D. A., & Grantham-McGregor, S. M. (2019). Integrating an early childhood development programme into the Bangladeshi Primary Health Care Services: A cluster randomised trial. The Lancet Global Health, 7(2), e366-e375. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30535-7

76. Hossain, S. J., Rahman, S. M., Fisher, J., Rahman, A., Tofail, F., & Hamadani, J. D. (2024). Effect of a parenting and nutrition education programme on development and growth of children using a social safety-net platform in urban Bangladesh: A cluster randomized controlled trial. The Lancet Regional Health-Southeast Asia, 25, 100388.

77. Islam, M. J., Rahman, M., Broidy, L., Haque, S. E., Saw, Y. M., Duc, N. H. C., Haque, M. N., Rahman, M. M., Islam, M. R., & Mostofa, M. G. (2017). Assessing the link between witnessing inter-parental violence and the perpetration of intimate partner violence in Bangladesh. BMC Public Health, 17, 1-10.

78. Mehrin, S. F., Hasan, M. I., Tofail, F., Shiraji, S., Ridout, D., Grantham-McGregor, S., Hamadani, J. D., & Baker-Henningham, H. (2022). Integrating a group-based, early childhood parenting intervention into primary health care services in rural Bangladesh: A

cluster-randomised controlled trial. Frontiers in Pediatrics. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1393282/v1

79. Miah, M. A. A., Chandna, J., Gurung, R., Masoud, N. S., Paul, P., Ameen, S., Basnet, O., Miraji, M., Tann, C., Mili, I. A., Hossain, A. K. M. T., Chowdhury, A. I., Alam, A., Milner, K. M., Arifeen, S. E., Kc, A., Manji, K., Lynch, P., Lawn, J. E., & Hamadani, J. D.; E. N.-REACH collaborative group. (2024). Correction: Every Newborn-Reach Up Early Education Intervention for All Children (EN-REACH) - a parent group intervention for school readiness in Bangladesh, Nepal, and Tanzania: study protocol for a cluster randomized controlled trial. Trials, 25(1), 602. https://doi.org/10.1186/s13063-024-08445-7

80. Naved, R. T., Antu, J. F., Parvin, K., & Ziaei, S. (2023). Multi-level analysis of the determinants of physical domestic violence against children using longitudinal data from MINIMat mother–child cohort in Bangladesh. Frontiers in Public Health, 11, 1185130.

81. Naved, R. T., Samuels, F., Le Masson, V., Talukder, A., Gupta, T., & Yount, K. M. (2017). Understanding intimate partner violence in rural Bangladesh. London: Overseas Development Institute (ODI).

82. Pasricha, S. R., Hasan, M. I., Braat, S., Larson, L. M., Tipu, S. M. M., Hossain, S. J., Shiraji, S., Baldi, A., Bhuiyan, M. S. A., Tofail, F., Fisher, J., Grantham-McGregor, S., Simpson, J. A., Hamadani, J. D., & Biggs, B. A. (2021). Benefits and risks of iron interventions in infants in rural Bangladesh. The New England Journal of Medicine, 385(11), 982-995. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2034187

83. Tofail, F., Hamadani, J. D., Ahmed, A. Z., Mehrin, F., Hakim, M., & Huda, S. N. (2012). The mental development and behavior of low-birth-weight Bangladeshi infants from an urban low-income community. European Journal of Clinical Nutrition, 66(2), 237-243. https://doi.org/10.1038/ejcn.2011.165

84. Tofail, F., Islam, M., Akter, F., Zonji, S., Roy, B., Hossain, S. J., Horaira, A., Akter, S., Goswami, D., Brooks, A., & Hamadani, J. (2023). An integrated mother-child intervention on child development and maternal mental health. Pediatrics, 151(Suppl 2), e2023060221G. https://doi.org/10.1542/peds.2023-060221G

85. Islam F, Parveen M, Parvin R, Khan NZ et al. Child psychiatric disorders presenting to a tertiary multidisciplinary child development service in Bangladesh. Bang J Ch Health. 2011; 35 (3): 84-89. Link

86. National Mental Health policy, 2022

87. National Mental Health Strategic Plan 2022-2030

88. National Mental Health Survey Report, 2019

89. Proposed Operational Plan for Mental Health, 2025

90. Amaral, D. G., Anderson, G. M., Bailey, A., Bernier, R., Bishop, S., Blatt, G., Canal-Bedia, R., Charman, T., Dawson, G., de Vries, P. J., Dicicco-Bloom, E., Dissanayake, C., Kamio, Y., Kana, R., Khan, N. Z., Knoll, A., Kooy, F., Lainhart, J., Levitt, P., ... Whitehouse, A. (2019). Gaps in Current Autism Research: The Thoughts of the Autism Research Editorial Board and Associate Editors. Autism Research, 12(5), 700-714. Link

91. Darmstadt, G. L., Khan, N. Z., Lombardi, J., and Richter, L. M. (2018). Scaling up early childhood development programmes in low and middle-income countries. Child: Care, Health and Development, 44: 1–3. Link

92. Khan, N. Z., Sultana, R., Ahmed, F., Shilpi, A. B., Sultana, N., Darmstadt, G. L. (2018). Scaling up child development centres in Bangladesh. Child: Care, Health and Development, 44: 19–30. Link

93. Khan, N. Z., Muslima, H., Begum, N., Begum, N., Shilpi, A. S., Batra, M., Darmstadt, G. D. (2010). Validation of Rapid Neurodevelopmental Assessment Instrument for under-Two-Year-Old Children in Bangladesh. Pediatrics, 125(4): e755-62. Link

94. Khan, N. Z., Muslima, H., El Arifeen, S., McConachie, H., Shilpi, A. B., Ferdous, S., Darmstadt, G. L. (2014). Validation of a Rapid Neurodevelopmental Assessment Tool for 5 to 9 Year-Old Children in Bangladesh. J Pediatrics. Link

95. Khan, N. Z., Muslima, H., McConachie et al. (2012). Validation of a home-based neurodevelopmental screening tool for under 2-year-old children in Bangladesh. Child: Care, Health and Development. Link

96. Khan, N. Z., Muslima, H., Shilpi, A. B., Begum, D., Parveen, M., Akter, N., Ferdous, S., Nahar, K., McConachie, H., Darmstadt, G. L. (2013). Validation of Rapid Neurodevelopmental Assessment for 2-to 5-Year-Old Children in Bangladesh. Pediatrics, 131(2). Link

97. Muslima, H., Khan, N. Z., Shilpi, A. B., Monowara, P., Begum, D., et al. (2016). Validation of a Rapid Neurodevelopmental Assessment tool for 10-16 year olds in Bangladesh. Child: Care, Health and Development. Link

98. Nasrin, Sultana, Asma Begum Shilpi, Dilara Begum, Naila Z. Khan. (2022). Developmental Therapy – A Generic Professional Expertise within Child Development Centers in Bangladesh. Malaysian Journal of Medical and Biological Research, Vol 9: 1. Link

99. Naila Zaman Khan and Makhduma Nargis (editors). (2013). A Survey of Autism and Neurodevelopmental Disorders in Bangladesh. Ministry of Health and Family Welfare, Government of Bangladesh. Link

100. Costopoulos, E., Imamura, A., Khan, N., Butler, A., Millett, C., Hoque, M., et al. Adverse health outcomes associated with drinking high-salinity water. Unpublished material.

101. Hoque, M.A., Scheelbeek, P.F.D., Vineis, P., et al. (2016). Drinking water vulnerability to climate change and alternatives for adaptation in coastal South and South East Asia. Climatic Change, 136, 247–263. Link

102. Khan, A.E., Ireson, A., Kovats, S., Mojumder, S.K., Khusru, A., Rahman, A., et al. (2011). Drinking Water Salinity and Maternal Health in Coastal Bangladesh: Implications of Climate Change. Environmental Health Perspectives, 119(9): 1328–1332. Link

103. Khan, A.E., Scheelbeek, P.F.D., Shilpi, A.B., Chan, Q., Mojumder, S.K., Rahman, A., et al. (2014). Salinity in Drinking Water and the Risk of (Pre)Eclampsia and Gestational Hypertension in Coastal Bangladesh: A Case-Control Study. PloS One, 9(9): e108715.

104. Khan, N.Z., Muslima, H., Shilpi, A.B., Majumder, S.K., Khan, A.E. (2016). Neurodevelopmental Outcomes in Children Born to Climate Refugee Mothers in Bangladesh: Experiences from Cyclone Aila. Mymensingh Medical Journal, 25(4): 746-750. Link

105. Rahman, M.S., Hossain, K.M., van Loenhout, J., Wallemacq, P., Guha-Sapir, D. (2023). Effects of Salinity on Health due to Environmental Exposure. Coastal Disaster Risk Management in Bangladesh. 1st ed. Routledge; pp. 15-43.

106. Scheelbeek, P., Khan, A., Mojumder, S., Elliott, P., Vineis, P. (2016). Drinking Water Sodium and Elevated Blood Pressure of Healthy Pregnant Women in Salinity-Affected Coastal Areas. Hypertension (Dallas, Tex. 1979), 68(2): 464-470. Link

107. Shammi, M., Rahman, M.M., Bondad, S.E., Bodrud-Doza, M. (2019). Impacts of Salinity Intrusion in Community Health: A Review of Experiences on Drinking Water Sodium from Coastal Areas of Bangladesh. Healthcare (Basel), 7(1): 50. Link

108. Tsai, C., Hoque, M.A., Vineis, P., Ahmed, K.M., Butler, A.P. (2024). Salinisation of drinking water ponds and groundwater in coastal Bangladesh linked to tropical cyclones. Scientific Reports, 14(1): 5211. Link

109. Ara G, Sanin KI, Khanam M, Sarker MSA, Tofail F, Nahar B, Chowdhury IA, Boitchi AB, Gibson S, Afsana K, Askari S, Ahmed T. A comprehensive intervention package improves the linear growth of children under 2-years-old in rural Bangladesh: a community-based cluster randomized controlled trial. Sci Rep 2022;12(1):21962. doi: 10.1038/s41598-022-26269-w.

110. Choudhury N, Siddiqua TJ, Ahmed SMT, Haque MA, Ali M, Farzana FD, Naz F, Rahman SS, Faruque ASG, Rahman S, Ahmed T. Iron content of drinking water is associated with anaemia status among children in high groundwater iron areas in Bangladesh. Trop Med Int Health 2022 Feb;27(2):149-57. doi: 10.1111/tmi.13710.

111. Das S, Fahim SM, Rasul MG, Afrin S, Alam MA, Uz Zaman M, Chowdhury M, Arifeen SE, Ahmed T. Nutritional and dietary diversity status of under-5 children and adolescent girls among forcibly displaced Myanmar nationals living in Bhasan Char relocation camp, Bangladesh: a cross-sectional survey. BMJ Open 2023 Mar 29;13(3):e068875. doi: 10.1136/bmjopen-2022-068875.

112. Fahim SM, Das S, Rasul MG, Zaman MU, Alam MA, Afrin S, Saqeeb KN, Hasan MM, Alam AFMM, Chowdhury M, Ahmed T. Nutritional status and dietary diversity of pregnant and nonpregnant reproductive-age Rohingya women. Food Sci Nutr 2023 Jun 15. doi: 10.1002/fsn3.3508.

113. Haque MA, Choudhury N, Wahid BZ, Ahmed ST, Farzana FD, Ali M, Naz F, Siddiqua TJ, Rahman SS, Faruque ASG, Ahmed T. A predictive modelling approach to illustrate factors correlating with stunting among children aged 12-23 months: a cluster randomised pre-post study. BMJ Open 2023 Apr 26;13(4):e067961. doi: 10.1136/bmjopen-2022-067961.

114. Haque MA, Wahid BZ, Farzana FD, Ahmed SMT, Ali M, Naz F, Rahman SS, Siddiqua TJ, Faruque ASG, Choudhury N, Ahmed T. Influence of the Suchana intervention on exclusive breastfeeding and stunting among children aged under 6 months in the Sylhet region of Bangladesh. Matern Child Nutr 2023 May 27:e13535. doi: 10.1111/mcn.13535.

115. Hossain MS, Begum S, Rahman MM, Parvez M, Mazumder RN, Sarker SA, Hasan MM, Fahim SM, Gazi MA, Das S, Mahfuz M, Ahmed T. Environmental enteric dysfunction and small intestinal histomorphology of stunted children in Bangladesh. PLoS Negl Trop Dis 2023;17(1):e0010472. doi: 10.1371/journal.pntd.0010472.

116. Islam MR, Nuzhat S, Alam J, Huq S, Chisti MJ, Ahmed T. Inpatient morbidity and mortality of severely underweight children was comparable to that of severely wasted children in Dhaka, Bangladesh. Am J Trop Med Hyg 2023 Aug 14:tpmd230137. doi: 10.4269/ajtmh.23-0137.

117. Nyma Z, Rahman M, Das S, Alam MA, Haque E, Ahmed T. Dietary diversity modification through school-based nutrition education among Bangladeshi adolescent girls: a cluster randomized controlled trial. PLoS One 2023 Mar 8;18(3):e0282407. doi: 10.1371/journal.pone.0282407.

118. Rasul MG, Hasan M, Hossain D, Haseen F, Das S, Ahmed T. Qualitative assessment of programmatic constraints in delivery of effective interventions for improving maternal nutrition in Bangladesh. BMJ Nutr Prev Health 2023 Feb 15:e000395. doi: 10.1136/bmjnph-2021-000395.

119. Tariqujjaman M, Rahman M, Wangdi K, Karmakar G, Ahmed T, Sarma H. Geographical variations of food insecurity and its associated factors in Bangladesh: Evidence from pooled data of seven cross-sectional surveys. PLoS One 2023;18(1):e0280157. doi: 10.1371/journal.pone.0280157.

120. Akhter, S., Hussain, A. E., Shefa, J., Kundu, G. K., Rahman, F., & Biswas, A. (2018). Prevalence of Autism Spectrum Disorder (ASD) among the children aged 18-36 months in a rural community of Bangladesh: A cross-sectional study. F1000Research, 7, 424. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6039957/pdf/f1000research-7-14732.pdf

121. Banu, L. A. M., Akhter, S., Fatema, K., Alam, S. T., & Haque, F. A. (2022). Prediction of Neurodevelopmental Outcome of High-Risk Neonates: A study from a Tertiary Care Centre in Bangladesh. Malaysian Journal of Paediatrics and Child Health, 28(1), 51-58. file:///C:/Users/Naila%20Khan/Downloads/mpajournaladmin,+ID503_ORT_FINAL_51-58-1.pdf

122. Bangladesh Bureau of Statistics. (2022). Report on National Survey on Persons with Disabilities (NSPD) 2021. Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning.

123. Bornstein, M. H., & Rothenberg, W. A. (2022). The UNICEF Multiple Indicator Cluster Surveys and early childhood development index: Parenting, national development, and early childhood development in 51 low-and middle-income countries. In Parenting and child development in low-and middle-income countries (pp. 240-275). Routledge.

124. Campbell, T., Shanley, D. C., Page, M., McDonald, T., Zimmer-Gembeck, M., Hess, M., ... & Hawkins, E. (2024). Psychometric properties of the Rapid Neurodevelopmental Assessment in detecting social-emotional problems during routine child developmental monitoring in primary healthcare. https://assets-eu.researchsquare.com/files/rs-4652892/v1/0010fbec-ba2d-4d4b-940c-f540fb1a8abe.pdf?c=1721897586

125. Durkin M, Davidson L, Hasan M, Khan N, Thorburn M, Zaman S. (1990). Screening for childhood disability in community settings. In Marfo K and Thorburn M (eds) Early Intervention and Community-Based Rehabilitation in Developing Countries. St. John's Newfoundland: SEREDEl, pp. 179-197.

126. Durkin M, Zaman S, Thorburn M, Hasan M, Shrout P, Davidson L, Stein Z. (1991). Screening for childhood disability in less developed countries: rationale and study design. International Journal of Mental Health, 20(2):47-60.

127. Durkin MS, Davidson LL, Desai P, Hasan ZM, Khan NZ, Thorburn MJ, Shrout PE, Wang W. (1994). Validity of the ten questions screen for childhood disability: results from population-based studies in Bangladesh, Jamaica, and Pakistan. Epidemiology, 5:283-289.

128. Durkin MS, Wang W, Shrout PE, Zaman SS, Hasan ZM, Desai P, Davidson, LL. (1995). Evaluating a Ten Questions screen for childhood disability: reliability and internal structure in different cultures. Journal of Clinical Epidemiology, 48(5):657-66.

129. Ferdous, S., Chowdhury, M. S., & Hossain, R. (2015). Exploring the Vulnerability of Sexual Abuse among the Children with Disabilities in Bangladesh. Institutionalised Children Explorations and Beyond, 2(1), 15-26. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2349301120150103

130. Fischer, V. J., Morris, J., & Martines, J. (2014). Developmental screening tools: feasibility of use at primary healthcare level in low-and middle-income settings. Journal of Health, Population, and Nutrition, 32(2), 314.

131. Gottlieb, C. A., Maenner, M. J., Cappa, C., & Durkin, M. S. (2009). Child disability screening, nutrition, and early learning in 18 countries with low and middle incomes: data from the third round of UNICEF's Multiple Indicator Cluster Survey (2005–06). The Lancet, 374(9704), 1831-1839.

132. Hasan, S. H., Rashid, R., Samad, R., Karim, M. R., Faiz, M. A., Rahman, M. R., ... & Gomes, M. (2023). A study to validate the Ten-Question-Questionnaire+ for the detection of moderate to severe neurological disabilities in older Bangladeshi children. Disability and Rehabilitation, 45(12), 2031-2037.

133. Hoq, T., Chowdhury, P. K., Barua, S. K., Hasan, S. H., Biswas, S., Datta, M., & Ahmed, F. U. (2021). Assessment of Neurodevelopmental Status and Risk Factors for Adverse Neurodevelopmental Outcome in Late Preterm Infants at 6 Months Corrected Age: A Prospective Observational Study. Journal of Chittagong Medical College Teachers' Association, 32(2), 70-74. file:///C:/Users/Naila%20Khan/Downloads/70-74-1.pdf

134. Khan, N. Z., Muslima, H., McConachie, H., et al. (2012). Validation of a home-based neurodevelopmental screening tool for under 2-year-old children in Bangladesh. Child: Care Health Dev., 2012 Jun 8. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2214.2012.01393.x

135. Khan, N. Z., Muslima, H., Begum, N., Begum, N., Shilpi, A. S., Batra, M., Darmstadt, G. D. (2010). Validation of Rapid Neurodevelopmental Assessment Instrument for under-Two-Year-Old Children in Bangladesh. Pediatrics, 125(4):e755-62. Epub 2010 Mar 22.

https://publications.aap.org/pediatrics/article-abstract/125/4/e755/73180/Validation-of-Rapid-Neurodevelopmental-Assessment

136. Khan, N. Z., Muslima, H., Shilpi, A. B., Begum, D., Parveen, M., Akter, N., Ferdous, S., Nahar, K., McConachie, H., Darmstadt, G. L. (2013). Validation of Rapid Neurodevelopmental Assessment for 2-to 5-Year-Old Children in Bangladesh. Pediatrics, 131(2), e486-93. https://publications.aap.org/pediatrics/article-abstract/131/2/e486/31859/Validation-of-Rapid-Neurodevelopmental-Assessment

137. Khan, N. Z., Muslima, H., El Arifeen, S., McConachie, H., Shilpi, A. B., Ferdous, S., Darmstadt, G. L. (2014). Validation of a Rapid Neurodevelopmental Assessment Tool for 5 to 9 Year-Old Children in Bangladesh. J Pediatrics. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022347613015837

138. Khan, N. Z., Sultana, R., Ahmed, F., Shilpi, A. B., Sultana, N., Darmstadt, G. L. (2018). Scaling up child development centres in Bangladesh. Child: Care, Health and Development, 44, 19–30. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29235172/

139. Khan NZ, Lynch MA. (1997). Recognizing Child Maltreatment in Bangladesh. Child Abuse and Neglect, 21(8), 815-818. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9280385/

140. Khan NZ, Muslima H (editors). (2020). Training Manual for the Establishment of Child Development and Disability Services in Bangladesh. Clinical Neurosciences Center, Bangladesh Protibondhi Foundation. ISBN Volume I (Modules 1, 2, 3): 978-984-34-9327-9; ISBN Volume II (Module 4, 5, 6): 978-984-34-9329-6. https://www.bpfbd.org/wp-content/uploads/2021/03/e-Manual.pdf

141. Komanchuk, J., Cameron, J. L., Kurbatfinski, S., Duffett-Leger, L., & Letourneau, N. (2023). A realist review of digitally delivered child development assessment and screening tools: Psychometrics and considerations for future use. Early Human Development, 183, 105818. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378378223001147

142. Lipkin, P. H., Macias, M. M., Norwood, K. W., Brei, T. J., Davidson, L. F., Davis, B. E., ... & Voigt, R. G. (2020). Promoting optimal development: identifying infants and young children with developmental disorders through developmental surveillance and screening. Pediatrics, 145(1). https://www.helpmegrowshasta.com/wp-content/uploads/2023/04/peds_20193449.pdf

143. McConachie H, Huq S, Munir S, Ferdous S, Zaman S, Khan NZ. (2000). A randomised controlled trial of alternative modes of service provision to young children with cerebral palsy in Bangladesh. J of Pediatrics, 137(6):769-776, December 2000. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11113832/

144. Milaat WA, Ghabrah TM, Al-bar HMS, Abalkhail BA, Kordy MN. (2001). Population-based survey of childhood disability in eastern Jeddah using the Ten Questions tool. Disability and Rehabilitation, 23(5), 199-203.

145. Mondal, M. N. I., Ferdous, S., Islam, M. Z., Hossain, M. S., Shahiduzzaman, M., & Choudhary, M. S. R. (2014). Childhood disabilities and child protection in Rajshahi City, Bangladesh. Bangladesh e-Journal of Sociology, 11(1), 89. https://www.researchgate.net/profile/Md-Hossain-

279/publication/374919264_Childhood_Disabilities_and_Child_Protection_in_Rajshahi_City_Bangladesh/links/653681e25d51a8012b6789bf/Childhood-Disabilities-and-Child-Protection-in-Rajshahi-City-Bangladesh.pdf

146. Muslima H, Khan NZ, Shilpi AB, Monowara P, Begum D, et al. (2016). Validation of a Rapid Neurodevelopmental Assessment tool for 10-16 year olds in Bangladesh. Child Care Health and Development. 30 June 2016. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cch.12362

147. Qandeel Tariq, Scott Lanyon Fleming, Jessey Nicole Schwartz, Naila Z Khan, et al. (2019). Detecting Developmental Delay and Autism Through Machine Learning Models Using Home Videos of Bangladeshi Children: Development and Validation Study. Journal of Medical Internet Research, 21(4). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31017583/

148. Saha, S. R., & Khan, M. M. H. (2021). Risk factors for early childhood disability in Bangladesh: Evidence from Multiple Indicator Cluster Survey 2019. PLoS One, 16(11), e0259532. file:///C:/Users/Naila%20Khan/Downloads/journal.pone.0259532-4.pdf

149. Sabanathan, Saraswathy, Bridget Wills, and Melissa Gladstone. (2015). Child development assessment tools in low-income and middle-income countries: how can we use them more appropriately? Archives of Disease in Childhood, 100(5), 482-488. https://adc.bmj.com/content/archdischild/100/5/482.full.pdf

150. Thompson, L., Peñaloza, R. A., Stormfields, K., Kooistra, R., Valencia-Moscoso, G., Muslima, H., & Khan, N. Z. (2015). Validation and adaptation of rapid neurodevelopmental assessment instrument for infants in Guatemala. Child: Care, Health and Development, 41(6), 1131-1139. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4715612/pdf/nihms715808.pdf

151. World Health Organization. (2001). International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Geneva: WHO. Available at: https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health

152. Hoque, M.A., Scheelbeek, P.F.D., Vineis, P. et al. Drinking water vulnerability to climate change and alternatives for adaptation in coastal South and South East Asia. Climatic Change 136, 247–263 (2016). https://doi.org/10.1007/s10584-016-1617-1

153. Tsai C, Hoque MA, Vineis P, Ahmed KM, Butler AP. Salinisation of drinking water ponds and groundwater in coastal Bangladesh linked to tropical cyclones. Scientific reports. 2024; 14 (1): 5211. 10.1038/s41598-024-54446-6.

154. Khan AE, Ireson A, Kovats S, Mojumder SK, Khusru A, Rahman A, et al. Drinking Water Salinity and Maternal Health in Coastal Bangladesh: Implications of Climate Change. Environmental health perspectives. 2011; 119 (9): 1328–1332. 10.1289/ehp.1002804.

155. Khan, N.Z., Muslima, H., Shilpi, A.B., Majumder, S.K., Khan, A.E. Neurodevelopmental Outcomes in Children Born to Climate Refugee Mothers in Bangladesh: Experiences from Cyclone Aila. October 2016. Mymensingh Medical Journal 25(4):746-750

156. Scheelbeek P, Khan A, Mojumder S, Elliott P, Vineis P. Drinking Water Sodium and Elevated Blood Pressure of Healthy Pregnant Women in Salinity-Affected Coastal Areas.

Hypertension (Dallas, Tex. 1979). 2016; 68 (2): 464-470. 10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.07743.

157. Shammi M, Rahman MM, Bondad SE, Bodrud-Doza M. Impacts of Salinity Intrusion in Community Health: A Review of Experiences on Drinking Water Sodium from Coastal Areas of Bangladesh. Healthcare (Basel). 2019; 7 (1): 50. 10.3390/healthcare7010050.

158. Rahman MS, Hossain KM, van Loenhout J, Wallemacq P, Guha-Sapir D. Effects of Salinity on Health due to Environmental Exposure. Coastal Disaster Risk Management in Bangladesh. 1st ed. Routledge; 2023. pp. 15-43.

159. Khan AE, Scheelbeek PFD, Shilpi AB, Chan Q, Mojumder SK, Rahman A, et al. Salinity in Drinking Water and the Risk of (Pre)Eclampsia and Gestational Hypertension in Coastal Bangladesh: A Case-Control Study. PloS one. 2014; 9 (9): e108715.

160. Costopoulos E, Imamura A, Khan N, Butler A, Millett C, Hoque M, et al. Adverse health outcomes associated with drinking high-salinity water. Unpublished material.

পরিচ্ছেদ ৪: নেতৃত্ব, সুশাসন ও কর্মসংস্কৃতি

FURTHER READINGS

1. Ahmed SM, Evans TG, Standing H, Mahmud S. Harnessing pluralism for better health in Bangladesh. Lancet. 2013 Nov 23;382(9906):1746–55.

2. Kirigia JM, Sambo LG, Sambo HB, Barry SP. Health systems performance in Sub-Saharan Africa: governance, outcome and equity. BMC Health Serv Res. 2011;11:1–8.

3. Rannan-Eliya RP, Anuranga C, Manual A, Sararaks S. Sri Lanka health system review. Health Syst Transit. 2019;9(4):1–180.

4. Marchildon GP. Canada’s universal health-care system: achieving its potential. CMAJ. 2020 Apr 14;192(15):E400–1.

5. Lim JFY, Cheong I. Singapore’s health-care system: key features, challenges, and shifts. Lancet. 2021 Sep;398(10295):1094–105.

6. Dorji T, Melendez-Torres GJ, Ward PR. Health inequities in the free healthcare system of Bhutan: a health policy analysis. Public Health Chall. 2022;1(2):e34.

7. Ahsan KZ, Alam S, Ahmed S, Ahmed T, Lucas H. Strengthening health service delivery and governance through the Urban Health Atlas in Bangladesh. BMC Health Serv Res. 2022;22(1):1428.

8. Cumming J, Tenbensel T, McDonald J. The 2022 restructure of Aotearoa New Zealand’s health system: early evaluations and implications. Health Policy. 2023;127(11):102959.

9. World Bank. Path to transform Bangladesh's health system for universal health coverage. Washington (DC): World Bank; 2023.

10. Sinha R, Jha A, Nagori G, Sinha S. Unveiling the ABCs: Identifying India's healthcare service gaps and reimagining accessible, affordable, and accountable health systems. J Family Med Prim Care. 2023;12(8):1483–9.
11. Tran BX, Nguyen LH, Latkin CA, Vu GT, Le HT, Nguyen HLT, et al. Vietnam's evolving healthcare system: notable successes and challenges. Health Serv Insights. 2023;16:11786329231194775.
12. Karki KB, Pandey AR, Silwal PR, Subedi R, Gurung G. Overcoming the challenges facing Nepal’s health system during political transition: a health system reform perspective. Health Res Policy Syst. 2023;21(1):9.
13. World Health Organization. Embracing system-wide reforms for equitable, sustainable health services: strengthening primary health care delivery and enhanced governance in Malaysia. Geneva: WHO; 2023.
14. Mengistu N, Moodie R, Danchin M, Biggs BA. Drivers of the Australian health system towards health care for all. Health Promot Int. 2023 Dec;38(6):daad131.
15. Perry C, Gadsby EW, Boyd A. Transforming health care: the policy and politics of service reconfiguration in the UK's four health systems. Health Policy. 2021 Nov;125(11):1395–403.
16. Ikegami N. Japan’s healthcare delivery system: from its historical evolution to current challenges. Int J Health Plann Manage. 2024;39(1):63–75.

পরিচ্ছেদ ৫: স্বাস্থ্য জনবল ব্যবস্থাপনা ও **পরিচ্ছেদ ৬:** স্বাস্থ্য জনবলের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

REFERENCES

1. Zapata T, Zakoji M, Kanda M, etal. Implementing a decade of strengthening the health workforce in the WHO South-East Asia Region: achievements and way forward for primary health care, WHO South-East Asia Journal of Public Health | February 2021 | 10(Suppl. 1);
2. Bangladesh Health Workforce Strategy 2015, Human resource management Unit, Ministry of Health and Welfare, government of the people’s Republic of Bangladesh;
3. Workload and Staffing Needs Assessment at Public Sector Health Care Facilities in Bangladesh; https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00THWQ.pdf
4. Assessment of All Healthcare Providers in BD, by WHO and UKaid
5. International Labour Organization. International Standard Classification of Occupations Structure, group definitions and correspondence tables. ISCO-08. Vol 1. 2012.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf (Accessed on 12 June 2020);

6. Government of Bangladesh. Bangladesh Standard Classification of Occupations-2012. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS);
7. *HRH data sheet 2019, MOHFW*
8. Post Graduate Medical Education in Bangladesh: A Situation Analysis, Centre for Medical Education (CME), *Supported by* HRM Unit Ministry of Health & Family Welfare (MOH&FW);
9. https://www.sweducarebd.com/2018/09/levels-of-health-care.html;
10. https://www.frontenders.in/blog/difference-between-primary-secondary-tertiary-medical-care.html
11. http://www.searo.who.int/nepal/mediacentre/2010_increasing_access_to_health_workers_in_remote_and_rural_areas.pdf

পরিচ্ছেদ ৭: অত্যাবশ্যকীয় ঔষধপত্র, চিকিৎসা প্রযুক্তি ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ

FURTHER READINGS

1. Ahmed SM, Rahman MM. *Stock-outs of essential medicines in government facilities: A persistent challenge*. BMC Health Serv Res. 2020;20(1):550.
2. Alam S. *Economic implications of rising medicine prices in Bangladesh*. Dhaka Univ J Econ. 2022;14(2):85–97.
3. Bangladesh Association of Pharmaceutical Industries. *Progress on API Industrial Park*. 2023.
4. Directorate General of Drug Administration. *API import dependency report*. 2022.
5. Directorate General of Drug Administration. *National Essential Medicine List of Bangladesh*. 2023.
6. Islam MN, Haque MA. *Emerging pharmaceutical market of Bangladesh*. J Pharmac Sci. 2019;45(2):110–120.
7. Rahman M. *Bangladesh's vaccine production capabilities during the COVID-19 crisis*. Lancet Infect Dis. 2022;22(5):629–634.
8. Rahman S, Ahmed T. *Bangladesh’s pharmaceutical response to the COVID-19 pandemic*. Lancet Glob Health. 2022;10(4):e554–e556.
9. WHO. *Out-of-pocket expenditures on health: Bangladesh in focus*. 2021.
10. World Bank. *Bangladesh health sector review*. 2020.
11. World Health Organization. *Global report on medicine access and affordability*. 2021.
12. https://www.ghsupplychain.org/news/digitalization-covid-19-commodities-supply-management-strengthens-health-delivery-bangladesh

13. https://dghs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/dghs.portal.gov.bd/page/4124d18a_ab99_40e2_8fef_ff4052948739/2024-04-23-07-09-48541d4dd55108137e50961ebcba0477.pdf
14. https://www.mtapsprogram.org/where-we-work/bangladesh/
15. https://www.ghsupplychain.org/news/mtaps-recommendations-speed-procurement-process-bangladesh
16. https://www.tbsnews.net/thoughts/revitalising-bangladeshs-healthcare-supply-chain-786406?

পরিচ্ছেদ ৮: স্বাস্থ্য তথ্যব্যবস্থা

FURTHER READINGS

1. World Health Organization. The world health report 2000: health systems: improving performance: World Health Organization; 2000.
2. World Health Organization. Monitoring the building blocks of health systems. Geneva, Switzerland: WHO Document Production Services. 2010.
3. Begum T, Khan SM, Adamou B, Ferdous J, Parvez MM, Islam MS, Kumkum FA, Rahman A, Anwar I. Perceptions and experiences with district health information system software to collect and utilize health data in Bangladesh: a qualitative exploratory study. BMC health services research. 2020;20:1-13.
4. Directorate General of Health Services. Central Human Resource Information System (HRIS) 2025 [Available from: https://hrm.dghs.gov.bd/public.
5. Hospital Services Management, Directorate General of Health Services. eAMS (Electronic Asset Management System) 2025 [Available from: http://hospitaldghs.gov.bd/eams-electronic-asset-management-system/.
6. Directorate General of Health Services. eLMIS for DGHS 2025 [Available from: http://elmis.dghs.gov.bd/.
7. Directorate General of Health Services. ICT Equipment Distribution System User Manual 2025 [Available from: https://app.dghs.gov.bd/lpdasystem//files/manual.pdf.
8. Directorate General of Health Services. DHIS 2 Online Database 2025 [Available from: https://dghs.portal.gov.bd/site/page/492255ac-64e8-4a48-ac34-173ebe6a4290.
9. directorate General of Health Services. Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) 2025 [Available from: http://crvs.gov.bd/
10. Md. Humayun Kabir ME. The Sustainability of the Electronic Management Information System of Bangladesh’s Directorate General of Family Planning. Chapel Hill, NC, USA: MEASURE Evaluation, University of North Carolina.T; 2020. Available from: https://www.data4impactproject.org/wp-content/uploads/2021/02/tr-20-411-1.pdf.
11. National Institute of Population Research and Training (NIPORT), Associates for Community and Population Research (ACPR), ICF International. Bangladesh Health Facility Survey 2022. Dhaka, Bangladesh; 2024.

12. Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, Government of The People's Republic of Bangladesh. Population and Housing Census 2022. Bangladesh; 2022. Available from: https://sid.portal.gov.bd/sites/default/files/files/sid.portal.gov.bd/publications/01ad1ffe_cfef_4811_af97_594b6c64d7c3/PHC_Preliminary_Report_(English)_August_2022.pdf.
13. National Institute of Population Research and Training (NIPORT), Mitra and Associates, ICF International. Bangladesh Demographic and Health Survey 2022. Dhaka, Bangladesh and Calverton, Maryland, USA; 2024.
14. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) and UNICEF Bangladesh. Progotir Pathey, Bangladesh Multiple Indicator Cluster Survey 2019, Survey Findings Report. . 2019.
15. National Institute of Population Research and Training (NIPORT). Urban Health Survey Dhaka; 2021.
16. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). Sample Vital Registration System (SVRS) 2023.
17. icddrb. Health and Demographic Surveillance Systems (HDSS) 2025 [Available from: https://www.icddrb.org/health-and-demographic-surveillance-systems.
18. Child Health Research Foundation. Demographic Surveillance 2025 [Available from: https://chrfbd.org/blogs/research-surveillance/Demographic%20Surveillance.
19. Refat MNH, Riaz BK, Islam AS, Joarder T, Khandaker M, Hassan MM. Limitations of District Health Information Software 2 (DHIS2) as a Decision Support Tool for Upazila Health Service Management in Bangladesh. Journal of Preventive and Social Medicine. 2023;42(2):43-50.
20. Sarker RD, Ahmed B-N, Akther SQ, Nuh MT, Hossain S, Lima IJ, Chowdhury N, Sifat MT. Designing a Secured Health Data Linkage for Prioritizing Policy and Improvising Implementation: A Quest for a New Horizon. Sch J App Med Sci. 2024;12:1753-68.
21. UNICEF. Health System Strengthening: Transforming the health information system in Bangladesh: Case Study Bangladesh.
22. MEASURE Evaluation. Implementation of the Electronic Management Information System in Bangladesh: Experience and Lessons Learned. Chapel Hill, NC, USA: MEASURE Evaluation, University of North Carolina; 2019.

পরিচ্ছেদ ৭: অত্যাবশ্যকীয় ঔষধপত্র, চিকিৎসা প্রযুক্তি ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ

FURTHER READINGS

17. Ahmed SM, Rahman MM. *Stock-outs of essential medicines in government facilities: A persistent challenge*. BMC Health Serv Res. 2020;20(1):550.
18. Alam S. *Economic implications of rising medicine prices in Bangladesh*. Dhaka Univ J Econ. 2022;14(2):85–97.
19. Bangladesh Association of Pharmaceutical Industries. *Progress on API Industrial Park*. 2023.

20. Directorate General of Drug Administration. *API import dependency report*. 2022.
21. Directorate General of Drug Administration. *National Essential Medicine List of Bangladesh*. 2023.
22. Islam MN, Haque MA. *Emerging pharmaceutical market of Bangladesh*. J Pharmac Sci. 2019;45(2):110–120.
23. Rahman M. *Bangladesh's vaccine production capabilities during the COVID-19 crisis*. Lancet Infect Dis. 2022;22(5):629–634.
24. Rahman S, Ahmed T. *Bangladesh's pharmaceutical response to the COVID-19 pandemic*. Lancet Glob Health. 2022;10(4):e554–e556.
25. WHO. *Out-of-pocket expenditures on health: Bangladesh in focus*. 2021.
26. World Bank. *Bangladesh health sector review*. 2020.
27. World Health Organization. *Global report on medicine access and affordability*. 2021.
28. https://www.ghsupplychain.org/news/digitalization-covid-19-commodities-supply-management-strengthens-health-delivery-bangladesh
29. https://dghs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/dghs.portal.gov.bd/page/4124d18a_ab99_40e2_8fef_ff4052948739/2024-04-23-07-09-48541d4dd55108137e50961ebcba0477.pdf
30. https://www.mtapsprogram.org/where-we-work/bangladesh/
31. https://www.ghsupplychain.org/news/mtaps-recommendations-speed-procurement-process-bangladesh
32. https://www.tbsnews.net/thoughts/revitalising-bangladeshs-healthcare-supply-chain-786406?

পরিচ্ছেদ ৮: স্বাস্থ্য তথ্যব্যবস্থা

FURTHER READINGS

1. World Health Organization. The world health report 2000: health systems: improving performance: World Health Organization; 2000.
2. World Health Organization. Monitoring the building blocks of health systems. Geneva, Switzerland: WHO Document Production Services. 2010.
3. Begum T, Khan SM, Adamou B, Ferdous J, Parvez MM, Islam MS, Kumkum FA, Rahman A, Anwar I. Perceptions and experiences with district health information system software to collect and utilize health data in Bangladesh: a qualitative exploratory study. BMC health services research. 2020;20:1-13.
4. Directorate General of Health Services. Central Human Resource Information System (HRIS) 2025 [Available from: https://hrm.dghs.gov.bd/public.
5. Hospital Services Management, Directorate General of Health Services. eAMS (Electronic Asset Management System) 2025 [Available from: http://hospitaldghs.gov.bd/eams-electronic-asset-management-system/.

6. Directorate General of Health Services. eLMIS for DGHS 2025 [Available from: http://elmis.dghs.gov.bd/.
7. Directorate General of Health Services. ICT Equipment Distribution System User Manual 2025 [Available from: https://app.dghs.gov.bd/lpdasystem//files/manual.pdf.
8. Directorate General of Health Services. DHIS 2 Online Database 2025 [Available from: https://dghs.portal.gov.bd/site/page/492255ac-64e8-4a48-ac34-173ebe6a4290.
9. directorate General of Health Services. Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) 2025 [Available from: http://crvs.gov.bd/
10. Md. Humayun Kabir ME. The Sustainability of the Electronic Management Information System of Bangladesh's Directorate General of Family Planning. Chapel Hill, NC, USA: MEASURE Evaluation, University of North Carolina.T; 2020. Available from: https://www.data4impactproject.org/wp-content/uploads/2021/02/tr-20-411-1.pdf.
11. National Institute of Population Research and Training (NIPORT), Associates for Community and Population Research (ACPR), ICF International. Bangladesh Health Facility Survey 2022. Dhaka, Bangladesh; 2024.
12. Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, Government of The People's Republic of Bangladesh. Population and Housing Census 2022. Bangladesh; 2022. Available from: https://sid.portal.gov.bd/sites/default/files/files/sid.portal.gov.bd/publications/01ad1ffe_cfef_4811_af97_594b6c64d7c3/PHC_Preliminary_Report_(English)_August_2022.pdf.
13. National Institute of Population Research and Training (NIPORT), Mitra and Associates, ICF International. Bangladesh Demographic and Health Survey 2022. Dhaka, Bangladesh and Calverton, Maryland, USA; 2024.
14. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) and UNICEF Bangladesh. Progotir Pathey, Bangladesh Multiple Indicator Cluster Survey 2019, Survey Findings Report. . 2019.
15. National Institute of Population Research and Training (NIPORT). Urban Health Survey Dhaka; 2021.
16. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). Sample Vital Registration System (SVRS) 2023.
17. icddrb. Health and Demographic Surveillance Systems (HDSS) 2025 [Available from: https://www.icddrb.org/health-and-demographic-surveillance-systems.
18. Child Health Research Foundation. Demographic Surveillance 2025 [Available from: https://chrfbd.org/blogs/research-surveillance/Demographic%20Surveillance.
19. Refat MNH, Riaz BK, Islam AS, Joarder T, Khandaker M, Hassan MM. Limitations of District Health Information Software 2 (DHIS2) as a Decision Support Tool for Upazila Health Service Management in Bangladesh. Journal of Preventive and Social Medicine. 2023;42(2):43-50.
20. Sarker RD, Ahmed B-N, Akther SQ, Nuh MT, Hossain S, Lima IJ, Chowdhury N, Sifat MT. Designing a Secured Health Data Linkage for Prioritizing Policy and Improvising Implementation: A Quest for a New Horizon. Sch J App Med Sci. 2024;12:1753-68.
21. UNICEF. Health System Strengthening: Transforming the health information system in Bangladesh: Case Study Bangladesh.

22. MEASURE Evaluation. Implementation of the Electronic Management Information System in Bangladesh: Experience and Lessons Learned. Chapel Hill, NC, USA: MEASURE Evaluation, University of North Carolina; 2019.

পরিচ্ছেদ ৯: স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়ন

REFERENCES

1. Bangladesh Bureau of Statistics. Public Opinion Survey on Health Sector Reform 2025. Final Report. Statistics and Informatics Division. Ministry of Planning. Government of the People's Republic of Bangladesh.

2. World Health Organization. 2010. The world health report: health systems financing: the path to universal coverage [Available from: https://iris.who.int/handle/10665/44371.

3. Kutzin J. Health financing for universal coverage and health system performance: concepts and implications for policy. Bulletin of the World Health Organization. 2013;91:602-11.

4. Bangladesh Bureau of Statistics. (2022). Population and housing census 2022: National report (Volume 1). Statistics and Informatics Division (SID), Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh.

5. World Bank. 2021. Population, total. World Bank Data. [Available from: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.

6. World Bank. Land area (sq. km). World Bank Data. [Available from: https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2.

7. Exemplars in Global Health. Neonatal and maternal mortality reduction in Bangladesh. [Available from: https://www.exemplars.health/topics/neonatal-and-maternal-mortality/bangladesh.

8. Primary health care systems (PRIMASYS): comprehensive case study from Bangladesh. Geneva: World Health Organization; 2017.

9. Institute for Health Metrics and Evaluation. GBD Results Tool. Global Health Data Exchange. 2021. [Available from: https://vizhub.healthdata.org/gbd-results.

10. National Institute of Population Research and Training (NIPORT) and ICF. 2024. Bangladesh Demographic and Health Survey 2022: Final Report. Dhaka, Bangladesh, and Rockville, Maryland, USA: NIPORT and ICF.

11. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) and UNICEF Bangladesh. 2019. Progotir Pathey, Bangladesh Multiple Indicator Cluster Survey 2019, Survey Findings Report. Dhaka, Bangladesh: Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).

12. Bangladesh Bureau of Statistics. 2023. Bangladesh Sample Vital Statistics 2023. Statistics and Informatics Division (SID), Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh.

13. UNICEF. Bangladesh Faces Critical Challenges in Maternal and Newborn Care. 2025. [Available from: https://www.unicef.org/bangladesh/en/press-releases/bangladesh-faces-critical-challenges-maternal-and-newborn-care-over-100000-child.

14. Feng C, Li R, Shamim AA, Ullah MB, Li M, Dev R, et al. High-resolution mapping of reproductive tract infections among women of childbearing age in Bangladesh: a spatial-temporal analysis of the demographic and health survey. BMC Public Health. 2021;21:1-16.

15. Osman FA. Health policy, programmes and system in Bangladesh: achievements and challenges. South Asian Survey. 2008;15(2):263-88.

16. National Institute of Population Research and Training (NIPORT), and ICF. 2020. Bangladesh Demographic and Health Survey 2017-18. Dhaka, Bangladesh, and Rockville, Maryland, USA: NIPORT and ICF.

17. Nguyen PH, Tauseef S, Khuong LQ, Das Gupta R, Billah SM, Menon P, et al. Underweight, overweight or obesity, diabetes, and hypertension in Bangladesh, 2004 to 2018. PloS one. 2022;17(9):e0275151.

18. World Bank. GDP (current US). World Bank Data. [Available from: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD.

19. International Monetary Fund. GDP. [Available from: https://data.imf.org/en/.

20. Health Economics Unit. Bangladesh National Health Accounts 1997-2020. Health Services Division. Ministry of Health and Family Welfare. Government of the People's Republic of Bangladesh.

21. World Bank. GDP per capita (current US). World Bank Data. [Available from: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD.

22. World Bank. Gini index. World Bank Data. [Available from: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI/

23. Bangladesh Bureau of Statistics. Household Income and Expenditure Survey 2022. Final Report. Statistics and Informatics Division. Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh.

24. United Nations Development Programme. 2025. Human Development Reports. [Available from: https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI.

25. Ministry of Finance, Government of the People’s Republic of Bangladesh. [Available from: https://mof.gov.bd/site/page/f9aab5cd-f644-47bb-bb94-a70cb64c15ce.

26. World Bank. Tax revenue. World Bank Data. [Available from: https://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.CN.

27. World Bank. Tax revenue (% of GDP). World Bank Data. [Available from: https://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS.

28. World Bank. Employment to population ratio, 15+, total (%) (modeled ILO estimate). World Bank Data. [Available from: https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS.

29. World Bank. Account ownership at a financial institution or with a mobile-money-service provider (% of population ages 15+). World Bank Data. [Available from: https://data.worldbank.org/indicator/FX.OWN.TOTL.ZS.

30. World Bank. Current health expenditure per capita (current US). World Bank Data. [Available from: https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PC.CD.

31. World Health Organization. Global Health Expenditure Database. [Available from: https://apps.who.int/nha/database.

32. World Bank. Domestic general government health expenditure per capita (current US). World Bank Data. [Available from: https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.GHED.PC.CD.

33. World Bank. Out-of-pocket expenditure (% of current health expenditure). World Bank Data. [Available from: https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS.

34. Sheikh N, Sarker AR, Sultana M, Mahumud RA, Ahmed S, Islam MT, et al. Disease-specific distress healthcare financing and catastrophic out-of-pocket expenditure for hospitalization in Bangladesh. International Journal for Equity in Health. 2022;21(1):114.

35. World Health Organization. SDG 3.8.2 Catastrophic health spending (and related indicators). The Global Health Observatory. [Available from: https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/financial-protection/GHO/financial-protection.

36. World Health Organization. Bangladesh health system review. 2015.: Manila: WHO Regional Office for the Western Pacific.

37. Health Economics Unit: Ministry of Health and Family Welfare: Government of Bangladesh. Shasthyo Surokhsha Karmasuchi (SSK): Concept Paper. 2014.

38. Chowdhury ME, Hasan MZ, Akter R, Mehdi GG, Ahmed MW, Chowdhury A, et al. Evaluation of the Pilot Shasthyo Shurokhsha Karmasuchi (SSK). USAID; 2021.

39. Health Financing Progress Matrix assessment: Bangladesh 2021 summary of findings and recommendations. Geneva: World Health Organization; 2022.

40. World Health Organization. Tracking Universal Health Coverage: 2017 Global Monitoring Report.

41. World Health Organization. UHC service coverage index. 2024. [Available from: https://data.who.int/indicators/i/3805B1E/9A706FD#:~:text=The%20indicator%20is%20an%20index,newborn%20and%20child%20health%202.

42. World Health Organization. UHC service coverage index (3.8.1). The Global Health Observatory. [Available from: https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/4834.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই প্রতিবেদনটি প্রণয়নে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তি পর্যায়ের নানান অংশীজন তথ্যাদি ও পরামর্শ দিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছেন। এ সকল অংশীজনের তালিকা পরবর্তী কয়েকটি পরিশিষ্টে প্রদান করা হয়েছে। এই তালিকার বাইরেও অনেক মানুষ, বিশেষত বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত জনমত জরিপে অংশগ্রহণকারীগণ, তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ সুচিন্তিত মতামত দিয়ে এই প্রতিবেদনকে ঋদ্ধ করেছেন। বিবিএস-এর কর্মকর্তা এবং গবেষকবৃন্দ অতি অল্প সময়ে জনমত জরিপ পরিচালনা করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন তাদের সকলের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। এ সকল বিদগ্ধ ও অভিজ্ঞজনের সহায়তা ব্যতীত এই প্রতিবেদন প্রণয়ন করা সত্যি কঠিন হতো। পরিশিষ্টের তালিকায়, অনধাবনাবশত, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম বাদ পড়লে তা মার্জনা করার অনুরোধ রইলো।

প্রতিবেদন প্রস্তুতির অন্তরালে স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মীদের একান্ত পরিশ্রম আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করছি। কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উপসচিব, কাজী শরীফ উদ্দিন আহমেদ; স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন), ডা. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন; তথ্য অধিদপ্তরের উপপ্রধান তথ্য অফিসার, বিবেকানন্দ রায়; স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ল্যাবকল সেন্টার-এর মেডিকেল অফিসার, ডা. সোয়াদ মোঃ ইকরামুল হক; স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মেডিকেল অফিসার (প্রশাসন শাখা), ডা. রিয়াজ মাহমুদ তমাল; ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, মো. কামরুজ্জামান সোহাগ। কমিশন কার্যালয়ের কর্মীদের মধ্যে রয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস শাখার কম্পিউটার অপারেটর, মোঃ মোবারক হোসেন; স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অফিস সহায়ক মোঃ মফিজুর রহমান চৌধুরী; ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অফিস সহায়ক, মোঃ রেজাউল করিম। আমরা সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৫ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নম্বর ৬৩-আইন/২০২৫।—সরকার ১৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নম্বর ৩৯২-আইন/২০২৪ দ্বারা গঠিত স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশনের কাজ সুসম্পন্ন করিবার স্বার্থে কমিশনকে ৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত সময় প্রদান করিল।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. শেখ আব্দুর রশীদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd
(১০৭৯)
মূল্য : টাকা ৪.০০

CS CamScanner
CS CamScanner

পরিশিষ্ট-২

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, নভেম্বর ১৮, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১/১৮ নভেম্বর, ২০২৪

এস.আর.ও. নম্বর ৩৯২-আইন/২০২৪—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্যসেবাকে জনমুখী, সহজলভ্য ও সার্বজনীন করিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব করিবার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদনক্রমে 'স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন' নামে নিম্নরূপ কমিশন গঠন করিল:

(ক) **স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন**

১)	প্রফেসর এ কে আজাদ খান, সভাপতি, ডায়াবেটিক সমিতি	- কমিশন প্রধান
২)	প্রফেসর ডা. মোহাম্মদ জাকির হোসেন জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য ইনফরমেটিক অধিদপ্তর, বিএসএমএমইউ	- সদস্য
৩)	প্রফেসর লিয়াকত আলী, চেয়ারম্যান, পথিকৃৎ ফাউন্ডেশন	- সদস্য
৪)	প্রফেসর ডা. সায়েবা আক্তার, গাইনোকলজিস্ট	- সদস্য
৫)	প্রফেসর ডা. নায়লা জামান খান, শিশু স্নায়ুতন্ত্র বিভাগ	- সদস্য
৬)	জনাব এম এম রেজা, সাবেক সচিব	- সদস্য
৭)	প্রফেসর ডা. মোজাহেরুল হক সাবেক আঞ্চলিক উপদেষ্টা (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চল), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা	- সদস্য

৮) ডা. আজহারুল ইসলাম, আইসিডিডিআর,বি - সদস্য

৯) প্রফেসর ডা. সৈয়দ মো: আকরাম হোসেন - সদস্য
স্কয়ার ক্যান্সার সেন্টার, স্কয়ার হাসপাতাল

১০) প্রফেসর ডা. সৈয়দ আতিকুল হক - সদস্য
চীফ কনসালটেন্ট, গ্রীন লাইফ সেন্টার ফর রিউম্যাটিক কেয়ার এন্ড রিসার্চ

১১) ডা. আহমেদ এহসানুর রাহমান - সদস্য
বিজ্ঞানী, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য বিভাগ, আইসিডিডিআর,বি

১২) জনাব উমায়ের আফিফ, ৫ম বর্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ - সদস্য।

(খ) কমিশন অবিলম্বে উহার কার্যক্রম শুরু করিবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল মতামত বিবেচনা করিয়া পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট হস্তান্তর করিবে;

(গ) কমিশনের কার্যালয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে;

(ঘ) কমিশনের প্রধান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সরকারি পদমর্যাদা, বেতন/সম্মানি ও সুযোগ-সুবিধা পাইবেন; তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন প্রধান বা কোন সদস্য অবৈতনিক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতে চাহিলে বা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিতে না চাহিলে তাহা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা অনুমোদন করিতে পারিবেন;

(ঙ) প্রজাতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা কমিশনের চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহসহ সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করিবে;

(চ) কমিশন প্রয়োজনে উপযুক্ত ব্যক্তিকে কমিশনের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে; এবং

(ছ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এ কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. শেখ আব্দুর রশীদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

পরিশিষ্ট-৩

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ২৭, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ২৭ মার্চ, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নম্বর ১০০-আইন/২০২৫—সরকার স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন গঠন সংক্রান্ত ১৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নম্বর ৩৯২-আইন/২০২৪-এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:—

উপরি-উক্ত প্রজ্ঞাপনের দফা (ক)-এর ক্রমিক নং ২, ৮, ৯, ১১ ও ১২ এবং তদবিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রির পরিবর্তে যথাক্রমে নিম্নরূপ ক্রমিক নং ২, ৮, ৯, ১১ ও ১২ এবং তদবিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"২)	ডক্টর আবু মোহাম্মদ জাকির হোসেন সভাপতি, কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট	- সদস্য
৮)	ডা. আজহারুল ইসলাম খান কনসালট্যান্ট, আইসিডিডিআর,বি	- সদস্য
৯)	অধ্যাপক ড. সৈয়দ মোঃ আকরাম হোসেন স্কয়ার ক্যান্সার সেন্টার, স্কয়ার হাসপাতাল	- সদস্য
১১)	ড. আহমদ এহসানূর রহমান বিজ্ঞানী, আইসিডিডিআর,বি	- সদস্য
১২)	উমাইর আফিফ শিক্ষার্থী, ৫ম বর্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ	- সদস্য।"।

২। এই প্রজ্ঞাপন ১৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. শেখ আব্দুর রশীদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd
(৩৩২৩)
মূল্য : টাকা ৪.০০

CamScanner

পরিশিষ্ট-৪

৪.১ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর সঙ্গে "স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন"-এর সভা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর সঙ্গে "স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন"-এর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ও গঠনমূলক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলিতে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম এবং উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মোঃ সাইদুর রহমান, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব ডা. মোঃ সারোয়ার বারী, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মোঃ আবু জাফর, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাজমুল হোসেন, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ সাইফুল্লাহিল আজম, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের মহাপরিচালক ড. মোঃ এনামুল হক, নিপোর্টের মহাপরিচালক ডা. আশরাফী আহমদ, এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আনোয়ার হোসেন আকন্দ, এবং যুগ্ম-সচিব সহ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

৪.২ সাক্ষাৎ আলোচনায় অংশগ্রহণকারী অংশীজনদের গ্রুপভিত্তিক তালিকা

বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তর / সংস্থা

১. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৩. স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর
৪. পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৫. ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
৬. নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
৭. কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট
৮. জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রক সংস্থা

১. বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল
২. বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল
৩. বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ
৪. বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
৫. বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিল
৬. বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ

রাজনৈতিক সংগঠন

১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল
২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৩. জাতীয় নাগরিক কমিটি

চিকিৎসক ও শিক্ষার্থী সংগঠন

১. ডক্টরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
২. ন্যাশনাল ডক্টরস ফোরাম
৩. ডক্টরস ফর হেল্থ এন্ড ইনভায়রনমেন্ট

মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

১. বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

অন্যান্য সংস্কার কমিশন

১. নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন
২. শ্রম সংস্কার কমিশন

উন্নয়ন সহযোগী (একক)

১. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
২. ইউনিসেফ,বাংলাদেশ
৩. বিশ্বব্যাংক, বাংলাদেশ

উন্নয়ন সহযোগী কনসোর্টিয়াম

১. **ডেভেলপমেন্ট পার্টনার কনসোর্টিয়াম –**
- JICA
- USAID
- FAO
- US CDC
- WHO
- ADB
- UNODC
- FCDC **ইত্যাদি**

পেশাজীবী সামাজিক সংগঠন

১. দি মেডিকোলিগাল সোসাইটি অব বাংলাদেশ
২. মেডিকেল সোসাইটিস অব ইউকে, ইউএসএ এন্ড অস্ট্রেলিয়া
৩. বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি
৪. বাংলাদেশ গ্যাস্ট্রোএনটারোলজি সোসাইটি
৫. কমিউনিটি ক্লিনিক হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার সমিতি

বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

১. DORP
২. CUP

৩. বেলা
৪. নারীপক্ষ
৫. ব্র্যাক
৬. বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি
৭. সেন্টার ফর ইঞ্জুরি প্রিভেনশনস এন্ড রিসার্চ
৮. ব্লাস্ট

শিক্ষক-গবেষক-সমাজকর্মী-সংগঠক-সাংবাদিক ইত্যাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. Humayun Kabir, Former Senior Secretary, MOHFW
২. Md. Ashadul Islam, Former Senior Secretary, MOHFW
৩. Dr Hossain Zillur Rahman, Executive Chairman and Convenor, UHC Forum
৪. Dr. Syeed Abdullah Muhammad Taher, Nayeb-e-Ameer, Bangladesh Jamaat-e-Islami.
৫. Prof. Moudud Alamgir Pavel – Chairman, Media Cell, BNP
৬. Prof Nazrul Islam,President, Bangladesh Medical Accredition Council
৭. Prof. Dr. Md. Zaforallah Chowdhury, Vice President,BMDC
৮. Professor Dr. Choudhury Mahmood Hasan, Former Director, Drug Administration
৯. Prof. Mushtaque Raza Chowdhury, Convenor, Bangladesh Health Watch
১০. Dr. Tahmeed Ahmed, Executive Director, ICDDR'B
১১. Prof. Dr. Syed Abdul Hamid, IHE, Dhaka University
১২. Major General Md. Shameem Haidar,DG,Drug Administration
১৩. Dr. Pinaki Bhattacharya, eminent blogger and social media activist.
১৪. Dr. Sahina Subhan Mitu, Member, Public Administration Reform Commission.
১৫. Shireen Parveen Haque, chief of Women's Affairs Reform Commission
১৬. Dr Halida Hanum Akhter, Member, Women's Affairs Reform Commission
১৭. Maheen Sultan, Member, Women's Affairs Reform Commission
১৮. Fawzia Karim Firoze, Member, Women's Affairs Reform Commission
১৯. Kalpona Akter, Member, Women's Affairs Reform Commission
২০. Sumaiya Islam, Member, Women's Affairs Reform Commission
২১. Nirupa Dewan, Member, Women's Affairs Reform Commission
২২. Ferdousi Sultana, Member, Women's Affairs Reform Commission
২৩. Nishita Zaman Niha, Member, Women's Affairs Reform Commission
২৪. Ahmed Jamshed Mohamed, WHO Representative to Bangladesh
২৫. Prof Dr. Md. Shahinul Alam, Vice Chancellor, Bangladesh Medical University
২৬. Prof. Dr. Omar Faruque Yusuf, Vice Chancellor, Chittagong Medical University
২৭. Prof. Dr. Md. Ismail Patwary, Vice Chancellor, Sylhet Medical University
২৮. Prof. Dr. Md. Jawadul Haque, Vice Chancellor, Rajshahi Medical University
২৯. Prof. Dr. Abdul Wadud Chowdhury, Director, NICVD.
৩০. Syed Sultan Uddin Ahmed, Chair, Labour Reform Commission

৩১. Prof Dr. Md. Salim Reza, Dean, Faculty of Pharmacy, Dhaka University
৩২. Prof. Dr. Farhad Halim Donar – Chief Adviser, DAB
৩৩. Dr. Rafiqul Islam – Health Affairs Secretary, BNP
৩৪. Prof. Dr. Harun Al Rashid – President, DAB
৩৫. Dr. Abdus Salam – Secretary General, DAB
৩৬. Prof. Dr. Rafiqul Kabir (Labu) – Assistant Secretary, Family Welfare Affairs, BNP
৩৭. Dr. Md. Sirajul Islam, Vice President, DAB
৩৮. Mrs. Jahanara Begum,Assistant Secretary, Nurses and Health Assistants,BNP
৩৯. President, Nurses Association
৪০. Dr. Kazi Saifuddin Bennoor – Vice President, DAB
৪১. Prof. Mohammed Nazrul Islam, President, National Doctors' Forum (NDF)
৪২. Prof. Md. Mahmud Hossain,General Secretary, National Doctors' Forum (NDF)
৪৩. Dr. Ashraful Alam, Jatiya Nagorik Committee
৪৪. Dr. Tajnuva Jabben, Jatiya Nagorik Committee
৪৫. Dr. Tasnim Jara, Jatiya Nagorik Committee
৪৬. Monira Sharmin, Jatiya Nagorik Committee
৪৭. Dr. Jahidul Islam, Jatiya Nagorik Committee
৪৮. Sagar Barua, Jatiya Nagorik Committee
৪৯. Arpita Shyama Deb, Jatiya Nagorik Committee
৫০. Dr. Moniruzzaman, Jatiya Nagorik Committee
৫১. Dr. Jahirul Islam Shakil – Treasurer, DAB
৫২. Dr. Md. Mehedi Hasan, Senior Joint Secretary General, DAB
৫৩. Dr. Parvez Reza Kakon – Assistant Health Affairs Secretary, BNP
৫৪. Prof. Dr. Nazrul Islam – Assistant Health Affairs Secretary, BNP
৫৫. Dr. Mostafa Aziz Sumon, International Affairs Secretary, DAB
৫৬. Dr. Md. Munshi Hossan, Bangladesh Jamaat-e-Islami
৫৭. Dr. Mohammad Zahangir , Bangladesh Jamaat-e-Islami
৫৮. Dr. Md. Atiar Rahman , Bangladesh Jamaat-e-Islami
৫৯. Prof. Md. Abdul Khaleque, Bangladesh Jamaat-e-Islami
৬০. Prof. Dr. Mostaque Rahim – President, Medico-Legal Society of Bangladesh
৬১. Professor Dr Taskina Ali,Council Member,BMDC
৬২. Professor Dr M Nuruzzaman Khan,Treasurer, BMDC
৬৩. Dr. Nizam Uddin Ahmed, Chair of CSO, GAVI
৬৪. Prof Humayun Kabir,Registrar,Bangladesh Medical Asccredition Council
৬৫. Dr. Minhazul Abedin, Jatiya Nagorik Committee
৬৬. Dr. Kamar Uddin Muzakkir, Jatiya Nagorik Committee
৬৭. Dr. SK Md. Saeid Hossain, Jatiya Nagorik Committee
৬৮. Dr. Ataur Rahman Razib, Jatiya Nagorik Committee
৬৯. Md. Mehedi Hasan, Jatiya Nagorik Committee
৭০. Md. Masuduzzaman, Jatiya Nagorik Committee
৭১. Dr. Mahmuda Alam Mitu, Jatiya Nagorik Committee
৭২. Dr. Md. Abdullah (Tihan), Jatiya Nagorik Committee

৭৩. Dr. Humayun Kabir Himu, Jatiya Nagorik Committee

৭৪. Dr. Md. Abdul Asad, Jatiya Nagorik Committee

৭৫. Tarequl Islam, Jatiya Nagorik Committee

৭৬. Nahida Bushra Talukder, Jatiya Nagorik Committee

৭৭. Yamin Shahriar, Jatiya Nagorik Committee

৭৮. Samanta Sharmeen, Jatiya Nagorik Committee

৭৯. Dr. A K M Ziaul Haque, NDF

৮০. Dr. Md. Ruhul Quddus, NDF

৮১. Professor Md. Aminul Haque Khan, NDF

৮২. Professor Dr. Khorshed Ali Miah, NDF

৮৩. Professor Dr. Muhammad Zahangir, NDF

৮৪. Dr. Md. Shahadat Hossain, NDF

৮৫. M Nuruzzaman, WHO Bangladesh Country Office.

৮৬. Rajendra Bohara, Team Leader, Immunization and Vaccine,Team, WHO Bangladesh Country Office.

৮৭. Anupama Hazarika, The team leader of CDS WHO Bangladesh Country Office.

৮৮. Sangay Wangmo, Team Leader, Health System, WHO Bangladesh Country Office.

৮৯. Jun Nakagawa, Technical Officer, WHO Bangladesh Country Office.

৯০. Pallav Bhatt, Technical Officer,WHO Bangladesh Country Office.

৯১. Dr Syed Mahfuzul Huq , NPO-NCD,WHO Bangladesh Country Office.

৯২. Dr. Mohammad Sabbir Haider, Senior Scientific Officer (Epidemiology), IEDCR

৯৩. Md. Nasser Shahrear Zahedee – Chairman, Radiant Pharmaceuticals Ltd.

৯৪. Abdul Muktadir – Chairman & Managing Director, Incepta Pharmaceuticals Ltd.

৯৫. Muhammad Halimuzzaman, Deputy Managing Director & CEO, Healthcare Pharmaceuticals Ltd.

৯৬. Dr. Md. Zakir Hossain – Delta Pharma Limited

৯৭. M Mosaddek Hossain, Managing Director, Unimed Unhealth

৯৮. Harunur Rashid, Chairman, Globe Pharmaceuticals Ltd

৯৯. Major General Md. Mustafizur Rahman (Retd)

১০০. CEO, BAPI

১০১. Prof. Dr Selim Reza,Dean, Pharmacy Faculty

১০২. Dhaka University

১০৩. Dr. Md Hasan Kawsar,Secretary General

১০৪. Bangladesh,Pharmaceuticals Society

১০৫. Muhammad Mahbubul Hoque

১০৬. Secretary, Bangladesh Pharmacy Council

১০৭. Prof Dr.Priti Prasun Barua,Principal,Rangamati Medical College

১০৮. Maya Van Den Ent – Chief of Health, UNICEF Bangladesh

১০৯. Deepika Mehrish Sharma – Chief of Nutrition, UNICEF Bangladesh

১১০. Dewan Md. Emdadul Hoque – Health Manager, MNCAH, UNICEF Bangladesh

১১১. Dr. Golam Mohiuddin Khan Sadi is a Nutrition Specialist at UNICEF

১১২. Iffat Mahmud is a Senior Operations Officer at the World Bank

১১৩. Atia Hossain – Senior Health Economist, World Bank

১১৪. Dr. Vibhavendra Raghuyamshi - Chief of Health, UNFPA
১১৫. Dr. Abu Sayed Hasan - SRHR Specialist, UNFPA
১১৬. Dr. Saima Khan - Country Director, UNAIDS
১১৭. Iffat Mahmud - Sr Operations Officer, World Bank
১১৮. Md. Rafi Hossain - Operations Officer, World Bank
১১৯. Atia Hossain - Sr Economist (Health), World Bank
১২০. Rashid Zaman - Health Adviser, British High Commission
১২১. Dr. Shafiqul Islam - Health Adviser, British High Commission
১২২. Farzana Sultana - Development Advisor, Global Affairs Canada
১২৩. Dr. Momena Khatun - Health Technical Specialist (FSSP), Global Affairs Canada
১২৪. Susan Cornelia Kaydos-Daniels - CDC Country Director, CDC
১২৫. Sabera Sultana - National Professional Officer, WHO
১২৬. Mushfiqua Satiar - Senior Policy Advisor, The Netherlands Embassy
১২৭. Dr. Mohammad Zahirul Islam - Health Advisor, Embassy of Sweden
১২৮. Dr. Samina Choudhury - Infectious Disease Team Lead, USAID
১২৯. Dr. Umme Meena - Family Health Team Lead, USAID
১৩০. Patricia Mengech - Director, Office of Population, Health and Nutrition, USAID
১৩১. Belay Mengistu - Deputy Director, Health and Nutrition, USAID
১৩২. Miranda Beckman - Health and Development Officer, USAID
১৩৩. Ms. Rie Yamane - Health Advisor, JICA
১৩৪. Ms. Salma Akter - Deputy Program Manager, JICA
১৩৫. Mr. Yamada Eiji - Senior Representative, JICA
১৩৬. Maya - Chief of Health, UNICEF
১৩৭. Soloman - Health Manager (HSS), UNICEF
১৩৮. Emdad - Health Manager (MNCAH), UNICEF
১৩৯. Than Cho - Health Officer, UNICEF
১৪০. Nondini Lopa - Liaison Officer, GFF, World Bank/GFF
১৪১. Rui Liu - Senior Health Specialist and Country Focal, Asian Development Bank
১৪২. Dr. Motahara Tasneem - National Technical Advisor, FAO
১৪৩. Md AbuTaher - National Programme Coordinator, UNODC
১৪৪. Ms. Joy Kemp - International Midwife Specialist, UNFPA
১৪৫. Deepika Mehrish Sharma - Chief, Nutrition Section, UNICEF
১৪৬. Pallav Bhatt - Technical Officer, WHO
১৪৭. Prof. M Mostafa Zaman,Executive Editor,BMU Journal
১৪৮. Mr.Md. Abdullah,Former Joint Secretary,MOHFW
১৪৯. Dr. Md. Badiuzzaman, NPO-Planning & Management (Retd), WHO Bangladesh
১৫০. Dr. Md. Aminul Hasan, Consultant, UNICEF
১৫১. Prof. Dr. Md. Kamrul Alam,Pricipal,Dhaka Medical Cellege
১৫২. Dr. Arif Mahmud,Director,Medical Service,Evercare hospital
১৫৩. Prof. Khondokar Abdullah Al Mamun,CMED Health Limited
১৫৪. Dr. Subrata Paul, Focal Point, NHA and UHC, Health Economics Unit, MOHFW
১৫৫. Shishir Moral, Special Correspondent, Daily Prothom Alo.

১৫৬. Dr. Mohammad Zahirul Islam, Health Advisor, Embassy of Sweden

১৫৭. Dr. MD. Touhidul Islam, NPO-Health Financing, WHO Bangladesh

১৫৮. Mohammed Mizanur Rahman, Director General, Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)

১৫৯. Md. Alamgir Hossen – Deputy Director, BBS

১৬০. Aklima Khatun – Deputy Director, BBS

১৬১. Dr. B.M. Atiquzzaman – Faculty, College of Medicine, University of Central Florida, and Convenor, Planetary Health Academia

১৬২. Mohammad Raihan Kawser, Divisional Commissioner, Barisal,

১৬৩. Mohammad Delwar Hossain, District Commission, Barisal.

১৬৪. Dr. Md. Zaker Ullah – The Harley Street Clinic, The Holly Private Hospital and Barts , Health NHS Trust and Trustee, Planetary Health.

১৬৫. Dr. Sahina Subhan Mitu, Member, Public Administration Reform Commission.

১৬৬. Dr. Md. Ruhul Amin

১৬৭. Dr. Md. Barkat Ullah

১৬৮. Dr. Md. Rezwana Kabir

১৬৯. Md. Mahfuzul Haque

১৭০. Dr. Md. Ashraful Asad

১৭১. Dr. Nazmul Haque

১৭২. Dr. Mobarak Hossain

১৭৩. Dr. Mahmudur Rahman Chowdhury

১৭৪. Dr. Md. Hasibul Alam

১৭৫. Dr. Shahrima Tanzina Ritu

১৭৬. Dr. Md. Mejbah Ul Haque

১৭৭. Progga Parmita Roy

১৭৮. Dr. Mohammad Shariful Ahsan Rakib

১৭৯. Dr. Arafat Tannum

১৮০. Dr. Md. Mayeen Uddin Chisty

১৮১. Iqbal Hossen Nishat

১৮২. Md. Ratul Islam

১৮৩. Dr. Imran Ibn Nasir

১৮৪. Mehedi Hasan

১৮৫. Dr. Mohammad Anayet Ullah

১৮৬. Dr. Md. Rajibul Islam

১৮৭. Dr. Sohel Rana Rony

১৮৮. Dr. Md. Abrar Hamim

১৮৯. Dr. Md. Habibur Rahman

১৯০. Zabir Hossain

১৯১. Md. Habibur Rahman

১৯২. Dr. Maria Hasan, Civil Surgeon, Civil Surgeon,Barisal

১৯৩. Dr. Shyamal Krishna Mondal, Divisional Director of Health for Barisal Division

১৯৪. UHFPO,Babujonj,Barisal

১৯৫. Civil Surgeon, Jhalakathi

১৯৬. Civil Surgeon, Patuakhali
১৯৭. District Family Planning Officer (DFPO),Barisal
১৯৮. Dr. Md. Kabiruzzaman – President, DAB Barisal
১৯৯. Dr. Nazrul Islam – Secretary, DAB Barisal
২০০. Prof Dr Aziz Rahim,Former Principal,Sher E Bangla Medical College
২০১. Dr Mohsin Howlader,Clinical Oncologist,Sher E Bangla Medical College
২০২. Dr. Hedayet Ullah,Intern Doctor, Sher E Bangla Medical College Hospital
২০৩. Brig. General Dr. AKM Mashiul Munir, Director, SBMC
২০৪. Professor Jasim Uddin,Principal, Chittagong Medical College
২০৫. Director, Chittagong Medical College Hospital
২০৬. Dr. Jahangir Alam,Civil Surgeon, Chittagong
২০৭. Dr. Aung Swi Prue Marma,Divsional Director,Chittagong
২০৮. Mahfuza Zerin,UNO,Mirsari Upzilla
২০৯. Dr. Mohammed Minhaz Uddin,UHFPO, Upzilla Health complex,Mirsari, Chittagong
২১০. Dr.Nurul Karim Chowdhury,Vice President,DAB
২১১. Dr Mahmudur Rahman,Secretary, NDF,Chittagong Medical College Branch
২১২. Prof MA Faiz
২১৩. Prof Emran Bin Yunus
২১৪. Prof Sajjad Mohamad Yusuf, Clinical Oncologist,CMCH
২১৫. Mohammad Habib Ullah,Deputy Commissioner, Rangamati
২১৬. Dr. Nuyen Khisa, Civil Surgeon,Rangamati
২১৭. UHFPO,Kaptai Upzilla Health Complex,Rangamati
২১৮. Dr.Swei Mi Prue Roaza,UHFPO,Kawkhali,Rangmati
২১৯. Dr.Nilo Kumar Tanchangya
২২০. Member, Regional Council,Chittagong Hill Tracts
২২১. Panni Chakma, Member, Zila Porishad,Rangamati
২২২. Pratul Dewan, Member, Zila Porishad,Rangamati
২২৩. Minhaz Morshed, Member, Zila Porishad,Rangamati
২২৪. Sagorika Roaza,Zila Porishad,Rangamati
২২৫. Firoz Sarkar, Divisional Commissioner, KhulnaDivisional Commissioner, Khulna
২২৬. Mohammed Saiful Islam, District Commissioner, Khulna
২২৭. Director,Khulna Medical Collge Hospital
২২৮. Professor Dr. Din-Ul Islam, Principal, Khulna medical College
২২৯. Prof. Dr. Shaikh Md. Akhtar-Uz-Zaman, President, DAB,Khulna
২৩০. Dr Mohsin Alam Farazi,NDF, Khulna
২৩১. Dr. Monowar Tariq Sabu,DAB,Rajshai
২৩২. UHFPO,Ramphal Upzilla Health Complex,Bagerhat
২৩৩. Civil Surgeon, Rangpur
২৩৪. Civil Surgeon, Kurigram
২৩৫. Divisional Director, Rangpur
২৩৬. Brigadier General Ashikur Rahma,D irector,Rangpur Medical College
২৩৭. Prof Md. Shariful Islam, Principal,Rangpur Medical College

২৩৮. Dr. Jahan Afroza Khanam Lucky, Clinical Oncologist, Rangpur Medical College
২৩৯. Dr. Kazi Mohiuddin, NDF Representative, Rajshahi
২৪০. Dr. Morshed zaman Mia, NDF Rreprentative,Rajshai
২৪১. UHFPO,Taragonj Upzilla Health Complex,,Rangpur
২৪২. UHFPO,Rajarhat Upzilla Health Complex,,Kurigram
২৪৩. UNO,Rajarhat
২৪৪. UNO, Pirgonj,Rangpur
২৪৫. Afia Akhter,District Commissioner,Rajshahi
২৪৬. Brigadier General F M Shamim Ahmmed,
২৪৭. Director,Rajshai Medical college hospital
২৪৮. Prof. Dr. Khandker Md. Faisal Alam, Principal, Rajshahi Medical College
২৪৯. Professor. Dr. Ashim Kumar Ghosh,Clinical Oncologist,
২৫০. Rajshahi medical College
২৫১. Dr. Md. Mofakhkharul Islam,DAB, Rajshahi
২৫২. Dr. Kazi Mohiuddin,NDF, Rajshai
২৫৩. Prof Dr Md Ziaur Rahman Chowdhury,
২৫৪. Principal,Sylhet MAG Osmani Medical College
২৫৫. Prof. Dr. Shahriar Hussain Chowdhury – Principal, Northeast Medical College
২৫৬. Prof. Dr. Md. Abed Hossain – Principal, Jalalabad Ragib-Rabeya Medical College
২৫৭. Prof Dr.Md Nazmul Islam,President,DAB Sylhet District Barnch
২৫৮. Prof Shamimur Rahman, President,SOMC DAB Branch, Sylhet
২৫৯. Prof. Dr. Md. Shahnewaz Chowdhury – Anesthesiologist, Sylhet Women's Medical College
২৬০. Dr Md Zahed Hossain,Central Oranizing Secretary,NDF,Sylhet
২৬১. Dr Muhibur Rahman Jewel,Joint Secretary,NDF,Sylhet
২৬২. UHFPO,Fenchugonj Upzilla Health Complex,Sylhet
২৬৩. Civil Surgeon,Sylhet
২৬৪. Divisional Director,Sylhet
২৬৫. Kazi Ashraful Islam. MD,Shahjalal Fertilizer Company Ltd,Fenchuganj, Sylhet.
২৬৬. Civil Surgeon,Munshigonj
২৬৭. UHFPO, Sirajdikhan Upzilla Health Complex, Munshigonj
২৬৮. UHFPO, Sreenagar, Upzilla Health Complex, Munshigonj

ইন্টার্ন ও তরুণ চিকিসকবৃন্দ

১. Dr Md Ruhul Amin
২. Dr Md Barkat Ullah
৩. Dr Md Rezwan Kabir
৪. Md. Mahfuzul Haque
৫. Dr. Md. Ashraful Asad
৬. Dr. Nazmul Hque
৭. Dr. Mobarak Hossain
৮. Dr. Mahmudur Rahman Chowdhury

৯. Dr. Md. Hasibul Alam
১০. Dr. Shahrima Tanzina Ritu
১১. Dr. Md. Mejbah Ul Haque
১২. Progga Parmita Roy
১৩. Dr. Mohammad Shariful Ahsan Rakib
১৪. Dr. Arafat Tannum
১৫. Dr. Md. Mayeen Uddin Chisty
১৬. Iqbal Hossen Nishat
১৭. Md. Ratul Islam
১৮. Dr. Imran Ibn Nasir
১৯. Mehedi Hasan
২০. Dr. Mohammad Anayet Ullah
২১. Dr. Md. Rajibul Islam
২২. Dr. Sohel Rana Rony
২৩. Dr. Md. Abrar Hamim
২৪. Dr. Md. Habibur Rahman
২৫. Zabir Hossain
২৬. Md Habibur Rahman

৪.৩ প্রতিবেদন তৈরিতে বিবিধভাবে পরামর্শদানকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ-এর তালিকা

১. Mr. ASM Waheeduzzaman, Income Tax Commissioner (Rtd.)
২. Dr. Mohiuddin Ahmed, Assistant Professor of Oncology, Dalhousie University, Canada
৩. Dr. Md. Anisur Rahman, Scientist and Acting Senior Director, Maternal and Child Health Division, ICDDR, B
৪. Prof Md Abdul Mannan, Director and Head, Department of Neonatology & Infant-ICU, Ad-din Women's Medical College
৫. Dr. Shams El Arifeen, Maternal and Child Health Division, ICDDR'B
৬. Prof Abdul Kalam Azad, Former DG, DGHS
৭. Prof Dr ARM Luthful Kabir, Prof of Pediatrics, Ad-din Women's Medical College
৮. Dr. Jena Hamadani, Emeritus Scientist, MCHD Administration, Maternal and Child Health Division, ICDDR'B
৯. Prof. Helal Uddin Ahmed, Child Adolescent and Family Psychiatry, National Institute of Mental Health (NIMH)
১০. Dr. Nahid Mahjabin Morshed, Professor of Child and Adolescent Psychiatry and Former Chairman, Department of Psychiatry, BSMMU. Immediate Past President, Bangladesh Association for Child and Adolescent Mental Health (BACAMH)
১১. Dr. Selina Husna Banu, Professor of Pediatric Neurology, and clinical Neurophysiologist, Head of the department of Neurology and Development, Dr. MR Khan Shishu Hospital and ICH, Mirpur
১২. Prof. (Dr.) Mahmood Ahmed Chowdhury, Head of the Department, Paediatrics and Director
১৩. Dr. Md. Khairuzzaman Mozumder,Secretary, Finance Division, Ministry of Finance

১৪. Dr. Toh Hang Chong,Deputy Director,National Cancer Centre,Singapore
১৫. Dr. Taufique Joarder, Associate Professor, National University of Singapore.
১৬. Dr Omar Khayyam, Additional Secretary, GoB
১৭. Prof Mohammad Saiful Islam,President,BMDC
১৮. Dr. Md. Mosaddeque Hossain Biswas, Council Member, BMDC and Chairman, Welfare Trust, BPMPA)
১৯. Dr. Syed Moshfiqur Rahman,Assoc Prof,Uppsala Universitet,Sweden.

২০. Maj. Gen. Dr. Mohammad Masudul Alam Majumder, Consultant Physician General (CPG) DGMS
২১. Dr. Rounak Khan, Chief of Party, Save the Children
২২. Brigadier General Neelima Akhter,Director,Medical Services,Bangldesh Army
২৩. Crystal Bay, Lead Manager (International Cooperation), Ministry of Health (MOH), Singapore
২৪. Belinda Goh, Assistant Director (International Cooperation), Ministry of Health (MOH).
২৫. Professor London Lucien Ooi Singapore General Hospital and NCCS
২৬. Ms. Vijaya Rao,Director,International Collaboration,SingHealth and Deputy Director, Clinical Health Systems Programme,NUS Global Health Institute
২৭. Dr. AKM Alamgir,Director, Access Alliance,Toronto,Canada
২৮. Dr. Syed Moshfiqur Rahman,Assoc Prof ,Global Health,Uppsala Universitet.
২৯. Dr ASM Nurullah ,Family Physicain,Toronto,Canada
৩০. Dr Enamul Karim,Director,PEN Consulting,UK
৩১. Prof Tracy,Director,Nursing,Singapore GeneralHospital
৩২. Dr Anwarul Azim,Vice Chairman,Biopharma Limited
৩৩. Prof Abdus Salam, Former Chairman, Urology, BMU
৩৪. Prof Dr Aliya Shanaz,Head,Radiotherapy Department,Dhaka Medical College
৩৫. Prof Dr. Sabera Khatun,Founder Chairman,Gynae Oncology Department,Bangladesh Medical University
৩৬. Dr. Ahmed Sharif Shuvo
৩৭. Autism & Child Development Center
৩৮. Dr. Shahinur Kabir, Secretary, Bangladesh Palliative Care Network
৩৯. Chattogram Ma O Shishu Hospital and Institute
৪০. Dr. Aneire Ehmar Khan, Research Associate,Dept. of Epidemiology & Biostatistics, Imperial College London
৪১. Dr. Md. Ziaul Matin,Health Specialist,UNICEF India
৪২. Dr. Tareq Abdullah, Consultant Clinical Oncologist, Beatson Oncology Centre NHS, Scotland
৪৩. Dr SK Farid,Oncoplastic Breast Surgeon,NHS,UK
৪৪. Dr Hasan Imam Al Hadi,Consultant Colorectal Surgeon, NHS, BCHUB
৪৫. Dr. Imtiaz Ahmed, Lead Clinical Oncologist, South end University NHS Trust
৪৬. Dr Hossain Imam Al Hadi,ENT Surgeon,NHS,UK
৪৭. Dr Syeda Saiyara Annoor,Associate Member,World Medical Association
৪৮. Shahiduzzaman,News Editor,Daily New Age

৪৯. Omar Sharif Channel ২৪ and Trustee, Planetary Health Academia
৫০. Mark Heeb,Country Manager, Roche Bangladesh
৫১. Muzahid Shuvo, Special Correspondent, Ekhon TV
৫২. Muhammad Amir Abdullah, Head of Marketing, Oncology, Renata
৫৩. Mahmudul Haque, Executive Vice President, Beacon Pharmaceuticals
৫৪. Iqbal Masud,Director of Health and WASH Sector,Dhaka Ahsania Mission.
৫৫. Hamim Ul Kabir, Special Correspondent, Naya Diganta
৫৬. Prof. Golam Abu Zakaria, Medical Physics, Teaching Hospital, Cologne University, Germany.
৫৭. Dr. Md. Anwarul Islam, Former President,Medical Physics Society of Bangladesh
৫৮. Dr Raihan Rabbani,Sr Consultant,ICU,Square Hospital
৫৯. Dr. Tasbirul Islam, Clinical Associate Professor,Indiana University Health Arnet and Trustee, Planetary Health Academia.
৬০. Md. Jahirul Islam, Counselor (Hajj), Bangladesh Hajj Office, Jeddah, Saudi Arabia
৬১. Dr. Mustak Ibn Ayub, Associate Prof, Department of Genetic Engineering and Biotechnology,Dhaka University.
৬২. Monir Haider,Journalist.
৬৩. Prof Abdul Kalam Azad, Former DG, DGHS
৬৪. Prof. Dr. Shah Ali Akbar Ashrafi, Director MIS
৬৫. Dr. Khondaker Tanvir Mehdi, Health Advisory Council
৬৬. Professor Hasanat Alamgir, Public Health Forum

৪.৪ বিভিন্ন পক্ষ হতে প্রাপ্ত লিখিত সংস্কার প্রস্তাবকের তালিকা

মন্ত্রণালয়/সরকারি সংস্থা

১. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
৩. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৫. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৬. পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
৭. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (বিদ্যালয় -১ অধিশাখা)
৮. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৯. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১০. বাংলাদেশ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
১১. বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
১২. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (সড়ক নিরাপত্তা শাখা)
১৩. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
১৪. স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর
১৫. পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
১৬. ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
১৭. নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
১৮. বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ

১৯. বাংলাদেশ মেডিকেল এডুকেশন অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
২০. মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতল
২১. রেডিও থেরাপি বিভাগ, শের ই বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল
২২. বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ
২৩. ২৫০ বেড জেনারেল হাসপাতাল, ফেনী

দাতা সংস্থা

১. ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন
২. ইউনিসেফ
৩. ডেভেলপমেন্ট পার্টনার কনসোর্টিয়াম

বিভিন্ন সংগঠন

১. ডক্টর এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
২. ন্যাশনাল ডক্টরস ফোরাম
৩. জাতীয় নাগরিক কমিটি
৪. বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি
৫. বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক এসোসিয়েশন
৬. পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশন,বাংলাদেশ
৭. মেডিকেল সোসাইটিস অব ইউকে ইউএসএ এন্ড অস্ট্রেলিয়া
৮. অবসটেট্রিকাল এন্ড গাইনীকোলজিকাল সোসাইটি অব বাংলাদেশ
৯. বাংলাদেশ মেডিকেল স্টুডেন্টস সোসাইটি
১০. চিকিৎসা ঐক্য পরিষদ
১১. ইপিডেমিওলজি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
১২. বাংলাদেশ সোসাইটি অব কার্ডিওভাসকুলার ইন্টারভেনশন (বিএসসিআই)
১৩. ডক্টরস ফর হেলথ এন্ড ইনভায়রনমেন্ট
১৪. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পরিবার পরিকল্পনা) এসোসিয়েশন
১৫. বাংলাদেশ ডিপ্লোমা মেডিকেল এসোসিয়শেন
১৬. ডিপ্লোমা ইন ইলেক্ট্রো-মেডিকেল ইন্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশন
১৭. মেডিকেল ডিভাইস ব্যবসায়ী সমিতির সম্মিলিত জোট
১৮. বাংলাদেশ ফার্মাসিস্টস্ ফোরাম
১৯. কনজুরমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)
২০. ফুড সেফটি মুভমেন্ট
২১. নিউট্রিশন টাস্ক গ্রুপ
২২. নিউট্রিশন সামিট
২৩. বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ক্লিনিকাল বায়োকেমিষ্ট
২৪. হোমিও সেবা সংস্থা
২৫. বৈষম্য বিরোধী হোমিও আন্দোলন বাংলাদেশ
২৬. বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল ফেডারেশন
২৭. সম্মিলিত ফিজিওথেরাপি শিক্ষার্থী পরিষদ
২৮. বাংলাদেশ ফিজিও থেরাপি সোসাইটি
২৯. বাংলাদেশ ননকমিউনিকেবল ডিজিজ ফোরাম
৩০. বাংলাদেশ এপিআই এন্ড ইন্টারমিডিয়ারেইস ম্যানুফেকচারারস এসোসিয়েশন

৩১. ঢাকা ইউনিভার্সিটি মাইক্রোবায়োলজি এলামনি এসোসিয়েশন
৩২. ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট
৩৩. বাংলাদেশ হেল্থ এসিসট্যান্ট এসোসিয়েশন
৩৪. পরিবার পরিকল্পনা সরকারি চিকিৎসক সমিতি
৩৫. বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি
৩৬. জাতীয় মেডিকেল স্টুডেন্টস ফোরাম
৩৭. বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং টেকনোলজি
৩৮. বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক পরিষদ
৩৯. বাংলাদেশ রেস্টুরেন্ট ওনার্স এসোসেয়েশন
৪০. বাংলাদেশ সোসাইটি অব মেডিকেল বায়োকেমিস্ট
৪১. রাঙ্গামাটি জেলার সকল স্যানিটারী ইনস্পেক্টর ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকবৃন্দ
৪২. দি মেডিকোলিগাল সোসাইটি অব বাংলাদেশ
৪৩. বাংলাদেশ ডেন্টাল কাউন্সিল (বিডিসি)
৪৪. ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ণ, সিলেট
৪৫. দি মেডিকেল সোসাইটি অব বিডি
৪৬. ডিজিটাল হেলথ ফোরাম
৪৭. বাংলাদেশ এসোসিয়শন অব ফার্মাসিউটিকেল ইন্ড্রাস্ট্রিজ

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

১. Prof M A Hai, President Former Director, National Institute of Cancer Research, Dhaka, Bangladesh
২. Prof MA Faiz,Former DGHS
৩. Prof Emran Bin Yunus, Former Principal, Chittagong Medical College
৪. Dr Atifur Rahman. Clinical Director, Cardiologist, Gold Coast Health, Australia
৫. Dr. Khandkar Ali Kawsar, Consultant, Neurosurgeon, Lothian, Edinburgh
৬. Dr. Khondkar Siddique-e-Rabbani, Founding Chairman, Dept of Biomedical Physics & Technology, Dhaka University
৭. Dr. Abu Jamil Faisel, President, Public Health Association
৮. Dr. Nizam Uddin, Chair of CSO, GAVI
৯. Prof. Dr. Md. Ismail Patwary, Vice Chancellor, Sylhet Medical University
১০. Dr. Shakil Farid, Cardiac Surgeon, Royal Papworth Hospital, Cambridge, and Trustee Planetary Health Academia
১১. Prof. Taufiq Hasan,Dept. of BME,Group Leader, Health Research Group, BUET
১২. Prof. Dr. Md. Abdul Halim, Principal, Kumudini Medical College
১৩. Dr. Shafi U. Bhuiyan, Asso. Professor, School of Public Health, University of Memphis, TN, USA
১৪. Dr. S M Asib Nasim, Freelance Consultant, Health, and Environmental Health
১৫. Mohammed Islam Shakhu, Consultant,Psychiatry, Auckland, Auckland, New Zealand
১৬. Prof. Sohel Reza Chowdhury, Dept Epidemiology & Research, NHFR
১৭. Dr. Md. Bazlul Gani Bhuiyan,Vascular Surgeon,Labaid Hospital
১৮. Dr Reazul Islam Rafi,Associate Member,World Medical Association
১৯. Dr. Md. Aminul Islam

২০. Dr. Gazi Salauddin
২১. Md. Asif Iqbal
২২. Dr. Md. Humayun Kabir
২৩. Mr. Probal Kumar Mondol
২৪. Dr. Habibur Rahman
২৫. Dr. Ghosh
২৬. Dr. Shahidul
২৭. Dr. Khandoker Sujon
২৮. Prof. Md. Ziaur Rahman Chowdhury
২৯. Dr. Md. Rafiuzzaman
৩০. Prof. Md. Abdus Sattar
৩১. Engr. Shadab Mahmud
৩২. Dr. Mobassarul Islam
৩৩. Dr. Emran Murshed
৩৪. Dr. Kabiruzzaman
৩৫. Dr. Md. Iftekhar Ali
৩৬. Dr. Yousuf Ali
৩৭. Mr. Kibria
৩৮. Professor Dr. Md. Tafazzal Hossain Khan
৩৯. Aslam Ahmed
৪০. Dr. Asraf
৪১. Dr. Md. Aminul Hasan
৪২. Dr. Saifuddin Kitchlu
৪৩. MOMCHFP-Shibchar
৪৪. Mr. Abdur Rashid
৪৫. Mr. Shoyeb Mahamud
৪৬. Dr. Md. Aminur Rahman

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ

১. মৌমাছি
২. শিউলি মহিলা উন্নয়ন সংস্থা
৩. সমজা উন্নয়ণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
৪. শেয়ার ফাউন্ডেশন
৫. প্রগতি কৃষি উন্নয়ন সংস্থা
৬. শুচিতা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
৭. ডাস বাংলাদেশ
৮. মাইক্রো হেল্থ প্লাস সফ্টওয়্যার
৯. নিশান
১০. আদর্শ শাপলা উন্নয়ন সংস্থা
১১. পিপলস্ ডেভেলপমেন্ট সোসাইট
১২. থ্রী স্টার অর্গানাইজেশন

১৩. প্রজন্ম মানবিক অধিকার উন্নয়ন কেন্দ্র
১৪. প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন
১৫. ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার
১৬. বাঁচতে শেখায় উন্নয়ণ সংস্থা
১৭. ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ
১৮. অগ্রগামী সমাজ উন্নয়ণ কেন্দ্র
১৯. বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন
২০. প্রতিভা বিকাশ কেন্দ্র
২১. সম্প্রীতি সোসাইটি
২২. বস্তি উন্নয়ণ ও কর্ম সংস্থা
২৩. বাডাস
২৪. ওয়ারবি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
২৫. ইলমা
২৬. সোস্যাল এন্ড ইনভায়রনমেন্টাল ইনক্রিসিং এনালাইসিস মোভমেন্ট
২৭. রানি
২৮. সুস্বাস্থ্যের বাংলাদেশ
২৯. বাংলাদেশ আরবান হেল্থ নেটওয়ার্ক
৩০. সিমেড হেলথ লিমিটেড
৩১. কাপ
৩২. হামর্দদ ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ
৩৩. বেলা
৩৪. রোশ (Roche)
৩৫. প্রত্যাশা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা
৩৬. অগ্রগামী সমাজ উন্নয়ণ কেন্দ্র (অসুক) ব্রাক্ষ্মনবাড়িয়া
৩৭. যুব দক্ষতা উন্নযণ ফাউন্ডেশন
৩৮. DORP
৩৯. Urban Health Network
৪০. বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ